পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর



সম্পাদনা
মুনতাসীর মামুন মহিউদ্দিন আহমেদ

মুনতাসীর মামুন মহিউদ্দিন আহমেদ
সম্পাদনা
পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর

যারা অখণ্ড পাকিস্তানের চেতনার কফিনে সর্বশেষ পেরেক পুঁতে দিয়ে পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাত্রির ঘটনা ঘটায় এবং সেই নিষ্ঠুরতা পুরো নয় মাস বজায় রাখে, একটি গণতান্ত্রিক অর্জনের ফলকে নস্যাৎ করে দিয়ে দেশের এক অংশে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী নির্যাতন, নিপীড়ন হওয়া সত্ত্বেও কেন পাকিস্তানের অপরাংশের জনসমাজের প্রায় সকল স্তরে নির্লিপ্ততা দেখায় বা এজন্য বাঙালীদের আগাগোড়া দোষারোপ করে, কী প্রেক্ষাপটে, কেন এমনটি করেছিল, একাত্তরের ঘটনাবলীকে তারা তখন কীভাবে মূল্যায়ন করেছিল বা এখনো করে– সে ব্যাপারে খুব সামান্য কথাবার্তাই আমরা এ পর্যন্ত শুনেছি।

পাকিস্তানীদের কাছ থেকেও এসব বিষয়ে কোন খোলামেলা বক্তব্য বা মূল্যায়নও আশা করা যায় না, কারণ বিষয়টি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড ও তার পরাজয়কে ঘিরে আবর্তিত এবং পাকিস্তানী সমাজজীবন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্পষ্টভাবে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার মত স্বাধীনতা ভোগ করে না।

এই প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত বিষয়ে যতটা সম্ভব তথ্য আহরণের লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে এই বইটি প্রণীত হয়েছে। যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সামরিক-বেসামরিক ১১ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আমলা, ৯ জন রাজনীতিবিদ ও বাকী ৮ জন সিভিল সমাজের প্রতিনিধি। সাক্ষাৎকারদানকারীদের অধিকাংশ প্রত্যক্ষভাবে পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ে নীতি নির্ধারণে ও একাত্তরের যুদ্ধে জড়িত ছিলেন। যাঁরা জড়িত ছিলেন না তাঁরাও পাকিস্তান সমাজের সচেতন অংশের প্রতিনিধি।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা বুঝতে গেলে বা এ বিষয়ে কিছু রচনা করতে গেলে সংকলিত এই সাক্ষাৎকারগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(অপর ফ্লাপে দেখুন)

টাকা ৩৫০.০০

মুনতাসীর মামুন, পিএইচ ডি (জ. ১৯৫১) ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও একজন স্বনামধন্য গবেষক। তিনি তাঁর বিশ্লেষণাত্মক অথচ প্রাঞ্জল রচনার জন্য লেখালেখির জগতে সুপরিচিত। সমাজ-গবেষণার যখন যে বিষয়টি তিনি সম্পাদনা করেছেন, তা-ই পৃথক ও ব্যতিক্রমী মাত্রা লাভ করেছে। একক ও যৌথভাবে প্রবন্ধ-গবেষণা বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ষাটের কাছাকাছি। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর পঞ্চাশের অধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রে সাহসী কলাম লেখক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সমধিক। লেখক **১৯৯২** সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মহিউদ্দিন আহমেদ (জ. ১৯৪৪) সংবাদপত্রে সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেন। তিনি প্রায় ৪ বছর লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের পাকিস্তান শাখায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এ সময় তাঁর প্রকাশনার নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপক পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ হয়। তিনি স্বাধীনতার পর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, বাংলাদেশ-এর প্রধান নির্বাহী নিযুক্ত হন। তিনি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠা থেকে এ পর্যন্ত তার প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকরূপে কর্মরত আছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই। তিনি দেশে ও বিদেশে পুস্তক প্রকাশনা বিষয়ে নিয়মিত লেখালেখি করে আসছেন। দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উন্নয়ন বিষয়েও তাঁর রচিত নিবন্ধ প্রায়শ প্রকাশিত হয়। পুস্তক প্রকাশনায় বিরল অবদান রাখার জন্য তিনি ১৯৯১ সালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন।

ISBN 984 05 0274 3

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস
৬১ মতিঝিল বা. এ.
পোস্ট বক্স ২৬১১
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৯৫৬ ৫৪৪৩
E-mail: upl@bttb.net.bd, upl@bangla.net
Website: www.uplbooks.com

পুনঃমুদ্রণ ২০০৬
প্রথম প্রকাশ ২০০৫

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

ISBN 984 05 0274 3

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল বা.এ., ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ। মুদ্রণ: মার্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা।

Pakistanider Dristite Ekattar (Bangladesh Liberation War: Views from Pakistan) edited by Muntasir Mamun and Mohiuddin Ahmed, published by The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh.

যাঁদের জীবনোৎসর্গে এই দেশ
তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে

সূ চি প ত্র

প্রকাশকের কথা

ধারণাগতভাবে এই প্রকল্পটির সূত্রপাত একান্তই কাকতালীয়। এই গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থকার মহিউদ্দিন আহমেদ ১৯৯৬ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত একাডেমী অব লেটারস-এর আয়োজিত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে যোগদান করার সুযোগ লাভ করেন। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্কোন্নয়ন, '৭১-এর কর্মকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা প্রার্থনার সম্ভাব্যতা ও তার সুফল ইত্যাদি নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রকাশ্য আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে মহিউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে তাঁর এক পুরাতন বন্ধুর দেখা হয়। তখন তাঁর ঐ বন্ধুর সঙ্গে ছিলেন জেনারেল রাও ফরমান আলীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র। এ সময় মহিউদ্দিন আহমেদের আকস্মিক ধারণা হয়, '৭১ সালের ভূমিকা নিয়ে তিনি যদি জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাক্ষাৎকার নিতে চান তিনি তাতে সম্মত হবেন কি না। বলাবাহুল্য তাৎক্ষণিক যোগাযোগে জেনারেল রাও ফরমান আলী এ ব্যাপারে সম্মতি জানান। একই সূত্রে জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে যোগাযোগ হলে তিনিও সাক্ষাৎকারদানে সম্মত হন। অবশ্য সেই পালায় এঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়নি। পরে ঢাকায় ফিরে তিনি এ বিষয়ে বিশিষ্টজনদের সঙ্গে আলাপ করেন। তাঁরা প্রকল্প হিসাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করে আরও বৃহত্তর পরিসরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সাক্ষাৎকারমূলক একটি গবেষণা চালানোর পরামর্শ দেন। অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন এই উদ্যোগে সাগ্রহে যোগ দেন, যোগ দেন বিশিষ্ট সাংবাদিক আফসান চৌধুরী। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ও এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রফেসর রেহমান সোবহান এই প্রকল্পে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আংশিক আর্থিক সহায়তাদানের ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য যে, এ সময় বাংলাদেশে মহলবিশেষে এ ধরনের একটি ধারণা প্রচারিত ছিল যে, একাত্তরের ঘটনা সম্পর্কে পাকিস্তানীরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলবে। অপরদিকে দীর্ঘদিনের মৌনতা ভেঙে পাকিস্তানের কেউ কেউ এ সময় একাত্তর

সম্পর্কে মতামত ও আত্মস্মৃতি প্রকাশ করতে শুরু করেছেন, যাতে মনে হতে পারে পাকিস্তানের একটি মহল একাত্তরের কঠিন সত্যকে স্বীকার করতে উৎসুক।

উল্লেখ্য যে, এই সাক্ষাৎকারগুলি আয়োজন করতে প্রায় এক বছরকাল অতিবাহিত হয়। করাচীস্থ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের নির্বাহী পরিচালক আমিনা সাঈদ সাক্ষাৎকার-দানকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাঁদের সম্মত করানোর ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দেন। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসের ৫ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে এই সাক্ষাৎকারগুলি গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারগুলি করাচী, লাহোর, ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে নেয়া হয়। পুরো সাক্ষাৎকারপর্ব টেপে ধারণ করা হয়, অবশ্য অনেক সাক্ষাৎকারদানকারীই অফ দি রেকর্ড কিছু বক্তব্য রাখেন যা সঙ্গতকারণে টেপে ধরা হয়নি এবং ঐ একই কারণে সাক্ষাৎকারে ঐসব বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিশেষ ব্যস্ততার কারণে জনাব আফসান চৌধুরী কেবল করাচীতে গৃহীত সাক্ষাৎকারগুলিতে অংশ নিতে সমর্থ হন। মোট ৩৫ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হলেও এই গ্রন্থে মোট ২৮টি সাক্ষাৎকার সন্নিবেশিত হয়েছে। ৭টি সাক্ষাৎকার বাদ দেবার কারণ এই যে, হয় এই সাক্ষাৎকারগুলিতে উল্লেখ করার মত তেমন উপাদান ছিল না, নতুবা আমাদের টেপে ঐসব সাক্ষাৎকার ত্রুটিপূর্ণভাবে রেকর্ড করা হয়েছে, যাকে পূর্ণতাদান করা একান্তই অসম্ভব।

সাক্ষাৎকারগুলি নেয়া হয়েছে ইংরেজিতে, অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে উর্দুও ব্যবহৃত হয়েছে। টেপ থেকে এই সাক্ষাৎকারগুলি কাগজে-কলমে দাঁড় করানো এবং তাকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর ঘটানোর দুরূহ কাজটি করেছেন *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক আফতাব হোসেন।

সাক্ষাৎকারগুলি ১৯৯৯ সালে ধারাবাহিকভাবে *দৈনিক জনকণ্ঠ*-এ প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এগুলি *দৈনিক জনকণ্ঠ*-এ প্রকাশ করেছিলেন। সাক্ষাৎকারগুলি অনেক আগেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণে গত ছয় বছরে সম্ভব হয়নি। সুধীমহলের বারংবার তাগিদে এবং এই সংস্থার উপদেষ্টা সম্পাদক বদিউদ্দিন নাজিরের বিশেষ উদ্যোগের ফলে দেরিতে হলেও এটি গ্রন্থাকারে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

প্রকাশক

ভূমিকা

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আমাদের গবেষণার একটি বড় সীমাবদ্ধতা এই যে, এ কাজটি প্রায় একপাক্ষিকভাবে ঘটে চলেছে। সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ তিনটি—পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারত। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বাংলাদেশে আগ্রহের অভাব নেই, নানান স্তর থেকে একাত্তরের বিষয়টির আখ্যান রচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে অপর দুই পক্ষ পাকিস্তান ও ভারতের ভূমিকা এখনো তেমনভাবে উঠে আসেনি। বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি আত্মস্মৃতি ও বিশ্লেষণাত্মক রচনা ব্যতীত তেমন কিছু পাওয়া যায় না। অবশ্য একক উদ্যোগে সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির এ বিষয়ে ঐ সময়কার ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার প্রয়াস চালিয়েছেন, তাঁর গৃহীত কিছু কিছু সাক্ষাৎকার ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইতোমধ্যে পত্রপত্রিকায় স্থান পেয়েছে, কিন্তু পুস্তকাকারে সেগুলি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি।

কিন্তু যারা অখণ্ড পাকিস্তানের চেতনার কফিনে সর্বশেষ পেরেক পুঁতে দিয়ে পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাত্রির ঘটনা ঘটায় এবং সেই নিষ্ঠুরতা পুরো নয় মাস বজায় রাখে—ষোলই ডিসেম্বরের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যার যবনিকাপাত—কী প্রেক্ষাপটে, কেন এমনটি করেছিল, একাত্তরের ঘটনাবলীকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে—সে ব্যাপারে খুব সামান্য কথাবার্তাই আমরা এ পর্যন্ত জেনেছি। একটি গণতান্ত্রিক অর্জনের ফলকে নস্যাৎ করে দিয়ে দেশের এক অংশে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী নির্যাতন, নিপীড়ন হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের অপরাংশের জনসমাজের প্রায় সকল স্তরে নির্লিপ্ততা দেখানো বা বাঙালীদের আগাগোড়া দোষারোপ করার বিষয়টি আরও আশ্চর্যজনক। তাতে স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে, পাকিস্তান আন্দোলনে এবং পাকিস্তানের ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ সত্যিকারভাবে কোন দিন সহোদর হিসাবে গ্রহণ করেছিল কি না।

পাকিস্তানীদের কাছ থেকে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে কোন খোলামেলা বক্তব্য বা মূল্যায়ন আশা করা যায় না এ কারণে যে, বিষয়টি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড ও তার পরাজয়কে ঘিরে আবর্তিত এবং ঐ পাকিস্তানী সমাজজীবন মত

রোয়েদাদ, জহির, রফি রেজা, তারিক, ফরমান এবং নিয়াজী। এঁদের মধ্যে নিয়াজীই পরবর্তীকালে পাকিস্তানে উপেক্ষিত হয়েছেন। তাঁকে ধরা হতো পাকিস্তানের পরাজয়ের প্রতীক হিসেবে।

এখানে আলতাফ গওহরের কথাও উল্লেখ করতে হয়। আইয়ুবী আমলে তিনি ছিলেন প্রভাবশালী নীতিনির্ধারক। এ সময়কাল নিয়ে তিনি একটি বইও লিখেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি চাকুরিতে ছিলেন না কিন্তু নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ফলে অনেক অজানা তথ্য জানা যায় তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে।

দ্বিতীয় ভাগে আছেন ৯ জন রাজনীতিবিদ। এঁদের মধ্যে বেনজীর তখন সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না। কিন্তু ভুট্টোর কন্যা এবং তাঁর রাজনীতির উত্তরাধিকারী ও বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রভাবক হিসাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুবাশ্বির হাসান, ফারুক আহমদ লেঘারি* এবং মেরাজ মোহাম্মদ খান। তেহরিক-ই-ইশতিকলালের প্রধান আসগর খান। জামায়াতের গফুর আহমেদ। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত রেজা কাযেম, ওসমান বালুচ ও আহমদ সেলিম।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের আবার তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ডানপন্থী আসগর খান ও গফুর আহমদ। মধ্যপন্থী বা মৃদুবাম পিপিপির রাজনীতিবিদরা। বাকিরা ছিলেন বাম ঘেঁষা। উল্লেখ্য, ডানপন্থী হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র আসগর খান প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের হামলার বিরোধিতা করেছিলেন। আর আহমদ সেলিম ছিলেন ন্যাপ কর্মী ও কবি। তিনিও পাকিস্তানী হামলার বিরোধিতা করার জন্য জেলে যান। অবশ্য, আসগর খান পাকিস্তানী রাজনীতিতে ব্যতিক্রম। সামরিক বাহিনীর লোক হওয়া সত্ত্বেও সামরিক শাসনের তিনি বিরোধিতা করে এসেছেন। পিপিপি মধ্যপন্থী বা বাম ঘেঁষা হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে জামায়াতের সঙ্গে তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেছে।

বাকিরা হলেন সিভিল সমাজের প্রতিনিধি, যাঁদের অধিকাংশ সাংবাদিক বা কলামিস্ট। এম ভি নকভী, আই এ রহমান, মিনহাজ বার্না ও খালেদ আহমেদ সাংবাদিক। প্রথম তিনজন তখন সাংবাদিক হলেও খালেদ ছিলেন কূটনীতিবিদ। নকভী, রহমান ও বার্না তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক ও ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সামরিক জান্তার হামলার সমর্থন তাঁরা করেননি। খালেদ মাহমুদ অ্যাকাডেমিক, বাম ঘেঁষা। তাহেরা মাযহার আলী ও কুররাতুল আইন সমাজকর্মী। প্রথম জনের পারিবারিক ঐতিহ্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। তিনি ১৯৭১ সালেও সে ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হননি। এ থেকে প্রতিটি গ্রুপ বা ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যাবে।

এ ছাড়া করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের কিছু ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক, সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সাক্ষাৎকারও আমরা নিয়েছিলাম। কিন্তু এতদিন পর টেপ ও ট্রান্সক্রিপ্ট হারিয়ে যাওয়ায় এখানে তা উল্লেখ করা গেল না। তবে, উৎসাহী পাঠক ইউপিএল

* উল্লেখ্য যে, লেঘারির সাক্ষাৎকারে মূলত একাত্তরের সঙ্গে সম্পর্কহীন পাকিস্তানের সমসাময়িক রাজনীতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। সে হিসাবে বইটিতে সাক্ষাৎকারটিকে বেমানান মনে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের চলতি রাজনীতি ও ক্ষমতার কাঠামো সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু তথ্য থাকায় সাক্ষাৎকারটিকে এই বইতে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রকাশের এমন স্বাধীনতা ভোগ করে না যাতে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্পষ্টভাবে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা যায়। বস্তুত সে কারণেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাফাই গাইতে দু'একজন জেনারেল তাঁদের আত্মস্মৃতির আড়ালে বাংলাদেশের বিষয়টি বলার চেষ্টা করেছেন। মুষ্টিমেয় যে দু'একজন অসামরিক ব্যক্তি এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরাও উপরোক্ত কারণে যথেষ্ট রাখঢাক রেখে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি বাস্তবতা। ২৩ বছরের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস রচনায় তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ইত্যাদির দায় মূলত বাঙালীর উপরই বর্তায়। উদ্যোগটি তাই আমাদের নেয়ার কথা। কিন্তু নানা কারণে, বিশেষ করে সুযোগের অভাবে পাকিস্তান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের হয়ে ওঠেনি।

সেই সুযোগ কীভাবে আসে প্রকাশকের কথায় সে কথা বলা হয়েছে। আমরা স্থির করি যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে এ বিষয়ে আমরা পাকিস্তানীদের জানার চেষ্টা করব, তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা একে একটি ডকুমেন্ট হিসাবে ধরে রাখার প্রয়াস চালাব। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে আমরা করাচী রওয়ানা হই ও মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে ফিরে আসি। এই সময়ে আমরা করাচী, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি ও ইসলামাবাদে ৩৫ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। সেখান থেকে ২৮ জনের সাক্ষাৎকারের সংকলন বর্তমান গ্রন্থটি।

পাকিস্তানে আমরা যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি তাঁদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগে আছেন ১৯৭১ সালে সক্রিয় সামরিক-বেসামরিক ১১ জন উর্ধতন কর্মকর্তা ও আমলা। এঁদের প্রায় সবাই ১৯৪৭ সালের পর কোন না কোন সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত ছিলেন অথবা কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিষয় দেখাশোনা করতেন। এঁদের কেউ কেউ ১৯৭১ সালে নীতিনির্ধারণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সক্রিয় ছিলেন। সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল গুলাম উমর, জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজী, জেনারেল রাও ফরমান আলী ও ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী। সাক্ষাৎকারে অন্তর্ভুক্ত তারিক রহমান অবশ্য ক্যাডেট হিসাবে প্রশিক্ষণরত ছিলেন কাকুলে। প্রশিক্ষণ শেষে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করে কমিশন ত্যাগ করেন। উমর ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাদের একজন। ইয়াহিয়া সৃষ্ট নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিবের দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। ফরমান ও নিয়াজী ছিলেন বাংলাদেশে। একজন সামরিক প্রধান হিসাবে, অন্যজন বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে। রোয়েদাদ খান, হাসান জহির, আলমদার রাজা, কামরুল ইসলাম ও আফতাব আহমদ ছিলেন তৎকালীন সিভিল সার্ভিসের (সিএসপি ক্যাডার)। এর মধ্যে কামরুল ইসলাম ও রোয়েদাদ খান ছিলেন সিনিয়র এবং কেন্দ্রের সচিব। রোয়েদাদ তথ্য সচিব হিসাবে শুধু নীতিনির্ধারণই নয়, তা বাস্তবায়নেও ছিলেন সক্রিয় ও প্রভাবশালী। আলমদার রাজা ছিলেন ঢাকার ডিভিশনাল কমিশনার। হাসান জহির যুক্ত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে। আফতাব আহমদ ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। এঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে মন্ত্রী হয়েছিলেন রোয়েদাদ খান ও রাও ফরমান আলী। বই লিখেছেন (বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাসহ) সিদ্দিকী,

প্রকাশিত গ্রন্থ মুনতাসীর মামুন রচিত *সেইসব পাকিস্তানীতে* তাঁদের আলোচনার বিবরণ পাবেন।

আমরা যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁরা সবাই আমাদের সঙ্গে সজ্জনের মতো আচরণ করেছেন। বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেননি, উত্তেজিত হননি এবং সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। প্রয়োজন না হলে আমরা তাঁদের প্রশ্ন করিনি বরং তাঁদেরই কথা বলতে দিয়েছি। সাক্ষাৎকার পর্বগুলি টেপে ধারণ করা হয়েছে। অনেকেই অফ দি রেকর্ড কিছু কিছু বক্তব্য দিয়েছেন, সেসব বক্তব্য টেপে ধারণ না করায় এখানেও উল্লেখ করা হয়নি।

আলোচনার মধ্যে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ প্রাধান্য পেলেও সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান সৃষ্টি, জাতিগত সমস্যা, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংকট, বঙ্গবন্ধু, ভুট্টো, ইয়াহিয়া ও গণহত্যার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে পাকিস্তান ভাঙার কারণগুলি মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন ১. দুই প্রদেশের মধ্যে পার্থক্য; ২. শাসকচক্রের দৃষ্টিভঙ্গি; ৩. তাৎক্ষণিক কারণ। এখানে উল্লেখ্য যে, এই প্রতিটি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের কাছে বিষয়গুলি নতুন নয়, কিন্তু পাকিস্তানীদের কাছে বিষয়গুলি নতুন। সরকার এমনভাবে সাধারণের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে, এ বিষয়ে তাঁরা গভীরভাবে ভাববার অবকাশ পাননি। আমাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা যখন বলতে শুরু করেছেন তখন নিজেরাই বিস্মিত হয়ে দেখেছেন যে, বাঙালী বা শেখ মুজিবুর নয়, তাঁরা নিজেরাই পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী। এ বিষয়টি তাঁদের অনেককে বিব্রত করেছে।

তাঁরা স্বীকার করেছেন, কেন্দ্রে যারা শাসন করেছে তারা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানকে নিজেদের অংশ বলে মনে করেনি। না এটি পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে, না সৃষ্টির পর। এর কারণ হিসাবে স্যার ম্যালকম হিলির চিঠির উদাহরণ দিয়ে ড. মুবাশ্বির হাসান যে বক্তব্য রেখেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এর উপর শুরু থেকেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা করেছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং সংবাদপত্র।

এ-রকমটি করার কারণ নিহিত ছিল অন্যখানে, পরিষ্কারভাবে বললে বলা যায়, কারণটি ছিল বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তারই প্রমাণ পাওয়া যাবে খালেদ মাহমুদের সাক্ষাৎকারে। সেখানে তিনি বলেছেন

> বাঙালীরা ছিল পাকিস্তানের জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ শাসককুলের অভিজাতবর্গ অবাঙালী পদের বেশির ভাগই মোহাজির, পাঞ্জাবী মোহাজির। পাঞ্জাবী রাজনীতিবিদরা সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার গণতান্ত্রিক নীতিভিত্তিক কোন রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন না। দেশের শাসনতান্ত্রিক গঠন কাঠামো কেমন হবে সে বিষয়ে কোনরকম মতৈক্য ছিল না। আমার মতে মতানৈক্যের মৌলিক কারণটি ছিল এই যে, তারা যদি সংসদে একটি ঐতিহ্যবাহী ধারার সাধারণ সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় মত দেয়, তাহলে ক্ষমতা চলে যায় বাঙালীদের হাতে, কেননা সে ক্ষেত্রে পার্লামেন্টে বাঙালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। সেজন্য ওদের চেষ্টা ছিল এমন এক ধরনের ব্যবস্থা বের করা, যার বদৌলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের অধিকারকে অস্বীকার করা যাবে।

গোড়ার দিকে ওরা পার্লামেন্টে একটি উচ্চকক্ষ রাখার চেষ্টা করে। এ ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের তুলনায় উচ্চকক্ষের জন্য বেশি ক্ষমতা রাখার প্রস্তাব করা হয়, একটা প্রতিসাম্য আনার জন্য। তবে সে উদ্যোগ সফল হয়নি। এরপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানে শেষ পর্যন্ত ওরা একটা আপোস ফর্মুলা হিসাবে 'ওয়ান ইউনিট' ব্যবস্থা খাড়া করে। এই ওয়ান ইউনিটের আওতায় পার্লামেন্টে উভয় প্রদেশের সমপ্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হওয়ায় বাঙালীরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচনে যা পেতে পারত তা থেকে বঞ্চিত হয়।

বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আকস্মিকভাবে মুছে দেবার নয়, তাই প্রচারযন্ত্র পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু বদ্ধমূল পূর্ব-ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে এসেছিল, যার অন্যতম হলো যে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান হিন্দুদের তথা ভারতীয়দের দ্বারা প্রভাবিত, ইত্যাদি।

কিন্তু তারা বাঙালীদের কখনোই তাদের সমপর্যায়ের মনে করেনি, যোগ্য বলেও মনে করেনি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠাতাদের মনোজগতে পাকিস্তান সৃষ্টিপর্বে বাংলার কোন স্থান ছিল না। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃপর্যায়ে বাঙালীর যোগ্য স্থান হয়নি। বাঙালীদের তা উল্লেখ করার মতো প্রতিনিধিত্ব ছিল না সরকারে—সিভিল মিলিটারি আমলাতন্ত্রে। পূর্ব পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের কতটাই তুচ্ছ ভাবা হতো তার একটি নমুনা পাওয়া যাবে পাকিস্তানের শীর্ষ পর্যায়ের আমলা জনাব কুদরতুল্লাহ শাহাবের আত্মস্মৃতিতে। তখন সবেমাত্র পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি রপ্তানি বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি।

> একদিন অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদের কক্ষে বৈঠক ছিল। করাচীতে দাফতরিক ও বাসস্থানের প্রয়োজনে কিছু ইমারত ও কোয়ার্টার নির্মাণ হচ্ছিল। এ সবের জন্য স্যানিটারি মালপত্র আমদানি করার প্রয়োজন ছিল। বৈঠকে চার মন্ত্রী ও কিছু কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীদের মধ্যে মৌলভী ফজলুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও শিক্ষার দায়িত্বে। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর স্যানিটারি মালপত্র আমদানির পরিমাণ নির্ধারিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী মৌলভী ফজলুর রহমান নিচু কণ্ঠে প্রস্তাব করেন, এসব আমদানিকৃত পণ্যের কিছু অংশ ঢাকার জন্য নির্ধারণ করে দেয়া উচিত।
>
> তার এই প্রস্তাবে মিটিংয়ে হাসির রোল পড়ে যায়। কেউ বলেন, ঢাকায় এখনও বিশেষ কোন নির্মাণ কাজ শুরুই হয়নি। সুতরাং সেখানে স্যানিটারি ফিটিংস পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই। কেউ বললেন, এসব ঢাকায় পাঠানো হলে চোরাই পথে কলকাতায় চলে যাবে। এক সাহেব উপহাস করে বললেন, বাঙালীরা তো এখনও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় কলা গাছের ভেলায় বসায় অভ্যস্ত। তারা এখন কমোড আর ওয়াশ বেসিন নিয়ে কী করবে? মৌলভী ফজলুর রহমান হাসলেন, কিন্তু উত্তেজিত হলেন না। অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি পুনরায় জোর দিয়ে বললেন, বেশি না হোক অন্তত প্রতীক হিসাবে কিছু মালপত্র আপনারা ঢাকার জন্য বরাদ্দ করুন। কারণ মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এটা উত্তম পদক্ষেপ হবে। আরও কিছু আলাপ-আলোচনা এবং হাসি-ঠাট্টার পর মৌলভী ফজলুর রহমানের প্রস্তাব মেনে নেয়া হয়। ঢাকার জন্য কিছু স্যানিটারি মালপত্র বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চোনা ঢেলে দেয়ার মতো তিক্ততার সঙ্গে বিষয়টি সমাধান করা হয়। (কুদরতুল্লাহ শাহাব, *আমার কথা*, অনুবাদ আবদুল আউয়াল, *জনকণ্ঠ*, ফেব্রুয়ারি ৭, ২০০৪)

এ গ্রন্থে গ্রন্থিত কামরুল ইসলামের সাক্ষাৎকারেও আমরা এ সবেরই কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পাব। জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আসগর আলী শাহের আচরণ সম্পর্কে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি শাসকচক্রের মনোভাব ব্যক্ত করে।

এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তানকে কলোনি রূপে দেখতে চেয়েছিল এবং এ কারণে এক সময় পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন ত্যাগ করতে পারে এটিও তারা অনুধাবন করেছিল। ড. মুবাশ্বির হাসান একথা স্বীকার করে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি ঔপনিবেশিক চরিত্রের। পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের পুঁজির বাজারে পরিণত করেছিল। আমরা (পশ্চিম পাকিস্তানীরা) পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্বের উপকার ভোগ করছিলাম।"

এম ভি নকভী বলেছিলেন, "পঞ্চাশের দশকে পাশ্চাত্যের একদল অর্থনীতিবিদ দুই প্রদেশে এক সমীক্ষা চালিয়ে উপসংহারে পৌছেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিতে ও পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পে বিনিয়োগ করা হোক। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা কী জন্য? ওটা তো একদিন সটকে পড়বে।"

কামরুল ইসলাম দুই প্রদেশের পার্থক্যের কথা বলেছেন, সর্বস্তরে বাঙালীদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, "বাস্তবতা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানেই একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছিল, আর পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে অর্জিত বিদেশী মুদ্রা কাজে লাগানো হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরও উন্নয়ন, আরও অর্থের দরকার ছিল।" তিনি সামরিক স্থাপনাগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে তার যে সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করেছেন, তা কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে বলে মনে হয় না।

এম ভি নকভী বলেছেন, ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাস হবার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃগোষ্ঠী বাঙালীদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। "পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের প্রভাব ও নেতৃত্ব ছিল সেখানকার মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী জমিদার শ্রেণীর করায়ত্ত। পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদ ও গণপরিষদের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ আইনের অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তারা মনে করতে থাকে যে, বাঙালীরা তাদের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক, কাজেই তাদের ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না। পাকিস্তানী আমলাতন্ত্র পাকিস্তানী ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক ভূস্বামীদের মতলব বাস্তবায়ন তথা স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে কাজ করেছে।"

আসগর খান বলেছেন, শাসকচক্র ক্ষমতা ধরে রাখতে চেয়েছিল। তারা বাঙালীদেরকে ক্ষমতা দেবার কথা ভাবতেই পারেনি। আমরা নিয়ন্ত্রিত হই সামন্ত শ্রেণী দ্বারা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সরকার ক্ষমতায় আসুক তা তারা চায়নি।

এই শাসকচক্রের সহযোগী ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক আমলাবৃন্দ, যাঁদের অনেকে আবার ছিলেন সামন্ত পরিবারের অংশ। এই তিন গোষ্ঠী মিলে সৃষ্টি করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানী তথা কেন্দ্রীয় শাসকচক্র। রোয়েদাদ খানের বাসায় আলাপ হয়েছিল সিএসপি অফিসার মাসুদ মুফতির সঙ্গে। ১৯৭১ সালে ছিলেন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। ১৯৭১ সালে যুদ্ধবন্দিও ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "আর্মি ফিউডাল এক্সিস যে কোন উপায়ে আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে হুমকি মনে

করেছিল। কারণ, বাঙালীরা সচেতন ও উচ্চকণ্ঠ।" এ পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিম পাকিস্তানে বসে ক্ষমতা যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা ভেবেছিলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সামন্তবাদ থাকবে না, সুতরাং, তাদের ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না। এই মত আসগর খানেরও।

শাসকচক্র প্রকাশ্যে এসব কথা বলতে পারছিল না। তখন তারা নতুন এক তত্ত্বের অবতারণা করে, যে বিষয়ে আমরা খুব একটা জানি না। সেটি হচ্ছে, 'লায়াবিলিটি' তত্ত্ব। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান কোন সম্পদ নয়, সেটি না থাকলেই পাকিস্তান অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতি হবে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কাঁধে বোঝা স্বরূপ। এ কথা প্রায় সবাই বলেছেন। এ তত্ত্বের উদ্ভব ষাটের দশকে। এম ভি নকভী ও কামরুল ইসলামের সাক্ষাৎকারে এ বিষয়টি পাঠকরা খুঁজে পাবেন।

এম ভি নকভী বলেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানকে ছেঁটে দেবার একটা নিজস্ব পরিকল্পনা পাকিস্তানীরা তৈরি করেছিল। আর সেটির পক্ষে খোলাখুলি ওকালতিও শুরু হয়েছিল। পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের কিছু সদস্য ও আমলাতন্ত্রের নেতা বলা শুরু করেন, পূর্ব পাকিস্তান তো আমাদের কাঁধে বোঝা হতে চলেছে। কাজেই তাঁদের ওকালতি বা যুক্তি হলো, আমাদের এখন পূর্ববঙ্গ থেকে রেহাই পেতে হবে।"

কামরুল ইসলাম বলেছেন, বিশেষ করে ফাতেমা জিন্নার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানীরা জোটবদ্ধভাবে ভোট দেবার পর এম এম আহমদ, আইয়ুব খান ও কালাবাগের আমির প্রমুখের কথা ছিল এই যে, "পশ্চিম পাকিস্তান তো উন্নয়নের একটা স্তরে পৌঁছে গেছে। পাট খাতে বিদেশী মুদ্রার বদৌলতে কোরিয়ান বুম-এর সুবাদে। কাজেই অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজন নেই... পশ্চিম পাকিস্তানেরও বহু লোকের ধারণা হয়ত ছিল আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের দরকার নেই।"

কারও কারও মতে ১৯৭১ সালে তাদের সেই ইচ্ছাপূরণ হয়েছিল। যুদ্ধটা ছিল উপলক্ষ মাত্র।

পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে স্বেচ্ছায় ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার বিষয়টিতে কেউ যদি সন্দেহ পোষণও করেন তাদের কার্যকলাপই কি বলে দেয় না যে, তারা প্রকারান্তরে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে! মুবাশ্বির হাসানের স্বীকৃতি এরকমই :

> বরাবরই পূর্ব পাকিস্তানীদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর গোড়াপত্তন সেই সাতচল্লিশে। আমি ইতিহাসের সত্যিকার ছাত্র না হলেও বলি, যুক্তফ্রন্ট যে নির্বাচনে জয়ী হয় সে নির্বাচনকে নিষ্ফলা করে দেয়া হয়। তমিজুদ্দিন খানের দেশ কাঁপানো মামলার রায় কোন কাজে আসেনি, হাজির হয় সামরিক আইন।... বলা যায় পাকিস্তানের সকল শাসক একই রকম আচরণ করেছেন। কোন্ সময় আমরা একটা গণতান্ত্রিক স্থাপনার অধিকারী ছিলাম? পাকিস্তানে কখনও কোন সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়নি। এর পার্লামেন্ট ছিল। সে সব পার্লামেন্টে আধিপত্য ছিল পাকিস্তানের সামন্তপ্রভু, ভূস্বামী অথবা আমলাদের। তাদের মাঝে তাই গণতন্ত্র ছিল না। এই পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। একই কারণে পূর্ব পাকিস্তানীরা গণতন্ত্র বলতে যা বুঝে থাকেন সে ধরনের গণতন্ত্র আমরা পাকিস্তানে কখনও পাইনি। জনসাধারণ, রাস্তার মানুষ কিংবা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার—এদের প্রতিনিধি কোথাও ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানীরা বারংবার

তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে, তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছে আর এরই পাশাপাশি বারবারই তাদেরকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

খালেদ মাহমুদের ভাষায়, "এ দেশ এক বহুজাতি রাষ্ট্র যা পাকিস্তানের শাসকবর্গ স্বীকার করেনি।... অসম বা বিষম অর্থনৈতিক বিকাশের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, যারা ঘটনাক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের মাঝে বঞ্চনাবোধ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, যার নজির সত্যিই বিরল।"

তাহলে পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী কে? খালেদ মাহমুদের মতে "পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাবার ব্যাপারটির জন্য যদি কাউকে দায়ী করতেই হয় তাহলে সে দায়িত্ব বর্তায় পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের ওপর, যাদের বেশিরভাগই পাঞ্জাবী। ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চায়নি।" কিন্তু এই উত্তর একটি ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে হবে। এই প্রশ্নে দেখা যায়, কি নীতিনির্ধারক, কি সাধারণ মানুষ—সবাই এই প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে প্রায় পার্থক্যবিহীন। এরা দায়ী করে দু'পক্ষকেই নতুবা ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মুজিব বা ভুট্টো-ইয়াহিয়া-মুজিবকে।

লারী বলেছেন, দু'পক্ষই দায়ী। তাদের মতে, পশ্চিম পাকিস্তান হয়ত বেশি দায়ী। তবে, পূর্ব পাকিস্তান এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারত। এমনকি আসগর খানও তাই বলেছেন।

তবে, দ্বিতীয় উত্তরটির পক্ষেই অধিকাংশ মানুষ। শুধু ভুট্টো-ইয়াহিয়াকে এক-দুই নম্বরে স্থান দিয়েছেন। শেখ মুজিব তিন নম্বরে। কিন্তু আছেন।

পাকিস্তানে থাকাকালীন অধ্যাপক দানীর একটি বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালন করছিল ইসলামাবাদে বাংলাদেশ দূতাবাস। সেখানে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি বলেন, ১৯৬২ সালে তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন তখন উপাচার্য জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন তিনি চলে যাচ্ছেন? অধ্যাপক দানী উপাচার্যকে বলেছিলেন, এখানকার অবস্থা দুঃসহ করে তোলা হচ্ছে। "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পাকিস্তান ভেঙে যাবে।" তৎকালীন পাকিস্তান পিপলস পার্টির অন্যতম তাত্ত্বিক ড. মুবাশ্বির হাসানও বলেছেন, "বাংলাদেশের জন্ম ছিল অবশ্যম্ভাবী।"

পাকিস্তানে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, গণহত্যার বিষয়টি তাঁরা জানতেন কি না এবং এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? শুধু নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। উত্তরগুলির ধরন ছিল এরকম—১. জানতাম কী হচ্ছে, ২. কী ঘটছে তার কিছু কিছু জানতাম, ৩. [জানতেন কিন্তু এখন বলছেন] কিছুই জানতাম না। তাঁরা আরো জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও জানত না ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কী ঘটেছে। কারণ হিসেবে বলেছেন—১. রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচার ও ২. সম্পূর্ণ সেন্সরশিপ।

পাকিস্তানের উর্দু পত্র-পত্রিকাগুলি সব সময় বাঙালীদের বিরুদ্ধে ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকাংশ সময় তারা বাঙালীদের নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরেছে। বাঙালী এবং বঙ্গবন্ধুকে চিত্রায়িত করা হয়েছে একটি জাতি এবং একজন নেতা হিসাবে—যারা পাকিস্তান ভাঙতে চায় এবং পাকিস্তান ভাঙার জন্য তারা হিন্দু-ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ইয়াহিয়া খান হয়ত নিজেও তা বিশ্বাস করতেন। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি যা লিখেছেন সরদার মুহাম্মদ চৌধুরী [*দি আলটিমেট ক্রাইম*, অনুবাদ, মশিউর রহমান মহসিন]।

পাকিস্তানের পরাজয়ের পর ইয়াহিয়া খান যখন বন্দী তখন তিনি ইয়াহিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁকে খারিয়ান থেকে পিণ্ডি নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি হেলিকপ্টারে যাবেন না, যাবেন গাড়িতে। অবশেষে অনেক বাকবিতণ্ডার পর তাঁকে গাড়িতেই ওঠানো হলো। তখন তিনি বায়না ধরলেন পিণ্ডিতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে রুক্ষভাবে তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন। সরদার তাঁকে বললেন, 'কারণ, জনগণ আপনাকে পেলে ফাঁসিতে লটকাবে।'

'জনগণ কেন আমার বিরুদ্ধে খেপবে?'

'কারণ, পূর্ব পাকিস্তানে পরাজয় এবং ঢাকার পতন। তারা এখন ভীষণ আপসেট।'

'এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য রাজনীতিবিদরাই দায়ী, আমি নই।' তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগ ও উষ্মা ঝরে পড়লো।

'জনগণ এ জাতীয় অতি সূক্ষ্ম চতুরতা বা জটিলতা বোঝে না। কারণ, তারা গড়পড়তা মূর্খ।'

এসব বাকবিতণ্ডার মাঝে ট্রেনের কারণে এক ক্রসিংয়ে গাড়ি থামল। এমন নির্জন স্থানেও কিছু লোক ইয়াহিয়াকে দেখেই চিনে ফেলল। ব্যস, পাথরের পর পাথর ছুটে আসতে লাগল আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে।...

ঘটনার আকস্মিকতায় ইয়াহিয়ার মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। অনবরত কাঁপছেন।

সাক্ষাৎকারদানকারীদের অধিকাংশের মতে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বেড়ে উঠেছে সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে, মানসিক গড়ন তাদের একমুখী; সরকার যা বলছে তাদের ধারণা তা-ই ঠিক। ২৫ মার্চের পর গণমাধ্যম পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত নির্মম ঘটনাবলী ব্ল্যাক আউট করে দেয়। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের চিত্র টেলিভিশনে দেখার পরই তাদের ঘুম ভাঙে। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হতচকিত হয়ে পড়ে।

সাক্ষাৎকারদানকারীদের আলোচনা থেকে এও বোঝা যায়, তাঁদের মতে ২৫ মার্চের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী যে এত তীব্র হবে তা শাসকরা অনুধাবন করেননি। সরকার একদিকে বলছিল সব স্বাভাবিক এবং এ খবরও দিচ্ছিল 'দুষ্কৃতকারী'দের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে এবং তাদের দমন করা হচ্ছে। এ প্রচারে যে স্ববিরোধিতা ছিল পাকিস্তানে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। গড়পড়তা পাকিস্তানী বিশ্বাস করেছে তাদের জওয়ানরা যথার্থ কাজ করছে। সুতরাং তারা প্রশংসার যোগ্য। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী আমাদের আলোচনায় যা বলেছিলেন, তাঁর বইয়ে তা আরো স্পষ্টভাবে লিখেছেন, সৈন্যরাও (জনসাধারণের মতে) "In propaganda alone did he feel secure and vindicated."

প্রচারের এ লাইনটি ইয়াহিয়া নিজেই শুরু করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিতে বাঙালী স্বাধীনতাকামীদের তিনি উল্লেখ করেছেন কাফের বলে। এর অর্থ পাকিস্তানী সেনা যুদ্ধ করছে ইসলামবিরোধী অর্থাৎ কাফেরদের সঙ্গে। পাক বাহিনী হচ্ছে মুজাহিদ। মুজাহিদ হলো সে জিহাদে লিপ্ত। সুতরাং, এসব মুজাহিদকে বন্দনা ছাড়া আর কী করা যাবে?

সাক্ষাৎকারগুলি পড়লে দেখা যাবে, শিক্ষিতজনরা বলছেন, 'গণহত্যা'র ব্যাপারটি তাঁরা শুনেছেন কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা তেমন কিছু জানেন না। আর তাছাড়া বাঙালীরা বিহারীদের হত্যা করেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় কিছু বাঙালী নিহত হয়েছে। রোয়েদাদ খান এই লাইনটি গ্রহণ করেছিলেন পাকিস্তানের প্রপাগান্ডা চীফ হিসেবে।

এ প্রসঙ্গে নকভী যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, শিক্ষিতজন তো বটেই এমনকি সাধারণদের একটা অংশও গণহত্যা সম্পর্কে জানত। সে সময় ট্রানজিস্টর চালু হয়েছে। পাকিস্তান বাদে সব বেতার কেন্দ্র থেকেই গণহত্যার খবর প্রচারিত হয়েছে। তাছাড়া সৈন্যদের পাঠানো মনি অর্ডারে টাকার অঙ্ক বাড়ছিল। এ টাকা আসছিল কোথেকে? তবে, সুহাইল লারী যা বলেছেন, সেটিই মূল কথা। রেডিও শুনত লোকজন তবে খুব সম্ভব তারা তা কেয়ার করত না। যা শুনত তাও বিশ্বাস করত না, ভাবত বিবিসি মিথ্যা বলছে। "পিপল হ্যাড টোটালি ক্লোজড মাইন্ড।" তাছাড়া মানব আচরণের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, সে যা বিশ্বাস করতে চায় তাই সে বিশ্বাস করে।

সে সময় যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই গণহত্যার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। যেমন, নিয়াজী। আমাদের প্রশ্ন শুনে তিনি এমন ভাব করলেন যেন গণহত্যার বিষয়টিই তিনি বুঝছেন না। অথচ তাঁর বইতে তিনি ২৫ মার্চের ঢাকা অভিযানকে হালাকু খানের অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ফরমান আলীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন, 'গণহত্যা? না গণহত্যা হয়নি। আমি ২০ লাখ লোক নিহত হওয়ার হিসাব মেনে নিতে পারি না।'

আমরা বললাম, 'ঐ সংখ্যা নিয়ে আমরা তর্কে যেতে চাই না।'

তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বললেন, 'সংখ্যা ৪০-৫০ হাজারের মতো হবে।'

বলেই তিনি বুঝলেন ভুল হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বুদ্ধিজীবীদের হত্যার কথাও তিনি অস্বীকার করেছেন। ঢাকায় তৎকালীন কমিশনার আলমদার রাজা ব্যতিক্রম। তিনি গণহত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং এ বিষয়ে হাইকোর্টে রীট করেছিলেন। অবশ্য পরিপ্রেক্ষিতটি দিয়েছিলেন ভিন্ন। তাঁর আরজির একটি কপি আমাদের দিয়েছিলেন। আরজির ৫২ নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, যারা বড় ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের শাস্তি না দেয়াতে পাকিস্তান এখন বিশ্বের কাছে হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। এবং এর ফল কী হয়েছে—"The internal effect of this has been such that the extra judicial and custodial killing have become a part of national tradition."

হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যা করছিল তার বিরুদ্ধে একেবারেই যে প্রতিবাদ হয়নি তা নয়। হয়েছে, তবে সে ধারা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রতিবাদীরা বামপন্থার সমর্থক ছিলেন। তাহেরা মাযহার আলী, আহমদ সেলিম সাক্ষাৎকারে তা জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক আই এ রহমানের কথা উল্লেখ করতে হয়। শুরু থেকেই তিনি ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর নিন্দা করে আসছেন তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে। তবে আলতাফ গওহরের কথায় তিনিও নাকি একাত্তর সালে নিশ্চুপ ছিলেন।

লাহোরে মানবাধিকার কমিশনে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় আই এ রহমান আমাদের বলেছিলেন, হিন্দু ও ব্রিটিশরা যে পরিমাণ মুসলমান হত্যা করেছে আমরা মুসলমান হিসেবে তার চেয়ে বেশি মুসলমান হত্যা করেছি। তিনি আরো বলেন, অনেকে বলেন ১৯৭১-এ কী হয়েছে এখানকার বাসিন্দারা তা জানত না। এগুলি খোঁড়া যুক্তি। কম বেশি তারা জানত। তিনি ঢাকার পতনের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বহু আগে থেকে যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল তা যদি তাদের বিবেককে নাড়া না দিয়ে থাকে তাহলে ঢাকার পতনে আসমান থেকে জমিনে

পড়ার মতো ঘটনাই বা ঘটবে কেন? তার অনেক আগে থেকেই সবকিছু ঘটে যাচ্ছিল। সেদিন লাহোর ও করাচী থেকে হাওয়াই সফরে অনেকে হুড়োহুড়ি করে ঢাকায় যাচ্ছিল সম্পত্তি, লাইসেন্স পারমিট, পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাগানোর জন্য। জাতীয় পরিষদের শূন্য আসনগুলোর বেলাতেও এ রকমটি চলছিল।'

বাকি থাকে মুক্তিযুদ্ধের নায়ক শেখ মুজিবের কথা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীরা তাঁকে দেখেছে 'গাদ্দার' হিসেবে। আজ সে ধারণা খানিকটা বদলেছে। 'গাদ্দার' আমাদের সামনে কেউ তাঁকে বলেনি, তবে, পাকিস্তান ভাঙার জন্য তারা যে তিনজনকে দায়ী করেন তিনি তার মধ্যে একজন। তবে তাঁর স্থান তিন নম্বরে। এক-দুই নম্বর ভাগাভাগি করে নেন ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া। বেনজীর ভুট্টো বলেছেন, শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড নাকি তাঁদের নাড়া দিয়েছিল ভীষণভাবে। উপমহাদেশে তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে মনান্তর ও বৈরী সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আই এ রহমান যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তবে, ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে এর তাৎপর্য অধিকাংশ মানুষ এখনও অনুভব করতে অক্ষম। তিনি বলেছিলেন, "আমরা হিমালয়ের পুত্র। হিমালয় থাকবে না। তা না থাকলে আমরাও থাকব না। এ কথা মনে রেখেই আমাদের আচরণ করা উচিত।"

বর্তমানে, ইতিহাস রচনার একটি পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকারকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ পদ্ধতিকে 'ওরাল হিস্ট্রি' বা 'মুখের কথায় ইতিহাস' বলা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা বুঝতে গেলে বা রচনা করতে গেলে আমাদের গৃহীত বর্তমান সংকলনটি অর্থাৎ সাক্ষাৎকারগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কারণ, সাক্ষাৎকারদানকারীদের অধিকাংশ প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের প্রতি নীতি নির্ধারণে জড়িত ছিলেন। যাঁরা জড়িত ছিলেন না তাঁদের সাক্ষাৎকারও সাধারণ পাকিস্তানীদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেবে।

তবে, এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, এ সাক্ষাৎকারগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে, এককভাবে নয়। তাতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ জেনারেল উমরের সাক্ষাৎকারটি উল্লেখ করতে পারি। তিনি ছিলেন ইয়াহিয়া কর্তৃক গঠিত নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব। ২৫ মার্চ তিনি ছিলেন ঢাকায়। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কয়েকবার এসেছিলেন ঢাকায়। করাচীতে তার বাসভবনে গেলাম দেখা করতে। আমাদের দেখে তিনি এমনভাবে অভ্যর্থনা জানালেন যেন হারানো স্বজনদের খুঁজে পেয়েছেন। বললেন, বাঙালী ভাইদের জন্য তিনি এতক্ষণ কোরান শরীফ পড়ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। কী থেকে যে কী হয়ে গেল!

যখন জিজ্ঞেস করা হলো, '২৫ মার্চ সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'না', নিষ্পাপ ভঙ্গিতে বললেন তিনি।

'২৫-পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'না।'

'আপনি নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব ছিলেন। এবং আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে বললেন যে কিছুই জানেন না!'

'আমি কাউন্সিলের সামান্য সদস্য সচিব ছিলাম। কাউন্সিলের কোন মিটিংই ডাকা হতো না, কোন ক্ষমতাও ছিল না।'

অন্যদিকে, রফি রেজা বললেন, 'উমর জানে না মানে? (২৫ মার্চ) ঢাকা থেকে আমরা রওয়ানা হয়েছি। প্লেনে সে ঢুকল একটা ভাব নিয়ে। ভুট্টো বা আমাকে চেনে বলে মনে হলো না। কাউকে দেখেও দেখল না। ঢাকায় কী হয়েছে সে জানে না!'

আলতাফ গওহর জানিয়েছেন, 'শোনেন, রোয়েদাদ এবং উমর প্রায়ই যেত ঢাকায়। ফিরে এসে বিকেলে আমার বাসায় আড্ডা দিত। ঢাকায় কী ঘটছে তার বর্ণনা দিত। আপনারা রোয়েদাদকে আমার রেফারেন্স দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন এ কথা সত্য কি না?'

পঁচিশে মার্চের রাতে এমন ভয়াবহভাবে নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর পাকিস্তানী সৈন্যদের ঝাঁপিয়ে পড়াকে নিয়াজী তাঁর বইতে যেমনটি বলেছেন এই সাক্ষাৎকারেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা বলে বর্ণনা করেছেন এবং ঐ অপারেশনে ব্যাপক প্রাণহানির কথা স্বীকার করেছেন। সবচেয়ে গোলমেলে লাগে যখন নিয়াজী বলেন যে, তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করুন এটি জান্তার কেন্দ্রীয় স্তরের নেতাদের অভিলাষ ছিল না। তবে কী সেই লায়াবিলিটি তত্ত্ব! যুদ্ধের দামামার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে ছেড়ে আসা এটি একটি যুৎসই কারণ হতে পারে নিঃসন্দেহে। আর এই তত্ত্বের অস্তিত্বের কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন, আগামীদিনের ইতিহাসবিদরাই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলবেন এই আশা করা যায়।

অনেকে এখানে টিক্কা খানের সাক্ষাৎকার না দেখে বিস্মিত হতে পারেন। আমরা তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু তাঁরা জানিয়েছেন, টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্ভব নয় কারণ তিনি অসুস্থ। পরে শুনেছিলাম তিনি senile হয়ে গেছেন।

সাক্ষাৎকারগুলি অবিকৃত রাখা হয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে যেসব ইতিহাসবিদ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখবেন তাঁরা এগুলিকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন— তখন যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁদের কেউ-ই হয়ত বেঁচে থাকবেন না। আমরা সাক্ষাৎকার নিয়ে আসার পর ইতোমধ্যে কেউ কেউ পরলোক গমন করেছেন।

ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

মুনতাসীর মামুন
মহিউদ্দিন আহমেদ

বে ন জী র ভু ট্টো

◆ ১৯৭১-এ যে সব ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে আপনার যা মনে পড়ে তা বলবেন কি?

Δ ১৯৭১-এর গৃহযুদ্ধের সময় আমি ছাত্রী ছিলাম। এই গৃহযুদ্ধের পরিণতিতে স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ ও জাতি হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ সময়ে আমার বাবা দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বাবার কাছে আমি শুনেছি, জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পর ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। কেননা সামরিক অফিসাররা ঐ সময় তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। দেশের মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসে। জুলফিকার আলী ভুট্টো তখন পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা। তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। তবে দেশ এভাবে ভেঙে যাবার পরও সামরিক বাহিনী ক্ষমতার চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। কেননা সেনাবাহিনীর ডিভিশনগুলোর কর্মকর্তাদের এক বৈঠক ডাকা হলে যা কিছু বিপর্যয় ঘটে গেছে সে জন্য তাদের মধ্যে অত্যন্ত মারমুখী মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। জনসাধারণও, বিশেষ করে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত জনসভার সময় রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

বাবা বলেছিলেন, ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুরকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চান। আর এরপর ক্ষমতা ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর, যাতে নতুন সরকার সবকিছু ধোয়ামোছা তকতকে অবস্থায় কাজ শুরু করতে পারে। ইয়াহিয়া বলেছিলেন যে, শেখ মুজিব সবকিছুর মূল। তাঁকে যে তিনি আগেই হত্যা করেননি সেটিই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল। তিনি যদি তখনই তা করতেন তাহলে এতকিছু ঘটত না। আমার বাবা বলেছিলেন, না ওটা করবেন না। কেননা বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে তাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছে, আর আমরাও এখন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চাই। আমরা একটি একক দেশ ছিলাম। বাঙালীরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে অসুখী বোধ করে থাকে সেটি ওরা করতে পারে। আমাদেরকে আবার ওদের কাছে যেতে হবে। শেখ মুজিবের যদি কিছু হয়, তাহলে বাঙালী জনসমষ্টির সঙ্গে আমাদের আবার সেতুবন্ধন গড়ে তোলার কাজটি ঢের বেশি কঠিন হয়ে উঠবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন, মহিউদ্দিন আহমেদ ও আফসান চৌধুরী

তিনি সত্যিকারভাবেই তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সহযোগীদের বোঝাতে সক্ষমও হন।

আমার বাবা ক্ষমতা হাতে নেবার পর তিনি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করবেন বলে বার্তা পাঠিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হওয়া। কিন্তু শেখ মুজিব এ রকম উদ্যোগের গোড়াতে আশঙ্কা করেছিলেন, ওরা আমাকে হত্যা করতে আসছে। কিন্তু আমার বাবা যখন তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে হাসিমুখে বললেন, কেমন আছেন? জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান জানতে চাইলেন, এখানে কী করতে? আমার বাবা বললেন, "আমি এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।" এরপর তাঁরা কোলাকুলি করেন। আমার বাবা এরপর তাঁর সঙ্গে বসে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। শেখ মুজিবের রেডিও শোনার কোন সুবিধা তখন ছিল না। তাই অবশিষ্ট বিশ্বে তখন কী ঘটছে তা জানার উপায় তাঁর ছিল না। আমার বাবাই তাঁকে বলেছিলেন, আমরা নতুন করেই সবকিছু শুরু করতে চাই। সবকিছু ঘটে গেছে, শোধরাবার কোন উপায় আমাদের হাতে নেই। তবে আমি আপনাকে একান্ত অনুরোধ করছি এমন কিছু একটা করুন যাতে কোনভাবে পাকিস্তানকে একত্রে রাখা যায়। হতে পারে সেটি হবে এক ধরনের শিথিল ফেডারেশন। কনফেডারেশনও হতে পারে। দুটি দেশ হলেও আপত্তি নেই। পররাষ্ট্রনীতি এক রেখে কিংবা কোন প্রকার কাঠামোর মধ্যে রেখে কিংবা এমনকি নামমাত্র প্রধানের অভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদ রেখেও কমিটি করা যেতে পারে। দেশকে একসাথে রাখার একটা উপায় আপনি খুঁজে বের করবেন, সেই অনুরোধ আমি জানাই আপনাকে। শেখ মুজিব জবাবে বলেছিলেন, আমাকে ফিরে গিয়ে আমার লোকজনের মনোভাবটা বুঝতে হবে। কেননা আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছি। তিনি আমার বাবাকে এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, কোন শিথিল ফেডারেশন কিংবা এমনকি কোন এক ধরনের কনফেডারেশন কাঠামোতে কোনভাবে দু'দেশকে এর পরেও সম্পর্কিত রাখা যায় কি না তার জন্য কোন রকম একটা উপায় বের করার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। আমার বাবা বলেছিলেন, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের নীতি মেনে নিচ্ছি। আর তাতে বাংলাদেশ যদি ঐ কনফেডারেশন বা ফেডারেশনের শীর্ষ পদটি জয় করে, ভাল কথা। বাবা শেখ মুজিবকে এই বলে অনুরোধ জানান, এক্ষুনি আপনি বাংলাদেশে (অবশ্য সে সময় তিনি ছিলেন একজন বন্দী) মানে ঢাকায় ফিরে যাবেন না। আমি চাই, আপনি প্রথম লন্ডনে যান যাতে করে চিন্তাভাবনা করে দেখার কিছুটা অবকাশ আপনার মেলে, আর আপনাকে যাতে অবিলম্বে কোন সিদ্ধান্তে আসার মতো অবস্থায় পড়তে না হয়। শেখ সাহেব যখন লন্ডন যান আমার বাবা তখনও আশা করছিলেন শেষ মুহূর্তে একটা কিছু সমঝোতায় পৌছানো যাবে। তবে তা হবার ছিল না। শেখ মুজিব ঢাকায় অবতরণ করেই বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে এক বিবৃতি দিলেন। এ সত্ত্বেও পাকিস্তানের জনসাধারণ আজ অবধি মনে করে, অতীতে যা-ই ঘটে থাকুক স্বাধীনতার অভিন্ন সংগ্রামের ঐতিহ্যে আর এক সময়ে অভিন্ন স্বদেশ সৃষ্টির সুবাদে আমরা একত্রে সম্পর্কসূত্রে গাঁথা। একটা দেশ বা জাতি হয়ত বা আর হবে না। তবু সম্ভবত একটি কনফেডারেশন গড়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণের সাথে একত্রে কাজ করা আমাদের উচিত হবে। আমরা সার্ক আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠনে একযোগে কাজ করতে পেরে নিশ্চয়ই আনন্দিত। এ এক চমৎকার ফোরাম যেখানে

আমাদের সকলের একত্রিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে আমার প্রজন্মের মানুষগুলোর জন্য এমন প্রত্যাশা আজও স্বপ্ন হয়ে আছে। আমি জানি না বাংলাদেশের সাথে যাদের কখনও পরিচয় হয়নি পাকিস্তানের সেই নতুন প্রজন্ম কী ভাবে। তবে আমাদের প্রজন্মে এখনও একটা অনুভূতি হলো এই যে, এমনকি কনফেডারেশন কাঠামোর মধ্যেও যদি উপমহাদেশের দুইটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এক হতে পারে তাহলে সেটি হবে উভয় দেশের অভিন্ন কল্যাণের পথে এক ধাপ অগ্রগতি। পরবর্তীকালের পাকিস্তানে আমি জানি, আমরা পাকিস্তানীরা বাংলাদেশের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে এবং যে শত্রুতা ও বৈরীভাব এখন রয়েছে তা ঝেড়ে ফেলতে চাই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণা ছিল ঐ সময়ে যার কারণ—অনুমিত ক্ষোভ-অভিযোগ, অনুমিত হামলার। যুদ্ধ বড় নোংরা জিনিস—তা গৃহযুদ্ধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধ কিংবা দেশ ভাঙার যুদ্ধ—যাই-ই হোক। যুদ্ধের সময় কদর্য, কুৎসিত ঘটনা ঘটে। আর এ রকম অনেক ঘটনাই অনিবার্যভাবে ক্ষতের দাগ রেখে গেছে।

◆ ১৯৭১-পরবর্তী পরিস্থিতি কেমন ছিল পাকিস্তানে?

A খুবই কঠিন পরিস্থিতি ছিল সেটি। কেননা আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে যখন একটা সমঝোতায় পৌঁছতে চাচ্ছিলাম সেই সময়টায় পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালীদের অনুমিত নিষ্ঠুরতা নিয়ে প্রচুর আবেগ-উত্তেজনা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীদের তরফ থেকে অনুমিত বর্বরতার আবেগানুভূতি ছিল যেমন বাঙালীদের, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানীদেরও আবেগানুভূতি ছিল পূর্বের অনুমিত নিষ্ঠুরতা নিয়ে। কিন্তু আমার বাবা তখন মুসলিম উম্মাহ্র বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনায় নিয়োজিত হন। ঐ সময় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাদশাহ্ ফয়সলের সাথে আমার বাবাও যুগ্ম সভাপতিত্ব করেন। শেখ মুজিবকে এ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয় ও সমঝোতা অনুযায়ী বাংলাদেশকে ওআইসিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মুসলিম দেশ পাকিস্তানকে অনুরোধ জানায়। এ রকম এক পটভূমিকায় শেখ মুজিব পাকিস্তানে আসেন। লাহোরের শালিমার উদ্যানে এ সময় আমি আমার বাবার পাশে ছিলাম। আমার মনে আছে, শেখ মুজিবকে সে সময় উল্লসিত সংবর্ধনা দেয়া হয়। জনসাধারণ অত্যন্ত উৎফুল্ল ছিল। আমার বাবা ও শেখ মুজিব লিবীয় নেতা গাদ্দাফি ও ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাতের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবা ও শেখ মুজিব পরস্পর কোলাকুলি করলেন। জনগণ এ দৃশ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি করে ওঠে। কারণ তাদের মনে হয় আমার বাবা ও শেখ মুজিব যথাক্রমে রয়ে যাওয়া পাকিস্তান ও সদ্যজাত বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। তাঁদের মিলন দৃশ্যে জনতা আশার ঝিলিক দেখতে পায়—যে হৃদয় ভেঙে গেছে হয়ত আবার তা জোড়া লাগানো সম্ভব হবে। এ সময় বহু বিতর্কিত ইস্যু ছিল। ভারত তখন যুদ্ধবন্দী পাকিস্তানী সৈনিকদের বিচার করার হুমকি দিচ্ছিল। আমাদের যুদ্ধবন্দী ছিল ৯০ হাজার। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে দরকষাকষিমূলক আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যার নিষ্পত্তি করা হয়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে পাওনা সম্পদ ও দায়ের ইস্যু ছিল। তবে কোন কোন কারণে এ ইস্যুটি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আরও একটি সমস্যা ছিল। সেটি হলো বিহারীদের পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের সমস্যা। এই বিহারীরা হলো বঙ্গদেশীয় সীমানা সংলগ্ন ভারতের বিহার প্রদেশের লোক। এরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসী হয়েছিল।

এরা ছিল মোহাজির। এরা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল গৃহযুদ্ধে। তাই এই মর্মে একটা সমঝোতা হয়েছিল যে, ১ লাখ ৬০ হাজার বিহারীকে পাকিস্তানে এনে পুনর্বাসিত করা হবে। এবং এটি করা হয় আমার বাবা শাসন ক্ষমতায় থাকাকালে। এর পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে—ঠিক কোন্ সময়ে আমি খুব একটা জানি না, বাংলাদেশের অবশিষ্ট বিহারীদের নিয়ে কথা ওঠে।

◆ পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বী এই বিহারী ও বাংলাদেশের দায়দেনা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

∆ আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমার মনে হয়েছিল একটা গোটা নতুন প্রজন্মের লোকজন এখন বড় হয়ে উঠেছে যারা পাকিস্তানের কথা সত্যিকারভাবে জানে না। ওরা শুধু ওদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে এ সম্পর্কে শুনেছে। ওদের জন্ম বাংলাদেশে। ওখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ওদের লেখাপড়া শুরু। বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় আছে ওদের। আমিও বুঝেছিলাম, সামাজিক ও জাতিগোষ্ঠীগত সংহতি বিধানের বেলায় বহু ইস্যু অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আমাদের এখানেও এখন জাতিগোষ্ঠীগত প্রচুর আবেগানুভূতি রয়ে গেছে। আর সে কারণেই পাকিস্তান একটি ফেডারেল কাঠামোর রাষ্ট্র, কোন সমজাতীয় জনসমষ্টির দেশ বা জাতি নয়। তবে বাংলাদেশ সে তুলনায় ঢের বেশি সমজাতীয় জনভূভাগ। অর্থাৎ আপনাদের রয়েছে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি, আর কার্যত মাত্র একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। পাকিস্তান এমনটি নয় বলেই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। এ কারণেই যে পাকিস্তান রয়ে গেছে সেই দেশটিতে গুরুতর গোলযোগ দেখা দেবে। তাই বিহারীদের যদি পাকিস্তানে পুনর্বাসিত করতেই হয় তাহলে আগে স্বচ্ছতা বজায় রেখে একটা আদমশুমারি করতে হবে। এটি এমনিভাবে করতে হবে যা সকলের কাছে হবে গ্রহণযোগ্য। এর প্রথম কাজ হবে বাংলাদেশে কতজন বিহারী এখন রয়ে গেছে তা নির্ধারণ করা। যদি ভুট্টো সাহেবের সময় এক লাখ ৬০ হাজার এসে থাকে, আর তারপরে যদি আরও থেকে থাকে, আরও বিহারীকে পাকিস্তানে আনাও হয়, এরপরেও হয়ত কেউ বলবে, আরও রয়ে গেছে। তাই আমাদের পয়লা ভাবনা হলো বাংলাদেশের বিহারীদের একটা আদমশুমারি হতে হবে। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান তার নিজের জাতিগোষ্ঠীগত সমস্যার ব্যাপকতার আলোকে সব বিহারীকেই নিতে পারে না। এ জন্যই আমরা মনে করেছিলাম, এ ব্যাপারে ওআইসি'র পক্ষ থেকে একটা সাড়া আসা উচিত। তার আওতায় বিহারীদের সমস্যার পর্যায়ক্রমে সমাধান হওয়া উচিত। প্রতিটি মুসলিম দেশকেই একটা নির্ধারিত ও স্বীকৃতসংখ্যক বিহারীকে তাদের নিজ নিজ দেশে নিতে হবে যাতে এ সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি চিরকালের মতো হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিহারীরা ভাল থাকতে চায়—অবশ্য সবাই উন্নততর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা চায়, প্রত্যেকেই তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য উন্নততর ভবিষ্যৎ চায়। তাই আমি বলব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ—এ দু'টি দেশের মধ্যকার সবচেয়ে জরুরী সমস্যাগুলো হলো বিহারীদের প্রত্যাবাসন এবং দায়-সম্পদ বণ্টন প্রশ্ন।

আমি তবুও মনে করি, দুই দেশের জনগণের মধ্যে গভীর সম্পর্কের একটা বন্ধন রয়েছে। আমি যখন বাংলাদেশে গিয়েছিলাম, বাংলাদেশের মানুষ আমাকে যে প্রীতি ও ভালবাসা

জানিয়েছে তাতে সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছি। অবশ্য এর আগেও যে আমি ঢাকার কথা শানিনি তা নয়। আমার বাবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে মাঝে মাঝে ঢাকায় যেতেন। যখনই তিনি ঢাকা থেকে ফিরতেন আমাদের জন্য রসমালাই নিয়ে আসতেন। সেই রসমালাই আসত টিনে ভর্তি হয়ে, আসত চমৎকার রেশমী শাড়ি কাপড়। এ সবের পটভূমিতে ঢাকায় গিয়ে এ রকম বিপুল প্রীতি-ভালবাসা পেয়ে আমার একান্ত অভিভূত না হয়ে উপায় ছিল না। মনে পড়ে ১৯৭৪-এর কথা। সে সময় শেখ মুজিব পাকিস্তানে এসেছিলেন। তাঁকে পরম ভালবাসায় গ্রহণ করা হয়েছিল। যদি আমরা ক্ষণিকের জন্য হলেও রাজনীতিকে পাশে ঠেলে রাখতে পারি তাহলে আমার মনে হয়, গৃহযুদ্ধ যত কদর্য, ভয়ানক কুৎসিতই হোক না কেন, দু'দেশের জনগণের বুকের গভীরে রয়েছে পরস্পরের প্রতি গভীর মমত্ব, উষ্ণতা, প্রীতি ও ভালবাসা। আমার ঐ সময় মনে হয়েছিল দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে দু'দেশের উচিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা। অবশ্য আমরা জানি, বড় পড়শী পরিবেষ্টিত ছোট দেশগুলোর যা হয়ে থাকে তেমনি বাংলাদেশের এ ব্যাপারে সমস্যা রয়ে গেছে। আমরা এসব সমস্যার ব্যাপারে সংবেদনশীলও বটে।

আর ঐ রাতের কথা মনে পড়ে যে রাতে শেখ মুজিব মারা যান। আমার মনে আছে, আমরা তখন রাওয়ালপিন্ডিতে প্রধানমন্ত্রী ভবনে থাকতাম। আমার বাবার থাকার কক্ষটি ছিল ভবনের একটু বাইরে। আর মূল ভবনের ভিতরে ছিল তিনটি শয়নকক্ষ—আম্মু এক নং, আমি দুই নং ও আমার বোন সানি তিন নং কক্ষে থাকতাম। আমার দরজায় শব্দ শোনা গেল। বাবা বললেন, ওঠো, তোমরা ওঠো। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। তখন আমি তরুণ বয়সী। বয়স তখন হয়ত আমার ২০-এর কোঠায়, আমার ঠিক মনে নেই। আমি বললাম, 'ব্যাপার কী, কী হয়েছে!' তিনি জবাবে আমাকে তাঁর ঘরে যেতে বললেন। আমরা সবাই তাঁর ঘরে গেলে তিনি বললেন, এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবকে তাঁর লোকেরাই হত্যা করেছে। এরপর আমরা বাকি রাত জেগে রইলাম। আস্তে আস্তে খবর আসতে শুরু করল। আর সে রাতে ঐ ঘরের নীরবতা—ভয়ঙ্কর নীরবতার কথা মনে আছে। এর কারণ, খবর খুবই মর্মান্তিক রকমে ভয়ঙ্কর মনে হলো। প্রথমে বলা হলো, বাংলা বাবু না বাংলা বন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর জানা গেল তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। পরে—তাঁর কন্যাদের হত্যা করা হয়েছে। পরে আরও খবর এলো, কিছু শিশু শোবার খাটের নিচে ছিল। সেখান থেকে টেনে বের করে তাদেরও হত্যা করা হয়েছে। আমরা সকলেই শেখ মুজিবের জন্য শোক প্রকাশ করলাম। কেননা পাকিস্তানী হিসাবে তাঁর সম্পর্কে আমাদের মিশ্র অনুভূতি থাকলেও তিনি তো এক স্বাধীন দেশ ও জাতির আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সর্বোপরি, নীতিবাদী ব্যক্তি হিসাবে তিনি ব্যাপক পর্যায়ে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি এমনকি মৃত্যুর মুখে তাঁর নিজ নীতিতে অবিচল ছিলেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী, অল্পের জন্য তাঁর প্রাণরক্ষা পেয়েছে। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, রেহাই তিনি পাবেন না, তাঁকে মরতে হবে। আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসাবে তাঁর জন্য ছিল অগাধ শ্রদ্ধা—এমন একজন মানুষের ওপর এ ধরনের ট্র্যাজেডি নেমে আসায় বিষাদ নেমে আসে। তিনি ছিলেন তাঁর দেশ ও জাতির জনক। আর জাতির জনকের পরিণতি যদি এই হয় তাহলে তেমন পরিস্থিতি আমাদের জন্য খুব শুভ হতে পারে না।

ঐ সময় আমার মনে আছে, এমন আলোচনাও হয়েছে যে, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বলতে সত্যিকার অর্থে তেমন কিছুই ছিল না। মনে পড়ে, পরের দিনগুলোতে লোকজনের মুখে যেসব আলোচনার খৈ ফোটে সে সবের কথা। বলতে শুনলাম—আরে, ক্যুদেতা করতে বড়জোর একটা ট্যাঙ্ক হলেই হলো। কারণ বাংলাদেশের তখন পুরনো সেকেন্ডহ্যান্ড ট্যাঙ্ক বৈ কিছু ছিল না। এ ট্যাঙ্কগুলো কোত্থেকে যোগাড় করা? একটা গভীর বিষাদ নেমে এসেছিল এই ভেবে যে, নিজের লোকেরাই তাদের জাতির পিতাকে এমন বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতায় হত্যা করতে পারে!

◆ বাংলাদেশের মানুষের তা মনে নাও হতে পারে!

∆ আমার বিশ্বাস, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়েই এখন পরিণত অবস্থায় এসেছে উপলব্ধির দিক থেকে। পাকিস্তানে আমরা স্বীকার করি যে, বাংলাদেশের স্বীয় পরিচয় রয়েছে। ওদেশের জনগণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাদের স্বার্থ অবশ্যই তাদের নিজেদেরকেই দেখতে হবে। তবু আমি মনে করি, ওরা দু'দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে চায়। আমাদের উচিত নানা সেমিনার, আলাপ-আলোচনার অনুষ্ঠান করে, দু'দেশের বুদ্ধিজীবীদের পরস্পরের দেশে ভ্রমণ বিনিময় করে এ অনুভূতি ও উপলব্ধিকে আরও জোরদার করে তোলা। আমাদের জনসাধারণ বাংলাদেশের খবরাখবরে খুবই উৎসুক। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বা তাঁর বিচার—যে খবরই হোক অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাকিস্তানের জনসাধারণ শোনে, পড়ে। বেগম জিয়া কী করছেন, শেখ হাসিনা কী করছেন আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে। বহুকাল আগে ১৯৮৪ বা ১৯৮৫-তে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। লন্ডনের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ক্লাবে আমাদের দেখা হয়। এ সাক্ষাতের আয়োজন করেছিলেন চৌধুরী... হ্যাঁ, তাঁর নাম আমার মনে পড়ে, আবুল হাসান চৌধুরী। তিনি এখন আপনাদের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। চৌধুরী তখন ছিলেন জিসাস কলেজে। আমি ছিলাম লেডি মার্গারেট হলে। তিনিই এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন আমরা বয়সে তরুণ, আমাদের মাঝে তখন উত্তেজনা ছিল প্রবল। বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে পরবর্তীকালে যখন আবার দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটেছে তখন আমাদের আবেগ যথেষ্ট প্রশমিত।

আমরা পাকিস্তানীরা অত্যন্ত গভীর আগ্রহের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘটনাগুলো লক্ষ্য করি। আমাদের খবরের কাগজে ঐ সব ঘটনার খবর ফলাও করে ছাপা হয়। আপনাদের দেশে ডিক্টেটরের শাসনের একাধিক পর্যায় কেটেছে। আমাদের নিজেদেরও এর পাল্লায় পড়তে হয়েছে। এরপর আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন হয়েছে, হয়েছে আপনাদের দেশেও। আমাদের দেশে পরে কয়েকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, আপনাদের দেশেও। দেখা যায়, দু'টি দেশের ওপর দিয়ে একই ধরনের জোয়ার-ভাটার খেলা চলেছে, এসেছে একই ধরনের প্লাবন—এই তো মোটামুটি যা আমার মনে পড়ে।

◆ কিছুদিন আগে নওয়াজ শরীফ বলেছেন, '৭০-এর নির্বাচনের রায় যদি '৭১-এ বাস্তবায়িত হতো তাহলে দেশ আলাদা হয়ে যেত না। কিন্তু অনেক বই লেখা হয়েছে, যেগুলোতে আভাস দেয়া হয়েছে পিপিপিই ছিল এতে অন্তরায়। আপনার বক্তব্য কী?

▲ আমি এর ব্যাখ্যা দেব। শেখ মুজিব ৬ দফা চেয়েছিলেন যার আওতায় মাত্র ছয়টি বিষয় থাকবে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে। প্রতিটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তাদের নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিটি প্রদেশের থাকবে নিজ নিজ মুদ্রা ব্যবস্থা বা কারেন্সি। যদি তাই হয় তাহলে কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় প্রদানের জন্য কে প্রদেশগুলোকে বাধ্য করবে? আমরা বাস্তবিকপক্ষেই টের পাচ্ছিলাম, এ হলো আসলে নেপথ্যে স্বাধীনতার দাবি যে স্বাধীনতা শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়, বরং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর জন্যও। স্নায়ুযুদ্ধ যখন তুঙ্গে সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যিকার অর্থে চেয়েছিল কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তান ভেঙে যাক। তার এ চাওয়াটা কেবল ভারত-পাকিস্তান বৈরিতার জন্যই নয়। আমাদের মনে হয়েছিল, ভারতও এতে পুলকিত বোধ করে। কেননা তারা বলেছিল, স্বাধীনতার পর পাকিস্তান খুব বেশিকাল টিকবে না, ধসে পড়বে। আমরা মনে করেছিলাম ৬ দফা বাস্তবায়নের অর্থ হবে ১৯৭১-এ পাকিস্তানের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া। এ কারণেই আমরা ৬ দফার বিরোধিতা করেছিলাম। ৬ দফা কায়েম হলে আজকের পাকিস্তানের অস্তিত্বও থাকত না। ৬ দফার দফাগুলো ছিল এই—বৈদেশিক বাণিজ্য থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে; নিজ নিজ কারেন্সিও থাকবে প্রদেশগুলোর। এ অবস্থায় কি তাহলে দেশকে একত্রিত রাখা যাবে? কোন সেনাবাহিনীর অস্তিত্বও থাকত না। কোন সেনাবাহিনী না থাকলে পররাষ্ট্রনীতিরও কোন দরকার থাকে না। তাই আমার ধারণা, এ সব পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, '৭০-এর নির্বাচনে তৎকালীন পাকিস্তানের দু'টি অংশ ভিন্ন ভিন্ন রায় দিয়েছিল। পূর্বাঞ্চলের রায় ছিল দেশ ভাঙার অনুকূলে। কেননা ৬ দফা কার্যত দেশ ভাঙারই শামিল। ওদিকে পশ্চিমাঞ্চলের রায় ছিল ৬ দফার বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ ৬ দফার পক্ষে ভোট দেয়নি, বরং পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। এ অবস্থায় একটি রায়কে মেনে নেয়া, অন্যটিকে অস্বীকার করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্যই একটি আপোসরফা ছিল জরুরী বিষয়, বিশেষ করে যখন দেশ দু'টি বিবপরীত মেরু অভিমুখী রায় দিয়েছে।

তৃতীয়ত, ভুলে যাওয়া উচিত নয়, ১৯৭০-এর পূর্বাঞ্চলের নির্বাচনে সত্যিকার অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। মওলানা ভাসানী নির্বাচন বয়কট করেছিলেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। মওলানা ভাসানী দাবি করেছিলেন, ব্যাপক ও ভয়াবহ বন্যা এবং সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত রয়েছে। সেখানকার মানুষ ভোট দিতে অক্ষম। শেখ মুজিব এমন এক নির্বাচন জয় করেছিলেন যাতে প্রতিযোগিতা ছিল না।

◆ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত তো পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের। এ কমিশন ছিল কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত। তারাই ১৯৭০-এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। সিদ্ধান্তটি শেখ মুজিবুর রহমানের নয়। ঠিক আছে, শুধু ভাসানীর এলাকাগুলোতেই সামুদ্রিক ঝড়ের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। যে সব নির্বাচনী এলাকা বা অঞ্চল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলোতে নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন তিনি জানিয়েছিলেন।

▲ আমি বলিনি এ সিদ্ধান্ত তাঁর। আমার বক্তব্য ছিল, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। কারণ যা-ই হোক... আমি বলতে চাই যে, আমি যদি নির্বাচন করি আর নওয়াজ শরীফ না করেন তাহলে সে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট নির্ঘাত আমার পক্ষেই পড়বে। আর অবস্থা এর

উল্টো হলে নওয়াজ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতবেন। ব্রিটিশ শ্রমিক দল যদি নির্বাচনে না লড়ে, টোরিরা ফাঁকা মাঠে গোল দেবে। আমেরিকার রিপাবলিকানরা নির্বাচনের মাঠে থাকলেও তার পাশাপাশি ডেমোক্র্যাটিক দল গরহাজির থাকলে শেষের দল জিতবে না। তবে এসব যুক্তি ছাড়াও আমার বলার বিষয় হলো এই—যা আপনাকে মেনে নিতে হবে এমন নয়, সে নির্বাচনটিতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। মওলানা ভাসানী এ নির্বাচন বয়কট করেছিলেন আর সেটি চলে যায় শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের অনুকূলে।

◆ যেভাবেই হোক আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে ওঠে।

∆ পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

◆ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি একটি ম্যান্ডেটের ওপর জয়ী হয়। আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা কোন রকমের একটা সমঝোতা ছাড়া পার্লামেন্টে যোগ দিতে রাজি ছিল না। তাহলে ঐ সময় জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে কী ধরনের আপোসরফা, কী ধরনের সমঝোতা চেয়েছিলেন?

∆ আমি সে ব্যাখ্যাও দেব। ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, ১২০ দিনের ভিতর শাসনতন্ত্র স্থির করতে হবে। এ জন্য কায়েদে আওয়াম বলেছিলেন, ১২০ দিনের ম্যান্ডেট আপনি দেবেন না। কারণ সেটিই একটি প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠবে। তাই হয় সময়সীমার এ ম্যান্ডেট বাতিল করুন যাতে পূর্বাহ্নে আমরা দরকষাকষিমূলক আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে পাই, না হয় সময়ের সুপরিসর একটা ব্যবস্থা রাখুন। ১২০ দিনের অচলাবস্থা হতে দেবেন না। অনেক লোকই হয়ত ভুলে গেছে, আমি ভুলিনি। ভুট্টো পার্লামেন্টে যাবেন না—কখনও একথা বলেননি। বরং বলেছিলেন, বাধার কাঁটা রেখে আমরা সমঝোতায় আসতে পারি না। তিনি এ জন্য দু'টি বিকল্প দিয়েছিলেন—এক. হয় জাতীয় পরিষদ বা গণপরিষদ অনুষ্ঠান বিলম্বিত করুন আমাদের দরকষাকষির আলোচনার সময় দেবার জন্য, না হয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য ১২০ দিনের সময়সীমা তুলে নিন। কেননা পশ্চিম যেখানে ৬ দফা প্রত্যাখ্যান করেছে পূর্বাঞ্চল সেখানে সেটি গ্রহণ করেছে। দেশের বিচ্ছিন্নতা কীভাবে এড়ানো যায় ভুট্টো এমন একটা আপোসরফার জন্য তৈরি ছিলেন।

◆ কী ধরনের সমঝোতা চেয়েছিলেন তিনি?

∆ আমি পড়াশোনার জন্য বিদেশে থাকাকালে আমার কাছে বাবা চিঠির আকারে কার্যত একটি বই লিখেছিলেন। বইটির শিরোনাম প্রথমে ছিল—*মাই গ্রেট ট্র্যাজেডি*, পরে এটি *দ্য গ্রেট ট্র্যাজেডি*—এই শিরোনামে ছাপার আকারে প্রকাশিত হয়। আমি ইতিহাস থেকে সমঝোতার খুঁটিনাটি ও সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো মনে করতে পারছি না, তবে তাতে অনেক ক্ষেত্রে লেনদেনের ব্যবস্থা ছিল, যে আদান-প্রদানের জন্য তাঁরা তৈরিও ছিলেন। তবু একটি বা দু'টি বিষয় ছিল যে সব বিষয়ে তখন সংশয়, দ্বিধা, দোদুল্যমানতা ছিল। সম্ভবত এ সবের ব্যাখ্যা রয়েছে *দ্য গ্রেট ট্র্যাজেডিতে*। বইটিতে এ বিষয়ে আমার বাবার নিজের অভিমত রয়েছে।

◆ বইটি আমি পড়েছি। সুলিখিত এ গ্রন্থে বাস্তবিকপক্ষে সামরিক এ্যাকশনের অনুকূলে যুক্তি দেখানো হয়েছে। এতে রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী ভোটারদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার প্রয়াস। তবে এতে সবিস্তার আলোচনাও রয়েছে ৬ দফার।

A এভাবে আমার অবশ্য মনে নেই। তবে বইটি হাতের কাছে থাকলে আমি আমার বাবার সাথে কোন কোন আলোচনার কথা মনে করতে পারতাম। তবে যদ্দূর আমার মনে পড়ে, ৬ দফা মেনে নেয়া নয়, বরং ৬ দফার প্রশ্নে কী ছাড় দিতে তৈরি সে কথা তিনি ঐ বইতে লিখেছেন।

◆ জী হ্যাঁ, সে কথা তিনি প্রকাশ্য জনসভাতেও বলেছেন।

A না, প্রকাশ্য জনসভার কথা আমি বলতে চাইব না। কেননা খবরের কাগজে ঘটনাকে বিকৃত করার কুখ্যাতি রয়েছে।

◆ তিনি 'ট্র্যাজেডি' কথাটি বলেছেন আসলে নিষ্ঠুর পরিহাসে। আমি জানি না, এটি বাংলাদেশ বা পাকিস্তান কারও জন্য ট্র্যাজেডি ছিল কি না।

A ট্র্যাজেডি হয়ত দু'দেশের জন্যই। ওটা ছিল তাঁর ঐ সময়কার অভিমত।

◆ পিপিপি ছয় দফার সাড়ে চার দফা মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল। তাই ধরে নেয়া যায়, ওরা সত্যিই খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল। অথচ শেখ মুজিবের সাথে তিনি কী সমঝোতা চাচ্ছিলেন তা কেউ জানে না বলেই মনে হয়।

A শেখ মুজিব ছয় দফা নিয়ে চাপ বজায় রাখবেন না—এটি তিনি চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ছয় দফার জন্য যদি ম্যান্ডেট থেকে থাকে আপনার, আমার কাছেও ম্যান্ডেট রয়েছে সেই ছয় দফারই বিরুদ্ধে। তাঁর ও পিপিপির মতে, ছয় দফা আমরা মেনে নিলে আমাদের চোখের সামনেই পাকিস্তান ভেঙে পড়বে। দু'টি নয়, কেবল পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নয়, পাঁচ পাঁচটি দেশের আবির্ভাব ঘটবে। তাই পাকিস্তানকে রক্ষার বিষয়টি তিনি সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি ছয় দফার আরও দুই একটি দফা মেনে নিতে তৈরি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের আলোকে। তবে সে ক্ষেত্রে শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগকেও কোন না কোন বিষয় ছাড় দিতে হবে। এ সব বিষয়ের কথা তিনি তাঁর ঐ বইতে লিখেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, মুক্তিবাহিনী ঐ সময় গোটা ঢাকা নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র মূলত ঝরে পড়েছিল...।

তৃতীয়ত, তিনি আগে থেকে এ সব জানতেন না...।

◆ এটি কোন্ সময়ের ঘটনা? '৭১-এর ২৫ মার্চের?

A বিদ্রোহীদের ওপর সেনাবাহিনীর ক্র্যাকডাউন কিংবা সামরিক এ্যাকশন শুরুর সময়কার।

◆ কিন্তু সামরিক কমান্ডাররা তো ঐ সময় দাবি করেছিলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে? নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

A আওয়ামী লীগের সাথে দরকষাকষির আলোচনার জন্য ১৯৭১-এর মার্চে ঢাকায় থাকাকালে একটা সময়ে আমার বাবা যে হোটেলে ছিলেন মুক্তিবাহিনী সে হোটেলটি সিল করে দিয়েছিল...।

◆ সে সময় মুক্তিবাহিনী ছিল না, ওরা ছিল পাকিস্তানী।

▲ ওরা পাকিস্তানী? আমরা মনে করেছিলাম ওরা মুক্তিবাহিনী। আমি আসলে বলতে চাই, পাকিস্তানী সৈনিকরা উধাও হয়ে গিয়েছিল আর...।

◆ আপনি আওয়ামী লীগ সমর্থকদের কথা বলছেন?

▲ তা নয়, আমি সশস্ত্র সামরিক লোকজনের কথাই বলছি।

◆ এ রকম কোন সশস্ত্র সামরিক লোকজনের অস্তিত্ব তখন ছিল না।

▲ সে জন্য আমি ওদেরকে বলছি মুক্তিবাহিনী। কেননা, আমি মুক্তিবাহিনী বলতে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারীদের বোঝাতে চেয়েছি, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছিল।

◆ মুক্তিবাহিনী তো অনেক পরের কথা...।

▲ আমি আপনাকে এখন যা বলছি—তখন আমাকে এগুলো বলা হয়। ওখানে যে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন চলছিল সে বিষয়ে আমাদের কখনও কোন সন্দেহ জাগেনি। আমাদের সে ধারণা হয়তবা ভুল তবু যা আমি শুনেছি তাই আপনাকে বলছি।

সশস্ত্র দেহরক্ষী বা যারা পরে মুক্তিবাহিনী হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে তারা চাঁদা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দেয়, বিমানবন্দর ঘেরাও করে, আইন-শৃঙ্খলার বিষয় তদারকি শুরু করে দেয়। আর সবাই হোটেলের ভিতরে এসে আশ্রয় নেয়। ঐ রাতে আবার শেখ মুজিবের সাথে আমার বাবার বৈঠকের কথা ছিল। শেখ মুজিবও বলেছিলেন, তিনি ভুট্টোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠাবেন। আমার বাবা সেই লোকগুলোর জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ওরা আর আসেনি। তারপরে আচম্বিতেই সে রাতের আঁধার আলোকিত হয়ে ওঠে। গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। সকলেই বুঝতে পারে, একটা কিছু ঘটেছে কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে তা সত্যিই কেউ নিশ্চিত হতে পারছিল না। পরে আমার বাবাকে ঐ হোটেল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সে সময়ই তাঁর সুবিখ্যাত উক্তিটি করেন, "খোদা মেহেরবান, পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে!"

অনেকেই ভেবেছিলেন, লোকজনকে নিরস্ত্র করতে সংক্ষিপ্ত সামরিক এ্যাকশন নেয়া হলে নিঃশ্বাস ফেলার একটা সময় হাতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সামরিক এ্যাকশন যখন শুরু হলো তখন আমরা যারা পাকিস্তানে ছিলাম, এ ব্যাপারে তেমন কিছুই জানতে পারিনি। কেননা, ঐ সময়ে আমাদের খবরের কাগজগুলোতে ছিল কড়া সেন্সরশিপ। তবে সময় এগুতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এক মাসের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম আসলে কী সব ঘটছে তা নিয়ে আমার বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন।

◆ ঐ নয় মাসের গোটা সময়টা কি আপনি পাকিস্তানে না দেশের বাইরে ছিলেন?

▲ দেশের বাইরে ছিলাম।

◆ বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম তো তাহলে আপনার হাতের নাগালেই ছিল।

▲ ঠিক, কিন্তু আমি বাবার কাছে যা শুনেছি সেটিই বলছি। আমি যখন পাকিস্তান সম্পর্কে ধারণার কথা বলি সেগুলো আমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কথা। এখন আমার একান্ত

নিজের ধারণা কী তাও আমি বলতে পারি, তবে তার আগে আমার বাবার কথাই শেষ করতে দিন।

তিনি পাকিস্তানে ফিরে এলেন। আর এক মাসের মধ্যেই তিনি উদ্বিগ্ন, অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। পাকিস্তানী সংবাদপত্রে বাংলাদেশের ঘটনার খবর না থাকলেও বিদেশী পত্রপত্রিকায় যে সব রিপোর্ট বাংলাদেশের ওপর থাকত সেগুলোকে আমরা নির্বোধের মতো ভারতীয় প্রচারণা বলে মনে করতাম। আমরা পাকিস্তানীরা এমন এক বিশেষ ফ্যাশনে মানুষ যাতে করে সবকিছুই আমাদের কাছে ভারতীয় প্রচারণা বলেই মনে হতে থাকে।

বাংলাদেশ থেকে আসা যে সব ছেলেমেয়ে এখানকার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, যে সব লোক আমাদের জানাশোনা তাদের সকলেই নানারকমের ভয়াবহ বিভীষিকাময় কাহিনী আমাদের শোনায়। কেমন করে একজন সামরিক অফিসার ও তাঁর স্ত্রীকে কেটে ছয় টুকরো করা হয়েছিল, কারও চোখ তুলে নেয়া হয়েছিল, ইত্যাকার লোমহর্ষক কাহিনী...। এ সব লোকজনের বাংলাদেশে রয়ে যাওয়া আত্মীয়রা এখানে চলে আসতে থাকার সাথে সাথে এ সব কাহিনীও পাহাড় হয়ে উঠতে থাকে। কাজেই এ ছিল এক ভয়ানক দ্বৈরথ। আবেগ-উত্তেজনা চলতে থাকে চরম মাত্রায়।

১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে আমার বাবা প্রকাশ্যে সামরিক এ্যাকশন অবসান ও সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানান। পাকিস্তানে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক নেতা যিনি এ কাজটি করেন ও এ ধরনের বিবৃতি দেবার জন্য প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন। ফলত রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের তাঁর এ আহ্বানে কেউ সেদিন কান দেয়নি।

একাত্তরের ডিসেম্বরে তিনি এক পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে নিউইয়র্কে আসেন। আমরা তখন পিয়ের হোটেলে ছিলাম। ভয়ানক উদ্বিগ্ন আমার বাবা তখন যে কোন প্রকারে একটা সমাধান চাচ্ছিলেন। তাঁকে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা উভয় দায়িত্বে যুগপৎ বহাল করা হয়—যদিও তিনি এ জন্য আনুষ্ঠানিক শপথ নেননি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ওরা চেয়েছিল আমি শপথ নেবার পর এখানে আসি। সে ক্ষেত্রে এখানে আমার সমর্থক মহলের অস্তিত্ব থাকত না, কেননা আমি ছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি। বাবা আমায় বলেছিলেন, তিনি এ জন্য শপথ নেননি যে ওরা যা করছে তাদের একজন তিনি হতে চাননি। তিনি বলেন, আমি যদি ঐ শপথ নিতাম তাহলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। তিনি আরও বলেন, দেশের একত্ব বাঁচানোর জন্য পাকিস্তানের প্রয়াস আমি ঠেলে ফেলতে পারি না, আবার যুগপৎ আমি নিজেকে এ বাস্তবতা থেকে দূরে রাখতে চাইছিলাম যে, সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে যাওয়া হচ্ছে না, অথচ এরকম একটা পর্যায়ে এখন এসে গেছে।

আমি বাবার সাথে জাতিসংঘে যেতাম। একটা বিষয় ঐ সময়ে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, বিশেষ করে সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের লোকেরা তাদের ভাষণ ইচ্ছা করে লম্বা করার কৌশল অবলম্বন করে, কারণ তারা ঢাকার পতন দেখতে চায়। যেদিন আমার বাবার জাতিসংঘে ভাষণ দেবার কথা সেদিন তারা আবার তাদের ফিলিবাস্টারিং শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে আমার বাবা বক্তৃতা করার জন্য যে সব নোট তৈরি করেছিলেন তা ছিঁড়ে ফেলেন। তবে পোলিশ প্রস্তাবটি তিনি ছিঁড়ে ফেলেননি বলেই কিছু লোক জানায়। আমি তাঁর

ঠিক পিছনেই বসে ছিলাম। তাঁকে আমি অত্যন্ত আবেগময় ভাষণ দিতে শুনি। তিনি বলেন যে, "আপনারা এখানে সকলে ইচ্ছামতো প্রলম্বিত বক্তৃতা করছেন, আপনারা 'এখন কি লাঞ্চ করার জন্য বিরতি থাকবে, চায়ের জন্য সভা বন্ধ থাকবে? কিংবা কিছুটা বিশ্রাম নেয়া যাক'—এ ধরনের অনাবশ্যক কথাবার্তার তুবড়ি ছুটিয়ে চলেছেন যখন মানুষ মারা যাচ্ছে, ওদের হত্যা করা হচ্ছে।" তিনি বলেছিলেন, আপনাদের এ রকমটা প্রত্যাশিত নয় কারণ, বাস্তবতা বদলে যাচ্ছে।" তিনি বক্তৃতা দেবার পর বেরিয়ে গেলেন, সামনের সারির আসনের লোকজন তাঁর পিছু নিল। আমি পিছনের সারি থেকে উঠে তাদের অনুসরণ করলাম। সকলে আমরা ফিরে গেলাম পিয়ের হোটেলে। সেখানে সংবাদপত্র ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের লোকজনকে কী বলতে হবে তিনি তার ডিক্টেশন দিলেন। এরপর তিনি একান্তে থাকতে চাইলেন। আমরা দু'জনে নিরিবিলি হতে তিনি বললেন, চলো, আমরা একটু ঘুরে আসি। আমরা পিয়ের হোটেলের কাছাকাছি এলাকায় কিছু সময় ঘোরাফেরা করলাম।

বাবাকে অত্যন্ত বিচলিত ও বিমর্ষ মনে হলো। তিনি বললেন, মনে হলো ওরা সবাই অপেক্ষা করছে কখন ঢাকার পতন ঘটবে। আমরা বোধ হয় এখন আমাদের ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্ন তথা মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঐ দিন তাঁকে খুবই বিমর্ষ মনে হলো। হাজার হোক তিনি সেই মানুষটি যিনি ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা আদর্শভরা দিনগুলোর মাঝে বড় হয়েছেন।

তিনি এ কথাও উপলব্ধি করলেন, বাঙালীদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। আমরা যখন ছোট তখন ভাষা প্রশ্নে তাঁর অভিমত ছিল, হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা গ্রহণ করুন কিংবা চারটি প্রদেশের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন ভাষা সম্ভব হলে বেছে নিন। কেননা, এদেশের মানুষ ইংরেজী বলতে ও তাদের দেশী ভাষা বলতে জানত। ঐ সময় কেমন করে উর্দুতে কথা বলতে হয় ওরা জানত না। এ অবস্থায় বাঙালীরা মনে করতে থাকে, 'আমাদের ছেলেরা চাকরি-বাকরি পাবে না, কেননা তারা পরীক্ষায় ভাষার কারণে পাস করতে পারবে না, কেইবা ওদের চাকরি দেবে... ওরা তো উর্দু জানে না। এ রকমই একটা অনুভূতি ছিল ভাষা গোলযোগের সময়টায়। তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠকে শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করাটাও খুবই অন্যায়। তাঁর ধারণা প্যারিটি বা দেশের দুই অংশের মধ্যে সমতা নীতির তত্ত্ব দিয়ে আমরা বাঙালীদের প্রতি অবিচার করেছিলাম। কেননা, কার্যত আমরা বলতে চেয়েছিলাম "তোমাদের আমরা সমান পাকিস্তানী হিসাবে মানি না... ।"

আমি রাওয়ালপিন্ডির পেশোয়ার রোডে আমার বাবার সাথে থাকতাম। আমাদের আরও একটা বাড়ি ছিল সিভিল লাইন্সে। আমাদের কাছের পড়শী ছিলেন খাজা শাহাবুদ্দিন ও বগুড়ার মোহাম্মদ আলীরা। আমার মনে আছে আমি তখন খুব ছোট। মায়ের সাথে টি-পার্টিতে বেগম শাহাবুদ্দিন এলে আমি সেখানে থাকতাম। তাঁর বিড়ালের আঁচড় দেয়া দাগ এখনও আমার হাতে আছে। বিড়াল বেগম শাহাবুদ্দিনের খুব শখের। আমিও বিড়াল খুবই পছন্দ করতাম।

তাঁদের বাড়িতে অনেকে বেড়াতে আসত। সেখানে দেখা হলে তারা আমার মাকে অনুযোগ জানাত "জানো নুসরাত, ওরা আমাদের পাকিস্তানী মনে করে না। পাকিস্তানীর মতো আচরণ করে না। কিন্তু কেন ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না? আমরা তো আর-

সকলের মতোই পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছি। অথচ ভাবে মনে হয় আমরা পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।"

বিদ্যালয়গুলোতেও এ রকম একটা মনোভাব ও অনুভূতি কাজ করত। স্কুলের শিক্ষকরা বলতেন, পূর্বাঞ্চলের লোকরা ভাত খায়, আকারে খাটো; পশ্চিমের লোকের খাদ্য গম, ওরা লম্বা-চওড়া। এগুলো সত্যিই অত্যন্ত স্থূল রকমের বর্ণবিদ্বেষ। শিশু হয়েও আমি অনুভব করতে পারতাম, ব্যাপারটা অন্যায়। বড় হয়ে বুঝলাম বাঙালীরা কী বলে, বলতে চায়। এটি আমি বুঝেছি বড় হয়ে প্রধানমন্ত্রী হবার পর। আর সে উপলব্ধি হলো—আরেকজন যেমন, ঠিক আমিও তেমনি একজন পাকিস্তানী। আমি পাকিস্তানী হতে চাই না তা নয় বরং তুমি আমাকে সেই একইভাবে গ্রহণ কর না। পরিতাপের বিষয়, একটা যেন বর্ণ বৈষম্য রয়েই গেছে। আমি আমার শৈশবে যা শুনেছি আর যা বুঝিনি তা এখন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। আমি মনে করি, পাকিস্তান যদি ভাঙে সেজন্য পশ্চিমাঞ্চলের হঠকারিতাই দায়ী। বাঙালীরা একান্তই পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে। তবে ওরা এক লোক, এক ভোট চায়। আমরা ওদেরকে তা দিতে প্রস্তুত নই। আজকে আমি মনে করি এ কারণেই বাংলায় গোলযোগ শুরু হয়। আমরা বলেছিলাম, জমির ব্যাপারটাও হিসাবে নিতে হবে। তোমাদের জমি আমাদের চেয়ে কম।

এরপর বেলুচিস্তানে গোলযোগ দেখা দেয়। এ ঘটনা ঘটে বাংলাদেশের ঘটনার পরবর্তীকালে। আমরা বেলুচিস্তানকে বলেছিলাম, বেশ, এক লোক এক ভোট হোক। বেলুচিস্তানের জবাব ছিল, বেশ, জমির ব্যাপারটা তাহলে কী? তোমরা যতগুলো প্রদেশ সব যোগ করার পরও তো জমি আমাদের বেশি। আমাদের কথা ছিল—আমরা জমির ব্যাপারটা হিসাবে নেব না, এক লোক এক ভোট দেব। এখন আমাদের তৃতীয় আদমশুমারিতে হয়ত আবারও আমরা গোলযোগে পড়তে যাচ্ছি। এর কারণ হলো, আমরা সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচ, পাঠান বা মোহাজির যা-ই হই না কেন সেটি কোন বিষয় নয়; আমরা লাহোর, করাচী বা যে কোন জায়গায় বসবাস করতে পারি, আমরা সবাই পাকিস্তানী—এ কথা না বলে বরং লোক গণনার কারচুপির চেষ্টা করছে বাস্তবতাকে না মেনে নেবার জন্য। আর সেটিই আদত সমস্যা। যদি আমরা সবাই মেনে নিই, আমরা সবাই সমান পাকিস্তানী তাহলে কারও কোন এ ধরনের চিত্তবিকার থাকে না।

◆ বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষকরা হিন্দু ছিল। বাঙালীরা ওদের কাছে শিক্ষা পেয়েছে। তাতে ওদের মুসলমানত্ব কমে গেছে।

▲ আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর একই জিনিস লক্ষ্য করি। খবরের কাগজে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চলে যে, বেনজীর শতকরা ৭৫ জন হিন্দুকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছে। অথচ শিক্ষক নিয়োগে আমার করার কিছুই ছিল না। এমনকি কে চাকরির জন্য আবেদন করেছে, কে করেনি—এসব কিছুই আমি জানতাম না। এ ছাড়াও বিষয়টি প্রাদেশিক এখতিয়ারের। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিষয়টি সত্যি নয়। তবে বড় বাস্তবতা হলো এই যে, যদি প্রত্যেক নাগরিকই সমান হয়ে থাকে, এ ধরনের তারতম্য কেন হবে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোন কোন মহলে এমন তারতম্য করা হয়ে থাকে। আমরা এ সবে বিশ্বাস করি না, কারণ, আমরা যখন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পদে নিই তখন কীভাবে ওসব জায়গায় এ সব ঘটছে কী করে জানা সম্ভব? আমরা তাই এ সব মেনে নিতে রাজি নই। কিন্তু যদি আমরা একবার এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে পারি আমাদের নজরে পড়বে পাকিস্তানের শাসক ও কুলীন গোষ্ঠীর মাঝেই এ জিনিসটির অস্তিত্ব আছে যা কাজে লাগিয়ে তোলপাড় তোলা হয়, আর এ অবস্থায় আপনার রহস্য অজানা থাকার কথা নয়, কেন আপনারা হিন্দুকে শিক্ষক নিয়োগ করেন?

◆ তাহলে কি কুলীন শ্রেণীতেই এই জাতিগত পক্ষপাত ঘাপটি মেরে আছে?

Δ আমার মনে হয় ঠিক কোথায় সেটি আছে সে প্রশ্ন আপনার, বাঙালীদেরই করা উচিত।

◆ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস সম্প্রতি জেনারেল নিয়াজির যে বই প্রকাশ করেছে সেটি আপনি দেখেছেন বা পড়েছেন?

Δ আমি তাঁর বই পড়িনি। তবে হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি মনে করি, এ রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুতরভাবে জেনারেল নিয়াজীর প্রতিকূলে গেছে। এ কারণেই জেনারেল নিয়াজীর কী বলার আছে তার চেয়ে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে নিরপেক্ষ কমিশন কী বলে, সেটিই বরং আমি দেখব। স্পষ্টত জেনারেল নিয়াজী মনে করেছেন, মানুষ অতীতকে ভুলে গেছে। আর তিনি তাঁর পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। তবু হামুদুর রহমান কমিশন কী বলে বরং সেটিই আমার বিবেচ্য।

◆ পাকিস্তান সরকার হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করছে না। আপনিও তো দু'বার ক্ষমতায় ছিলেন, আপনিও তা করেননি, কেন?

Δ দেখুন, জনসাধারণ এ জন্য তেমন চাপ সৃষ্টি করেনি, হৈ চৈ তোলেনি।

◆ হৈ চৈ তোলা হলে কি প্রকাশ করতেন?

Δ আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার পর আমি নিজে পড়ে দেখার জন্য হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের একটি কপি চাই। তবে কোন কপি আমি পাইনি। আমি জানি না রিপোর্টের কপিগুলো নিয়ে জেনারেল জিয়া কী করেছেন?

আমার বাবা এ রিপোর্ট প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বলে আমি জানি। তবে সামরিক কর্তৃপক্ষ এর প্রকাশনার ব্যাপারে আপত্তি জানায়। আমার মনে হয়েছিল, আমরা এখন পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে নতুন করে গড়ে তুলছি, সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। এ অবস্থায় ১৯৭১-এর ঘটনাবলীকে আবার টেনে তুলে সেনাবাহিনীকে এমন আলোকে দেখাব না, যা এর পুনর্সঞ্জীবিত করার প্রতিকূল হবে। আমি এর আগে বলেছি, যুদ্ধ এক কদর্য কাজকারবার, এ রকম কদর্য, কুৎসিত ঘটনা যুদ্ধে ঘটে থাকে, তাই এগুলো দুর্ভাগ্যজনক।

এরপর জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসেন। তিনি এ রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু কখনও তিনি তা করেননি কারণ সামরিক বাহিনী কখনও ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হোক চায়নি। অবশ্য আজকের সামরিক বাহিনী এতে কিছু মনে করবে না। মনে হয়, পাকিস্তানের আজকের সেনাবাহিনী কিছুটা বেশি আলোকপ্রাপ্ত... আমি সামরিক বাহিনী বলতে এর গোয়েন্দা অংশ

বাদ দিয়েই বলছি। যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলাম এটি প্রকাশের জন্য কোন চাপ ছিল না। জনসাধারণ কোনভাবে এগিয়ে চলেছিল।

◆ আগামীতে কি আপনি এটি প্রকাশ করবেন?

▲ তাহলে ব্যাখ্যা করেই বলি। ঐ সময় মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয় যে, ২৫ বা ৩০ বছরের বেশি পুরনো কাগজপত্র জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হবে। তবে ঐ সিদ্ধান্ত নওয়াজ শরীফ উল্টে দেন। ঐ সিদ্ধান্ত এখন বলবত। আমি মনে করি ২৫ বছরেরও বেশি কিংবা ৩০ বছরের মতো ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে।

আমি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের একটা কপি চেয়েছিলাম। আমাকে বলা হয়, রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না। আমি যদি সঠিকভাবে মনে করতে পেরে থাকি তাহলে আমি বলব ঐ রিপোর্টের মূলত তিনটি কপি ছিল। একটি কপি ছিল সুপ্রীমকোর্টে, আরেকটি কপি ছিল যে কর্তৃপক্ষ কমিশনকে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, এখতিয়ার নির্ধারণ করে দেয় তাদের কাছে আর তৃতীয় কপিটি তখনকার প্রধানমন্ত্রী—আমার বাবার কাছে।

কোট লাখপতের কারাগারে থাকতে আমার বাবা এজিএন কাজীর কাছ থেকে একটি চিঠি পান। তিনি নিজে বা জেনারেল জিয়া হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের ঐ কপিটি চান যা তাঁর (জনাব ভুট্টো) কাছে রয়েছে। আমার বাবা জানান, ঠিক আছে আমি ওটা আপনাকে দেব—তবে সেটি আমি ঐ কমিশন সদস্যদের উপস্থিতিতে দিতে চাই। কারণ আমি আশঙ্কা করছি যে, আপনারা ঐ রিপোর্টটিতে রদবদল করতে চলেছেন। তাঁর এ আশঙ্কা জাগার কারণ, তাঁর বিরোধীরা হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ছাপার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর অনীহার সুযোগ নিয়েছিল তাঁর (জনাব ভুট্টোর) ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য। তাই তিনি ঐ রিপোর্টের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কমিশন সদস্যদের প্রত্যায়ন ও অনুস্বাক্ষর নেয়ার ব্যাপারে সবিশেষ উদগ্রীব ছিলেন যাতে প্রমাণিত হয় সেটিই মূল হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট। তিনি কাজীর পত্রের জবাব এভাবেই পাঠান। আমিও তাঁকে লিখি। কিন্তু কখনও কোন জবাব পাইনি।

আমার বাবা তখন আমাকে বলেন যে, ঐ রিপোর্টটি আমাদের বাড়ির অমুক জায়গায় একটা ব্রিফকেসে রয়েছে। তুমি ওখানে খুঁজলেই পাবে। আমরা মনে করেছিলাম, ওরা আমাদের বাড়িতে আসছে আর এসে বলবে, হ্যাঁ, ওটা আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরে পেতে চাই। আমি ব্রিফকেসে রিপোর্টটি খুঁজে পাই। এভাবে ওটা ওখানে আছে নিশ্চিত হবার পর আমি তাদেরকে ওটা দিয়ে দেবার জন্য তৈরি হই। অবশ্য ওরা আর আসেনি। আমাকে, আমাদের সকলকে একের পর এক গ্রেফতার করা হয়। শেষে যে রাতে ওরা বাবাকে ফাঁসিতে লটকায় সেই রাতে আমাদের বাসায় হানা দেয় এবং ঐ রিপোর্টটি নিয়ে যায়। আমার ধারণা, কখনও যাতে ঐ রিপোর্ট সাধারণ্যে ফাঁস না হয়ে যায় সেটি নিশ্চিত করার জন্যই রিপোর্টটি ওরা নিয়ে যায়। ঐ সময়ই রিপোর্টটি আমি পড়ে দেখেছি। কারণ, ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে আমার আগে থেকেই কৌতূহল ছিল আর তাই ঠিক করলাম, এটি যখন হাতছাড়া হতে চলেছে একবার পড়ে নিই। ঐ সময়কার সামরিক বাহিনীর জেনারেলদের সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল। ঐ সময় সামরিক বাহিনীতে পদোন্নতির গোটা পদ্ধতিই ছিল ভিন্ন। আমি

প্রধানমন্ত্রী হয়ে ঠিক করি, পদোন্নতি একভাবেই হবে। কিন্তু অচিরেই লক্ষ্য করলাম, সময় বদলে গেছে।

◆ জেনারেল নিয়াজীর বইয়ের ব্যাপারে আপনি কী যেন বলছিলেন?

∆ বইটি আমি পড়িনি। তবে আমি মনে করি, আমার কয়েক বছর আগে পড়া রিপোর্টটিতে জেনারেল নিয়াজী সম্পর্কে তীব্র ধিক্কার ও নিন্দামূলক কথাবার্তা ছিল।

◆ যেহেতু এ রিপোর্ট নিয়ে এখন কথা উঠেছে, বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসাবে আপনি এটি প্রকাশ করার দাবি কি তুলবেন?

∆ অবশ্যই, আমরা তা করতে পারলে খুশি হব। এখন অনেকটা সময় কেটে গেছে, পানিও গড়িয়েছে ঢের। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে আমি খুব খুশি হব। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত ইতিহাসের সাথে জনসাধারণের একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। হামুদুর রহমান কমিশন ছিল এক স্বাধীন, নিরপেক্ষ কমিশন। এর নেতৃত্বে ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় বিচারক যিনি এমনকি আমার বাবাকেও সমন পাঠিয়ে আদালতের কাঠগড়ায় তুলেছিলেন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য রেকর্ড করার জন্য।

প্রকৃতপক্ষে, রিপোর্টটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, কারণ, এটি কমিশনের একটি রিপোর্ট আর লোকজন কী বলেছে তাও ঐ রিপোর্টে রয়েছে। সেখানে ঐ রিপোর্ট সত্যিকার অর্থে ইতিহাসে নতুন কিছু সারবস্তু যোজনা করবে। এ কমিশনে যে সব ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন তাঁদের কেউ জানতেন না, অন্যজন কী বলেছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু কমিশনের সদস্যরা। রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশ না করার বিষয়টি ইতিহাসবিদদের জন্য এক বড় ধরনের বিপর্যয়।

◆ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার দুই দেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার ব্যাপারে কী কী করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

∆ আমার মনে হয়েছিল দু'দেশের সাধারণ মানুষ পর্যায়ে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি হওয়া উচিত। তবে আমার এও উপলব্ধি ঘটে যে, সার্কের মাধ্যমে একযোগে কাজ করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সার্ক দেশগুলোকে আরও কাছাকাছি আনার জন্য আমি কয়েকটি ব্যবস্থার ব্যাপারে পথিকৃতের কাজ করেছিলাম। এ সবের অন্যতম ছিল পার্লামেন্টারিয়ান ও জজদের মতো এক সেট লোকের জন্য সাধারণ পাসপোর্টের ব্যবস্থা যাতে তাঁরা সার্ক দেশগুলোতে কোন ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারেন। এ ব্যবস্থাটি আজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমি গ্রহণ করেছিলাম ও পরবর্তীকালে যে পরিকল্পনাটি বাতিল করা হয় সেটি হলো একটি অভিন্ন সার্ক এনভেলপ প্রবর্তন, যাতে সার্ক দেশগুলোর লোকেরা পূর্বে মূল্য পরিশোধিত ডাকটিকিট সম্বলিত খাম ব্যবহার করতে পারবে। আর এ খাম হবে সকল সার্ক দেশে একইরূপ।

দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক প্রথা অনুমোদন। আমি মনে করি সার্ক দেশগুলোর অভিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে এ ধরনের অগ্রাধিকার শুল্কপ্রথা প্রয়োজনীয়।

◆ **আমি তো এই সম্পর্কের বিষয়টি আরও বেশি করে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতেই ভাবছিলাম।**

▲ আমার ধারণা, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কও বেশ ভাল। আমরা আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই কামনা করি। তবে পাকিস্তান ও ভারতের সাথে সম্পর্ক রক্ষার বেলায় বাংলাদেশ একটা ভারসাম্য রাখতে চায়—আমার এ কথা ভুল হতেও পারে, তবে আমার ধারণা এটাই। আমরা একটা কনফেডারেশন করে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারি।

◆ **আমরা বোধহয় গোটা আলোচনার শেষে পৌছেছি। আলোচনাটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই।**

▲ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

আ ল তা ফ গ ও হ র

[আলতাফ গওহর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সময় তথ্য সচিব হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠজন হিসাবে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। আইয়ুব খানের পতনের পর তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়। এক পর্যায়ে দেশ ত্যাগ করে তিনি লন্ডনে যান এবং আইয়ুবী আমলের ওপর গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৭১ সালের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গেও ছিল তাঁর সম্পর্ক। আলতাফ গওহরের এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় ইসলামাবাদে তাঁর বাসভবনে।]

◆ **যেসব অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে '৭১-এর ঘটনা, এর আগের নির্বাচন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, সেই অর্থনৈতিক ইস্যুগুলো সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন?**

Δ অর্থনৈতিক ইস্যুগুলো খুবই জটিল বিষয়। এই ইস্যুগুলোকে কেবল '৭১-এর ইস্যু বলা যাবে না। এর কারণ নিহিত রয়েছে একেবারে গোড়ায়। পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময়ে কেন্দ্রে অত্যন্ত শক্তিধর এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল জাতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এসব সম্পদের বিতরণের ক্ষমতা অর্জন করে ঐ সরকার। তখন ১৯৪৭ কিংবা '৪৮-এর গোড়ার দিক। আমার মনে পড়ে স্যার জেরেমি হেইসম্যানের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠিত হয়। মি. হেইসম্যান পরবর্তীকালে ভারতের অর্থমন্ত্রী হন। তাঁর অধীনে এ কমিশনের কাজ ছিল জাতীয় সম্পদ কী কী আছে নিরূপণ করা, কোন্ কোন্ কর ও শুল্ক প্রদেশে/কেন্দ্রের খাতে যাবে তা নির্ধারণ করা। বাস্তবিকই এই কমিশন পূর্ব পাকিস্তানকে পাট খাতে উপার্জিত শুল্ক-অভিশুল্ক থেকে বঞ্চিত করে। ব্রিটিশ আমলে পাটের শুল্ক প্রদেশের হাতেই ছিল, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে নয়। আমার আরও মনে আছে, দেশের গণপরিষদে নূরুল আমিনের প্রথম ভাষণের কথা। এ ভাষণে তিনি বলেছিলেন, এভাবে একেবারে খালি হাতে কিংবা যৎসামান্য নিয়ে কেন্দ্রে আসার পরিস্থিতি তৈরি করে আমাদের আপনারা একান্ত ভিখারি করে তুলছেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

তাই বলছিলাম, অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারা সকল প্রদেশকে কেন্দ্রীয় অর্থসংস্থানের একান্ত মুখাপেক্ষী করে তুলেছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষই নির্ধারণ করত এ শুল্কের হার কী হবে। তারা এমনকি শুল্ক সংগ্রহের দায়িত্ব কুক্ষিগত করে। তারা প্রদেশগুলোর হাত থেকে শুল্ক সংগ্রহের ক্ষমতাটুকুও নিয়ে যায়। এমনিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারই শুধু জানত কত টাকার শুল্ক আদায় হয়েছে, কতই বা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এমনি করেই অর্থনৈতিক গোলযোগের সূত্রপাত ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দের নাগাল পেতে তুলনামূলকভাবে তেমন অসুবিধা পোহাতে হতো না। কেন্দ্রের বাজেট বরাদ্দের বেলায় ঢাকার এ রকম কোন সহজ নাগাল ছিল না। এ অসুবিধার আমি নিজেই ভুক্তভোগী। ১৯৫৮ সালে আমি গোটা দেশের জন্য প্রধান আমদানি ও রফতানি নিয়ন্ত্রক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি। আমি তখন ঢাকায় একটি আমদানি ও রফতানি নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যাই। এ রকম একটি কার্যালয় ঢাকা বা চট্টগ্রামে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কেননা, প্রধান আমদানি-রফতানি নিয়ন্ত্রককে পাট ও লবণের মতো প্রধান আমদানি ও রফতানি পণ্যের লেনদেন তথা সবকিছুই দেখাশোনা করতে হতো। অর্থাৎ এখানে আমি বলতে চাই, এর আগে সকল লাইসেন্স ইস্যু করা হতো করাচী থেকে। তাই আমরা এ কার্যালয় ঢাকায় বসিয়ে উল্লিখিত কাজগুলো এখানেই সারার ব্যবস্থা করি। এ অফিসটি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছিল শুধু আমি ১৯৫১ থেকে '৫৬ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলাম সেই সুবাদে। আমি তখন বুঝেছিলাম যে, প্রদেশগুলোতে এভাবে অর্থ বিলিবণ্টনের গোটা পদ্ধতিই সম্পূর্ণ অন্যায়সম্মত। আর এর ফলে প্রদেশগুলো কেন্দ্রের একটি উপপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আরেকটি সমস্যা ছিল। এটি ছিল টেকনিক্যাল প্রকৃতির। যেমন ধরুন, কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কোন একটি খাতে বরাদ্দ দেয়া হলো। এ রকম বরাদ্দ দেয়ার পর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বলবে যে, প্রকল্পে এ বরাদ্দ অর্থ যে কাজে লাগানো হবে সে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা রিপোর্ট দিন। এতে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার প্রথমে পাঠাবে খোদ প্রকল্পটি, পরে এর সম্ভাব্যতা রিপোর্ট। তখন কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রণালয় এ সম্ভাব্যতা রিপোর্টের নানা রকম ফাঁক-ফোকর, গলদ-ত্রুটি বের করবে ও বলবে, এই এই কারণে এ প্রকল্প তেমন কাজ দেবে না। এভাবে তর্ক চলতে থাকলে বহু ক্ষেত্রে দেখা যাবে সম্ভাব্যতা রিপোর্টের ত্রুটির কারণে বহু ক্ষেত্রেই বাজেট বরাদ্দ তামাদি হয়ে গেছে। এভাবেই গোলযোগের সূত্রপাত হয় ও ক্রমেই এ সঙ্কট ঘনীভূত এবং গভীরতর হতে থাকে। আমার ধারণা, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ এই মেয়াদে তৎকালীন বাঙালী রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব অনেক বেশি জাতীয়তাবাদী ও পাকিস্তান ধারণার প্রতি অনেক বেশি মমত্বপূর্ণ ছিল। এ সময় দেশের অর্থনীতি ও সংস্থানের বেলায় যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অনেকেরই মনে থাকার কথা '৫৬ কিংবা '৫৭তে জনাব সোহরাওয়ার্দী দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি আমাকে কাস্টমস বা বহিঃশুল্ক বিভাগের চাকরি থেকে ডেকে পাঠিয়ে করাচীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করেন। ঢাকায় তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘটে। আমার ধারণা, এ সময়ের শেষ দিকে দেশে সামরিক আইন জারি করা হয় ও সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বিক ক্ষমতা গ্রহণ করে। সামরিক কর্তৃপক্ষ দুই প্রদেশে একজন করে গভর্নর নিয়োগ করে। এই দুই

গভর্নর ছিল সম্পূর্ণ সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। মোনেম খান আইয়ুব খানের কাছে এত সম্পদ নেবার ব্যাপারে আদৌ কোন আপত্তি তুলতেন কি না সন্দেহ। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল জেনারেল আজমের বিষয়ে তাঁর জানা ছিল। কাজেই এ রকমই ছিল তখনকার অর্থনৈতিক পটভূমি। জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টন তখন হতো না। আর এই হলো অর্থনৈতিক সমস্যার নেপথ্য রহস্য। আরেক অর্থনৈতিক ইস্যু ছিল, সরকারী আমলা-কর্মকর্তাদের বেলায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বড় রকমের অসমতা। এ সময় বাঙালী আইসিএস অফিসারের সংখ্যা ছিল নিহায়তই নগণ্য। এর পিছনে, বলা বাহুল্য, কোন পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল না। তবে উল্লেখের দাবি রাখে যে, বাঙালী তরুণ ও যুবকরা যাতে সরকারী আমলা নিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে অংশ নিতে আগ্রহী হয় সে জন্য প্রয়োজন ছিল প্রয়াস ও উদ্যোগ গ্রহণ করা। অথচ সেটি না করার কারণ ছিল সম্ভবত এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, ওরা এসব কাজ করতে সমর্থ হবে না, আর সে কারণে এ ধরনের খাতে কোন বিশেষ বরাদ্দ দেবারও দরকার নেই। আমি এ ধরনের পরীক্ষায় বসেছিলাম ব্রিটিশ ভারতের মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট সংখ্যক পদের জন্য। আমি এ পরীক্ষায় নির্বাচিত হই। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারও পারত এভাবেই সরকারী আমলা পদে বালুচ, সিন্ধী ও বাঙালীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে। অথচ তখন বাস্তবিকই যা হচ্ছিল তা হলো, লোকজন যে কোত্থেকে পাতাল ফুঁড়ে আসছে আর সরকারী পদগুলোতে নিযুক্ত হচ্ছে! আইয়ুব খানের ব্যাপারটা ব্যতিক্রমধর্মীই বলতে হয়। আমাকে যদি তখন চট্টগ্রামের মতো ভাল জায়গায় নিয়োগ দেয়া হতো তাহলে হয়ত আমি সেখানকার কোন একটা চমৎকার বাংলোয় আরামেই থাকতে পারতাম। কিন্তু বাঙালীদের সাথে সত্যিকারের মেলামেশা ও তাদেরকে চেনার সুযোগ আমার হতো না। আমাকে বড় রকমের ছবক দিয়েই ঠাকুরগাঁওয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। বাস্তবিকপক্ষেই আমার এ এলাকায় তখন সুযোগ-সুবিধা বলতে কিছুই ছিল না। সেখানে আমার চাকরিকালে স্থানীয় লোকজনের সাথে পরিচয় ও মেলামেশার অসুবিধার জন্য বাঙালী রাজনীতিবিদরাও দায়ী। কেননা তাঁদের কেউ এদিকটায় ভ্রূক্ষেপ করেননি। একের পর এক স্মৃতি ভাসতে থাকে মনের গহীনে। আমি ভাবতে থাকি, যখন ভাষা আন্দোলন চলছিল তখন কেন আমি সূচনার সমস্যা আসলে কী তা বুঝে উঠতে পারিনি। আসলে সমস্যাটি হলো সত্যিকারের অর্থনৈতিক সমস্যা। বিষয়টি আলোচনার অবকাশ রাখে। ফরিদপুরে এ সমস্যা ছিল আরও ব্যাপক, আর জটিল। যদিও আদত সমস্যাটি অভিন্ন। ফরিদপুর জেলা হিসাবে আয়তনে বিশাল। ফরিদপুর শহরে সমস্যাটি ঠিক সরাসরি নজরে না পড়লেও শহরের চৌহদ্দি পেরিয়ে গাঁয়ে পা দিলেই সেটি প্রকট হয়ে উঠত। আমি নানা মামলায় আদালত পরিচালনায় গ্রামে যেতাম—সেখানে লোকজনের সাথে আলাপ-পরিচয়ও হতো। আমি যে কী করে চাকরিতে টিকে থাকতে পেরেছিলাম সেটি সত্যিই আমার অজানা। এ রকম কথা আমি বলছি এ কারণে যে, তখন গোটা বিচার ব্যবস্থাই ছিল বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানের নিরিখেই গলিত, পচা। এ ব্যবস্থাটি তখনও দাঁড়িয়ে ছিল ব্রিটিশ পদ্ধতির বুনিয়াদে। আমার মনে হয় আমি...

◆ '৫২ সাল সম্পর্কেই বলুন।

∆ এ সময় স্কুলগুলো থেকে ছেলেরা এসে বলেছিল, এই এই ঘটনা ঘটেছে। অনেক সময় আমি বুঝি না কেমন করে এসব সম্ভব? কারণ তখন কোন রকমের যোগাযোগ করার সুবিধা ছিল না। না ছিল রেডিও, ট্রানজিস্টর, না টেলিফোন, বিদ্যুৎ—কোন কিছুই না। তাই আমি ছেলেদেরকে বললাম, তোমরা কোত্থেকে, কেমন করে এসব খবর পেয়েছ? তারা বলল, দিনাজপুর থেকে কেউ একজন এসেছিল, সে-ই বলেছে। তারা এও জানাল, দিনাজপুর থেকে ঢাকার যোগাযোগ তো আছে। ঠাকুরগাঁওয়ের এ রকম কোন সুযোগ ছিল না। ঐ ছেলেরা এমন খবরের ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁওয়ের রাস্তায় মিছিল বের করে। দু'দিন পরে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছায় ঠাকুরগাঁওয়ে, তাতে বলা হয় কোন মিছিল বের করতে দেয়া যাবে না। তবে এ নির্দেশ যেখান থেকে কর্তারা দিচ্ছিলেন সেখানে কিন্তু ঘরে ঘরে নিহত ছাত্রদের জন্য শোক প্রকাশ ও প্রতীকী গানের অনুষ্ঠান চলছিল—সে বিষয়টি তাদের আদৌ খেয়াল হয়নি। কী সব ঘটছে ঢাকায় তাদের অজানা ছিল না বলেই মনে হয়। এ বিষয়টি আমার ভাবনার কারণ হয় ও পরে বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার হয়। কিন্তু আমি বুঝি না, জিন্নাহ কেমন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন আর বলে ফেললেন, উর্দু, শুধু উর্দুই হবে জাতীয় ভাষা। তিনি তো অমন মানুষ নন। তাহলে? এমনকি তিনি নিজেও উর্দু জানতেন না। এখানে একটি জিনিসের দিকে আমি মনোযোগ ফেরাতে বলি। দেখুন, এ সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নাজিমউদ্দিন। জিন্নাহর সাধারণ সব বক্তৃতা ও বিশেষ করে ১১ আগস্ট যে ভাষণটি দেন—এসব ভাষণই তৈরি করে দেয়া হয় সেক্রেটারিয়েট থেকে। আর এ কাজগুলো করেছিলেন ঐসব বাঙালী মুসলমান যাঁরা প্রভাব, পদ ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। নাজিমউদ্দিন, শাহাবুদ্দিন উর্দু ভাষার পক্ষে একটা আন্দোলনই করছিলেন। অন্তত তখনকার দুয়েকটি প্রামাণ্য কাগজপত্র দেখলে যে কেউ এটি বুঝতে পারবে। উর্দু শব্দ ভাণ্ডারে অনেক আরবী, ফারসী শব্দ আছে। কাজেই এ সবের যুক্তিবলে তারাই জিন্নাহকে উর্দু ভাষার সারবত্তা বুঝিয়ে দেয়। তারা নিশ্চয়ই তাঁকে বুঝিয়ে থাকবে যে, উর্দুই হলো কাঙ্ক্ষিত ভাষা, আর এ ভাষা নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। এমনটি যদি নাই হয়ে থাকবে তাহলে কোন রকম বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ এই ভাষার বিষয়টি পাড়বেন কেন তিনি? তখনও দেশের জন্য কোন সংবিধান ছিল না। দেশ তখন মোহাজির সমস্যার মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে। ফল কেমন হলো তা ঠাকুরগাঁওয়ে বসে আপনি কেমন করে বুঝবেন। আমি বুঝি না, বুঝতেই পারিনি যে, আদৌ এ রকম একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। নাজিমউদ্দিন ও আরও বড় বড় লোক তো আর ঠাকুরগাঁওয়ে বাস করেননি, আর করেননি বলেই বাস্তবতার ধারণাও তাঁদের ছিল না। আর উর্দুও যে তাঁরা খুব ভাল জানতেন এমন বলা যায় না। তাই হঠাৎ একদিন ফাঁস হলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের গোটা জনসমষ্টিই প্রায় উর্দু শব্দাবলী সম্পর্কে জানেই না। বাঙালীরা উর্দু না জানলেও কিন্তু স্কুল কলেজে ও ডাক্তারদের এ ভাষা শিখতে হয়েছে। আর যেহেতু আদালতের এজলাসে বসে বাংলায় সাক্ষ্য-শুনানি হতো সেহেতু এ ভাষাটি আমাকে রপ্ত করতে হয়। এখানে অপরিহার্য বাস্তবতা হলো ওদের সাথে তো আর আপনি উর্দুতে যোগাযোগ করতে পারেন না। বড়জোর ইংরেজীতে—তাও এক ধরনের বিশেষ বাচনভঙ্গি, নিজস্ব ইংরেজীতে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলা যায়। তাদের উচিত ছিল বাংলা ভাষাই অনতিবিলম্বে জানা।

অথচ ১৯৫৬তে সরগরম আলোচনা চলছিল এ রকম আমরা ফারসী, আরবী বা উর্দুতে শিখতে, লেখাপড়া করতে চাই। ১৯৪৭-এ এসব ছিল অর্থহীন। তাই আমি মনে করি, আমরা যে প্যারিটি বা উভয় অংশের সমতার কথা বলেছি গলদটা সেখানেই। নাজিমউদ্দিন ও শাহাবুদ্দিনের মতো নেতারা বাংলা লিখতে বা পড়তে কোনটাই জানতেন না। কিন্তু তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পদে বা অবস্থানে ছিলেন। কাজেই তাঁরা হয়ত এমন একটা ধারণা দিয়ে থাকবেন যে, সমস্যাটির সমাধান ওভাবে হবে না, ওটা করা উচিত হবে না। আমি জানি না, কেন তাঁরা এমনটি করেছিলেন, যদিও সেটিই মূল জিনিস নয়। অন্য জিনিস বলে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি সেটি, বলাবাহুল্য, অর্থনৈতিক বিষয়। অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল আসল সমস্যা। কোন প্রয়োজনই ছিল না এর মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক সমস্যা তৈরি করার। আমাদের বরং বলা উচিত ছিল, আমাদের বাঙালী ভাই সবেরা, আসুন এক কাজ করা যাক। আমাদের একটা অভিন্ন ভাষা থাকবে। সেটি ইংরেজী ভাষা। তাতে কারও কোন আপত্তি উঠত না। নাজিমউদ্দিনের জবান ছিল উর্দু। তার পাশাপাশি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার যাঁরা তখন নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা ছিলেন ভারতের সাবেক উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী লোক। লিয়াকত আলী খান ও তাঁর মতো ভদ্র লোকেরা এ সময় সর্বদাই উর্দুর কথা নিয়ে মুখর ছিলেন। অথচ এই ভাষা পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের ভাষা ছিল না। তখন পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিদের বরং এদের বলা উচিত ছিল, ঠিক আছে, আপনাদের মাতৃভাষাই হবে আপনাদের শিক্ষা ও লেখাপড়ার মাধ্যম, আর অভিন্ন সাধারণ সরকারী ভাষা হবে ইংরেজী। আর এই সঙ্গে উচিত হতো ইংরেজী শেখার ব্যাপারে প্রচুর গুরুত্বারোপ করা। কেননা, আমাদের মাতৃভাষা তো আর কোথাও যাচ্ছিল না, সেটা তো থাকতই। ধর্মীয় ও কিছু সাংস্কৃতিক বিষয় ছাড়াও ওটা থেকে আমাদের কিছু লেখাপড়ার ছিল। তা না করে বরং এমনিভাবে এই সাংস্কৃতিক সমস্যা তৈরি করা হয়েছে। এ এখন বাস্তবতা। এর উৎপত্তি নিহিত '৪৭ ও '৪৯-এ। '৫৪-র নির্বাচনে নুরুল আমিন কোন আসনই পেলেন না কেন? এর কারণ, তিনি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে ফরিদপুর থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। এর পরোক্ষ কারণ শেখ মুজিবুর রহমান। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব লাল মিয়া বলেছিলেন, ওখানে শেখ মুজিবুর রহমান নামে এক ছেলে নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর বক্তৃতা দিচ্ছে। সে বিষয়টি দেখার জন্য আমাকে পাঠানো হলো। যা হোক এখন আমি শেখ মুজিবের এ সময়কার বক্তৃতাগুলো থেকে কিছু বরাত দেব। লাল মিয়া বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব এমনকি আমার জেলাতেও এসব কথা বলে বেড়াচ্ছেন।' কিন্তু আমি জবাবে বলেছিলাম 'না, তা নয়।' আসলে আমরা ঐ ধরনের কোন খবর পাইনি। তবে লাল মিয়াদের গোয়েন্দারা তাদের রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল। এ অবস্থায় আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করলাম। শেখ মুজিব তখন তরুণ, অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। যা হোক মুজিব আমার ওপর ঝাল ঝাড়া শুরু করলেন, 'তোমরা পাঞ্জাবীরা... জোচ্চোর, মনিব, প্রভু' হেনতেন ইত্যাদি। 'আর দ্যাখো, তুমি যদি আমাকে গ্রেফতার করার জন্য এসে থাক, গ্রেফতার কর, আমাকে এ্যারেস্ট কর।' আমি বললাম, 'আমি আপনাকে এ্যারেস্ট করতে আসিনি বরং আলাপ করতে এসেছি।' এরপর দু'জনে কথাবার্তা হলো, চা হলো, চা খাওয়ার অভ্যাস আমার ছিল না। আমি তাঁকে বললাম, এমন ভয়ানক আপত্তিকর সব বক্তৃতা দিচ্ছেন কেন আপনি, তা আর যাই হোক নির্বাচনী

বক্তৃতা নয়, আসলে এ ধরনের কথাবার্তা তো...। তখন শেখ মুজিব বললেন, তা আমার বক্তৃতাগুলোর কোন্ কোন্ অংশ সম্পর্কে আপনার আপত্তি? আমি বললাম, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, যেমন আপনি বলেছেন, 'নূরুল আমিনের পিঠের চামড়া আমি তুলে নেব, আর সেটি দিয়ে আমার জুতো বানাব।' কেন এটি আপনি বলতে গেলেন, স্যার! এ কথার জবাবে শেখ মুজিব বললেন, 'আরে না, এর জন্য একটা ভাল কারণ তো ছিলই। তার চামড়া খুবই সুন্দর। তাই আমি বলেছি, এ চামড়ার জুতো হবে আরও সুন্দর।' এ মুহূর্ত থেকে আমরা দু'জন খুবই বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠলাম। পরে আমি স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানিয়েছিলাম, একে আমি গ্রেফতার করছি না। সত্যি বলতে কি, তখনকার গোটা পরিবেশের মেজাজটাই ছিল এ রকম। এমনি করে, পাকিস্তানের শাসক কর্তৃপক্ষীয় মহলের ধারণা হলো যে, সময়মতো যদি তাঁরা সবকিছু গোছগাছ করে নিতে পারেন, ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে যদি সঠিক সময় দেয়া যায় তাহলে তাঁরা নির্বাচনে জয়ী হতে পারবেন। কিন্তু ১৯৫৪ নাগাদ গোটা পরিস্থিতিই যে বদলে গেছে তা তাঁদের খেয়ালে আসেনি। '৫৪ নাগাদ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামগ্রিক সমস্যা একটা অত্যন্ত স্পষ্ট রাজনৈতিক চেহারায় ফুটে ওঠে। ওদের এ সব থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। তাই পরিণতি হিসাবে দেখা গেল, মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি আসন ছাড়া মুসলিম লীগ মোট ৩১০টি আসনের প্রায় সবটাই খুইয়েছে। ওদিকে, প্রতিপক্ষের নির্বাচনী ময়দানে সমবেত হয়েছিলেন ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো তরুণ, প্রাণবন্ত যুবশক্তি। নির্বাচনের পর ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। আমি তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাজনৈতিক বিষয়ক উপসচিব। বিশেষভাবে রাজবন্দীদের বিষয়েই ভারপ্রাপ্ত ছিলাম আমি। এ সময়ে পরিচিত জন দেখা করতে আসত, যেমন ধরুন শেখ মুজিবের স্ত্রী ফজিলা, যিনি স্বামীকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন নিয়েই এলেন। এটি দিতে হবে তিন দিনের জন্য। আমি বললাম, ঠিক আছে, আপনি যান, মুজিবও যাবেন। পরে ফিরে আসুন। এসে আমার সাথে দেখা করুন।

◆ মরহুম নেতার সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

∆ মরহুম নেতা আমাকে আদৌ পছন্দ করতেন না। বরং তাঁর মায়ের সাথেই বেশির ভাগ সংস্পর্শে আসতে হতো আমাকে। এমনকি তিনি আমাকে কিছু ছাড় দেবারও অনুরোধ জানান। এরপর আরও একজন আমাকে একই ধরনের অনুরোধ জানাতে আসেন। আওয়ামী লীগের আরও নেতারা আসেন। তবে সে যা-ই হোক, পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তা তড়িঘড়ি করাচী চলে যান। তাঁরা সবাই ভেবেছিলেন তাঁদের চাকরি থেকে বাদ দেয়া কিংবা উৎখাত করা হবে। আমি তখনও পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম। এরই মধ্যে একদিন ফজলুল হক আমাকে ডেকে পাঠান। আমার স্ত্রী ইতোমধ্যে আমায় জানিয়েছিল যে, ঢাকার বাইরে কোন জেলায় হয়ত আমাকে দায়িত্ব দিয়ে বদলি করা হবে। যা হোক, আমি ফজলুল হক সাহেবের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখি, লুঙ্গি পরে তিনি বসে আছেন। তিনি বললেন, আমাকে তাঁর একান্ত সচিব হতে হবে। আমি বললাম, স্যার আমি? আমাকে বলছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আর সেটি তোমার স্বাভাবিক কাজের দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে। এ কথা যখন পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের কানে

গেল, তাঁরা জানলেন আমি ফজলুল হকের একান্ত সচিব হয়েছি, তখন যেন ওদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, হুঁশ হলো। আর আমিও উপলব্ধি করলাম, বাঙালীরা আসলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরোধী বা বৈরী নয়। তাঁদের আপত্তি কেবল কিছু মূলনীতি ও নীতিগত বিষয় সম্পর্কে, যেগুলো এতদিনেও যুক্তিসম্মত রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক করা যায়নি বা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা স্পষ্ট, বোধগম্য ও পরিষ্কার করে তোলা হয়নি।

◆ ১৯৫৪ সালের পর কি এ নীতিতে কোন পরিবর্তন হয়েছিল?

▲ '৫৪ থেকে সরকারে পরিবর্তন আসছিল। ঐ সময় দু'এক বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আসে সেনাবাহিনী। এরপর শুরু হয় আইয়ুব খানের আমল। আইয়ুব খান অবশ্য পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে দেশের সামগ্রিক জনসমষ্টি এ দৃষ্টিতে দেখার বা এ বাস্তবতা মেনে নেবার জন্য তৈরি ছিলেন। এমনকি বাঙালীদের জন্য তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ছিল। কিন্তু বাঙালীদের সমস্যাগুলোর যথার্থতা কিংবা তাদের ঐ দাবিগুলো যে ন্যায়সঙ্গত এ সব সম্পর্কে সত্যিকারের উপলব্ধি তাঁর ছিল না। আইয়ুব খানের সাথে আমার এক আলোচনার কথা আমার মনে আছে। আমি এ সময় বলেছিলাম, "আপনি সেনাবাহিনীতে বাঙালীদের নিচ্ছেন না কেন?" তিনি জবাবে বললেন, "সাবেক ব্রিটিশ শাসকরা এ ব্যাপারে নিয়ম-কানুন করে দিয়ে গেছে। সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হবার জন্য ন্যূনতম দৈহিক-উচ্চতা নির্দিষ্ট রয়েছে। এ রকম আরও কিছু বাধা রয়েছে।" আমি এর পাল্টা মোকাবিলায় বললাম, গোর্খা সৈন্যদের বেলায় তো এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। এ কারণে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে ৬-৭" লম্বা হতেই হবে এমন নয়। কাজেই এটি পরিষ্কার, পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদেরকে পরিকল্পিতভাবেই সেনাবাহিনীর বাইরে রেখেছে। এরপরে ধরা যাক, সিভিল সার্ভিস তথা সিভিল সার্ভিসে বাঙালী সদস্যদের কথা। পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালী সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেত না, কেন্দ্রীয় সরকারের পদেও নয়। মাত্র দু'একজন লোক ছিল সেখানে। আমি বলতে চাই, এমনকি '৬৯ সালেও মাত্র এক বা দু'জন বাঙালী সচিব ছিলেন। এভাবে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কিংবা রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় যদি বাঙালীদের আপনি না রাখেন তাহলে শুধু মোনেম খান, সবুর খান কি বলছেন তা কেমন করে বুঝতে পারবেন। বিচারপতি ইব্রাহিম বা হাফিজুর রহমানের মতো লোকদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আইয়ুব খানও হয়তবা পার্থক্যের সংখ্যা কমিয়ে আনছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাবানেরা এ রকম বাঙালী অফিসারদেরকে ভিন্ন চোখে দেখত। আইয়ুব খানের আমলের সকল কাগজপত্র থেকে অবশ্যই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, বাঙালী কর্মকর্তারা যে সত্য কথা বলার সাহস দেখিয়েছিলেন সে জন্য প্রশংসা প্রাপ্য আইয়ুব খানের কিছু পূর্ব পাকিস্তানী বন্ধু। এই মাত্র কয়েকজন বাঙালী আমলা... হাফিজুর রহমান, বিচারপতি ইব্রাহিম বাঙালীর শক্তি আরও গতিময়, বেগবান করেছিলেন। ঐ সময়ের বিবেচনায় তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ—এ কথা বলতেই হয়। এই ন্যায়পরায়ণ, স্পষ্টবাদী ব্যক্তিরা পাকিস্তানী ক্ষমতাসীনদের বলতে পেরেছিলেন, এসব দাবির অস্তিত্ব রয়েছে। এগুলো আপনাদের মেটাতেই হবে। একটি কনফেডারেশন ব্যবস্থা করতেই হবে...।

◆ তার মানে আপনি বলতে চান, যে আমলাতন্ত্রের আপনিও একজন সদস্য সেই আমলাতন্ত্রের ওপর আইয়ুব খান বহুলাংশেই নির্ভর করতেন?

∆ সে আর বলতে! এই গোটা আমলাতন্ত্রের আমি ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি—বাংলাদেশ সম্পর্কে যার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। তবে আমি তেমন বিশ্বাসভাজন ছিলাম না। কেননা, মোনেম খান আইয়ুবকে বলতেন, এই লোকটির মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখের মতো বহু অবাঞ্ছিত বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। এ রকম বলার কারণ, আমি যখনই ঢাকায় যেতাম, আমি ওদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতাম, সাহচর্যে থাকতাম, কথাবার্তা বলতাম। আইয়ুব খানকে... এভাবেই কথাগুলো বলা হয়।

◆ এ রকম একটা ধারণাও রয়েছে যে মোনায়েম খান ও বাঙালী অন্যান্য নেতা যেমন ধরুন, খাজা শাহাবুদ্দিন ও সবুর খানদের মতো নেতাও সিনিয়র আমলাদের মন্ত্রণায় কান দিতেন?

∆ না না, এ কথা মোটেই ঠিক নয়। জনাব শাহাবুদ্দিন তো আমার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রতি আমার দারুণ শ্রদ্ধা রয়েছে। তবে যা বাস্তব সত্য তা হলো এই যে, তিনি বাঙালীদের সমস্যা কী তা জানতেন না। সবুর খান ও মোনায়েম খানের আরও একটি সমস্যা ছিল। সেটিও অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিল ক্ষমতার অবস্থান। তাঁরা এমন এক ভাষায় কথা বলতেন, যে ভাষাই প্রকৃতপক্ষে শুনতে চাইতেন আইয়ুব খান। আমলারাও যেমন বাঙালীদের মনোভাব সম্পর্কে জানতেন না, শুধু তাঁদের ছাড়া অন্য কোন বাঙালী নেতৃস্থানীয়দের ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহও ছিল ন্যূনতম। আর তাই বাঙালীদের কথা আলোচনা করতে গেলেই, মানে আমি ঐসব বাঙালী ব্যক্তিত্বের কথা বলতে চাই, একটা অবস্থান ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে তাঁরা কথা বলতেন। আমার জানা মতে, তাঁদের মধ্যে পড়েন ইব্রাহিম, বাণিজ্যমন্ত্রী হাফিজুর রহমান ও কিছুটা আবুল কাসেম খান।

আরও আগের আমলে চার বছরের শেষে সামরিক আইন তুলে নেয়ার পর মন্ত্রিসভায় সামরিক বাহিনীর লোকদের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। আপনাদের বোধ হয় মনে আছে, জেনারেল শের খান ও তাঁর কিছু সহযোগী ছিলেন মন্ত্রিসভায়, ব্রিগেডিয়ার আতাহার খান ছিলেন তথ্য সচিব। কাজেই ক্ষমতার ওপরতলায় ছিল সামরিক প্রাধান্য। আমি যখন এই ক্ষমতার বৃত্ত এলাকায় প্রবেশ করি, অর্থাৎ আইয়ুব খানের সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হই সেই সময়টি ছিল ১৯৬৩। এ সময় নাগাদ একটি শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়েছে, আরও কিছু হয়েছে। এ ব্যাপারে কার কী করার ছিল! তাই আমি মনে করি এগুলোই ছিল ১৯৭১-এ বিবেচ্য বিষয়। '৭১-এ এগুলোকেই ছেঁটে ছোট...।

◆ ঠিক তাই। আপনাদের হয়ত মনে আছে আরবী হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা হয়েছিল। আমি বলতে চাই, এবার অত্যন্ত...

∆ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাঙালী কবি হিসাবে দেখানো হচ্ছে—এ নিয়ে শাসক কর্তৃপক্ষ ছিল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তারা বলছে, ওরা ঠাকুরকে নিয়ে মুখর... বাংলা গান ইত্যাদি নিয়ে মগ্ন। ওরা পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহী। ওরা পশ্চিম বাংলায় যাওয়া-আসা করছে।

◆ এ সময় বাঙালী জাতীয়তাবাদের উত্থানে এসবকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়।

▲ না, আমি তা মনে করি না। আমি আমার মূল অনুভূতি, ধারণার কথাই বলছি। হতে পারে এ ধারণা একান্তই ভ্রান্ত। মূলত জিনিসটি ছিল একটি সাংস্কৃতিক ব্যবধান, যা আমরা একে অন্যকে দেখিয়েছি আর সেটি ছিল মস্ত ভুল। যা হোক, আগে যে কথা বলেছি সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ওরা আরবী হরফে বাংলা লেখা... ইত্যাদির প্রস্তাব করে। কিন্তু কাউকে আরবীতে লিখতে দেখা যায়নি। কেউ আরবী জানত না। আর পশ্চিম পাকিস্তান—এখনকার পাকিস্তানেও বলা শুরু হয়ে যায়, উর্দু রোমান/ইংরেজী হরফে লেখা হোক। কিন্তু এ সবই বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমি বলতে চাই, আর যা-ই হোক, এগুলো অন্তত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

◆ আপনি এসবে গুরুত্ব...?

▲ আমি কোন গুরুত্বই এ বিষয়ে দেব না, আমি জোর দেব এ বিষয়টায়—তাঁরা বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত বেতারে সম্প্রচার করা যাবে না।

◆ ওরা অবশ্য শাসক মহলের ঐ সব লোক যারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারেনি।

▲ ওরা হতেও পারত না। তবে রবীন্দ্রনাথ বিষয় হয়ে উঠেছিলেন ঠিকই। তাঁরা তখনকার ক্ষমতার শীর্ষ অভিজাতবর্গকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বাঙালীরা যত না আমাদের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের। তাছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের ইসলামের সাথে সংযোগসূত্রও তেমন নেই। আমাদের মতো মুসলমানদের সম্পর্কেও তাদের তেমন কোন ধারণা নেই। অথচ তাদের সাথে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে তাদের সকল আগ্রহই রয়েছে।

◆ ঠিক এ রকম এক যুগসন্ধিক্ষণেই কি আগরতলা মামলা ঘটে?

▲ আগরতলা মামলার ঘটনাটি খুবই হাল্কা ধরনের ব্যাপার। এ মামলা আসে আইয়ুব খানের কাজকারবার বন্ধ হয়ে আসার পর। দেখুন, যখন একজন ডিক্টেটর অসুস্থ, রুগ্ন হয়ে পড়ে তখন বিশ্বের যেখানেই বলুন একই ধরনের নাটকের অবতারণা ঘটে। তখন আইয়ুব খান পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন, এ পৃথিবীতে তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর ক্ষমতার সবকিছু সাঙ্গ হতে যাচ্ছে। তখন আর কী হতে বাকি থাকে? তিনি তখন ঢাকায়। প্রথমবারের মতো আমি একজন সিএসপি অফিসারের কাছ থেকে শুনতে পাই, আগরতলা চক্রান্তে আমাকেও একজন দোসর হিসাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাই আইয়ুব খান তখন সিলেটে যাচ্ছিলেন। সে সময় আমাকে তাঁর বিমানে থাকার পরামর্শই আমি পেলাম। কেননা যদি কিছু...।

◆ সিএসপি মানে? আপনি কোন বাঙালী সিএসপি'র কথা বলছেন?

▲ বাঙালী সিএসপি'র কথা থাক। এরপর আমি আইয়ুব খানের সচিবকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, না না, মোটেও না। এরপর আমি পাকিস্তানে (করাচী) চলে আসি। আইয়ুব খান আমাকে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমাকে বললেন, ইয়াহিয়া খান আমার সাথে এই আগরতলা ষড়যন্ত্রের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। আগামীকাল জিএইচকিউতে একটা সভা ডাকা হয়েছে। তুমি সেখানেও যেও। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেল, আমি যেন সেখানে থাকি। জিএইচকিউতে পৌঁছে আমি দেখলাম,

সেখানকার সদর দফতর সামরিক অফিসারে গিজগিজ করছে, খোদ ইয়াহিয়া খানও রয়েছেন। এখানে একটু চোখ খোলা রাখলেই ধরা পড়বে, আইয়ুব খানের অসুস্থতার মুখে ইয়াহিয়া কী করতে পারেন। ইয়াহিয়া তাই আইয়ুব খানের অনেকটা সচেতন অবস্থাতেই ক্ষমতা কব্জা করেন। আর তারপর ইয়াহিয়া খানের চেহারা আগাগোড়া বদলে যায়। আর তাই তিনি হৈ চৈ তোলপাড় করেন এই কে আছে? অফিসার? তাকে অবশ্যই এ মামলা করতে হবে, কাকে কার মুখোমুখি হতে হবে, ওকে ও কাজ করতে হবে, সে করবে ওটা... এসব। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি হয়ত জানেন, আইয়ুব খান এটি চান না—আইয়ুব খান এই মামলা চান না। তার কারণ, এর আগে রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র নামে যে মামলা হয়েছিল, সে মামলা অনুষ্ঠানের ব্যাপারটি হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার, ইত্যাদি। আর তাই সামরিক লোকজনের ওপর এ বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হ্যানো-ত্যানো এ-না সে-না বলে, শেষে বললেন, দ্যাখো গহর, আইয়ুব কিন্তু এ মামলাটার ফুলপ্রুফ প্রচার চান। আমি বললাম, আপনি যে ফুলপ্রুফ প্রচার পাবেন তাতে সন্দেহ নেই, কেননা এ ঘটনা হলে গোটা দুনিয়াই এসে নামবে ঢাকায়। কিন্তু এ তো গেল সরকার পক্ষের মামলার কথা। কিন্তু তারপর আপনি,... বলবেন, এ মামলায় প্রতিপক্ষের বক্তব্য আপনি প্রচার করবেন না। আর তখনই কিন্তু আপনাকে ফাঁদে পড়তে হবে। তাহলে বোকা বনবেন আপনি। তিনি জবাব দেয়ার চেষ্টা করলেন, তুমি কি মনে কর, আমাদের হাতে সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই? আমি বললাম, আমার জানা নেই। তখন তিনি একজন অফিসারকে বললেন, 'ওহে, সাক্ষ্য-প্রমাণ কী আছে সব এই লোকটিকে দেখাও তো।' আমি বললাম, ধন্যবাদ আপনাকে, এ সব সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি ফুলপ্রুফই হয়ে থাকে, আপনি ফুলপ্রুফ পাবলিসিটিই পাবেন। এরপর আমি আমার অফিসে ফিরে এলাম। আমার অফিসে তখন একজন যুগ্মসচিব ছিলেন, সয়্যদ আহমদ। আমি বললাম, ভাই সয়্যদ, কাগজটা পড়, আমিও পড়ি। আমরা উভয়েই পড়লাম। সয়্যদ আহমদ আমাকে বলল, বাঙালী সংস্কৃতি অনুযায়ী আমরা যখন আলাপ করি, আর সেই আলাপে কারও সম্পর্কে যদি কিছু বলা হয় তাহলে তাতে তার সম্পর্কে আমরা যেভাবে আলাপ করি এই রিপোর্টের কথাবার্তা সেভাবে কিন্তু বলা হয়নি। এ রিপোর্টে লাগাতার বলা হচ্ছে, শেখ এই বলেছে, শেখ ঐ বলেছে, শেখ এটা করেছে কিংবা শেখ ওটা করেছে। সয়্যদ আরও বলল, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কারও আলাপের নমুনা এ হতে পারে না। বরং এ রকম আলাপে সাধারণত বলা হয়, শেখ মুজিবুর এ কথা বলেছে বা কিছু করেছে। তারা শুধু শেখ—এভাবে উল্লেখ করে না। আমি বললাম, ঠিকই বলেছ। এরপর আমি কাগজটা আইয়ুব খানের কাছে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, গোটা ফাইলের কোথাও মুজিবুর রহমানের নাম নেই, শুধু শেখ—ঐ শব্দটির উল্লেখ আছে। কে এই শেখ? এ সবের পটভূমিতে আমি বললাম, আপনি যদি অভিযুক্তদের নামের তালিকায় শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি রাখেন তাহলে তাতে প্রচুর সমস্যা দেখা দেবে। এ মামলা করছেন করুন, মামলায় সাক্ষ্য থেকে যদি দেখা যায়, এই শেখ বলতে আসলেই শেখ মুজিবুর রহমান, তাহলে তেমন পরিস্থিতির আলোকে আপনি তাঁকে তখন এক সহ-অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্তদের তালিকায় যোগ করতে পারেন। এখন এই তথ্যটি একটি ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতা হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বিষয়টির সত্যতা যে কেউ খবরের কাগজ থেকে যাচাই করে নিতে পারে। আমার এ

কথাবার্তার পরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অভিযুক্তদের নামের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল সেই তালিকায় শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল না। এর দশ দিন পর আমি নিজে এও দেখেছি যে, ঐ তালিকায় এখন আবার শেখ মুজিবের নাম যোগ করা হয়েছে। দেখা গেল, মামলা যথারীতি চলেছে। আমার মনে হলো, জিএইচকিউতে একটা বড় রকমের নির্বোধসুলভ কিছু ঘটছে। এখন কর্তা লোকটি ইচ্ছা করেই তাদের জানাতে চাচ্ছে না। সত্যিই কিছু একটা ঘটেছে? হয়ত ঘটে থাকতে পারে ছোটখাটো ধরনের কিছু একটা। আর তাতে নিশ্চিতভাবেই কিছু বাঙালী থাকার কথা। হতেই তো পারে, ওরা পরিস্থিতির সবকিছু দেখে শুনে হয়ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই এমন একটা ছোটখাটো কিছু হয়েই থাকতে পারে। তেমনটাই মোটামুটি চলছিল। এরকম কিছু তেমন অবস্থায় ঘটতেই পারে। তবু আমার ধারণা হয়েছিল, আগরতলা মামলার আদৌ দরকার ছিল না, সাক্ষ্য-প্রমাণও ছিল না।

◆ তাহলে বলতে হয় এ মামলার কোন ভিত্তি ছিল না?

∆ জজ হিসাবে, ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে, এই মামলায় যে কাগজপত্র পাওয়া গেছে এবং সেই আলোকেও যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে আমি চার্জশীট ইস্যু করতাম না। আমি বরং বলতাম, এ বিষয়টি আর এগুতে দেয়া যাবে না।

◆ এটি কি কোন শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত...?

∆ সুনিশ্চিতভাবেই ঘটনা তেমন নয়, ঐ সিদ্ধান্ত আইয়ুব খানের নয়। এ নিয়ে তিনি অসুখী ছিলেন। তাঁরা তাঁকে পরামর্শ...

◆ মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, এ মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়ানো, যার অর্থ হতো ছয় দফার বিরুদ্ধে লড়াই করা?

∆ কেমন করে এসব হলো তার বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না। তবে আপনাদের যা বলছিলাম— ক্ষমতার অধিষ্ঠানস্থলের যত কাছের মানুষই আপনি হোন না কেন, সবকিছু আপনি জানতে পারেন না। আপনাকে যা বলা হয় সেটুকুই আপনি জানতে পারেন। আমি কখনও আঁচ করতে পারিনি ঐ কালরাতে ঐ বিষয়েই আলোচনা হয়েছিল, আর তারপর সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছিল। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এটি সেনাবাহিনীর কোন ষড়যন্ত্র ছিল কি না বলা যায় না! এমনও হতে পারে যে, তাঁকে হয়ত বলা হয়েছে... ঐ হলো রূঢ় বাস্তবতা। আবার হয়ত অসহায় পরিস্থিতির শিকার হয়ে আইয়ুব খান সেই পরামর্শ অনুসরণে বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঐ সময় তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই হতে পারে, তাঁকে এভাবে চক্রান্তের কানাগলিতে এনে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু আইয়ুব খান স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এ রকম অনুভূতি আমার কখনও হয়নি, এমনকি মঞ্জুর কাদেরের কাছ থেকে সে রকম কিছু জানা যায়নি—তিনি ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার দায়িত্বে। মঞ্জুর কাদের বলেছিলেন, মামলার ভিত্তিটা বেশ জোরালোই আছে, আইনমন্ত্রীও সে কথাই বলেছিলেন। আমি সে রকমই মনে করি। আইন মন্ত্রণালয়ের মামলার নথি ভাল করে আদ্যোপান্ত বিবেচনা করলে জোরালো কেস আছে কি না, আমার ধারণা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। মঞ্জুর কাদেরেরও মনে

হয়েছিল, সার্বিক বিবেচনায় বিষয়টি ভিন্ন রকমের বলেই ঠেকে। আমার বিশ্বাস, ঐ সময় একটা ক্ষমতার লড়াই চলছিল। কিন্তু তখন এ কথাটি বলা সম্ভব ছিল না যে সবকিছু সেখানে ঘটছে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা চায়, কাজেই ঐ ঘটনা সেখানেই থাকুক, এটাও দেখার চেষ্টা হচ্ছিল।

◆ '৭০-এর নির্বাচন ও তার পরের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই।

Δ কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে, আমি ঐ সময় আর চাকরিতে ছিলাম না। ইয়াহিয়া খান আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। তখন এ সব ঘটনায় আমি হয়ে পড়েছিলাম বাইরের লোক। আমি নির্বাচনের ধারে-কাছেও ছিলাম না। আর বাস্তবিকপক্ষেও করাচীতে আমার ওপর গোয়েন্দা নজরদারি চলছিল। তবে তখনও আমি লোকজনের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করেছি। নজরদারির আওতায় থাকলেও বাড়িতে আমাকে অন্তরীণ থাকতে হয়নি। তাই রাওয়ালপিণ্ডি-ইসলামাবাদেও ঐ সময় যেতে পারতাম। এ সময় করাচীতে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর অফিসারদের সাথেও কথাবার্তা হতো। আমার অন্যতম বন্ধু মাহমুদ হারুন ছিলেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেশের স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথেও আমার বেশ জানাশোনা ছিল। তাঁর নাম রোয়েদাদ খান। আমার পাশের বাড়িতে থাকতেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ হারুন। সে বাড়িতে আমি একদিন ওদের সাথে ডিনার খেতে যাই। সেখানে ওরা আমায় বলে...

◆ মাহমুদ হারুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর আপনি কিনা ছিলেন গোয়েন্দা নজরদারির আওতায়?

Δ ঠিক তাই।

◆ সেনাবাহিনীর নজরদারিতে?

Δ জি হ্যাঁ।

◆ সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের নজরদারি?

Δ ঠিক। ওরা আমাদের সকলের সম্পর্কেই রিপোর্ট করছিল। তবে মাহমুদ হারুন নয়, আসল লক্ষ্য ছিলাম আমিই। যা-ই হোক, মাহমুদ হারুনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই ওরা আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, নির্বাচনের ফল কী হতে পারে? আমি বলেছিলাম, ওটা বলতে পারি। আমি বলেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ১০০টি আসন পাবেন শেখ মুজিবুর রহমান। আর পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ১০০টি আসন পাবেন ভুট্টো। আমি ইচ্ছা করেই বলেছিলাম। তাঁরা বললেন, এ সব কী রাবিশ তোমার কাছ থেকে শুনছি! তাঁরা বললেন, আমাদের খবর হলো শেখ মুজিব শতকরা ৪০ থেকে ৪৫টির বেশি আসন পাবেন না। ভুট্টোও পাবেন না ...। আমি পাল্টা বললাম, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, এ নিয়ে আমার কিছুই করার নেই। আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আমি পড়ার মধ্যে শুধু খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা পড়ি, লোকজনের সাথে মেলামেশা করি, তাদের কথা শুনি। আমি আমার যে তথ্য, যদ্দূর জানি, তাতে আমার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী বলতে পারি, এই দু'টি লোকই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে।

◆ আপনার এমন ধারণার কারণ কী?

▲ এর কারণ আমার কাছে বিষয়টি একেবারেই পরিষ্কার। করাচীতে বসেই দেখেছিলাম জামায়াতে ইসলামী ও অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কোন ভূমিকাই নেই, ভুট্টোর পিপিপি সারা দেশে তুফান তুলেছে। আর আমি যেখানেই গিয়েছি ঠিক এ কথাগুলোই শুনেছি মানুষের মুখে। '৭০-এর নির্বাচনের আগে কিংবা হতে পারে '৬৯-এর আগে শেষবারের মতো আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। তখন আমার বাঙালী বন্ধুরা আমার বাড়িতে আসত। করাচীতেও অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাদের আমি চিনতাম। এসবকে আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সাক্ষ্য-প্রমাণের অংশ হিসাবে মনে করা হতো। অথচ এদের সাথে দেখা হলেও সবার সম্পর্কেই আমাকে জানতে হবে এমন নয়। আমাকে এভাবেই মনে করা হতো, আমি ৬-দফার প্রণেতা।

◆ কারা এ সব বলেছে আপনাকে?

▲ খবরের কাগজগুলোতে ইত্যাকার রিপোর্ট ছাপা হচ্ছিল। আমি তিনটি পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করি। ছয় বছর পর করাচী হাই কোর্টে আমি একটি লাইয়েবল বা কুৎসা মামলাও রুজু করি। এরপর এখনও...।

◆ আপনি কি জানতে চেষ্টা করেছেন আসলে কারা এ কাজ করেছে?

▲ চেষ্টা করিনি। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ—আর্মি ইন্টেজিলেন্স আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে..., আমার উৎখাত দেখতে চেয়েছে। তবে ওরা আমাকে সরাসরি আঘাত করেনি। আর এই যে গুজব... এ গুজবের এখন অবসান ঘটেছে। এখন প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে, সেনাবাহিনীই । বলেছে, আমি মুজিবের অতি কাছাকাছির লোক... এ ধরনের নানা কিছু। আর এ জন্য আমার বাঙালী বন্ধুরা আমাকে প্রায়ই বলত, এটি আমার জন্য জুতার পেরেকের খোঁচার মতো হয়ে উঠবে। তবে এ সব যাক, এখন আর এ সব কিছুই নেই।

আগরতলা মামলার পর শেখ মুজিব প্রায় মহানায়ক হয়ে ওঠেন। আর এ কারণেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ ছিল না। আর ওখানেই আমার সমস্যাটি অদ্ভুত হয়ে দেখা দেয়। আপনারা নিজেরা বাঙালী হয়েও জানেন না যে বাঙালী বন্ধুরা কত বিপজ্জনক। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আদালতে ওঠার পরও বাঙালীরা কার্যত নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আর তখনকার বিরোধী দল বলছিল, মুজিবুর রহমানকে ডাকুন, ওকে পাকড়াও করি। আইয়ুব খান সে প্রস্তাবে রাজি হচ্ছিলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে তলব করতে রাজি হয়েছিলেন। আমি সেদিন সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে বসে ছিলাম। আপনি আমার স্ত্রী ওয়াজিফাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। চৌকিদার সে রাতে আমার কাছে এসে বলল, একজন ভদ্রলোক বাইরে একটা গাড়ির ভিতরেই বসে আছেন। বেরিয়ে আসতে চান না। দয়া করে আপনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দেখুন কে এসেছেন। দেখলাম শেখ মুজিব সেখানে বসে। "এই তুমি কি করতে... আরে, আমি তোমার... মানে আমি। তুমি...।" এক সময় শেখ মুজিবের এহেন কথাবার্তার ফাঁকে আমি বললাম, মেহেরবানি করে ঘরের ভিতরে চলো। যা হোক, মুজিব বলল, "ভাবি এ লোক আমার পুরনো দোস্ত। তার সাথে কয়েক বছর দেখা নেই। আমি কী করে বুঝব যে লোকটা!" সে যা-ই হোক, আমি ঘর থেকে নেমে তার কাছে পৌঁছে

বললাম, "তা কী খবর?" সে বলল, "দ্যাখো, আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে আইয়ুব খানের সাথে দেখা করতে যেতে হবে। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকে আইয়ুব খানের কাছে নিয়ে যাবে। এর কারণ, ওরা আমায় গ্রেফতার করে জেলে পাঠাতে পারে।" আমাদের দু'জনের কথাবার্তার ওপর যে লোকটি নজর রাখছিল তার কাছে এসব কথাবার্তা ছিল অর্থহীন। যা হোক, মুজিবকে আমি আইয়ুব খানের কাছে নিয়ে গেলাম। তাদের দু'জনের আলাপ অল্প সময়েই শেষ হয়ে যায়। এ আলাপ দ্বিতীয় দফায়। আমার ধারণা, আইয়ুব খানের বক্তব্য মুজিব বুঝতে পারছিল। আইয়ুব সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ফর্মুলা দেবেন। আইয়ুব খান প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথাও মেনে নেবেন। তবে সমস্যা যেটি হয়, তা হলো, দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হবার পর। অথচ এ নির্বাচন যদি '৬৯-এর আগে অনুষ্ঠিত হতো তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান হয়ত সকল আসনে জয়ী হতে পারতেন না। কিন্তু সত্তর-একাত্তরে এ ধরনের কোন অবকাশই ছিল না। আর সে কারণেই এর আগে আমি বলেছি, পাকিস্তানের এ অংশের মানুষ এ ধরনের নির্বাচনী ফল মেনে নিতে রাজি ছিল না। আর তাই পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক কর্তৃপক্ষ ঐ নির্বাচনে ইসলামী দল ও লোকজনকে নানাভাবে মদদ দিচ্ছিল অংশ নিতে। জামায়াতে ইসলামী '৭০-এর নির্বাচনে অংশ নেয়ার প্রস্তুতি নেয় তাদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে। ওরা টাকা দিয়ে লোকজন কিনতে থাকে। নিজেদের পক্ষে যোগাড় করে খাজা খয়ের উদ্দিনের মতো লোককে। আমার ধারণা, ওরা সব সময়ই এভাবে যথেষ্ট পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও বাঙালীকে দলে ভিড়িয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে নিশ্চিত হই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন এ ব্যাপারে সকল গোয়েন্দা রিপোর্টের সরাসরি খবরদারি করছিলেন। তাঁরা নিজেরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, মুজিব ৪৫টির বেশি আসন পাবেন না। ভুট্টোও বেশ কিছু আসন পাবেন ও একটা প্রভাবশালী অবস্থানে থাকবেন। কিন্তু নির্বাচনী ফলে দেখা গেল, পুরোপুরি ভরাডুবির ব্যাপার। এরপর ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ পটভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজ পদে ইস্তফা দিয়ে চলে যান। আর এর আগেই, আপনাদের আমি বলেছি, নতুন কেবিনেট গঠিত হয়। আর সেটি ছিল কার্যত সামরিক ব্যক্তিদের মন্ত্রিপরিষদ। এখন তাদের সত্যিকারের মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়। এ মন্ত্রিপরিষদের জন্য ব্রিফ কয়েকদিন আগে কিংবা পরেই তৈরি করা হয়। আর আমার ধারণা, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আমাদের এ্যাকশনই নিতে হবে। তবে এ জন্য প্রস্তুতি নিতে তাদের একটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। কারণ... অন্যান্য আয়োজন তখনও সম্পূর্ণ হয়নি; আর কাজটাও ছিল বেশ কঠিন। আর তাই তখন দরকষাকষিমূলক যেসব আলোচনা চলছিল, আমি মনে করি, সেগুলো সবই ছিল ধোঁকা দেয়ার ব্যাপার, প্রহসন মাত্র। এর কারণ, ওরা ভুট্টোর... এমন এক হাতিয়ার পেয়ে যায় যা ব্যবহার করা ওদের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আর জনাব ভুট্টোও এ কাজে তাদের স্বেচ্ছায় সহযোগী হন। মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে যাবার আগে ভুট্টো তাঁর অন্যতম ডান হাত হামিদ রামেকে আমার সাথে দেখা করতে পাঠান এ কথা বলে, "আপনার সাথে তো মুজিবের খুব ভাল জানাশোনা আছে, আমি তাঁর সাথে দেখা করতে কাল ঢাকায় যাচ্ছি। ব্যাপারটা আমি সবচেয়ে ভালভাবে কেমন করে সামাল দিতে পারি?" এর জবাবে আমি হামিদ রামেকে বললাম, তিনি যেন ভুট্টোকে জানান যে, আমি যদি ভুট্টোর

জায়গায় হতাম তাহলে আমি শেখ মুজিবকে বলতাম—ছয় দফা? বেশ তো, আপত্তি নেই। তবে এ দাবি সব মেটাতে কিছু সময় লাগবে। আমি এও বললাম, মুজিব একজন আবেগতাড়িত লোক। কাজেই তাঁর সাথে এ কথা আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু ভুট্টো কী করবেন তা আগে থেকেই নিজে ঠিক করে রেখেছিলেন। এখন আমাকে সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হলো। অর্থাৎ ক্ষমতায় এসে প্রথমেই তিনি যে কাজ করেন তা আগে ইয়াহিয়া খান ও খবরের কাগজগুলো করেছিল।

◆ তিনি (ইয়াহিয়া) কী নিয়ে শেখ মুজিবের সাথে দরকষাকষি করতে চেষ্টা করেছিলেন বলে আপনি মনে করেন?

▲ তিনি তেমন কোন বিষয় নিয়ে দরকষাকষি করেননি শেখ মুজিবের সাথে। ইয়াহিয়া খান যা করার চেষ্টা করেছিলেন শেখ মুজিবের সাথে, ভুট্টো ঠিক সেটিই করছিলেন। মুজিব ইয়াহিয়া খানকে প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিলেন যা ভুট্টোর মনঃপূত ছিল না। ভুট্টো চাননি, ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিব কোন সমঝোতায় আসুক। তিনি '৭১-এ বাংলাদেশে সামরিক এ্যাকশন চেয়েছিলেন। এ বিষয়েই আমি লিখেছি। আর এখন সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের বক্তব্যে এর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে সামরিক এ্যাকশনের পরিকল্পনা নিয়ে এখানে আলোচনা হবার পর ইয়াহিয়া খান করাচী গিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁকে করাচী পাঠিয়েছিলেন। ভুট্টো পরিকল্পনার বিষয় শুনে পরিকল্পনাটিকে উত্তম বলে অভিহিত করেছিলেন। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ভুট্টো সাহেব এ বিষয়ে তখন মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তাঁর চাই ক্ষমতা, ওটার কলকাঠি হাতে পেতেই তিনি তাঁর এসব খেলা শুরু করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি নানা বোলচাল শুরু করেন। তিনি ঢাকায় যাবেন না, বাংলার শেখ মুজিবকেই আসতে হবে। আর তলে তলে চলতে থাকে এ্যাকশনের প্রস্তুতি। কাউকে তখন বলতে শোনা যায়নি, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন তারা কেন স্থগিত রাখলেন? এমন কী ঘটে গেল যে তারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হতে দিচ্ছে না? কিন্তু ওদিকে এলএফও'র খাঁড়া তো ঝুলেই রয়েছে যাতে এর প্রণেতাদের হাতে সবকিছু নাকচ করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। কোন কুমতলব যদি না-ই থাকে তো সমস্যাটি তাহলে কী? এখানে যা বলার তা হলো, আপনারা বলবেন, কী বলতে চান আপনি? আমি বলব, আমি সত্যিকার যা উপলব্ধি করি, তা হলো ওরা পরিকল্পিতভাবেই এসব করে চলেছে।

◆ আসুন, ২৫ মার্চের কথায় এবার আসি। মানে আমি বলতে চাই, ২৫ মার্চ ও এরপর থেকে ১৬ ডিসেম্বর অব্দি যা কিছু ঘটেছে সেসব সম্পর্কে আপনি কী জানেন? বাংলাদেশে তখন কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আপনি জানতেন? জেনে থাকলেও সে ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া ছিল কী?

▲ দেখুন, একটা কিছু তখন ঘটেছে, আমার জানার চৌহদ্দি তাতেই সীমিত। আমি যা কিছু শুনেছি সেনাবাহিনীতে যারা ছিল তাদের কাছ থেকেই। ২৫ মার্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয় তিনি হলেন বালুচ নেতা গাউস বখস বেজেঞ্জো। অনুমান করি, বেজেঞ্জো ঢাকায় সামরিক অভিযান শুরুর আগের দিন পাকিস্তানে ফিরে আসেন। তাঁর সাথে দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় তিনি আমায় বললেন, গতকাল ১১টার দিকে আমি

ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি ও তাঁর সামরিক সচিব আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকা থেকে চলে যেতে বললেন। তিনি আরও বললেন, দেখলাম ইয়াহিয়া খান গায়ের শার্ট খোলা অবস্থায় আয়েশী মুডে বসে আছেন, পাশে হুইস্কির বোতল। এমন অবেলায় এ দৃশ্যে আমি একটু চমকেই উঠলাম। ইয়াহিয়া খান গোড়াতেই আমার নাম জানতে চাইলেন। "আর আপনার আসল নামটা যেন কী? ব্যাঞ্জো? কোন্‌টা তাহলে? ভ্যাঞ্জো নয়?" কোন তামাশা? এসব কথার খৈ ফোটার মাঝে আমি... মনে হলো, ইয়াহিয়ার সকল আলাপ-আলোচনা নিছক সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। আর সে কারণে আমার চলে যাওয়াই ভাল। তাই বিদায় নেয়ার জন্য উঠলাম। বেজেঞ্জো এসব বলার পর বললেন, এ সবই একটা প্রহসন। আজ রাতে কী হতে যাচ্ছে তা আমি জানি না। আমার অনুমান তিনি আমাকে বলেছিলেন সামরিক এ্যাকশন শুরু হওয়ার কথা । বলেছিলেন, আজ রাতে কী ঘটতে যাচ্ছে তা আমি জানি না। আমি এসব শুনে গভীর দুশ্চিন্তায় পড়লাম। দেখুন, আমি মনে করি, বালুচ নেতা বেজেঞ্জো অত্যন্ত সৎ ও দৃঢ়চেতা মানুষ। তিনি জানালেন, ইয়াহিয়া কেন এ রকম গুরুতর ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা করেছে—ব্যাপারটি সামরিক এ্যাকশন। আমি তখন কল্পনা করতে পারিনি, এ ঘটনাই ইতিহাসের পাতায় সত্য হতে চলেছে। আমার এ রকম মনে করার কারণ, '৬৯-এর গণবিক্ষোভের সময়, আমার মনে আছে, মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী ও পুলিশের সাবেক আইজি শামসুদ্দোহা বলেছিলেন, এসব বিক্ষোভ ঠাণ্ডা করার জন্য কিছুই দরকার নেই, ঢাকায় একটা আর করাচীতে একটা ট্যাঙ্ক দেখেছেন, করাচীর রাস্তায় যদি একটা নামিয়ে দেয়া হয়, নগরীর লোকসংখ্যার কথা তো জানেন, একখানা ট্যাঙ্কের তুলনায় সে তো রীতিমতো সমুদ্র, অকুল পাথার!

এই হলো আমার এক অভিজ্ঞতা। আমার আরেক অভিজ্ঞতা হয় আইয়ুব খানের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। আমি যাই করাচী থেকে তাঁর সাথে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে। তখন সেনাবাহিনীর এ্যাকশন শুরু হয়েছে। আইয়ুব খানকে দেখলাম, খুবই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। এর আগে আমি আর কখনও তাঁকে এতখানি উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত দেখিনি। তিনি বলেছিলেন, ওরা কানাগলির গোলকধাঁধায় গিয়ে ঢুকেছে, এখন সেখান থেকে ওদের আর পরিত্রাণের কোন আশা নেই। সুনিশ্চিতভাবেই তিনি সেনাবাহিনীর কথাই বলছিলেন। তারা এসব শুরু করতে গেল কেন? কেন করল তারা? তাঁর ধারণায়, গোটা পরিকল্পনাই সামরিকভাবে বাস্তবসম্মত নয়। এরপর করাচীতে এক ডিনারে আমি এক মন্তব্য করেছিলাম। আর দেখুন, সেটিই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি। আমার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল—আমি বলেছিলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা চট্টগ্রাম থেকে করাচী সাঁতরানো পথের দূরত্ব অনেকখানি। আমি এ ক্ষেত্রে আইয়ুব খানের কথার ওপর নির্ভর করছিলাম—চট্টগ্রাম থেকে করাচী সাঁতরানো?—সে অনেক পথ! যা হোক, সামরিক এ্যাকশন শুরু হলে দেখা গেল, ওটা এতই যন্ত্রণাদায়ক যে, অফিসার থেকে শুরু করে বেসামরিক নাগরিক পর্যন্ত এখানে চলে আসতে শুরু করেছে। তারা এখানে ফিরে এসে আমাকে বিশেষভাবে এ কথাটিই উল্লেখ করে বলত, "দেখুন, আপনার কথাবার্তায় তো কোনই সারবস্তু ছিল না... বাঙালীদের মধ্যে লড়াকু কোন লোকজন নেই, আমাদের হাতে তো ওরা সাফ হয়ে যাবে।" এ রকম কথা যাদের বলতে শুনেছি, তাদেরই একজন হচ্ছে

জেনারেল ওমর। আমার মনে হয় না, এ রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক হতে পারে। আমি সত্যিকার অর্থেই এসব নিয়ে কিছু লিখেছিলাম। বাস্তব বিষয় হলো এই যে, ওরা নরহত্যা শুরু করেছিল। আমার ডান হাত যেন আমাকে বলছিল কোন বাঙালী হয়ত আর বেঁচে নেই। ভাবছিলাম...। আর অবশেষে ওরা বলতে শুরু করেছিল, যারা হতাহত হয়েছে ওরা ভারতীয়। আর ভারতীয়দের কাজেরই ফল এগুলো। কারণ ভারতীয়রাই স্বাভাবিকভাবে এসবে এগিয়ে আসবে, আসলেই ওরা আসবে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করতে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, যেভাবে পরিস্থিতি মোড় নিচ্ছে বা পরিস্থিতির আকার নিচ্ছে সেটি তাদের মনঃপূত। তারা বরং তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিজেরাই জয়ী হতে চেয়েছিল। আমার তো মনে হয়, এ মানসিকতারই দরকার ছিল। যা হোক, আমি শুধু এ কথাই বলতে পারি, এ সম্পর্কে আমার জানার পরিধি সীমিত। অন্তত ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক এ্যাকশন চলাকালে আসকার খান সেখানে যান ও ফিরে এসে আমাকে জানান, ওদের (সামরিক কর্তৃপক্ষ) গোটা পরিকল্পনা এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের নীলনক্সা। আমার এক আত্মীয় বিমানবাহিনীতে চাকরি করত। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক এ্যাকশন চলাকালে সে সেখানে যেতে অস্বীকার করে চাকরিতে ইস্তফা দেয়। তাকে ২৪ মার্চ বিমানবাহিনী থেকে বের করে দেয়া হয়। ওর নাম মাসুদ।

◆ সে সময় আপনার ঐ আত্মীয় কোথায় থাকেন?

▲ জার্মানিতে। সে পূর্ব পাকিস্তানের এ অভিযানে নৈতিক কারণে অংশীদার হতে অস্বীকৃতি জানায়।

◆ বিমানবাহিনীতে তাঁর পদমর্যাদা কী ছিল?

▲ সে ছিল বিমানবাহিনীর একজন কমান্ড্যান্ট, মানে বেস কমান্ড্যান্ট বা এ জাতীয় কিছু পদমর্যাদার জুনিয়র অফিসার। তার পুরো নাম মাসুদ জাফর। এ মাসুদ জাফরের সাথে দেখা করলেও কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কেননা ঐ সময় সামরিক বাহিনীর বৈঠকগুলোর কোন কোনটিতে সে হয়ত ছিল। জেনারেল ওমরের কাছ থেকেও আপনারা বহু তথ্য পেতে পারেন। তবে এই লোকটা বোধহয় এক ধরনের মনোবিকারগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছেন। এখন তিনি দরবেশের মতো, অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মতো আচরণ করছেন।

◆ অথচ তাঁকে দেখে আমাদের যে ধারণা হয়েছে...

▲ তাই, আপনারা তাহলে ইতোমধ্যেই তাঁর সাথে দেখা করেছেন?

◆ দেখা হয়েছে। তিনি কিছুই জানেন না।

▲ দেখুন, ঠিক বলছেন আপনারা?

◆ দেখা করেছি আমরা তাঁর সাথে। কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না।

▲ লোকটা বলেছে, কী বলছেন আপনি? অথচ সে লোকজনের কাছে বলেই চলেছে, ইয়াহিয়া খানের ওখানে কি আপনার সাথে আমার দেখা হয়নি? আর আমি কিছুই জানি না!

◆ তিনি তো বললেন, আমি তার নিরাপত্তা সচিব ছিলাম, আর...

▲ ও লোকটা ছিল কেবলই টাকা বানানোর তালে? করাচী ফেরা অবধি সে ওটাই করেছে। সে লোকটাই ঢাকায়ও গেছে। আমি তো লক্ষ্য করেছি, যতবারই রোয়েদাদ খান, জেনারেল ওমরের লোক ঢাকা থেকে এখানে ফিরে আসত, ততবার তারা যেত শাকিব ইরানীর বাড়িতে। তখন আমাকেও দাওয়াত দেয়া হতো, হয়েছিল। ঐ আসরে আমার এক বন্ধুও ছিল। দুই তরফে অনেকটা লিয়াজোঁর কাজ করত সে। আর সেই সুবাদে সে ওদেরকে বলত, ওহে, বাঙালীদের ওপর কীসব করেছ বলতে পার? জেনারেল ওমরও তো আমার কাছে সবসময়ই তার গপ্পোর ফানুস উড়িয়েই চলত। অথচ এখন দেখুন, তার বোধোদয় ঘটেছে বলেই মনে হয়। এখন এই যে আলাপ আমি আপনার সাথে করছি, এ আলাপের অন্য আর কোন অবকাশ ছিল না। এখানকার লোকজনের চোখে একটা বদ্ধ কারাগারে থাকার মতো অবস্থা আমার। বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে কী জানেন আপনি, কতখানি যোগাযোগ তাদের সাথে রয়েছে আপনার? এ প্রশ্ন যদি করা হয়, আমি বলব, এ সব কোন কিছুই ছিল না আমার। তবু যদি আবার আমার বাংলাদেশে যাবার অবকাশ ঘটে, তাহলে ঠিক আমি আবার টিকটিকির নজরদারিতে পড়তে পারি। সোজা কথা এটুকুই যে, ঐ পরিস্থিতিতে পড়লে কারও কিছু করার থাকে না।

◆ ঠিক, আমারও জানা নেই। জানি না এখানে বাকস্বাধীনতা কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অবস্থা কী। তবু কিছু জিনিস তো আছে...

▲ দেখুন, এ জন্য আমি এ সব বিষয় নিয়ে তেমন লিখি না। কিন্তু উর্দু পত্রিকাগুলোতে এ নিয়ে ভারি অসন্তোষ। আমি উর্দু জানি। অতীত ঘাঁটার ফল এদের চোখে কী আর গলদটা কোথায় তা-ও আমার অজানা নয়। উর্দু পত্র-পত্রিকার লোকেরা এক বিশেষ মনন ও মানসিকতার লোক। এই উর্দুভাষী লোকগুলোর বিশ্বাস, এ লোকটাই (আমি) সবকিছুর হোতা। আর এ তো জানা কথাই, এ লোকটারতো এ সব লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম ছিল। নিশ্চয়ই আপনাদেরকে আমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, এ রকম সকলেই অজুহাত, তথা এ্যালিবাই, ছুতো খোঁজে। কী করে সেই এ্যালিবাই খুঁজে বের করা যায়? কেমন করে একজন সাংবাদিক রহস্যভেদ করার মতো করে আমাকে ব্যাখ্যা দেয়, কেন আমি ঐ সব ঘটনা সম্পর্কে একটি কথাও লিখি না?

◆ কথাটা ঠিকই বলেছেন। আসলে সে প্রশ্নই আমরা করতে চাচ্ছিলাম।

▲ এ ব্যাপারে কোন একটি শব্দও আপনি লিখলেন না? আপনার তো কলমের ধার রয়েছে, রয়েছে কাগজ? আমি বুঝি না করাচীতে গোয়েন্দাদের নজরবন্দী থেকে কী করে একজনের পক্ষে সবকিছু জানা সম্ভব? ওরা আমাকে প্রকাশ্যে বলেছে, ঐ সময়কার বহু সাংবাদিককে বলেছে, কেন তাদের কেউই এ বিষয়ে কিছু লেখেনি? কার্যত একমাত্র ব্যক্তি, একমাত্র ব্যতিক্রম সাংবাদিক এ বিষয় কিছু বলেছেন, তিনি হলেন লাহোরের আবদুল্লাহ মালিক। তিনি এ নিয়ে এক সভায় গেছেন, এ নিয়ে কথা তুলেছেন ও শেষ পর্যন্ত তাঁকে মারধর করা হয়েছে।

◆ আই এ রহমানও এ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন।

▲ আই এ রহমানের কথা বলছেন তো? আই এ রহমান ও মাযহার আলীর মতো প্রগতিবাদীদের কেউই এ বিষয়ে লেখেননি। তাঁরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে ছিলেন। তখন গোটা বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ টুঁ শব্দটি করেনি। রাজনীতিকরা কিছুই করেনি। ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী সেই একই পথের যাত্রী। তাই শেখ মুজিবের কীই বা করার ছিল? তবে মূল বিষয় হলো ওরা বাঙালী মুসলমানের হাতে কার্যকর ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। কারণ, তাদের কথায় পাকিস্তানী মুসলিম? সেটা হতে পারে। আমরা সবাই মুসলমান...পাঠান মুসলমান, বালুচ মুসলমান, বাঙালী মুসলমান বটে। কিন্তু বাঙালী? এ রকম কিছু নেই। ছিল ওদের মাঝে বর্ণ গোষ্ঠী, বৈষম্য ছিল নৈতিক, আকৃতিগত... এ রকম আরও কত কিছু। আর এ অভিশাপগুলোই সবচেয়ে বেশি প্রবল ছিল সশস্ত্র বাহিনীতে। এমনকি পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ গ্রামবাসীদের মাঝেও এ ধরনের বৈষম্যের অস্তিত্ব রয়েছে। এর অর্থ, আমি বলতে চাই পাঞ্জাবের একটি গ্রামে গিয়ে দেখুন, এ ধরনের বহু কিছু আপনার মনে হবে। আমার যা বলার তা হলো, কতটুকু জানে তারা? তাদের মাঝে আরও অনেক বৈষম্য আছে। অভিজাত শ্রেণীর বৈষম্য তো আছেই, কেননা ওরাই ওদেরকে (বাঙালী) চাকরি থেকে হটিয়ে রাখতে চেয়েছিল, ওরা চেয়েছিল ওদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে রাখতে। তাই সবকিছুই একান্তভাবে গড়িয়েছে অযৌক্তিক পথে, অন্যায়ভাবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে যা-ই হোক, আপনারা এর মধ্যেই বেশ কিছু লোকের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন...।

◆ জি হ্যাঁ, করেছি।

▲ তবে তেমন কিছুই বোধহয় গলেনি? খুব বেশি। কিছু জানতে পারেননি আপনারা...।

◆ মাফ করবেন, একেবারেই পাওয়া যায়নি তা নয়, তবে দেখেছি সবাই যেন আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত। যদিও আমরা তাদের কাছ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব চাইনি, আসলেও জেনারেল ওমরের মতো লোক যখন বলেন, কোন কিছু জানি না, তখন আর কী করা যায়! ওটা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা বা আগ্রহের ব্যাপার।

▲ আসলে আমার কথা হলো আমিও জানি, আপনারাও জানেন, আমি যা কিছুই বলি না কেন, আপনারা সেটাকে নির্ভেজাল সত্যি হিসাবে নেবেন না। এটিই হলো ধারণা...।

◆ ঠিক বলেছেন।

▲ বাস্তবিক পক্ষেও তো জানার সবকিছু তখন আমাদের নাগালে ছিল না, জ্ঞাতব্য ছিল না। লোকজন আমাকে যা বলেছে তার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে আমাকে। কাজেই আমার কথার মধ্যে কিছু ভ্রান্তিও থাকতে পারে। আর সে কারণেই আমি বলছি, সত্য ও মানবিকতাকে খুঁজুন। আল্লাহর দোহাই, আসুন আমরা সেগুলোই অনুধাবন করে বের করি।

◆ আপনি কি মনে করেন এ ক্ষেত্রে ট্রুথ কমিশন কাজ করতে পারে?

▲ আমার ধারণা, করতে পারে। আমি মনে করি, সত্যের প্রশ্নে আমরা বুদ্ধিজীবী মহলকে তৈরি করে তুলতে পারি। কারণ এ ছাড়া অন্য কোন পথ তাদের নেই। আর সে জন্যই জেনারেলদেরকে প্রয়োজনে অপ্রিয়ভাবে হলেও বলতে হবে কমিশনের এজলাসে সত্য বর্ণনার

জন্য। আর যাঁরা স্বেচ্ছায় আসবেন, ভাল। এমন হলে, জেনারেল ওমর কমিশনের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সত্য ঘটনা বলবেন। আমি তাঁকে এক বার্তা পাঠিয়ে বলেছি, আল্লাহর ওয়াস্তে এটি করুন। কারণ আমার মতো আপনাকেও একদিন মরতে হবে। যদি সত্য এভাবে প্রকাশ করতে না চান, কাগজ আপনার হাতের নাগালে রয়েছে। তাঁর ছেলেকেও বলেছি, কোন রাজনীতিই একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে না। আমি এখনও এ কথা বলতে আনন্দিত বোধ করছি এ জন্য যে, এ সব কথাবার্তা থেকে কিছু হলেও আমার প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। অন্ততপক্ষে এ বিষয়ে আলোচনা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে যা পুরোপুরিই হারিয়ে গিয়েছিল, কারও কোন কথাবার্তাই শোনা যাচ্ছিল না।

◆ এখন সবাই এ নিয়ে মুখ খুলছেন, কেননা...

Δ বটেই, যেমন—আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী তো বই লিখে ফেলেছেন, প্রকাশিত হয়েছে। তা জেনারেল নিয়াজী একজন যোগ্য অপদার্থই বটে। কারণ তিনি এখনও তাঁর পেনশন চান। তা সে থাক, আমাদের কথা হলো, আমরা কী করতে পারি। আমার এখনও মনে পড়ে একজন কাশ্মীরী ভারতীয় সাংবাদিকের কথা। ভদ্রলোক খুব ভাল উর্দু জানেন। একদিন তিনি লন্ডনে আমার সাথে দেখা করতে এসে বললেন জনাব এ বেগম গওহর, 'কিয়া ইয়ে উর্দুকি মানে বদল গ্যায়া? আপ কিয়া হুঁ? মায় নে কঁহা, ক্যায়সে? কাহতে কে'... এই ভারি শব্দটির অর্থ পাকিস্তানে বদলে গেছে। নিয়াজীর বইয়ে বর্ণনা রয়েছে। জনতা বলল: জেনারেল নিয়াজী; 'কওম কা গাজী'। সৈনিক হিসাবে এক চরম মুহূর্ত এক সময় আসে যখন তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়, অস্ত্র নামিয়ে রাখতে হয়। সাধারণত এ অবস্থায় পরাজিত জেনারেলের সামনে পথ খোলা থাকে আত্মহত্যার, কিংবা অন্ততপক্ষে তা না হলে যা তিনি করতে পারেন তা হলো কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করা। তবু যা হোক, জেনারেলের বই প্রকাশের জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস যে উদ্যোগ নিয়েছে আমি তাকে...

◆ তাই! কারণ রাও ফরমান আলী ও জেনারেল ওমরকে এখন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে হলেও মুখ খুলতে হবে।

Δ অবশ্যই। এখন আমি এ সবের উর্ধে। এখন আমাকে আর বলতে হবে না জিনিসটা বাঙালী বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি। বরং এখন আমি বলব, খোদ জেনারেল নিয়াজী এ অভিযোগ করেছেন। আপনাদের জবাব কী বলুন।

◆ রাও ফরমান আলী সম্পর্কে এখন আপনি কী ভাবছেন? মানে আমি বলতে চাই, তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যা কিছু ঘটেছে সে বিষয়ে কোন কিছুই তিনি জানেন না।

◆ আপনিই তো আবার পুনরুজ্জীবন শুরু করার কথা বলেছেন!

Δ আমি প্রাণ খুলেই বলছি, এতে আমি খুবই খুশি।

◆ আমরাও আনন্দিত, কারণ...

Δ আমি নিজে খুশি। এ কারণে যে আমাকে আর কিছুই লিখতে হবে না, ভাবতেও হবে না। এর শুরু হতে পারে কীভাবে! বেসামরিক বিষয়গুলো দেখছিলাম। সামরিক আইন সম্পর্কিত বিষয়েই ছিল নাকি তাঁর কাজকারবার বা এ ধরনের কিছু। অর্থাৎ নিয়াজী হলো সেই লোক,

সামরিক আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ছিল যাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যুদ্ধেও ব্যাপৃত ছিলেন তিনি। নিয়াজী বকলম, ধোয়া তুলসীর পাতা... এ তামাশা বৈ কিছুই নয়। হয় তার ওপর এক ধরনের হামলা হয়। তামাশা আর রঙ্গ টইটুম্বর নির্বোধসুলভ আমোদ। কর্নেল আবেদ নামের এক ডেন্টিস্ট আমাকে বলেছে, পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের রাতে ভারতীয়রা "আমাদেরকে ডিনার দিয়েছিল।" আবেদ আরও জানায়, এ গোটা সময়টা নিয়াজী রঙ্গ-তামাশা আর শাহী খানাপিনায় পেট ভরানোতেই ব্যস্ত ছিলেন। আবেদের মতে, এ ধরনের লোকের কোন লজ্জা-শরমের বালাই নেই। রাও ফরমান আলীও ছিলেন পালের গোদা। আসরার খানই হোক, জেনারেল ওমরই হোক তাদের প্রত্যেকের সাথে রাও ফরমান আলীর দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছে। ওরা আবার আমাকে এসে বলেছে, এসব ঘটনা ঘটছে। আমি রাও ফরমানকে আদৌ চিনতাম না। এই লোকটি সম্পর্কে কিসসার শেষ নেই। তবে এই মহাজনটি এখন দরবেশের মতো আচরণ করছেন। ফরমান একজন আদর্শিক তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছেন। আর এদের সবাই 'ইনাম' পেতে সক্ষম হন জিয়াউল হকের কাছ থেকে। নিয়াজীর বেলায়ও এ সব সত্য। তারা সকলেই ভাল ভাল চাকরি পেয়েছে। টিক্কা খানতো প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছে। আর যশোরে রহিম খোলা, যে নাকি এক সময় করাচীতে কোর কমান্ডার ছিল, আর আদালতে দাখিল করা কাগজপত্র অনুযায়ী যার গোয়েন্দা নজরদারিতে ছিলাম খোদ আমি, সে হয়েছিল প্রতিরক্ষা সচিব। রাও ফরমান আলী ফৌজি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানের গদি পান। জেনারেল ওমর ইন্সটিটিউট অব স্ট্রাটিজিক স্টাডিজের প্রধান নিযুক্ত হন। সকলেই আখের গুছিয়েছেন। জিয়াউল হক পীরজাদার পেনশন বহাল করেছেন। এদের শত জনে একজনও কার্যত সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি। নিয়াজী পর্যন্ত তাঁর বইয়েই আমাদের জানাচ্ছেন, ভুট্টো তাঁকে চাকরি দিতে চেয়েছিলেন... এ হওয়াটাও অসম্ভব কিছু ছিল না। কেননা, ওরা সকলেই তো একই ঝাঁকের কৈ! তাই কেমন করে এ সব লোকের কাছ থেকে সত্য খুঁড়ে বের করবেন আপনারা? আমাকে হামুদুর রহমান কমিশনের কাঠগড়াতেও দাঁড়াতে হয়েছে। এ কমিশনের রিপোর্ট আমি দেখিনি। এর অংশবিশেষ অবশ্য আমি পড়েছি। কমিশন রিপোর্টের সত্য উদ্‌ঘাটনের আগে আমার একটি কৌতূহল ছিল, আমি চেয়েছিলাম রিপোর্টটি জাতীয় পরিষদে পাঠানো হোক। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শুধু এটি নিশ্চিত করুন আর তাহলেই সত্যের জন্য ক্ষেত্র পুরোপুরি তৈরি হতে পারে। সে জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম। রিপোর্টটি নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করুন। জাতীয় পরিষদ এটি গ্রহণ করলে চমৎকার। তখন এর ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু পরিষদ তো এটিকে প্রত্যাখ্যান করতে চলেছে এ কারণে যে, এতে সাবেক সেনাকর্মকর্তাদের সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। এমনটি হলে আরেকটি কমিশন গঠনের অনুকূলে উত্তম ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যাবে। তবে সত্যিকার অর্থে আমার অনুভূতি ছিল, আমি আপনাদের বলি, ওটি বাস্তবে ঘটতে যাচ্ছে... এমন আশা আমি করিনি। ধরে নিয়েছিলাম, আমাদের জীবদ্দশায় এটি স্বপ্ন হয়েই থাকবে। থাকবে, কেননা, গোটা মুসলিম ইতিহাসে এর অনুকূলে কিছু নেই। আপনারা আমার সাথে হয়ত একমত হবেন না। তবু বলি, আপনাদের তরফেও এ ধরনের জিনিস আসছে। আপনাদের সেনাবাহিনীকে এ রকম কিছুর মধ্যে যেতে দেবেন না। একটা ব্যবস্থার প্রয়োগ মহড়ার অনুশীলন প্রথমে হতে দিন, আপনাদের এ অবস্থায় পড়তে হবে না। তবে আপনারা একটা যাঁতাকলে রয়েছেন, যে

অবস্থান থেকে সর্বশক্তিমান খোদাই কেবল উদ্ধার করতে পারেন। তাই আপনাদের এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজতে হবে প্রথমেই। এ না হলে, বলার অবকাশ এসে যাবে... না, না, তাহলে ভারতই এটি করবে। আমার বিশ্বাস, সত্যের কণিকার সন্ধানে রয়েছেন আপনারা। সমীক্ষা করছেন কোন্‌টি হবে সর্বোত্তম।

◆ কোন এক ধরনের ট্রুথ বিষয়ক কমিশনের কথা বলছেন আপনি?

Δ সর্বোত্তম ট্রুথ কমিশন! তবে আমি মনে করি না, আপনারা যা বের করেছেন, কোন কমিশন তার চেয়ে বেশি তথ্য পাবে।

ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী

[ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী একাত্তর সালে ছিলেন আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দফতরের পরিচালক। ১৯৭৫ সাল থেকে ২২ বছর তিনি ছিলেন 'ডিফেন্স জার্নাল' পত্রিকার প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক। বর্তমানে তিনি রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব পিস এ্যান্ড সিকিউরিটি'র সঙ্গে জড়িত। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় করাচীতে তাঁর বাসভবনে।]

◆ জনাব সিদ্দিকী, আপনি একাত্তরের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

Δ কিছুদিন আগেও আমি মাসিক *ডিফেন্স জার্নাল* পত্রিকার প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক ছিলাম। এ পত্রিকার কাজ আমি ১৯৭৫-এ শুরু করি। ২২ বছর ধরে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। তারপর আরেকজনের হাতে এর দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়েছি। পত্রিকায় এখনও আমার নাম ছাপা হয়, যদিও পত্রিকার কাজের সাথে আমার যোগাযোগ নেই। আমি সম্প্রতি কিছুকাল ধরে একটা ইনস্টিটিউটে কাজ করছি। এই ইনস্টিটিউটের নাম 'রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব পিস এ্যান্ড সিকিউরিটি এ্যাফেয়ার্স' (আরআইপিএসএ)। এ প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি, কল্যাণ—যুদ্ধ নয়। আমি গুরুত্বহীন ও গতানুগতিক কোন বিষয়ে নিয়োজিত থাকতে চাই না। আমি শান্তিপূর্ণ সব কাজে ও উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকতে চাই। আমি পাকিস্তান ও ভারত—এ দু'দেশের ব্যাপারে ইতিবাচক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। আমি মনে করি, সকল অমীমাংসিত সমস্যার ইতিবাচক নিষ্পত্তির জন্য তাদেরকে আলোচনায় বসতে হবে, দেখতে হবে কী কী কারণে তাদেরকে যুদ্ধে যেতে হয়েছে। এটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। কেননা, সমস্যার বোঝা দীর্ঘকাল বহন করার সাধ্য দু'দেশের কোন দেশেরই নেই। আর সামরিক ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমার মত হলো, যে প্রতিরক্ষা সাধ্যের মধ্যে নেই, সেই প্রতিরক্ষাই সম্ভবত উত্তম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষুণ্ন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে পারে না। এসব বিষয় নিয়েই আমি কাজ করছি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে, কারণ আমি সেখানে ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলাম।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন, মহিউদ্দিন আহমেদ ও আফসান চৌধুরী

◆ **আপনার কর্মদায়িত্ব কী কী ছিল?**

∆ আমি সেনা সদর দফতরে নিয়োজিত ছিলাম আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দফতরের পরিচালক হিসাবে। আর সে হিসাবে আমি জনকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই বিভাগটিকে যথাসাধ্য সুপরামর্শ দিয়েছি। আমি নীতিনির্ধারক মহলের খুব কাছে থাকলেও নীতিনির্ধারণী সেলের কোন অংশ ছিলাম না। বরং আমি ছিলাম দর্শক মাত্র। একাত্তরের ২৫ মার্চ আমি ছিলাম ঢাকায়। ১৬ মার্চ আমাকে ঢাকায় সামরিক দায়িত্ব পালনের জন্য রিপোর্ট করতে হয়। ওটা ছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ১৫ মার্চ ঢাকা সফরের পরের দিন। ১ এপ্রিল অবধি থাকার পর আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসি। আর সে কারণে খুব কাছে থেকে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে, প্রত্যক্ষ করেছি নীতিনির্ধারক হিসাবে নয়—পর্যবেক্ষক হিসাবে। ২৫ মার্চের রাতে কী ঘটেছে তা প্রকৃত অর্থে দেখেছি, শুনেছিও। ওখানকার মহল্লাগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় চারদিক থেকে। আমি শহরেও গিয়েছি। খবর নেয়ার চেষ্টা করেছি। এখানে আমি ও আমার লোকেরা পূর্ব পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী রিপোর্ট কভার করেছিলাম। পূর্ব পাকিস্তান সফরে মাঝে মাঝে যেতে হতো। নিয়াজীও পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিলেন। তবে তা আমার জন্য প্রীতিকর ছিল না। কিন্তু তিনি ঐ কাজটি করেছিলেন। সম্ভবত আমি অন্য কারও তুলনায় সবচেয়ে বেশি ঘন ঘন ঢাকা সফরে গিয়েছি। আমি পরিস্থিতি যতটা সম্ভব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছি। সেই সময়কার অভিজ্ঞতায় নিয়াজীর কার্যকলাপে আমি খুব একটা খুশি হতে পারিনি। এ কথা তাঁকে আমি বলেছি। এ নিয়ে বারবারই তাঁর সাথে আমার কথা হয়েছে। ১ অক্টোবর তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা হয়। তখন যে কোন সাধারণ লোকেরও না বুঝতে পারার কথা নয় যে, সব কিছুই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সেনাবাহিনী ছিল, আর সে সেনাবাহিনী এসপার-ওসপার লড়াই করতে পারত। আর সে লড়াই হতো আখেরী জং। কেননা আমাদের বাহিনীর সব সৈন্য ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে—তারা আদৌ কেন্দ্রীভূত ছিল না। জেনারেল নিয়াজী ছিলেন এক নিরেট নির্বোধ। তাঁকে আমি একথা বলে তাঁর প্রতি বদান্যতা দেখাচ্ছি। কেননা, তাঁকে আরও কটু ভাষায় সম্বোধন করলেও তা অযৌক্তিক হতো না। নির্বোধ নিয়াজীর ধারণা ছিল, পরিস্থিতি তাঁর সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় রয়েছে। আর সেই সুবাদে তাঁর ধারণা ছিল, ৫/৬ মাইলের মতো পরিমিত এলাকায় তিনি এক নিরাপত্তা বেষ্টনী, প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলতে পারবেন। তাঁর সাথে সেই আমার শেষ দেখা।

◆ **তারপরে ... না ঠিক আছে, চমৎকার! আমি শুধু আপনাকে কথার খেই ধরিয়ে দিচ্ছি।**

∆ তারপর আমি রাওয়ালপিণ্ডি সেনাবাহিনী সদর দফতরে ফিরে আসি। আমার ধারণা, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি তারপর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। এরপর ২১/২২ নভেম্বর ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে।

◆ **নভেম্বর?**

∆ একাত্তরের নভেম্বর। তারা আক্রমণ করে—আমি এ কথাগুলো এভাবে ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি। প্রকৃত ঘটনাও ছিল তাই। ওরা সে সময় সাতটি ফ্রন্টে পূর্ব পাকিস্তানে সকল দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। সে ছিল ঈদের পরের দিন। আমরা ভেবেছিলাম যে,

ইসরাইল যেমন ঈদ-উল-ফিতরের কাছাকাছি সময়ে শেষ রমজানে মিসরের ওপর সামরিক হামলা চালায়, তারা সেই ইসরাইলী কৌশলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইছে। সে সময় অবশ্য প্রথমে হামলার উদ্যোগ নেয় মিসর। আমাদের বেলায় ভারতীয়রাই আক্রমণ করে, আমরা নই। আমাদের সেনারা যেদিন ঈদ করছে, ঠিক তার পরদিনই শুরু হয় ভারতের আক্রমণ। আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির ওপর দৈনিক ব্রিফিং দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি পূর্ব পাকিস্তানের মুখপাত্র। সময় যখন এভাবে এগিয়ে চলেছে তখন আমরা আশা করেছিলাম, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সেনা সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে রণাঙ্গন আরও প্রসারিত করে এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাড়া দেবেন। তেহরানে ইরানী রাজবংশের ২৫তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ১১ অক্টোবর রওনা হবার আগে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হলে সামগ্রিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু সেই আক্রমণ হলেও সামগ্রিক কোন যুদ্ধ হলো না। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল পত্রপত্রিকা তথা গণযোগাযোগ মাধ্যম ও বহু বিদেশী সংবাদদাতাকে দিনে এক বা দু'বার করে ঐ আক্রমণ বিষয়ে ব্রিফ করার। তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে তেমন একটা খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। আমাকে যুদ্ধ সম্পর্কে সামরিক 'সিচ্যুয়েশন রিপোর্ট' যা কিছু করা হচ্ছিল সেগুলোর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল বেশি করে। আসলে এ সব 'সিচ্যুয়েশন রিপোর্ট' ছিল অসার—কোন কাজেরই নয়। এসব রিপোর্টে ছিল বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রং চড়ানো। এতে অনেক কিছু ছিল কাল্পনিক, অলীক। এর মতলব ছিল একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ গড়ে তোলা...।

◆ কিন্তু এই কাজটি করছিল কে?

∆ কে আবার, নিয়াজী। তিনিই তো ছিলেন কমান্ডার, অধিনায়ক।

◆ তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনি যেসব ব্রিফিং দিয়েছিলেন তা আসলে ছিল...?

∆ সিচ্যুয়েশন রিপোর্টের ভিত্তিতে।

◆ অধিকাংশই তাহলে সেনাবাহিনীর সিচ্যুয়েশন রিপোর্ট?

∆ হ্যাঁ, কেননা এগুলোই ছিল একমাত্র তথ্যসূত্র।

◆ আর আপনার ধারণায় যেগুলো ছিল অতিরঞ্জিত?

∆ শুধু অতিরঞ্জিতই নয়...।

◆ '৭১ সালে যুদ্ধের সময় আপনি সশস্ত্র বাহিনীর ব্রিফিং নিয়ে যে সকল রিপোর্ট করতেন, তা কেবল অতিরঞ্জিত ছিল না, ছিল মিথ্যাও?

∆ সেগুলো ছিল অসার, অকেজো। আসলে রণাঙ্গনের বাস্তবতা এতে প্রতিফলিত হয়নি বরং নানা কারণে কমান্ডার তাঁর 'মানসনেত্রে কি হেরিতেছেন' সেটির গাঁজানি ছিল। আর তা ছাড়া তিনি গোমর ফাঁক করতেও চাননি এ সব রিপোর্টে। একদিন ঐ বিষয়ে চীফ অব স্টাফ আমাকে বললেন, সেটি ৩ নভেম্বরের পর আর ততদিনে সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, রিপোর্টে পরিস্থিতি সাজানো হয়েছে শুধুমাত্র ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে। অথচ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এভাবে ক্ষয়ক্ষতি, হতাহতের উল্লেখে আসলে সেনা মনোবল ভাঙছিল মাত্র। বিষয়টি

নিরেট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। তাই যুদ্ধ যখন চলছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে একটা অচলাবস্থা দেখা দেয়, যা আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না। আমরা পাল্টা চাপ সৃষ্টিমূলক একটা অপারেশন পরিচালনা করছিলাম। কিন্তু যেভাবে আমাদের জবাব দেবার কথা সে রকম কিছু ঘটেনি। অথচ ঐ জবাবের নেপথ্যের মূল প্রেরণাটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। এজন্য দরকার ছিল আরও বড় আয়োজন ও প্রয়াসের। কিন্তু বাস্তবায়িত করা যে কারণেই হোক তা হয়নি। আর সে কারণটা আপনি জানতে চাইতেই পারেন। যা হোক, আমরা তা করিনি। আমরা শুধু চেষ্টা করছিলাম লাহোর, রিসালপুরের মতো জায়গায় সুবিধাজনক অবস্থানগুলোকে মজবুত ও নিরাপদ রাখতে। কিন্তু আক্রমণাত্মক বড় রকমের কোন সেনা অভিযান করা হয়নি, নামানো হয়নি রিজার্ভ বাহিনীকেও। ফলে যা হবার তাই হয়। যুদ্ধের ৩য় বা ৪র্থ দিনে এখানে আমাদের দিকে যুদ্ধ এগিয়ে না এলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে খবর আসতে থাকে যে, ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে আসছে, চলে আসছে ঢাকার কাছে। কখন কী খবর পড়া হচ্ছিল তা আপনাদের ভালভাবেই জানা। ওরা তখন এগিয়ে আসছে প্রধান সড়ক ও অন্যান্য বড় রাজপথ ধরে নয়, অপ্রধান, গৌণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো ধরে। ওরা প্রধান প্রধান রাজপথ ও শহরগুলো এড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের প্রতিরক্ষার প্রধান ঘাঁটিগুলো এভাবেই পদানত করে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম একমাত্র যশোর। যশোর দুর্গের পতন হয় ৭ ডিসেম্বর। এ ক্ষেত্রেই শুধু আক্রমণের লক্ষ্য সরাসরি দখল করে ভারতীয় বাহিনী এবং তা সবার চোখের সামনে। তারা সিলেটকে এড়িয়ে আসে, কুমিল্লাকে পাশ কাটিয়ে আসে। আর আমরা তখন ছিলাম, আমাদের ভাষায়, আমাদের প্রতিরক্ষার কেল্লাগুলোতে। ভারতীয় বাহিনী কখন আমাদের ওপর চড়াও হবে আর আমরা তাদের ওপর কখন ঝাঁপিয়ে পড়ব তারই ইন্তেজার করছিলাম সেখানে। এ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! কী বলব আমি আপনাদেরকে! এ রকম বলিহারি চমৎকার প্রস্তুতি আর হয় না! আমাদের তরফে সমন্বিত কমান্ড বা বুদ্ধিদীপ্ত কমান্ডের অভাব বেশি, এটা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে! এখানে অসাধারণ মেধার অধিনায়কের ইচ্ছাশক্তি, মনোবল—না, এমন কিছুর বালাই ছিল না।

◆ আরে কী যে বলেন, উনি তো অত্যন্ত বড় বড় খেতাবখচিত জেনারেল! তাহলে...। মানে আমি বলতে চাইছি... তা হলে ব্যাপারটা, কী বলে আপনার ধারণা?

∆ ভালই বলেছেন বটে। আমি বলি কি, ওখানে একটা জিনিসই ছিল যাকে মহাসম্মানে ভূষিত করা উচিত। তবে ওটা এক ব্যাপার, আর একজন ভাল কমান্ডার হওয়া একেবারেই ভিন্ন বিষয়। জেনারেল (নিয়াজী) ছিলেন মেজর বা লেফটেন্যান্ট কর্নেল কিংবা বড়জোর ব্রিগেডিয়ার স্তরের একজন ভাল অফিসার। কেন্দ্রীয় বা মূল অধিনায়কের কোন যোগ্যতা, আর যা-ই হোক, তাঁর ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও এর আগে '৬৫-র যুদ্ধে—উভয় যুদ্ধে সেভাবেই তাঁর দরদাম যাচাই হয়েছে। হয়েছে আবার একাত্তরের যুদ্ধেও...। তাই আপনার জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব দিতে গেলে আমাকে বলতেই হচ্ছে, এ ধরনের কলঙ্কজনক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তিনি উত্তম অধিনায়কের ভূমিকাভিনয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা, তাঁর অত উঁচু স্তরের মেধা ও উৎকর্ষ ছিল না।

◆ দৈনন্দিন অসামরিক পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট দেয়াও কি তাঁর দায়িত্ব ছিল?

Δ না, যুদ্ধের নয়। আসলে পূর্ব পাকিস্তানের অসামরিক প্রশাসন চালানোর দায়িত্বও ছিল সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের ওপর।

◆ আর আপনার কাজ ছিল খবরের কাগজের লোকজন, বিদেশী যোগাযোগের মাধ্যম ইত্যাদিকে দৈনিক এই বলে 'ব্রিফ করা' যে, বিলকুল ঠিক হ্যায়, সব কিছু স্বাভাবিক। তাহলে সেই স্বাভাবিকতা কতটুকু স্বাভাবিক ছিল তখন জনাব?

Δ কোন কিছুই তখন স্বাভাবিক ছিল না। উল্টো পরিস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক ছিল তখন।

◆ কিন্তু আপনাকে তো রিপোর্ট করতে হচ্ছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

Δ না, পরিস্থিতি স্বাভাবিক এমন রিপোর্ট আমরা করছিলাম না। বরং পৃথিবীর অন্য যে কোন জায়গায় যুদ্ধের রিপোর্ট যেমন করা হয়, সেভাবেই যুদ্ধ সম্পর্কিত রিপোর্ট করছিলাম।

◆ কথাটা ঠিক হলো না। যুদ্ধ শুরু হয়েছে আরও পরে। আমি তো ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের কথা বলছি।

Δ ঠিক ধরেছেন, আসলে আমি টিক্কা খান সম্পর্কে এ যাবত আদৌ কিছু উল্লেখ করিনি। টিক্কা খানই 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করেছিলেন। সি-ইন-সি'র তরফে ইয়াহিয়া খান তখনকার অপারেশন কমান্ডার জেনারেল আব্দুল হামিদ খানের সাথে সলাপরামর্শ করে এ অপারেশনের সব কিছু ঠিক করেছিলেন। হ্যাঁ, আসলে এ বিষয়গুলোও আলোচনার দরকার। আমি এখন সে আলোচনাতেই আসছি।

২৫ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের মধ্যে যুদ্ধ (অপারেশন সার্চলাইট) যখন শুরু হয় তখন কী ঘটে সে ব্যাখ্যার বর্ণনা এখন আমি আপনাদের দেব। তার আগে এ সবের একটা পটভূমি দেয়ার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর যখন জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে তখন কী ঘটে আমি তার বিবরণ দেব। ১১ ডিসেম্বর আমি প্রেস ব্রিফিং করছিলাম। আমার ওপরওয়ালা সিজিএস লে. জেনারেল গুল হাসান খান আমাকে এ কথা জানিয়ে দেন 'পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সব খেল তো খতম! কাজেই তোমার এখন একটা কিছু করে ফেলাই ভাল।' তবে এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি সত্যিই এক বড় রকমের শক বা আঘাতের মতো। আমি নিজে কথাটি শুনে স্তম্ভিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়! কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ধরুন, আমার কোন অতি ঘনিষ্ঠজন শুয়ে আছেন মৃত্যুশয্যায়। আপনি জানেন, মৃত্যু নিশ্চিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা, তবু... তবু যখন ঘটনাটি আসলে ঘটে, আর কেউ এসে জানায়, সব শেষ। খুব বড় শক্ সেটি... নয় কি? পূর্ব পাকিস্তানের সাথে আমি অনেকখানি জড়িয়ে ছিলাম। আর সে সম্পর্ক স্পর্শকাতর নয় ঠিকই, তবে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল অন্যত্র। এখনও আমার বন্ধু স্বজন রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে। বাস্তবিকই আমার পরিবার... পরিবারের একটা অংশ রয়েছে সেখানে। আমি সেখানে দীর্ঘকাল না থাকলেও আমার আত্মীয়দের সেখানে বড় ব্যবসা ছিল। আপনি মনে হয় জনাব এহ্সান আলীর নাম শুনেছেন, তিনি আমার শ্বশুর। তাই আজও পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঢের বেশি। তাই আমার মনে হতো, পূর্ব পাকিস্তানে এই যে এত কিছু ঘটে গেল, এ

সব এড়ানো যেত, এমনকি পাকিস্তানের দুই অংশের বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হলেও। আর সে ব্যবচ্ছেদ অস্ত্রে ও হিংসায় না করে আলোচনার টেবিলে করাই বাঞ্ছিত ছিল।

◆ বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে আপনি কি সংক্ষেপে কিছু বলতে পারেন আমাদেরকে?

∆ আপনারা যা জানেন তার বেশি কিছু আমার জানা নেই। এর সিংহভাগ আমাদের কিংবদন্তি। আমি অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর হত্যা ও তার কথাবার্তা শুনেছি বটে। তবে আমি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারি না। সে সময়টায় আমি ওখানে ছিলাম না, কোন তথ্যও বিস্তারিত আমার জানা নেই।

◆ আপনি তখন ঢাকায় ছিলেন না?

∆ আমি ছিলাম না।

◆ তা-ই?

∆ আমি তো বলেছি, কোন সংস্রবের অবকাশ ঘটেনি আমার।

◆ কে এর পরিকল্পনাকারী? কী করে এসব ঘটে বলে আপনি মনে করেন?

∆ কে এসব পরিকল্পনা করে থাকতে পারে তা আমার জানা নেই। তবে এর দায়িত্ব কমান্ডারের। নাটের গুরু আমার কাছে একজনকে মনে হয়—তবে এও বলি, প্রমাণ করতে পারব না আমি।

◆ না, মানে আপনি অনুমানের কথাই...

∆ আমার ধারণা ফরমান আলীই সেই ব্যক্তি। কেননা ফরমান সেই ব্যক্তি যার ওপর কর্তৃপক্ষের আস্থা ছিল সবচেয়ে বেশি। ফরমানই পারত নিঝুম নীরবতাকে প্রচণ্ড শক্তিশালী, সরব বিষয় করে তুলতে। ফরমান হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আপনার বক্তব্য শুনবেন, যার চেহারায় ধরে রাখা আছে একটা বৈদগ্ধ্যের ছাপ। চোখে আছে চশমা, আছে সর্পিল সম্মোহনী এলাজ।

◆ তা আপনিও ঐ সময় চশমা পরতেন বুঝি?

∆ আমিও।

◆ তাহলে বেশ একটা জুটিই বটে।

∆ তাঁর সাথে আমার কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন মেজর জেনারেল সিভিল অ্যাফেয়ার্স (এমজিসিএ)—অসামরিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল। তিনি ছিলেন আস্ত একটি গাধা। তিনি ছিলেন সব কিছুর নেপথ্য চক্রী।

◆ তিনি ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স (ইপিসিএপি), রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি বাহিনীও তৈরি করেছিলেন?

∆ সে কথা আমি বলব না। আপনারা এ বিষয়ে আপনাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন। আপনারা বলতে পারেন, হ্যাঁ বা না। কেননা, ফরমান ছিলেন এমজিসিএ। তিনি গভর্নরের পরামর্শদাতাও ছিলেন। আপনারা অবশ্য বলেছেন আগেই। তবু আমি আবার

বলছি, বেসামরিক ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটত তার কোন কিছুই ফরমানের অজ্ঞাতসারে হতে পারত না। আর তাই বলে যে তাঁকে সে সবের জন্য আদেশ-নির্দেশও দিতে হতো এমন নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিধর ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি কিনা এখন বলেন, কিছুই জানেন না! না, আমি বলি, সব কিছুই জানা ছিল তাঁর।

◆ **ফরমান তাঁর লেখা বইতে দাবি করেছেন যে, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের একজন বিরাট বন্ধু মানুষ ছিলেন। আপনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন? কোন মন্তব্য আছে আপনার? তিনি কি আসলেই শেখ মুজিবুর রহমানের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন?**

Δ না, তিনি হয়তবা অফিসিয়ালি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবেন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। তাঁর হয়ত দিনে তিনবার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখাও হয়েছে। কেননা, একমাত্র তাঁর পক্ষেই দাবি করা সম্ভব হয়েছে যে, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে খুব পরিষ্কার চেহারায় বেরিয়ে আসা। তিনিই প্রশাসনকে জানিয়েছেন...। এই ফরমান আলী এমন কাজ করেছেন যা তাঁর করা উচিত ছিল না। ফরমান ছিল পুরোপুরি এক ভিন্ন শ্রেণীর লোক, একেবারেই আলাদা। তাঁর মতো লোকের পক্ষেই বন্ধুকে পুরোপুরি পথে বসানো বা তার সর্বনাশ ডেকে আনা সম্ভব। বাস্তবিকপক্ষেও তিনি একজনকে বন্ধু হিসাবে নেন তার বারোটা বাজানোর জন্য, যে কাজটি আপনারা কেউ বন্ধু হলে তার বেলায় করতে পারতেন না। তাই আমি তাঁর ব্যাপারেও উদার হতে চেষ্টা করেছি। আমি তাঁকে কখনও বিশ্বাস করিনি। ফরমান লোকটি এমন যে, সব সময় যেন মুখোশ পরে আছেন। আপনি ওর চোখ-মুখ দেখলেও ধরতে পারবেন না ঐ মুহূর্তে তিনি কী ভাবছেন, কী ফিকির করছেন, কিংবা ওর মনে কী আছে! লোকটা বুদ্ধিমান, চতুর ও প্রচণ্ড রকমের নিষ্ঠুর। এ রকমই মানুষ হলেন ফরমান যাঁর মাঝে দয়ামায়ার কোন অনুভূতি নেই, কিছু নেই। এ হলো গিয়ে আদ্যোপান্ত ফরমান। তাঁর চেহারা তিনি আমায় একবার দেখিয়েছিলেন নির্বাচনের ঠিক পরপরই, জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারির দিকে। তার অল্প কিছুদিন আগে একাত্তরের ২৭ ফেব্রুয়ারি গভর্নর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'অপারেশন সার্চলাইট' প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফরমান এই সম্মেলনের জন্য একটি দলিল বা পেপার তৈরি করেন। ওটা ছিল সাধারণ লেড পেন্সিল দিয়ে লেখা, আমাকে দেখিয়েও ছিলেন সেটি। তাতে ইপিআর, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতি বিভাগীয় সাড়া বা প্রতিক্রিয়া কী হবে তা প্রদর্শিত ছিল। অবশ্য এ সবের পরেও আমি বলতে চাই যে, ফরমান যদি বলেন, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন তাহলে তাঁকে সঠিকও বলতে হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, তিনি একথা আমাদের জানাননি যে তিনি তাঁর ঐ মহৎ বন্ধুর জন্য কাজও করেছেন তাঁকে অধিকার দেবার জন্য। কাউকে না কাউকে অবশ্যই আপনার বন্ধু হতে হবে।

◆ **আমরা এখানে আসার মাত্র কয়েকদিনে আমরা এর একটা কারণের কথা শুনেছি। শুনেছি কেন 'অপারেশন সার্চলাইটের' পক্ষে এখানে প্রবল অভ্যন্তরীণ অভিমত ছিল। এই হেতুর পিছনের অন্যতম বাস্তবতা ছিল এই যে, আইয়ুব শাহীর যখন পতন হয় তখন সেই পতনের**

অন্যতম কারণ ছিল ছাত্র বিক্ষোভ। আবার সামরিক আইন পুনঃআরোপ করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে ক্ষান্ত দেয়।

▲ আপনি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন আরোপের কথাটা কী বলছেন তা আমার বোধগম্য নয়। কেননা, সামরিক আইন তো গোটা পাকিস্তানেই আরোপ করা হয়েছিল।

◆ না। মানে হ্যাঁ। বলতে চাই ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানেও ছাত্র বিক্ষোভ হচ্ছিল। সামরিক আইন জারির পর তারা ঐ বিক্ষোভ বন্ধ করে ও পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। আর তাই এ ধারণা গড়ে ওঠে যে, এ রকম একটা সামরিক শাসনের প্রবর্তন করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও শান্ত হবে।

▲ কথাটা মোটেও সত্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র বিক্ষোভের সূচনা হয় ১৯৬৮'র অক্টোবরের দিকে যখন আইয়ুব খানের উন্নয়ন দশকের ইতি ঘটছিল। এ বিক্ষোভে পূর্ব পাকিস্তানে নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী। তখন ওখানে সেনাবাহিনীর জিওসি ছিলেন জেনারেল মুজাফফার উদ্দিন। ছাত্র বিক্ষোভের মোকাবিলায় ঐ সময় সেনা মেতায়েন করা হয়। আসগর খানও ঐ সময় ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। এ ছিল ওখানকার ছাত্র আন্দোলন। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

◆ আমার ধারণা পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভকারীরা সামরিক আইন জারির পরপরই বিক্ষোভে ক্ষান্ত দেয়। ১৯৬৯-এ সামরিক আইন আরোপের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে নানা যুক্তি খাড়া হতে থাকে এই বলে যে, যদি 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মতো একটা বিদ্যুৎ গতির সামরিক অভিযান পরিচালনা করা যায় তাহলে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে।

▲ আপনি কি সামরিক আইন জারির কথা বলছেন?

◆ আমরা মনে করি, এ ধরনের কিছুর কথা ভাবা হয়। উচ্চতর সামরিক মহলে একটা ধারণা গড়ে ওঠে যে, ১৯৬৮-৬৯-এ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ হয়। এর শুরু '৬৮তে। এ আন্দোলনের কারণে আইয়ুব গদিচ্যুত হন। আর পূর্ব পাকিস্তানের সব কিছু শান্ত হয়ে আসে। এ কারণে সেনাবাহিনীতে উঁচু মহলে এমন এক ধারণা গড়ে ওঠে যে, সেনাবাহিনী যদি দ্রুত তৎপরতা চালাতে পারে তাহলে কাজ হবে।

▲ বলার দরকার, সর্বকালেই সেনাবাহিনী যখন কোন এ্যাকশনে যাবার কথা বিবেচনা করে তখন তারা এও ভাবে ও বিশ্বাস করে যে, তারা সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে। আর তাই এ ধরনের পরিকল্পনা বরাবরই করা হয়ে থাকে। এতে নতুন কিছু নেই। অবশ্য, অপারেশন সার্চলাইটের জন্য সময়সীমা নির্ধারিত ছিল ১০ এপ্রিল। ওদের বিশ্বাস ছিল, এই ১০ এপ্রিল তথা অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার ১৫ দিন পর সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে, সব কিছু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। কিন্তু যে ক্রোধ, ক্ষোভ ও তিক্ততা ওখানে পুঞ্জীভূত হয়েছিল সে বিষয়টি তারা আঁচ করতে পারেনি। আর এও ভুলে যায়, এ ধরনের অপারেশনে ব্যাপক সমর্থন দরকার; তা না থাকলে সেটি সফল হতে পারে না।

◆ 'অপারেশন সার্চ লাইটের' হিসাব-নিকাশের গলদের বিষয়টি কেন তারা আগে থেকে অনুমান করতে পারল না?

A এ জন্যই তো ওদেরকে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। আর ইয়াহিয়া খান রোমেলের চেয়েও বড় কোন জেনারেল ছিলেন বলে আমি মনে করি না। তিনি হিটলারের চেয়ে কোন বড় নেতাও ছিলেন না। তবু হিটলার যুদ্ধে পরাজিত হন। অথচ আগে তিনি যুদ্ধে ক্রমাগত জয়ী হচ্ছিলেন। তিনি কার্যত গোটা পশ্চিম ইউরোপ জয় করেন। রোমেল তাঁর অপারেশন বারবারোসা'র নেতৃত্ব দেন যুদ্ধের দু'টি রণাঙ্গন খোলার জন্য, একটি রাশিয়া অভিযানের জন্য। আপনারা জানেন, সে অভিযানের কী পরিণতি ঘটে। এ সবই ঘটনা। যুদ্ধ চলে সাধারণত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে। এ কথা ভুলবার নয়।

লিবার্টো প্রসঙ্গত বলেছেন, যুদ্ধ শুধু জেনারেলদের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে—যুদ্ধ আদৌ এমন হালকা বিষয় হয়। আর আমি আপনাদেরকে এ বিষয়ে একটু যোগ করেই বলি, যুদ্ধ খুবই গুরুতর বিষয় যা আধুনিক জেনারেলদের হাতে ছেড়ে দেয়ার বিষয় নয়। রাজনীতি ও সমরশক্তি উভয়কেই নানা স্তরে সম্পর্কিত থাকতে হবে, তাদের ভূমিকাও থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানে রাজনীতিক ও আমলাদের সমর্থন পেতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি ওঠেনি, কোন প্রতিরোধ সংগঠিত আকারে আসেনি, বিরোধিতা করা হয়নি, বিক্ষোভ হয়নি অথচ পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছিল সে বিষয়েও কেউ তেমন আগ্রহ বা কৌতূহল দেখায়নি। তাই আমি নিশ্চিত, সামরিক বাহিনী কালপ্রিট বা অপরাধী নয় তবু সেই সামরিক বাহিনীই ছিল আসামী। সে কথাই আমাকে শুনতে হয়েছে। সামরিক বাহিনী তার অপরাধীসুলভ কার্যকলাপে দেশের বেসামরিক মহলগুলোর সমর্থন পেয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিরেট, নিটোল বিষয় এটি। পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান যা-ই হোক, এই ছিল বিধিলিপি। যখন বাঙালী আধিপত্যশীল ছিল ঠিক সেই সময় যুগপৎভাবে পাঠান, সিন্ধী, বালুচরা সামাজিকভাবে একই রকমে আধিপত্যশীল হয়ে উঠতে পারেনি। আর বাঙালীরা ছিল...।

◆ জেনারেল নিয়াজী তাঁর বইয়ে একটি পরিকল্পনার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সেটির তথ্যে তিনি জানাচ্ছেন, এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল কোন জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানে যাক-না যাক নিয়াজীকে যেতেই হবে (বলির পাঁঠা হিসাবে!)। আর তাঁকে যুদ্ধে পরাজয়বরণ করতেই হবে, কেননা তাঁকে কোন মদদ দেয়া হবে না।

A আপনাদের তরফে কেবল তেমনটি প্রত্যাশা করাই সম্ভব। আমি আসলে বলতে চাই যে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বিশ্বাস করুন তিনি এখানকার হাই কমান্ডে থাকলেও নেতিবাচক দৃশ্যপটে তিনিও তেমন রদবদল করতে পারতেন না। এ রকম দায়িত্ব তাঁকে দেয়াই উচিত ছিল। আশা করি আপনারা ভুল বুঝবেন না, কেননা, এ এক তাৎক্ষণিক কাকতালীয় ব্যাপার। এ নিয়ে আমি লিখেছিও। এ হলো নিয়াজীর বই সম্পর্কে আমার বলার। এ নিয়ে আমি বিস্তৃত কলেবরে পুস্তক সমালোচনার আকারে লিখেছি এবং তা নিবন্ধ আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। জেনারেল জ্যাকবের বই সম্পর্কেও লিখেছি। জ্যাকব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ওপর একটি বই লিখেছেন, তার একটি কপিও আমি পেয়েছি।

◆ এ সপ্তাহে?

∆ জ্বি। আমি সঠিক মন্তব্য করেছি, বক্তব্যের সারসংক্ষেপ দিয়েছি এবং একটি দলিল উপস্থাপন করেছি—এর পাঞ্জাবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দলিলটির রচয়িতা আসমত ইরানীর বাবা। আমার মনে হয়, এটি অত্যন্ত প্রামাণ্য দলিল—এর একটি কপি আপনিও পেতে পারেন। যা কিছু একাত্তরে ঘটে গেছে তার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এ দলিলে। এটি আসলে একটি চিঠি যা লেখা হয়েছিল একাত্তরের এপ্রিলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে।

◆ ঐ চিঠির লেখক তাঁর ঐ চিঠিতে কী বলেছিলেন?

∆ তিনি বলেছিলেন, সব কিছুর নিষ্পত্তি হবে বিশ্বজনীন পর্যায়ে, আর আপনারা (পাকিস্তানীরা) হেরে যাবেন, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। পূর্ব পাকিস্তানে আপনারা আজ যা করেছেন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধ করুন। এই আসমত ইরানীর পিতাই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি কাগজে-কলমে তাঁর এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এ চিঠির একটি কপি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, যা এখনও আমার কাছে রয়েছে। যার অংশবিশেষ...। বইয়ের একটা কপি আপনারা রাখুন।

◆ আপনাদের এখানকার কেউ কেউ আমাদের জানিয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শাসন কেন্দ্র তথা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের শাসকবর্গ '৬০-এর দশকের শেষের দিকে থেকেই বলে আসছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দায়—তার ভার বোঝা হয়ে উঠেছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে ফেলাই ভাল।

∆ কথাটা নতুন নয়। একেবারে প্রথম থেকেই এ ধারণা চলে আসছে। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ সন্দেহাতীতভাবে পরাজিত হয়। এ ঘটনাও হয়ত তেমন কিছু। যদি তাই না হবে তাহলে মি. জিন্নাহ কেন পশ্চিম পাকিস্তানে এসেছিলেন? কেন তিনি ঢাকায় গেলেন না? অথচ পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচকরা ছিল শতকরা ৫৬ জন। এসব কথা বলতে গেলে কাহিনী অনেক লম্বা হয়ে যাবে। সেটি আপনারা ভাল করেই জানেন। আমার এ বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে। আমি বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা-গবেষণা করছি। বলা যায়, এতে আমি খুব একটা আনন্দিত নই। আর একটা বড় কথা যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি তাঁকে দিয়েছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দী, কিরণ শংকর রায় ও এনামুল হাসান খান প্রমুখ। জিন্নাহ এ প্রস্তাবের জবাবে বলেছিলেন, বেশ তো, আমার কোন আপত্তি নেই। আর কলকাতা ছাড়া বাংলা? সে কথা আমি ভাবতেই পারি না। আপনারা তাহলে এগিয়ে যান। তবে হ্যাঁ, সেটি একটি মাত্র শর্ত সাপেক্ষে। তা হলো, আপনারা কখনও স্বাধীন ভারত ইউনিয়নের অংশ হবেন না। কাজেই ঐ অবধি তিনি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

◆ আরেকটি বিষয়ের কথা আমাদের কানে এসেছে। সে সময় নাকি হিন্দু শিক্ষকরা পূর্ব পাকিস্তানীদের শিক্ষা দেবার ছলে তাদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে?

∆ বলছি আপনাদেরকে।

◆ এ হলো সাম্প্রতিক অভজ্ঞতা। এখনই কেবল এসব কথা শুনছি।

▲ ফরমান আলীর বই থেকে বিষয়টি আমি জেনেছি। আর এভাবেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদের কাজের যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। আমি বিষয়টি আদৌ বুঝি না, কেননা দেশ ভাগের আগে তো হিন্দু শিক্ষক, অধ্যাপকের সংখ্যা বেশি ছিল। মুসলিম শিক্ষক ছিল কম। আর তাদের বিরুদ্ধে যা-ই বলা হোক, আমাদের আন্দোলনে তারাও আগ্রহ নিয়ে অংশীদার হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আমার একদিন এক কৌতূহলোদ্দীপক তর্ক-বিতর্ক হয়। আমি বলেছিলাম, অসুবিধাটি কোথায়? আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি আমাকে বল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এ রকম একটা ডাক বিভাগীয় ঠিকানায় যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে বাংলাদেশকে তো পাকিস্তানের আওতাতেই রেখেছ? কাজেই আলাদা দেখলেও আসলে তা এক সাথে মিলে একক দেশ। সে জবাবে বলেছিল, বাংলাদেশ বলে কি বোঝাতে চাও তুমি? আমি বললাম, বাংলাদেশ। ও বলল, তুমি কি দেশ আর প্রদেশের তফাত বোঝ না? আমি নীরব থেকে ওকে সময় দিলাম ভাববার। সে আবার বলল, দেশ হলো একটা রাষ্ট্র অঞ্চল আর প্রদেশ হলো রাষ্ট্রীয় অঞ্চল বা দেশের অংশ। যেমন, উত্তর প্রদেশ ভারতের একটি প্রদেশ। আমি বললাম, দোহাই জেনারেল, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ও রাস্তায় ব্যাপারটাকে নিও না। ওতে কোন ফল পাওয়া যাবে না। বস্তুত ওভাবেই ওরা সব কিছুকে বিচার করে, ওটা ওদের রীতি, আদর্শ, নিয়ম-আচার। আদর্শিকভাবে ধরে নিলাম 'দেশ' বা 'প্রদেশ' যা-ই হোক, দোষটা কী? দেশ যদি বাংলাদেশ-পাকিস্তান হয়! কী হয় তাতে? আমার এখনও নিশ্চিত বিশ্বাস, বাংলাদেশ আর যা-ই হোক কখনও 'দেশ'-এর তল্লাশে ছিল না। বাংলাদেশ কেবল স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। তারা তাদের একান্ত নিজস্ব বিষয়-আশয়ে নিজ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিল। আমার বরাবরের ধারণা ছিল এ রকমই। আমি আমার জীবনের দীর্ঘ সাতটি বছর কাটিয়েছি পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষায়। আমি একটা বইও প্রকাশ করেছি। সেই বইয়ের অংশবিশেষ আমার লেখা কতকগুলো নিবন্ধ ধারাবাহিক *দ্য নেশন* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেগুলো নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। দেখে থাকলে আপনাদের মন্তব্য কী আমার জানা নেই। এ হলো সেগুলোর কপি, আপনাদের জন্য।

◆ আমরা জেনারেল উমরের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি জানিয়েছেন ২৫ মার্চ রাতে তিনি ঢাকায় ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন না।

▲ আমিও এ বিষয়ে কোন কিছু জানতাম না। তবে স্পষ্টত বুঝতে পারছিলাম এ লোকটি এর মধ্যে ছিলেন।

◆ ২৫ মার্চ যা ঘটেছিল তাতে জেনারেল উমর ছিল একথা কেন আপনার মনে হয়?

▲ কারণ তিনি এতে ছিলেন বলে। ২৫ মার্চ সকালে তাঁর সাথে যখন আমার দেখা হয় তখন আমার পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরার সময় হয়েছে। আর সে কারণেই আমি জেনারেল পীরজাদার কাছে বিদায় নিতে যাই। তখন তিনি ঢাকায় ছিলেন। আমি তাঁকে রীতিমাফিক স্যালুট দিয়েছিলাম। আমার মুখের আকৃতি তেমন সুদর্শন কিছু নয়। আমার মুখটা বরং সিরিয়াস গম্ভীর প্রকৃতির। আর ২৫ মার্চে তো অনিবার্যভাবেই আমার মুখমণ্ডল খুব গম্ভীর হওয়ারই কথা। তাই তিনি আমাকে বললেন, ওহে, কী জন্য তুমি এত গম্ভীর? আমি বললাম, স্যার,

এখানকার পরিস্থিতি তো জানেনই। তিনি বললেন, আরে না না, চিয়ার আপ, মুখ গোমড়া করে থেকো না। সেদিন ২৫ মার্চ, ১৯৭১।

◆ কথাগুলো কার? জেনারেল উমরের?

∆ জেনারেল উমরের। আর তারপর তিনি একটি শায়ের (কাব্য স্তবক) আবৃত্তি করলেন। বললেন সবকিছু ভুলে থাকতে।

◆ তা কাব্য স্তবকটি কী ছিল? শায়ের সুনাইয়ে জারা?

∆ হ্যাঁ, শোনাব। সম্ভবত আমার এর পুনরাবৃত্তিতে ভুল হয়ে যেতে পারে।

◆ ইয়ে গুজারনে কোয়ি বাত নেহি।

∆ "মায়ই যবভি ঢাকা যাতাহু
ওয়ো কাতিল ছে কাহতা যাতাহু
তাওহি মে দ্যাস্তো বালু হ্যায়
ওয়ো ওয়াক্ত কি যো...।"

কোন আঘাত করার সময় পুরো গায়ের বল কাজে লাগানো না হলে তা এক অবমাননাকর অমর্যাদাই বটে—ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাকে বিশ্বাস করবে। সে আঘাতটাই আসে পঁচিশের নিশুতি মধ্যরাতে—১১টা বা ১২টায়। আর সে কারণেই জেনারেল উমর যদি বলে থাকেন, বলতেই পারেন, কেননা তিনি পাকিস্তান জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান। আর কারণটি সম্পর্কে জেনারেল জ্যাকব তাঁর বইয়ে বলেছেন, জেনারেল উমর ছিলেন ইয়াহিয়ার কসাই। তবে ওটা আমার মন্তব্য নয়।

◆ তাহলে আপনি কী বলেন?

∆ তিনি এ সব ব্যাপারে খুব ভাল করেই ছিলেন কিংবা অনেকটাই এর ভিতরে ছিলেন। এ রকম করে বলছি এ কারণে যে আমি ছিলাম জনসংযোগের লোক। সবকিছুই আমার নজরে আসত, তবে সবার শেষে। আর এ কারণেই আমি বলছি, আমি ধারেকাছেই ছিলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোন অংশীদার ছিলাম না।

◆ এ সম্পর্কিত বইপত্র পড়লে সেনাবাহিনীর জেনারেলদের সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয় আমি সেটিকে কীভাবে বলি... কেমন যেন, এলোমেলো, বিভ্রান্তিকর, স্ববিরোধী মনে হয়।

∆ আরে না, এ জন্য অনেক দলিল, কাগজপত্রও তো রয়ে গেছে। মানে আমি বলতে চাই, তাদের সকলের মতামত একই হতে পারে কী করে?

◆ ঠিক তা নয়, একসময় তারা জেনারেল উমরের মতোই বলছে, আমি এই করছিলাম। আমি সেই করছিলাম। ইয়াকুব, নিয়াজীও বলছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ বলেছে ভিন্ন কথা।

∆ আমার তা জানা নেই। আমি জানি না জেনারেল উমর এসব বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন। দলিলপত্রই বা কেমন তাও আমি জানি না। আমি জেনারেল ইয়াকুবের বরাত দিতে পারি। তিনি অনেক কিছুই স্বীকার করেছিলেন। জেনারেল ইয়াকুবের সাথে তাঁর সামরিক আইন প্রশাসন দফতরে আমার দেখা হয়। সর্বশেষ তাঁর সাথে আমার দেখা হয়

ঢাকায়। তিনি জানিয়েছিলেন, ১৯৭০-এর নভেম্বরের নির্বাচনের দিন কয়েক আগে অস্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী কিছু সৈনিক একটি জরুরী পরিকল্পনা তৈরিতে উদ্যোগী হয়। আর এ বিষয়ে আমার এই যে নিবন্ধটি দেখছেন আগামী সপ্তাহে ইসলামাবাদের কোন একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাই বলতে পারি জেনারেল ইয়াকুব ছিলেন তাঁর স্বকীয় ধারার এক জঙ্গী বাজপাখি। তাঁর ধারণা ছিল এভাবেই তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তবে তাঁরা আসলে দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেননি। সে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর এ ধরনের অভিযান আগাগোড়াই নিরর্থক। ১৯৭০-এর নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তীকালে আমি সেখানে ছিলাম। আমি ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এসব উপকূলীয় এলাকা যেমন—ভোলা, হাতিয়া ও এ ধরনের আরও প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়েছি। ঐ সময় বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমি অনুমান করেছিলাম, আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, আর অন্য দলগুলোর ভরাডুবি হবে। তবু ওদের কোন চৈতন্যোদয় ঘটেনি।

◆ বাংলাদেশ সম্পর্কিত বইগুলোতে '৭০ সালের নির্বাচনের ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কেমন ব্যাপার? কী মনে করেন আপনি এ বিষয়ে? কতগুলো আসন কোন্ দল পাবে তা ওরা নিরূপণ করতে পারল না?

▲ দেখুন, গোয়েন্দা বিভাগ বরাবরই ব্যর্থ হয়—সব সময়। আর গোয়েন্দা প্রবরেরাই কর্তৃপক্ষকে ডোবায়। দেখুন না, ভারতে কী ঘটেছে, ওখানকার বোমা বিস্ফোরণ, বিশিষ্ট ব্যক্তি হত্যা—যার কোন কূলকিনারা, নিশানা-আভাসও পাওয়া যায়নি। সব সময়ই এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই ললাট লিখন।

◆ আবারও আমি সামরিক বিষয়েই প্রশ্ন করছি। জেনালের নিয়াজী সম্পর্কে। আপনি তো তাঁকে ভাল অফিসার বলে মন্তব্য করেছেন। এখন আমি যোগ করতে চাই—বহুগুণে শক্তিশালী ভারতকে ঠেকাতে তো তিনি তাঁর যথাসাধ্য করেছেন। আসলেও তিনি যা করেছেন তা তাঁর সাধ্যের বাইরেও। অথচ বহু লোকে এখন বলছেন জেনারেল নিয়াজী কোন যোগ্য জেনারেল ছিলেন না। আমার প্রশ্ন হলো, তাঁর যোগ্যতার বিষয়টি পাকিস্তানী সেনা সদর দফতরের কি জানা ছিল না? যদি থাকে, তাহলে বিষয়টি কেমন বিসদৃশ দেখায় না কি?

▲ আপনি কিন্তু অনেকগুলো বিষয়কে বেমালুম টপকে যাচ্ছেন। ভারতের মতো দেশও অনেক জায়গায় সামরিকভাবে পরাজিত হয়েছে, কাশ্মীরে তাকে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে, অহমিয়াদের হাতে বহু সেনা খুইয়েছে, এগুলো কি সত্যি নয়?

◆ এগুলোতো আছেই। কিন্তু আমরা বলতে চাই, জেনারেল হিসাবে নিয়াজী ধাঁধার জবাব কী?

▲ না, আমি কেমন করে বলি, তিনি ভাল জেনারেল নন। আমি বলি তিনি নিষ্ঠাবান, খুব ভাল একজন সামরিক অফিসার।

◆ আপনিতো জানেন যে তিনি জানিয়েছেন, দুই-তিন জন জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানে সেনাপতিত্বের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। কাজেই বাছাইয়ের সিঁড়িতে নিচে থাকা সত্ত্বেও নির্বাচকরা তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে সিপাহসালার হিসাবে তুলে নেন।

▲ আর সেটাই হলো আখেরের বাছাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কী ঘটেছিল জানেন? রেবেন এক সময় লক্ষ্য করেন যে, তিনি যে সময় সিদি ইব্রাহিমে ছিলেন তখন তাঁর ঐ অবস্থান থেকে তিনি জার্মান জেনারেল রোমেলকে সেখান থেকে হটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু রিচার্ডসনের কাছ থেকে আদেশ এলো তাঁর কাছে দুই ডিভিশন সেনা পাঠাও গ্রীসে। তিনিও সে হুকুম তামিল করলেন। কিন্তু তাতে কী হলো, গ্রীসে কোন ভাল ফলতো পাওয়াই গেল না, সিদি ইব্রাহিমের দিকে অগ্রগতিও স্তব্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হলে এ নিয়ে বহু সমালোচনার বার্তা আসতে থাকলে রেবেন বললেন, না ওটা ছিল আমারই ভুল। আমি সেভাবেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে নোট পাঠানোর সাহস রাখি। আর সেটিই কথা। জেনারেলের এখানে কোন প্রশংসা পাবার নেই। জেনারেল নিয়াজী আমার সাথে অত্যন্ত চমৎকার আচরণ করেছেন। আর আমিও একমাত্র ব্যক্তি, যে তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত সদয় মন্তব্য করেছি।

◆ জ্যাকব সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

▲ জ্যাকব তো আরেক ইয়াকুব। আমি বলব, আরেক নিয়াজী। কারণ জ্যাকব অনেক কাজই করেছেন। ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'র সাথে ১৯৯২-এর নভেম্বরে তিনি পাকিস্তানে এলে অল্পকালের জন্য আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আমি তখন লাহোরে ছিলাম। লোকটি রীতিমতো সুরাসক্ত, জানতেনও না বোধ করি যে তিনি একজন জেনারেল। খুবই মোটা থলথলে শরীর। আর তাঁর মুখ থেকে যেসব বচন বেরোয় তা সত্যিকার পেশাদার সৈনিক শুনলেও লজ্জা পাবে। এহেন জ্যাকব এখন যুদ্ধে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হবার দাবিদার। তাঁর সে দাবির নিক্তির প্রান্তে ঝুলে আছেন মানেক শ, আর আরোরা বেচারা তো লাপাত্তা। তিনিই সে দিগ্গজ যিনি যুদ্ধের সব কিছুর প্রণেতা। তারপর মানে শ...। এহেন জ্যাকবের উক্তি, না-না, ঢাকা তো আপনাদের রাজনৈতিক কেন্দ্র, কত কিছু। আমি জবাবে বলেছিলাম, জ্বি, যা ঘটেছে তাতো নিশ্চয়ই, তবে কখনও বলবেন না...। আমি তাই বলি জ্যাকব ও নিয়াজী একই শ্রেণীভুক্ত। তফাত শুধু এই—জ্যাকব নিয়াজীর চেয়ে...

◆ আপনি বলেছেন, যুদ্ধের বিষয় এমন গুরুতর যা জেনারেলদের হাতে যেমন ছেড়ে দেয়া যায় না, তেমনি রাজনীতিকদের হাতেও নয়। এখন বলুন ভুট্টোর ভূমিকা কী ছিল? তিনি ছিলেন...

▲ তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিপর্যয় আর কি! তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন একই দেশের দুই দেশরক্ষা দফতর, জোড়া প্রধানমন্ত্রী পদের। তিনি আটকেই থাকুন বা লারকানা, ইসলামাবাদে থাকুন, তিনি সব সময় ক্ষমতার জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন, আর সেটাই তাঁর... সব। আমি মনে করি প্রশ্নটি আসলে ক্ষমতা হস্তান্তরের ছিল না, বরং বেশ কয়েকটি স্তর পেরিয়ে তা হবার কথা ছিল। ১নং স্তর : নির্বাচন। ২নং স্তর : জাতীয় পরিষদে উদ্বোধনী অধিবেশনের দিন তারিখ নির্ধারণ। ৩নং স্তর : জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রেসিডেন্টের উপস্থিত ও ভাষণদান। ৪নং স্তর খোদ শাসনতন্ত্রের বিষয়াবলী ১২০ দিনের সময়সীমার মধ্যে নির্ধারণ। ৫নং স্তর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্রের অনুমোদন। ৬নং স্তর : ক্ষমতার হস্তান্তর। কিন্তু সবকিছু গোলে হরিবোল করে দেয়া হয়।

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আমার বিবেচনায় মোটেই সঠিক ছিল না। আমি আমার ওপরওয়ালা মেজর জেনারেল গুল হাসান খানকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে প্রেসিডেন্টকে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে দিন। জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন নির্ধারিত তারিখে হতে দিন। সেই অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাবেন ও ভাষণ দেবেন। আর সেই সাথে তিনি তাঁর যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে কোন একটা কার্যকর রফা ও ব্যবস্থায় উপনীত হবেন। আর তাতে দুই-তিন বা পাঁচ মাস লাগতে পারে। এ সময়টি ১২০ দিন সময়সীমার বাইরে থাকবে এবং ফেডারেল শাসনতন্ত্রের জন্য ১২০ দিনের যে মেয়াদ তা নির্দিষ্ট তারিখে শুরু হবে—পাকিস্তানের দুই অঞ্চল শাসনতন্ত্র প্রশ্নে আলোচনা শুরুর ঠিক পর থেকে। আর সেটিই হতে পারে নিখুঁত কাজের উপযোগী ব্যবস্থা। কিন্তু তারপর কী ঘটে সে তো আপনাদের জানা। লারকানার সলাপরামর্শের পর ভুট্টোর ভোল পাল্টে গেল। সবকিছুর তালগোল আরও একবার পাকিয়ে গেল। ইয়াহিয়া খান কখনও একথা বলেননি, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি একাত্তরের ১৪ জানুয়ারি বিমানবন্দরে বিমানে ওঠার আগে কোন এক ব্যক্তির দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, আমি দেশের যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি। ঐ ব্যক্তি তাঁকে আরও প্রশ্ন করেন কে তাহলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বলে আপনি মনে করেন? ইয়াহিয়া বলেন, 'কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা।' তিনি কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। তিনি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কথাই বলেছিলেন। আর কিছুই নয়। কিন্তু এরপর ইয়াহিয়া যান লারকানায়, আর তারপরই গোটা রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে যায়।

◆ বিষয়টা কি সেনাবাহিনীতে জানা ছিল যে তিনি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবেন?

▲ অবশ্যই। তারা অলস বসে ছিল না, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তাদের সহানুভূতি ছিল। আর ভুট্টো তাদের মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি নানা রকমের কাহিনী ফাঁদতে শুরু করেন। তিনি এমন আজগুবি কথা শুরু করে দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের সব ট্যাঙ্ক ও বিমান নিয়ে যাবেন। অথচ সকলের জানা উচিত যে, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে করাচী, করাচী থেকে চট্টগ্রাম ট্যাঙ্কগুলো নিতে বেশ একটা সময় লাগার কথা। যা হোক, আপনি কি সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রাম গেছেন? চট্টগ্রামের নতুন পাড়ার সেনাবাহিনীর রেজিমেন্টাল সেক্টরে একটা রুশ উভচর ৭৬-টি ট্যাঙ্ক এখনও থাকার কথা। সেটা এখনও আপনি দেখতে পাবেন। এই ট্যাঙ্কটিকে কাসুর থেকে চট্টগ্রাম নিতে তিন মাস সময় লেগেছিল।

◆ তাহলে তিনি ওদের ভীতির এই বিষয়টি নিয়ে 'মাদারির খেল' শুরু করেছিলেন?

▲ ভীতি নয় বরং বলুন উচ্চাভিলাষ, যার নির্গলিতার্থ আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, নির্বুদ্ধিতা। উচ্চাভিলাষ? হ্যাঁ, ওটা ছিল বটে তবে কোন ভীতি ছিল না।

◆ আসলে পশ্চিম পাকিস্তানে তখন এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বিপর্যয় চলছিল। সে সময় ভুট্টো সেনাবাহিনীতে তাঁর একাধিক সমর্থকগোষ্ঠীর উদ্দেশে বার্তা পাঠাচ্ছিলেন, বার্তা ছিল জেনারেলদের জন্যও, বার্তা ছিল সর্বস্তরের সেনামহলগুলোর জন্য।

▲ না, না, তা মোটেও নয়। সেনাবাহিনী মূল্যের নিরিখে যা-ই হোক না কেন, এ সংগঠনটি বাস্তবিকপক্ষেই মনোলিথিক, একাট্টা, কেন্দ্রাভিমুখী। ভুট্টো সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এ হলো আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর কথা। আমি আপনাদের দেশে গিয়েছি। জেনারেল এরশাদের সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলাপ হয়েছে। সে সময় তিনি ছিলেন আপনাদের প্রেসিডেন্ট। আপনাদের সেনাবাহিনীর পদাতিক বাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর মতোই উত্তম। আপনাদের বেলায় শুধু তফাতটি হলো যে, তারা অস্ত্রসজ্জিত নয়। সেনাবাহিনী হলো এককেন্দ্রিক সংগঠন। আমাদের দেশের সেনাবাহিনীতে এখনও মধ্যপ্রাচ্য দেশীয় ধাঁচ আসেনি। অথচ আপনারা লে. কর্নেলদের জন্য একটি ভাষার, অন্যদের জন্য অন্য ভাষার প্রস্তাব করেছেন। এটি হয়ত বা কিছুকাল পরে হবে। সে বিষয়ে আমি বলতে পারি না। এরপর জেন্টলম্যানদের (জেন্টলম্যান ক্যাডেট) জন্য আরেকটি ভাষা রেখেছেন।

◆ নওয়াজ শরীফের সাম্প্রতিক মন্তব্য সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন?

▲ মনে হয় ঠিক হবে না। কেননা আমি আমার নিবন্ধে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি। আমি আশা করি, নওয়াজ শরীফ যা বলেছেন তা কখনও তিনি অস্বীকার করবেন না। কারণ, ওটা এখন বাস্তব সত্য। এ নিয়ে আর বেশি কিছু মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কেবল আপনি যদি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধগুলোর কপি আমাকে পাঠান তা-ই যথেষ্ট হবে।

◆ আবশ্যই, যা কিছু হোক আপনি তার কপি পাবেন।

▲ আর হ্যাঁ, আব্দুল হাফিজ, যিনি এক সময় ভুট্টোকে সমর্থন করতেন, তাঁর কিছু অদ্ভুত ধ্যানধারণা আছে আমার ও আমাদের ব্যাপারে। তবে আমি বিষয়টি গায়ে মাখি না। কেননা কেউ যদি সদ্য পরিচিত কারও সম্পর্কে একভাবে চিন্তা করে বা করার বিষয়ে স্থির করে থাকে, তাতে আমার বলার কিছু নেই। তেহরানে তিনি আমার সাথে দেখা করেন। তিনি বলেন, কেন আমাকে আপনার অফিসে ডেকেছেন? আমি কোন জন্তু বা এরকম কোন কিছুর সাথে কথা বলি না। সে যাই হোক আমি তাঁকে ডেকেছিলাম। তিনি একজন লাগামবর্জিত মানুষ, কেননা...।

◆ ও, হাফিজের কথা বলছেন! এ ব্যাপারে তো তাঁর রীতিমতো সুখ্যাতিই আছে।

▲ না, না, তিনি ও জন্য খ্যাত নন। তিনি সে রকম মানুষ নন। তিনি অসহিষ্ণু, অহমিকাক্লিষ্ট—একবার কিছু সিদ্ধান্ত নিলে সেখান থেকে তিনি নড়েন না।

◆ এ ঘটনা ঘটে কবে?

▲ ১৯৮৯-এ আমার তেহরান সফরের সময়।

◆ তা আপনি কেন ভাববেন হাফিজ এখনও বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক? তিনি ইতোমধ্যে ওখান থেকে চলে গেছেন।

▲ ঐ সময়টায় আমি বাংলাদেশের গোটা বিষয়টি বিচার-বিবেচনা ও সমীক্ষা করছিলাম। তখন ১৯৮৬। আমি এরশাদের সঙ্গে বাংলাদেশে যাই। তাঁর সাথে বৈঠকে মিলিত হই। একথা আপনাদের খুব ভাল করে জানা। ঐ সময় বাংলাদেশে, ডিসিএমএলএ বা উপপ্রধান

সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন জেনারেল আতিকুর রহমান। তিনি এক বিশদ বিস্তৃত বৈঠকের আয়োজন করেন। তিনি খুবই সদয় ব্যক্তি। তিনি আমার স্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। কারণ আমার আত্মীয়-স্বজন কিছু বাংলাদেশেও রয়েছে। এ সফরে আমাকে যে ভিআইপি ফ্ল্যাটে থাকতে দেয়া হয়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সেই একই ফ্ল্যাটে আমি ছিলাম। আমি আপনাদের দেশ ও দেশের লোকজন দেখেছি। খুবই চমৎকার। এরশাদের সাথে আমার তিন দফা বৈঠক হয়। আর অপরিহার্যভাবেই আপনাদের আবাসিক সেনাবাহিনী সম্পর্কে আমার একটা ধারণা নেবার সুযোগ হয়। কিন্তু বলার বেশি কিছু নেই, কেননা, আপনাদের সেনাবাহিনী অস্ত্রসজ্জিত নয়। এটি আপনাদের বিবেচ্য বিষয়। মহোদয়, সেনাবাহিনী সার্বভৌমত্বের প্রতীকও বটে, এরশাদ এসবের জবাবে বললেন, ঠিকই বলেছেন। ধরুন যদি বদমাশ ভারতীয়রা... আমি মনে করি নিশ্চিত আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন। দেখেশুনে মনে হলো লোকটির আদ্যোপান্ত সব দেখা হয়ে গেছে। তবে তাঁর সম্পর্কে একটা ধীর আর সহিষ্ণু ধারণাই হলো। তাঁকে খুব ভাল করে জানা এর আগে হয়নি। তিনি এখানে ছিলেন। এখানে যে ২০-২৮ হাজার বাঙালী সৈনিক ছিল তিনি তাদেরই একজন।

◆ যাই বলুন এঁরা তো সবাই পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক একাডেমী থেকেই বেরিয়েছে।

Δ আর সেটাই জঘন্যতম ব্যাপার।

◆ কী আর বলা!

Δ মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার একদিকে, বাঘা সিদ্দিকী একদিকে, আর এরশাদ, বিএমএ একদিকে। সব মিলেমিশে ওরা একাকার। এক হয়ে যায়। সেনাবাহিনী হয়ে ওঠে গেরিলা বাহিনী। বাঘা সিদ্দিকী বাঘা সিদ্দিকীই থেকে যান। আর যে মুহূর্তে শিক্ষিত সেনাবাহিনী এসে যায়, কাদেরিয়া বাহিনী তাতে রণক্ষেত্র হারায়। কেননা, বাঘা সিদ্দিকীর গেরিলারা কোন্ টাইপের তা আপনারা জানেন। আর ওরা সব সময়ই এক রকমের। অথচ যা উচিত তা হলো, গেরিলাদেরকে অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়। একবার শান্তি ও নিয়মিত বাহিনী এলে সেখানে আর গেরিলা বাহিনী থাকতে পারে না। টাইগার সিদ্দিকী সম্পর্কে অনেক লোহমর্ষক বিবরণ রয়েছে। আমাদের একজন সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, এই বাঘা সিদ্দিকী অবাঙালী লোকজনকে ঘেরাও পাকড়াও করার পর তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে তাদের রক্তে নিজেদের হাতের আঙুল রাঙিয়ে নিতেন। সেটা তাঁরা করেছেন বিশ্ব যোগাযোগ মাধ্যমের উজ্জ্বল পাদ-প্রদীপের সামনে। কিন্তু যাই হোক, তিনি তাঁর কাজ তো করেছেন। বাঘা সিদ্দিকী সমস্যার নিষ্পত্তি করেছেন। সে রকমই মানুষ তিনি। এসব কাজের শর্তই এমন। আমি হলে আমাকেও এমন কাজের অংশীদার হতে হতো।

◆ কিন্তু কাজটা তো ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময়!

Δ সর্বাত্মকভাবে। কিন্তু সবকিছুর পরেও এ কথাতো নির্মম সত্য, এ কার্যকলাপ চলেছে। ভিতরে এ সব হিংস্র নির্মমতা, বহিঃপ্রলেপের প্রসাধনীই তো কেবল সাধারণের নজরে পড়ে।

◆ আসলেও দীর্ঘ নয় মাসের দুঃসহ বিভীষিকার রাজত্বের পর ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর এলে কারুর পক্ষে জান্তব আক্রোশ, তথা প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখা ছিল খুবই কঠিন কাজ।

▲ আমি স্বীকার করি সে কথা, হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে এ ব্যাপারে একমত। আরও একটি জিনিস। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বলে সেটি ছিল সবচেয়ে জঘন্য। আমরা বিদেশী সংবাদদাতাদের ২৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করেছিলাম। এই একবারই মাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন টিক্কা খান তাঁর সারা জীবনে। অতীতে কিছু দেখানোর ছিল না, তাই কখনও তিনি সিদ্ধান্ত নেননি। ঢাকায় তখন কার্ফ্যু ছিল। আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে লম্বা ড্রাইভে পোস্তা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে বহু লাশ আমার চোখে পড়েছে। অবশ্য ঢাকা ক্লাবের বাইরে মাত্র ২/১টি লাশ দেখেছি। আর কিছুই না। কিন্তু তবু বিদেশী সংবাদদাতাদের অনতিবিলম্বে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্তটিতে গৌরবের কিছু ছিল না। তাদের আগে কোন বিদেশী সংবাদদাতাকে পরিদর্শনে নিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়নি। আমিই পরে প্রথমবারের মতো ছয়জন বিদেশী সংবাদদাতার একটি দলকে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে নিয়ে যাই। এঁরা হলেন, *টাইম ম্যাগাজিন, ফিনান্সিয়াল টাইমস, সিনহুয়া, রয়টার, নিউইয়র্ক টাইমস* ও আরও কয়েকজন সংবাদদাতা। তাঁরা উপদ্রুত এলাকাগুলো ঘুরে দেখেন। তাঁদেরকে ঘুরে দেখার সময় লোকজনের সাথে কথা বলার সকল স্বাধীনতা দেয়া হয়। কিছু লোক আমাদের দেখে সরে পড়ে। আমরা ওদের বাইরে আনতে পারিনি। এসব ঘটনা ঘটে যায় দুর্ভাগ্যক্রমে। খুব বাড়াবাড়ি করা হয়েছে বলেই আমার ধারণা। আমি এ বিষয়ে নিবন্ধ লিখে তখন পাঠিয়েছিলাম। আমি মনে করি আমাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক ক্ষমা চাওয়া দরকার রয়েছে এ বিষয়ে। আমরা যে সব দোষ করেছি আপনাদের তুলনায় তা অনেক বেশি। তবে আপনারাও ভুল করেননি, অন্যায় করেননি এমন নয়। পাকিস্তান যা ছিল আজ আর তা নেই।

◆ জানতে চাই, কীভাবে এই সহযোগিতামূলক ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা ঘটবে?

▲ আমি বলতে চাই, আমাদের দুই পক্ষকে পরস্পর ক্ষমা চাইতে হবে। কেননা, আপনারাও সব সময় ঠিক কাজ করেননি।

◆ হলো তাই। কিন্তু এ বিষয়ে কাউকে তো কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করতে হবে? মানে দুই তরফকে তাদের সীমানা অবধি এগিয়ে আসতে হবে।

▲ না, আমার ধারণায় সর্বোত্তম জিনিসটি হলো পরস্পরকে বলা যে, ভাই যা-ই ঘটেছে সে জন্য আমরা দুঃখিত। আর সেটিই সব।

◆ ক্ষমা প্রার্থনা করায় কি এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায়... আমি তো মনে করি না।

▲ আমিও মনে করি না।

◆ বিষয়টি সম্পর্কে আপনি ইতোমধ্যে বলেছেন। থাক—অনেক বাস্তব তথ্যও বেরিয়েছে আপনার কথা থেকে।

▲ আমি যা বলেছি, তাতে পাকিস্তানের ভিতরটা আপনারা দেখেছেন।

◆ তাতে কী? বলি...।

▲ না, না। এ কথাটা বলতে দিন আমাকে। এ ধরনের কথাবার্তা বলতে যথেষ্ট বুকের পাটার প্রয়োজন হয়।

◆ আমি সেটা বিশ্বাস করি।

∆ বিশেষ করে একজন পাঞ্জাবীর এ ধরনের কথাবার্তা বলা...।

◆ আমি মনে করি এটি যথেষ্ট তাৎপর্যবহ।

∆ আসলে এ বিষয়ে চাপা দেয়ার বিষয়টি বেশ কঠিন। আপনার কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি জানি পরস্পর ক্ষমা চাওয়ার যুক্তিযুক্ত নিখুঁত কারণ রয়েছে। কেননা, ভুল করেছে দুই পক্ষই। সবকিছু জগাখিচুড়ি পাকিয়েছি আমরা এধারে, আপনাদের ওদিকে নয়। তবে এসব আর নয়। শেখ মুজিবুর রহমান জয়ী হয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে, তাঁর কেন আসার দায় থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানে? আমাদের সে তর্কের অবকাশ নেই।

মেরাজ মোহাম্মদ খান

[মেরাজ মোহাম্মদ খান পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্মের মোটামুটি গোড়ার দিকের ছাত্রনেতা, বামঘেঁষা সক্রিয় রাজনীতিক ও ভুট্টোর এক সময়ের অন্যতম রাজনৈতিক সহযোগী। ভুট্টো সরকারের প্রতিমন্ত্রীও হয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় করাচীতে মেরাজের বাসগৃহে।]

◆ জনাব খান, যদিও আমরা আপনার সম্পর্কে জানি, তবুও খানিকটা বিস্তারিত বলবেন কি?

Δ বর্তমানে আমি তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের মহাসচিব। আমি আসলে একজন রাজনৈতিক কর্মী। সবাই আমাকে এ দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর, আমার নিজ দলের ও ভুট্টোর পিপলস পার্টির রাজনৈতিক কর্মী বলে মনে করে। আমার রাজনৈতিক অতীত সংক্ষেপে এ রকম ছাত্রজীবনে আমি ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনে ছিলাম। আমি এনএসএফ-এর সভাপতি ও সম্পাদক উভয় পদেই কাজ করেছি। পাকিস্তানে বহু রাজনৈতিক দলের সূচনা ও ঐসব আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে আমি ভূমিকা পালন করেছি। বড় ধরনের কিছু আন্দোলন যেমন, তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স বাতিলের আন্দোলন, তিন বছর মেয়াদী আইন কোর্স বাতিলের আন্দোলন এবং মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে একাধিক আন্দোলনে আমি ছিলাম। এরপর আমি শ্রম আন্দোলনে যোগ দিই। তারপর পিপলস পার্টিতে। কিছুদিন ক্ষমতায় থাকার পর আমি পিপলস পার্টি থেকে ইস্তফা দিই। এরপর আমার কারাবাসে কাটে ৪ বছর। ওরা আমায় জেলে পাঠায়। ১৯৭৭-এ কারামুক্তি। তখন আমি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে আমার বহু সহযোগীকে নিয়ে এমআরডি (মুভমেন্ট ফর রেস্টোরেশন অব ডেমক্র্যাসি) বা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন শুরু করি। এ আন্দোলন ছিল সামরিক আইন বা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। তখন আমার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল কওমি মাহায-এ-আজাদী। আগেই বলেছি, আমি এখন রয়েছি তেহরিক-ই-ইনসাফ-এ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মহিউদ্দিন আহমেদ, মুনতাসীর মামুন ও আফসান চৌধুরী

◆ একাত্তরে যেসব ঘটনা তখন পূর্ব পাকিস্তান ও আপনাদের এ অঞ্চলে ঘটে সে সম্পর্কে আমরা আপনার ধারণার কথা জানতে চাই। জানতে চাই, কেন ওসব ঘটল বলে আপনি মনে করেন, কেমন করে ঘটল সে সম্পর্কে আপনি আমাদের বলুন।

∆ সত্তরের নির্বাচন ও তার পরবর্তী ঘটনাবলীকে আমরা অনেকে অনেকভাবে দেখি। আমারও একটা ধারণা রয়েছে। পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নির্বাচনে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন তাঁরা ছিলেন জনমতের প্রতিভূ। তাঁদের অনেকেই বড় মাপের নেতাও ছিলেন। তবে আমার চোখে যেসব ইস্যুর ভিত্তিতে, যে সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে মানুষ সেদিন তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেছিল সে সব বিষয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার দৃশ্যপটের আলোকে আমার তো ধারণা যে, ওখানকার মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। আর নির্বাচনে সামগ্রিকভাবে জয়ী হয়ে এসেছে এই দলের প্রার্থীরাই। আওয়ামী লীগ ছিল একটি লোকায়ত দল, তারা ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচী দেয়। তাদের এ কর্মসূচীতে ছিল সর্বাধিক আর্থ-স্বশাসনের দাবি, যাকে বলা যায় মধ্যপন্থী পররাষ্ট্রনীতি, সেই জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে তাদের ছিল আস্থা। অনেকটা এ দৃষ্টিতেই দেখা চলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকেও। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছিল সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে প্রধান রাজনৈতিক দল। লোকায়ত সংগঠনও বটে এ দলটি। দলটি সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী, গণতন্ত্রমনা ও শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার আদায়ে সংগ্রামী হিসাবে চিহ্নিত। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে প্রাধান্য ছিল পিপলস পার্টির। এই দল তখন দেশের নানা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলতে থাকে, এ দল ছিল আপাত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদবিরোধী, ভাবভঙ্গিতে গণতান্ত্রিক আর সাধারণভাবে লোকায়ত। সত্তরের নির্বাচনে পাকিস্তানের ভোটাররা এ সব কথা মনে রেখেই ভোট দেয়। মূলত ঐসব রাজনৈতিক দল পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বলতে যাদের বোঝায় তাদের ভোটই পায়। এসব দল সাধারণভাবে স্বায়ত্তশাসনেও বিশ্বাস করত। তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো প্রধানত তিনটি বড় ভাগে বিভক্ত। আমার যতদূর মনে পড়ে—এক. পূর্ব পাকিস্তানে ছিল একটি বড় ভাগ, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে ছিল দ্বিতীয় ভাগটি যেখানে প্রধান ভূমিকায় ছিল ন্যাপ, আর তৃতীয় ভাগটি ছিল পিপলস পার্টি—পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল ছিল। যেমন, দুটি দলই স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। এ দুই দলই ছিল লোকায়ত ও সাধারণভাবে জোটনিরপেক্ষতামূলক পররাষ্ট্রনীতিতে আস্থাবান। দেশের ভিতরের বিরাজমান অবস্থার পরিবর্তন কামনা করছিল এই দুই দল। তারা সাম্রাজ্যবাদ খতম দেখতে চাচ্ছিল। আর দুই প্রদেশে প্রধান রাজনৈতিক দল পিপলস পার্টিও এসব চাচ্ছিল। তবে একথা ঠিক, ওদের জোব্বার ভিতরে আসলে কী ছিল তা বলা যায় না। জনাব ভুট্টো বাস্তবে কী করতেন আর বলার সময় কী বলতেন সেটি স্বতন্ত্র বিষয়। ঐ সময়কার বনেদী শাসক মহলে নীতির প্রশ্নে একটা ঐকমত্য ছিল বলা যায়। কেননা আমি দেখেছি যে, তারা ঐ সব বিষয় বরদাশত করতে তৈরি ছিল না। কেননা, ঐ সময় আমার কিছু কাগজপত্র পড়ার সুযোগ হয় যেগুলোর প্রণেতা ছিল একটি বিশেষ গুপ্ত স্বতন্ত্র সংস্থা। তাদের ধারণা ছিল না যে, ভুট্টো পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে অমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন। তাদের ধারণা ছিল, এ রকম কিছু একটা করতে হলে তাঁর লোকজনকে অনেক সময় নিয়ে, দীর্ঘ এক

কাল পরিক্রমায় সে শক্তি অর্জন করতে হবে। ন্যাপও যে এতটা মাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে সে কল্পনাও তারা করতে পারেনি। আওয়ামী লীগের ব্যাপারে তাদের সাধারণ ধারণা ছিল যে, দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে ঠিকই তবে সেই সাথে তারা গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে অন্য দলগুলোকে টাকা-পয়সাও দেয়। এর লক্ষ্য ছিল, আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যাপকতা যদি এভাবে কিছুটা হলেও ছেঁটে দেওয়া যায় তাহলে ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসলেও শক্তিতে তা অতখানি অদম্য হয়ে উঠতে পারবে না। এ ছিল ওদের বড় গেম প্ল্যান। অনেক কিছুতেই তারা ওপরে ওপরে সায় দিলেও মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বছরের পর বছর দলীয় কর্মসূচী বা নীতি বাস্তবায়নে কিছুই করেনি। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি তারা মেনে নেয়নি। সামন্তবাদবিরোধী কথাবার্তা শুনতে কিংবা জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির জন্যও তারা তৈরি ছিল না। ১৯৬৫ ও একাত্তরের যুদ্ধে আমাদের গোটা জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। কেউ সেদিন বাইরে থেকে আমাদের কোন সাহায্য-সমর্থন তো দেয়নি বরং কোমর বেঁধে অনেকে আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। তবে যেসব বিষয় ওরা একেবারেই বরদাশত করতে তৈরি ছিল না তা ছিল ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়নের পদ্ধতি সম্পর্কিত। ওরা ফেডারেশনকে ইউনিটারি পদ্ধতির মতো করে বরাবর পরিচালনা করতে চাচ্ছিল। তাদের আরও ধারণা ছিল যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলোর সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি যদি তারা করে, তাহলে জাতীয় স্তরে ফেডারেশন ইউনিটের সম্পর্কের সুতার বাঁধন আরও ঠুনকো হয়ে যাবে—ক্ষমতা আরও নিম্নগামী হওয়ার কারণে। সেটি হলে ক্ষমতা বা ক্ষমতার আধার বুনিয়াদি স্থাপনা তাদের হাত থেকে ফসকে যাবে। আমি মনে করি, সেটিই ছিল আসল কথা আর সে জন্যই তাদের কথা ঐ রকমের। তারা এ ক্ষেত্রে যে অবিশ্বাস-চক্রান্তের মনোভাবে আক্রান্ত সে জন্য ইয়াহিয়া খান মনে করেছেন, তাঁর তো ওদের সাথে কথা হয়েছে। ভুট্টোর সাথেও তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু ওদের মনে ছিল তখন অন্য ভাবনা। কেননা, ইয়াহিয়া খান যদি প্রেসিডেন্ট হয়ে যান, আর শেখ মুজিবুর রহমান যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হন তাঁরা দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বা রাখতে পারবেন। সেনাবাহিনী ঐ অবস্থায় জরুরী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য থাকবে বটে কিন্তু ক্ষমতা থাকবে না। এ কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান সফরে গিয়ে ইয়াহিয়া খান যখন শেখ মুজিবের সাথে বৈঠকের পর বললেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানই হবেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী তখন ত্বরিত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ভুট্টো বললেন, সেটি হবে না, কেননা পাকিস্তানে রয়েছে তিনটি পক্ষ—পিপলস পার্টি, আওয়ামী লীগ আর সেনাবাহিনী। এ তিনের মধ্যে সাব্যস্ত হতে হবে ওটা।

◆ আপনি কি মনে করেন ভুট্টোর এ রকমের ধ্যান-ধারণা সঠিক?

∆ আমি মনে করি, ভুট্টোর এ ধরনের চিন্তাভাবনা ঠিক ছিল না।

◆ গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় তো সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, যার পক্ষে জনসমর্থন সবচেয়ে বেশি, তারই ...।

∆ গণতান্ত্রিক ধারণায় তাঁর এ ধরনের মনোভাব ঠিক নয়। আমার ধারণা, মনে মনে ভুট্টো শক্তিশালী কেন্দ্রে বিশ্বাসী ছিলেন। আমরা যখন দল গড়ি সেই গোড়ার দিকে এক ইউনিট

নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকি, প্রশ্নটির গুরুত্ব নির্ধারণে নিয়োজিত হই তখন থেকেই আমার ধারণা যে, ভুট্টো ক্ষমতার প্রভূত কেন্দ্রায়নে বিশ্বাস করতেন।

◆ ভুট্টো সাহেব ক্ষমতার প্রভূত কেন্দ্রায়নে বিশ্বাস করতেন?

∆ ভুট্টো সাহেবই তো। তিনি এতে বড্ড বেশি বিশ্বাস করতেন। আর সেজন্য আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি, ভুট্টোর ধারণা ছিল, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় ঘটতে যাচ্ছে তা ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়নের পাঁয়তারা। আর এখানে যদি সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের রাজনৈতিক শক্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যৌথ সমর্থন যুগিয়ে শক্তির দিক থেকে ওপরে উঠে যায়, সে আশঙ্কায় ভুট্টোর আর তর সইল না। তাঁর ধারণা হয়, তেমন ক্ষেত্রে তাঁর আর ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। ক্ষমতার রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি এমন ধারায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন ঘটে যায় তাহলে তাঁর ক্ষমতায় আবির্ভাবের সম্ভাবনা বহু দিন পিছিয়ে যাবে।

◆ আমি এখানে আরও একটি প্রশ্ন করব আপনাকে। তাঁর যদি এ ধরনের চিন্তাভাবনা থেকেই থাকে তবু আপনি তো তখন আপনার পিপলস পার্টির ওপর তলার নেতাদের সাথে এক আপোসরফায় পৌছানোর জন্য অনেক আলাপ-আলোচনাই করেছিলেন। আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোর ছয় দফা নিয়েও আপনাদের আলোচনা চলছিল। এ নিয়ে আপনাদের দলীয় পর্যায়ে যুক্তিতর্কও নিশ্চয়ই হয়েছে সমঝোতা ও রফার প্রশ্নে। আপনারা হয়তবা ছয় দফায় কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করে থাকবেন সংশ্লিষ্ট তরফের কাছে। আর দু'তরফকে এসব যুক্তিতর্কের বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসে আপনাদের তরফে এমন ঘোষণাও দেয়া হয় যে, ৬ দফার সোয়া ৪ দফা নিয়ে কোন মতপার্থক্য এখন আর নেই তবে বাকি পৌনে দুই দফা নিয়ে এখনও মতপার্থক্য রয়ে গেছে। ওরা দরকষাকষি করছিল, দরকষাকষি করা দরকার শুধু সে মতলবেই কি? গণতন্ত্রে তো এমন কোন নজির নেই, এমন কোন ঘটনা নেই যে আগে দরকষাকষি করতে হবে; অথচ ভুট্টো সেটিই করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে খোদ পিপলস পার্টির ভিতরে এ ব্যাপারে কী অভিমত ছিল, আপনাদের দল এ নিয়ে কী ভাবছিল—এ হলো একটি প্রশ্ন। আর এর সাথে আরও জানতে চাইব, কিছু কিছু লোকের এ রকম এক ধরনের মনোভাব তখন ছিল যে, আরে পূর্ব পাকিস্তান তো নিহায়ত দায়বোঝা হয়ে উঠেছে কাজেই সে যদি আমাদের সাথে না-ই থাকে, ভালই তো। আগেভাগেই ওটাকে আলাদা করে দেয়া দরকার। কেননা, এ ধরনের চিন্তাধারার কিছু লোক আরও ভাবতে থাকে যে, আপনারও বোধ করি অজানা নয়, নির্বাচনের পরবর্তীকালে এ ধরনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। এ দুই প্রশ্নে... ?

∆ আমি তো একবারের জন্য হলেও বলব যে, ভুট্টো খুবই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি। তিনি সহজে তাঁর নিজের কথা অন্যের কাছে বলতেন না। দলের কোন কোন ব্যক্তির এমন ধারণা ছিল যে, ভুট্টো ভিতরে ভিতরে ক্ষমতার কেন্দ্রায়নে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই ভুট্টোর জন্য ক্ষমতায় একটা ভাগ পাবার মওকা এলেও শেখ মুজিব আবার ক্ষমতার ভাগাভাগিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কেননা, প্রশ্ন ছিল ক্ষমতার নিম্নাভিমুখী প্রবাহ ও বন্টনের, যা নিয়ে রসুলবক্স তালপুর, জে এ রহিমের মতো ব্যক্তি কথা

বলছিলেন কিন্তু সে আলোচনার অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। এ বিষয়ে তাঁরা অনেক বেশি সচেতন থাকলেও পাঞ্জাবের নেতাদের—যাঁরা ছিলেন তাঁদের মাঝে—এই চেতনা ছিল না।

◆ রফি রেজা এ রকমই অনেকটা লিখেছেন, তাঁর সাথে এ নিয়ে কথা হয়েছিল কি?

▲ রফি রেজা আমাদের সমঝোতা কমিটিতে আসেন,.... আমাদের দল...

◆ তা তাঁর একান্ত মত কী হতে পারত?

▲ তিনি তাঁর বক্তব্য দেন কিছুটা পরে... আর তার আগেই আমাদের কমিটির আলোচনা এগিয়ে যায়... একেবারে শেষ বেলায়...।

◆ আমরা তো এ জন্যই প্রশ্ন করছি যে, তিনিও তো একটি বই লিখেছেন, সেটি প্রকাশিত হয়েছে...?

▲ জ্বি, তিনি ১৯৬৯-৭০ মেয়াদে এখানকার মানে করাচীর সভাপতি ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে সামরিক আইন জারি করা হয়। তিনি তখন এখান থেকে চলে যান। আমাদেরকে তখন এখানকার পরিস্থিতির সামাল দিতে হয়। তবে রফি রাজাও মনে করতেন যে, ক্ষমতার নিম্নমুখী বণ্টন বা প্রবাহের ন্যায়ত কোন বিকল্প নেই, এর বিরোধিতা চলে না। তিনি এ রকমটাই বুঝতেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁর দুর্বলতা ছিল এই যে, তিনি জনাব ভুট্টোর সামনে কথাগুলো যথেষ্ট জোর দিয়ে বলতে পারতেন না। আমরাই শুধু খুব জোর দিয়ে কথা বলার সাহস রাখতাম ভুট্টোর মুখের ওপর। আর আমাদের অভিমত ছিল এই যে, তোমাদের ধারণা এ রকম। ভুট্টোর ধারণা আবার সে রকম নয়। এ দিকে আমরা আমাদের দলীয় সংগঠনের ভিতরে এ কথার ওপর জোর দিয়েছিলাম যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব মেনে নেয়া যায়। কিন্তু ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত ঐ ধারণা নাকচ করে দিলে তখন পিপলস পার্টি প্রকাশ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, এই হতে হবে, সেই হতে হবে—এমন দাবি তোলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে যখন সঙ্কট দেখা দেয় ও শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসে তখন আমাদের ধারণা হলো যে, ভুট্টো সাহেব হয়ত এখন মনে মনে ভাবছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে আমাদের রাষ্ট্রকাঠামোয় পরিবর্তন আসবে, আরও অনেক কিছু ঘটবে। আসলেও এসব জল্পনা-কল্পনা তখন চলছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সময়ে কোন সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই ওরা ক্ষমতায় এলে এখানে একটা বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার হতে পারে। এ কারণে জনাব ভুট্টো মনে করতে থাকেন, অবস্থা যদি তেমন দাঁড়ায় তাহলে ক্ষমতার মঞ্জিলে পৌঁছতে বহু দেরি হয়ে যাবে, গদির জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে দীর্ঘকাল। এ জন্য ১৯৭০-এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠক লাহোরের সারওয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে এই ইস্যুর ওপর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় যে, আমরা ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কট করব কি করব না। ওখানে আমরা মত প্রকাশ করেছিলাম, বয়কট না করাই ঠিক হবে। ফলে অনেকটা একাকী ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার অবস্থা হয় আমার। তবে আমরা তখন এ কথাও জোর দিয়ে বলেছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান আমাদের সাথে থাকবে না। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার যে মূল্যায়ন ছিল তাতে আমার ধারণা হয় যে, আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে এতই বৈরী করে তুলেছি, তাদের প্রতি বছরের পর বছর

এতই উপনিবেশসুলভ আচরণ করেছি যে, এ ব্যাপারে তাদেরকে সমঝোতায় আসতে বলার মতো নৈতিক অধিকারটুকুও আমাদের নেই। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোন উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতেও তাদের ন্যায্য হিস্যা দেয়া হয়নি। এ জন্যই আমাদের অত্যন্ত জোরালো মত ছিল এই যে...।

◆ তা এ সব ব্যাপারে এই যে বোধোদয় তা কেমন করে সম্ভব হলো বলতে পারেন? বামপন্থী নেতাদের সাথে তো আপনাদের কথাবার্তা হতো! তাতেই কি...?

∆ জ্বি! রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী—এঁরা আমাদের ওখানে তখন যেতেন। আমি তখন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সভাপতি ছিলাম। আন্দোলনের সচিব ছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের কাছে আমাদেরও যাতায়াত ছিল। আওয়ামী লীগের লোকজনের সাথেও সালাম, কুশল বিনিময়, দোস্তি আমাদের ছিল। তবে আমাদের অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল মওলানা ভাসানীর সঙ্গে। ভাসানী ও ওয়ালি খানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলাম আমরা। আমাদের সাথে যখন পূর্ব পাকিস্তানের নেতা-কর্মীদের সাথে যোগাযোগ ছিল তখন আমি দু'বার পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছি কিছুদিনের জন্য। একবার গিয়েছি জনাব ভুট্টোর সঙ্গে, আরেকবার নিজে আলাদাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের লোকজনের সাথে ওঠাবসা ও ভাব বিনিময়ের জন্য। তাছাড়া, এখানকার কিছু লোকও ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হয়েছিল, তাদের সাথে দেখা করারও এ ছিল এক সুযোগ। তখন আমার ওখানকার শ্রমিক-কিষান, শহরবাসী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করার সুযোগ হয়েছে। তাতে আমি জেনেছি, মোটামুটি তাদের মতামত কী। আমি যেবার ভুট্টো সাহেবের সাথে যাই সেবার দেখি ওখানে পুরোদস্তুর এক বিদ্রোহ চলছে। সেদিন ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের বাইরে মশালের উজ্জ্বল আলোয় আমরা দেখতে পাই মানুষের মিছিল থেকে স্লোগান উঠছে। আন্দোলনকারীরা তখন একের পর এক কর্মসূচী দিয়ে চলেছে। কথার শোরগোল চলছে, আলোচনা চলছে। ওদের বক্তব্য আমরা তো সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ সব থেকে আমার অনুমান করতে অসুবিধা হলো না—আমার সম্মুখে অতীত, অতীতের ইতিহাস, পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যা কিছু হয়েছে, হলাহল বা ফলাফল যা-ই বলি, এ সবই যেন জীবন্ত মিছিলে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে অতীতে যে আচরণ ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা তাদের কাছে হস্তান্তরিত না হওয়ায় দেশের দু'টি পাখার এক অঙ্গে গেঁথে থাকার প্রশ্ন তামাদি হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, উপমহাদেশের এ অঞ্চলের দৃশ্যপটে তখন যে ধরনের আঞ্চলিক রাজনীতির 'মাদারির খেল' অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুগান্তরিত বিবাদ-বিসম্বাদের পটভূমিতে, তা থেকে পুরো ফায়দা তুলে নেয় ভারত—যার চূড়ান্ত ফল হিসাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠে—পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবে। কীটদষ্ট পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ ঘটবে। বস্তুত এ ধরনের অভিমত খুবই জোরদার হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই আমরা পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঐ অভিমতের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। এ রকম এক ধারণার ভিত্তিতে ভুট্টো একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র বানাচ্ছিলেন, সেটি বোধহয় আমাদের খুঁজে দেখা দরকার। দলের কিছু লোক আমার অভিমতের প্রথমে বিরোধিতা করার পর আমাকে পরিশেষে সমর্থন করে। জে. রহিম পর্যন্ত ভুট্টোকে সমর্থন জানান। একান্তপক্ষে

একটা ফেডারেশনের কথা ভাবা যেত কিন্তু কমিটিতে মত প্রকাশ করা হয় যে, এমনি ধারা সব কিছু হলে আর যাই হোক ফেডারেশনও চালানো যাবে না শেষ পর্যন্ত। এভাবে কিছু চলে না। কেননা, বেশিরভাগ লোকই ওখানকার আলাদা কারেন্সি, টাকার কথা বলছে অথচ আলাদা করে একাধিক কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক—সে তো সম্ভব নয়; দেশ ভাগ অনিবার্য। গোড়ার দিকে এ বিষয়ে জে. রহিমের দোদুল্যমানতা ছিল, একমত হতে পারছিলেন না। কিন্তু আমাদের কথা ছিল, এ জন্য দরকার বিশাল, শালপ্রাংশু নেতৃত্বের, মহৎ বিনয়ী চারু হৃদয়ের, আর সমস্যা মোকাবেলার... যার অস্তিত্বই ছিল না। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পরের দিন, কী বার ছিল আমার মনে পড়ে না, সেটিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল সারওয়ারিতে। সম্ভবত সেদিন ছিল ২৪ কিংবা ২৫ ফেব্রুয়ারি। খুব বড় আকারের সভা ছিল সেটি। ঐ জলসায় ভুট্টো...

◆ ভুট্টোর ঐ সভা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি..।

∆ জ্বি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ছিল জনসভার দিন। জনসভাটি হয়েছিল মিনার-ই পাকিস্তানের পাদদেশে। আর ২৭ তারিখে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক।

◆ না, বৈঠকটি হয়েছিল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে।

∆ আমি ঐ সভায় যাই অতিথির ভাষণ দিতে, সেখানে আমি থাকিনি। তাঁরা বলেছিলেন যে আমিই সভার কার্যসূচী চালিয়ে নিতে পারি। আসলে ২৮ ফেব্রুয়ারিতেই ছিল জনসভা, আর তার পরের দিনই ইয়াহিয়া খান ঢাকায় নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেন। তাদের যে তকলিফটুকু করতে হয় ঐ সভায় তা হলো, সভামঞ্চের ওপর বসে থাকা আর সভার বক্তাদের কথা শোনার পর তশরিফ উঠিয়ে ঢাউস আকারের বিবৃতি দান করা। আরও বহু লোক ছিল সভায় যাদের সাথে আমার মতের মিল না হওয়ায় তাঁরা মঞ্চ থেকে নেমে শ্রোতা আম-জনতার মাঝে গিয়ে বসে পড়লেন। তাঁদের বক্তৃতায় সেনাবাহিনীকে মদদ যোগানোর আহ্বান জানানো হলো। লাহোরেও অনুরূপ বক্তৃতা দেয়া হলো। বলাবাহুল্য, লাহোর তথা পাঞ্জাবের বহু লোকই ছিল সেনাবাহিনীতে। রিক্রুটও হতো এ প্রদেশ থেকে প্রচুর—হাবিলদার, এনসিও থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন, মেজর, জেনারেল পর্যন্ত। আর তাই বেশিরভাগ পরিবারেরই ফরজ হয়ে ওঠে সেনাবাহিনীকে জবরদস্ত সমর্থন যোগানো। লাহোরে এ ধরনের জনমত সংগ্রহমূলক সভা ডাকা হয় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কোন রকমের আপোসরফার বিরুদ্ধে। সেনাবাহিনীর একটি অংশ এ ধরনের মীমাংসায় পৌঁছতে প্রয়াসী—এ রকম আশঙ্কা ছিল তাদের। আমার অনুমান ইয়াহিয়া খানকে প্রেসিডেন্ট করার বদলে এ ধরনের রফা হতে পারে বলেই এ আশঙ্কা দেখা দেয়। এ ছিল তখনকার অভিমত। তাই যে সব মহল সেনাবাহিনী নিয়ে ভাবত তাদের ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, কারণ বিরোধ-বিসম্বাদের সময় এটি নয়। তারা ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করার, রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার...

◆ **এ কথা বলছেন আপনি...?**

∆ **এ হলো আমার ধারণা, আমার মূল্যায়ন।**

◆ আপনি কথাগুলো বলছেন যেহেতু পূর্বাপর ঘটনা আপনার কাছে পরিষ্কার ছিল, নেপথ্য প্রেক্ষাপট ভেবে দেখেছেন বলে?

∆ না, না, তা কেন? তখনই আমি এ সব বুঝতাম যদিও এ কথা আমার বোধগম্য ছিল না যে, ভুট্টো যদি অতদূর পর্যন্ত যায় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানই ভেঙে যাবে। বিষয়টি আমি অনুমান করতে পারিনি। তিনি ওয়েস্টমিনস্টার টাইপের ক্ষমতার রাজনীতি করছিলেন, আর এ ক্ষমতার রাজনীতির...

◆ তিনি কি এ কথা কখনও বলেছিলেন যে, আমি বিরোধী দলের আসনে বসতে তৈরি নই? কিংবা এ ধরনের কোন বাকওয়াজ তিনি করেছিলেন কি?

∆ না, তিনি কখনও এ কথা বলেননি। তবে তিনি অবশ্যই এ কথা বলেছিলেন যে, পাকিস্তানে রয়েছে তিনটি পক্ষ বা শক্তি। আর এই তিন পক্ষের সম্মতি ছাড়া ক্ষমতার হস্তান্তর হবে না। আমি নিজে সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক কোন শক্তি বলে মনে করি না। আমি এর বিরোধিতা করেছি। যেহেতু আমাদের দলটি এক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল সেহেতু আমাদের কিছু বক্তব্য ছিল সাফ, খোলাসা, পরিষ্কার। আমাদের কথা, আরে ভাই এই যে শক্তির কথা বলা হচ্ছে ওটা আসে কোন্ সূত্রে? আসলে তো ওটা আমাদের কাঁধে জবরদস্তি চেপে আছে। যদি বলা হয় আওয়ামী লীগ আর পিপলস পার্টির কথা, সেটি বোধগম্য না হবার কিছু নেই। কেননা, ওরা রাজনৈতিক শক্তি, আর ওদের মধ্যে কোন আলোচনা বা যুক্তিতর্ক, দরকষাকষি আলোচনা হলে তাতে আপত্তির কিছুই নেই। এ ধরনের সংলাপ হতেই পারে। বয়কটের যে কথা তোলা হয় তা আপত্তিকর বটে। এ ব্যাপারে ভুট্টো সাহেবের সাথে জোরাল তর্কে অবতীর্ণ হতে পারেনি—সেটি ওদের দুর্বলতা, কমজোরী। আর সে কারণেই ঐ সভায় ওরা সাফ ঘোষণা দেয় যে, যারা ওদিকে পা মাড়াবে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যাবে, তাদের টেংরি আমরা ভেঙে দেব, শের কুচল দুঙ্গা, মাজা ভেঙে দেব। আবার ওদের মুখ দিয়ে অন্য বাতচিৎও বেরিয়ে আসতে থাকে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের উদ্দেশে, সেনাবাহিনীর লোকজনের উদ্দেশে—যার আগে বরাত চিহ্নের মধ্যে এ ধরনের কথা বলা হয়: "হে আরবের কিবলাহ, হে জুমা মসজিদের মিনার, তোমরা জেনে রাখ যেন আমার লাশের ওপর দিয়ে দুই পাকিস্তান হয়।" আর জাতীয় পরিষদের এই যে অধিবেশন ডাকা হয়েছে তা দুই পাকিস্তান করারই আঞ্জাম। এ কাজ করেছে অন্যে। কাজেই এর মাঝে সেনাবাহিনীর প্রতিও এ ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, ও কাজে অংশীদার হয়ো না, পরিষদ অধিবেশন খতম করে দাও। তৃতীয়ত, মুজিবুর রহমানের উদ্দেশেও আবার নানা কথা বলা হয়। যেমন বলা হয় তুমি ওধারে, আমি এধারে... যে কথাবার্তার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় : আমি এখানকার প্রতিনিধি, আর তুমি সেখানকার প্রতিনিধি। কাজেই আমার সাথে কোন একটা সমঝোতায় এসে যাও, যে সমঝোতায় আমারও হিস্যা থাকে, তোমারও হিস্যা থাকে। আমি যদি এখন চাল দিই তাহলে আপনি ক্ষমতায় আসতে পারবেন না, আমাদের ছাড়াও আরও শক্তি রয়েছে। এখন আপনারাই দেখুন, সেনাবাহিনীও তাদের আগের অবস্থান থেকে ক্রমেই সরে আসতে শুরু করে। গোড়ায় তারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করে। তবে আমার অনুমান এই যে, ঐ সময়ে যেসব মহলের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হচ্ছিল তাদের

কথাবার্তায় সেনা শিবিরে হতাশা নেমে আসে। তাদের ধারণা, ক্ষমতা যদি হস্তান্তর না করা যায় তাহলে আসলে হবেটা কী? সেনাবাহিনীর ভিতরে আরও এমন সব মহলের অস্তিত্ব ছিল যাদের ধারণা ছিল যে, এখন কোন রকমের নাজুক কোন ব্যবস্থা না দিয়ে আগে দরকার দেশের জরুরী পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। কিন্তু লাহোরে ভুট্টোর উল্লিখিত সভা অনুষ্ঠানের পর জরুরী পরিস্থিতি আমূল বদলে যেতে শুরু করে। আর আমি এ জন্যই জনাব ভুট্টোর সাথে, ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করতে যাই। তবে সেটি কোন্ সময় তার দিন-তারিখ আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

◆ কিছু রাজনীতিক, কিছু সেনাবাহিনীর অফিসার আমাদেরকে লারকানা পরিকল্পনার কথা বলেছেন। ইয়াহিয়া খান লারকানায় গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে কিছু আলোচনাও করেছিলেন, কিছু নিরীক্ষাধর্মী কথাও বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

Δ আমি লারকানা...

◆ মানে, আমি বলতে চাই, এখন তো আপনি এ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন?

Δ আমি লারকানা পরিকল্পনায় যাইনি, কেবল এক দফা ওখানে গেছি অনেকটা জবরদস্তিক্রমে। তবে পরে আমি আর কখনও যাইনি।

◆ এ সব কথার মধ্যে কি কোন সারবস্তু আছে আসলে? যাদের সাথে আমরা কথা বলেছি, বিশেষ করে জেনারেলদের সঙ্গে, তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা ছিল ক্ষমতা হস্তান্তর করার। কিন্তু সেই যে তিনি লারকানা গেলেন, ভুট্টোর সাথে মিলিত হলেন আর তারপরেই গণেশ উল্টে গেল, ভোল পাল্টে গেল তাঁর নিজের।

Δ কথাটা তাই, তিনি পাল্টে গেলেন, এই বিশ্বাসে যে তাঁকে প্রেসিডেন্ট করা হবে। ভুট্টো করবেন। তিনি হবেন আবারও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।

◆ ওটা তো জানা কথা!

Δ কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে, এ বিষয়ে লারকানা ছিল সর্বশেষ, এর আগে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে ঘটে সেটি পিণ্ডি আলোচনা। আমি নিজেও সে বৈঠকে ছিলাম।

◆ না, না, আরও একটি বৈঠক হয়েছিল...

Δ আর সেই বৈঠকে তিনি...

◆ বৈঠকটি হয় দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঠিক পরেই... জানুয়ারিতে।

Δ আমি একটি লেখা লিখেছিলাম এ বিষয়ে *পাঞ্জাব পয়েন্ট* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। ঐ বৈঠকটি হয়েছিল একটি আমগাছের তলায়, বৈঠকটি ঐ নামেই খ্যাত হয় পত্র-পত্রিকার লেখা অনুযায়ী। আমগাছের তলায় লারকানায় হয়েছিল ঐ বৈঠক। আমি মনে করি বৈঠকটি হয়েছিল...।

◆ আপনি বলতে চাচ্ছেন, আপনার কোন মতলব ছিল না সে সময়ে, যে সময়ে আপনি দেশের ওরকম একটা চিত্র তুলে...।

∆ এরও আগে ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক হয়। ইয়াহিয়া খান এ রকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন ভুট্টোর সাথে। প্রথম বৈঠকটি হয়, আমি আগেই বলেছি, পিণ্ডিতে। ঐ বৈঠকে ইয়াহিয়া গোড়ার দিকে ভুট্টোর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেন। তিনি ভুট্টোকে বলেন, "আমি তোমাকে গ্রেফতার করব। তোমার দলের জন্য ঢের করা হয়েছে। তোমার দল অনেক বেড়ে গেছে, বোলচালে বাড়াবাড়ি করছে। তাই আমি তোমার এই পার্টিকে গুঁড়িয়ে দেব। তোমার পার্টি তো আসলে টি-পার্টি থেকে বেশি কিছু নয়। তুমি মানুষের ক্ষমতা আন্দাজ করতে জান না। আমি তো তোমার বহু পুরনো দোস্ত। তবে যদি কোন রকম গড়বড় কর তো এক রাতে তোমাদের সবাইকে আমি খাঁচায় ভরব।" ওঁরা দু'জনে আমার সামনেই এ ধরনের কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি আর ভুট্টো সাহেব ওখানে গিয়েছিলাম, ইয়াহিয়া খানকে কিছুটা থামানোর চেষ্টা করার জন্য। তবে আমাদের বোঝাপড়া ছিল যে, খুব বেশি ঝগড়াঝাটি করা যাবে না। যদি ইয়াহিয়া সুর নরম না করাই স্থির করেন, কথাবার্তা তো চলতে পারে, যুক্তিতর্কও হওয়া দরকার। ইয়াহিয়া তো আর দল ভেঙে দিতে পারবেন না। কেননা, পিপলস পার্টি তো একটা উপলব্ধিজাত দল, মজদুরের দল, আম-জনতার দল, নির্বাচন বিজয়ী দল। এ দলকে খতম করে দেয়া এতই সহজ! তবে সে যা-ই হোক, পিণ্ডি বৈঠক এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ঐ সময় অবধি ক্ষমতায় সেঁটে থাকার মতলবটি তাঁর নিজের মাথায় ভর করেনি। মতলব ছিলও না তখন পর্যন্ত। আমার যতদূর মনে আছে, ইয়াহিয়া খানের মাথায় তখনও জাতীয় পরিষদের ঐ অধিবেশন না ডাকার কোন খেয়াল আসেনি। তখনও তিনি এ সব বিষয়ে খাঁটি, সাফ কথার মানুষটি। কেননা, তিনি তখনও ভুট্টোর বিরোধিতা করে যাচ্ছিলেন ও বিভিন্ন জায়গা থেকে ডিক্রি, ফরমান ইত্যাদি জারি করছিলেন। আমার ধারণা, এর পরবর্তীকালে সভা-সমিতিগুলোতে জনমত তাঁর পক্ষে পুরোপুরি অটুট করে গড়ে তুলতে শুরু করেন। যেখানেই তিনি জনসভা করতে গেছেন, প্রচার অভিযানে গেছেন, সেখানেই তিনি নানাভাবে সেনাবাহিনীকে চাপের নিচে আনতে চেয়েছেন। তাঁর এ প্রচারণার মনোযোগকেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব। আর এভাবে আস্তে আস্তে ছয়টি জায়গায় বিরুদ্ধ প্রচার চালানো হয়। প্রথমে এ ধরনের প্রচার চালিয়ে জনসাধারণকে, পরে ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীকেও বৈরী করে তোলা হয়, প্রচার শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের বিজয়ী দল ও জনসাধারণের অনুকূলে কোন আপোস-নিষ্পত্তির ধারণার বিরুদ্ধে। তাদের এ সব আলামত দেখে আমি উপলব্ধি করি, ২৮ ফেব্রুয়ারি যে জনসভা হয়েছিল সে জনসভার মতের অনুকূলে ক্ষমতাসীনরা সেদিন ৩ মার্চে নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেয়। কিন্তু সেদিন আমি ঠিক ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি। বসে ছিলাম আমি নিষ্ক্রিয়ভাবে। আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল, কোন পরিকল্পনা হয়ত বা আঁটা হচ্ছে।

◆ কোন্ পরিকল্পনা আঁটা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল আপনার? একটু খুলে বলুন।

∆ মনে হচ্ছিল কেউ যেন...।

◆ কেন, আপনি কি কাউকে এ ব্যাপারে দায়ী করছেন, যে নাকি...?

∆ আমার ঐ রকম মনে হয়েছিল জনাব ভুট্টোর তখন বার বার সফরে যাওয়া লক্ষ্য করে। এছাড়া, আরও লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার ছিল। তিনি আমাকে জানান যে, সমস্যা দেখা

দিতে পারে। কেননা আমাদের দলের তৃণমূল স্তরের লোকজনের সংখ্যা তো বিপুল। কাজেই সে অবস্থায় তাদের তৈরি রাখা। ক্ষমতার হস্তান্তর হতে দেয়া চলবে না। আর যদি সেনাবাহিনী এখানে ক্র্যাকডাউন করে তাহলে আমাদের ঐ লোকেরা তার প্রতিরোধ কী করে করবে সে সম্পর্কে ওদের পরামর্শ-উপদেশ দিতে হবে। কিন্তু ভুট্টোর মনে মনে তো জানাই ছিল, সেনাবাহিনী এমন কিছু করবে না। আর কেনইবা তা করবে? সেনাবাহিনীতে মতদ্বৈধ ছিল। ভুট্টো সেই মতবিরোধকে আরও উস্কে দেন। এদিকে, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঞ্জাবের প্রাধান্য থাকার কারণে এ বিষয়ে কখনও বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। আলোচনা হয়নি গণপর্যায়েও। কেবল আমরা কিছু লোক নেপথ্যে এ নিয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া করতাম। সাধারণভাবে এ নিয়ে তেমন বিচার-বিবেচনা বা আলোচনা হতো না। আমাদের তখন মনে হতো এ বিষয়ে খুব একটা মদদ এখানে কারও কাছে তেমন মিলবে না। বিষয়টা অনেকে বোঝেও না। আর আমাদের তখন এও মনে হয়েছিল, এ নিয়ে একটা বড় রকমের রিএ্যাকশন হয়ে গেছে, আর এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা গড়িয়েছে চরম পর্যায়ে। আমার ধারণা ছিল, একটা বছর হয়ত জুলুমের শিকার হতে হবে আমাদের, আর তারপর এক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হবে, যার আওতায় এক-দুই বছরে ক্ষমতাসীন চক্র—তাদের আপন চক্র নিজ নিয়মে পুরো হলে—এমনও হয়ত দেখা যাবে যে ক্ষমতা আবার আমাদের হাতেই ফিরে এসেছে। আমার তাৎক্ষণিকভাবে একথাও মনে পড়ে যায় যে, ক্ষমতাসীন চক্র খুব বেশিদিন সরকার চালাতে পারবে না। এ হলো এক কথা আর দ্বিতীয়ত, আগাগোড়া নির্ভেজাল নওকরশাহী বা ফৌজশাহী যদি ঐ সরকার হয়ে থাকে তাহলে সেকারণেই তারা ক্ষমতায় খুব বেশি দিন টিকতে পারবে না। অবশ্য, আমাদের এখানে কঠিন ও বড় সমস্যা হলো এই যে, এখানকার সামন্তবাদ অত্যন্ত শক্ত শেকড় গেড়ে আছে।

◆ তা ভুট্টো সাহেবেরও মত কি এরকম ছিল?

Δ জ্বি, মানে...

◆ তাহলে তিনি কি এজন্যে তৈরি ছিলেন না?

Δ উনিতো বলতেন, হাঁ হাঁ, কথাতো ঠিকই। তবে আবারও বলি, উনি খুবই বুদ্ধিমান, চতুর রাজনীতিক ছিলেন, সিধা, সাফ জবাব তিনি কখনও দেননি।

◆ ২৫ মার্চের ব্যাপারে কী বলার আছে আপনার?

Δ ২৫ মার্চে তো তিনি আমার কাছে কিছু করতে অস্বীকৃতি জানালেন। উনি তো আগে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যেতে অস্বীকার করেছিলেন। আমি এ রকম পটভূমিতে তাঁকে বললাম, খবর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আপনিতো এর মধ্যেই বহু দেরি করে ফেলেছেন, ঢের বিলম্ব হয়ে গেছে অধিবেশন বয়কটের কারণে। আর বাস্তবিকপক্ষেও রফি রেজার কথা আমার মনে আছে। কথা ছিল ভুট্টো সাহেব শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাবেন। কেননা তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কট করবেন—এই খবরে ওখানে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে, হাঙ্গামা হচ্ছে।

◆ ৩ মার্চ থেকে?

Δ ৩ মার্চ থেকে। যা হোক, রফি রেজা, ভুট্টো সাহেব—তাঁরা নিজেরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণধী রাজনীতিক। তাঁদের জন্য মিনিটখানেকের মধ্যে একটি তারবার্তার লিপি তৈরি করে পাঠানো কোন ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু ভুট্টো তা করেননি, রফি রেজা অবশ্য তারবার্তার একটি কপি তৈরি করেছিলেন। তারবার্তায় এই মর্মে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল যে, আমরা কথা বলতে চাই, যুক্তি-তর্ক প্রয়োগে সামনা-সামনি পরিস্থিতির চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। যদিও আসলে সে চেষ্টা চলছিল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের হুমকি দিয়ে—ভুট্টো সেভাবে চাপ দেয়ার ভ্রান্ত পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর আমার তো ধারণা যে, রফি রেজা উল্লিখিত টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত আকারের একটি মুসাবিদা তৈরি করেছিলেন। পরে এ বিষয়ে আমার অভিমত আমি ভুট্টো সাহেবকে জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সব তো উল্টোই ঘটছে। আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। আপনি যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা কোন গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নয়। আর এসবের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে এখন ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। কাজটি সত্যিই এখন নিদারুণ কঠিন। যেভাবে ওখানে সেনাসমাবেশ চলেছে, যে আচরণ চলছে ওখানকার জনসাধারণের ওপর, এখান থেকে যে পরিমাণ রসদ, পেট্রোল, ফৌজ পাঠানো হচ্ছে, একটু বুদ্ধি থাকলেই যে কারও কাছে পুরো পরিষ্কার হয়ে যায় এসব কিসের লক্ষণ, মতলবই বা কী এ সবের। আলোচনা যে হবে না, তা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। আর আমি এর আগেই বলে দিয়েছিলাম আমি আর পূর্ব পাকিস্তানে যাব না, কেননা তাতে কোন লাভ হতো না। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য ১৯৭২ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে দেয়া আমার বক্তৃতায় রয়েছে। তাতে আমি বলেছিলাম, আমাকে বলা হয়েছিল, ঢাকা চলো, আমি বলেছিলাম আমি যাব না। আমাকে বলা হচ্ছে সিমলা চলো, আমি বলছি আমি সেখানে যাব না। আমি বলেছিলাম তিনি আমার নেতা, আমি তাঁর নেতা। আমি তাঁকে যে অনুরোধ করেছিলাম তিনি তা রাখেননি। আমার কথা ছিল—কাজের কিছুই করবেন না তো ঢাকায় গিয়ে কী হবে, ওখানে গিয়ে কী করবেন আপনি? তিনি বলেছিলেন, আমার যেসব দোস্ত আছে ওখানে তাদের সাথে মিলে একটা কিছু করব। আমি বলেছিলাম যাই করুন, কাজ হবে না। আপনারা যা করছেন তাতে সেনাবাহিনী ওদেশের মানুষের ওপর যাতে চড়াও হয় অবস্থা এখন সে দিকেই যাচ্ছে। সেনাবাহিনী এখন সেখানে তাদের অবস্থান সংহত করছে। আর আপনার ও আপনার দলের এখন চেঁচামেচির সময় হয়েছে! ঐ সময় অবধি রহিম ভুট্টোর সাথে ছিলেন। যা হোক, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক এ্যাকশন শুরু হয়ে যাবার পর তাঁরা সেখান থেকে ফিরে আসেন। আমি তাঁদের খোশ আমদেদ জানানোর জন্য বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম। বেগম ভুট্টোও গিয়েছিলেন। ভুট্টো সাহেব বিমান থেকে নেমে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে কথা বিনিময়ের সময় বললেন, 'খোদা পাকিস্তানকে রক্ষা করেছেন।' আমি বলেছিলাম যে, এখন কোন মিঞাই পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবে না। তবে ইতোমধ্যে ভুট্টো সাহেব তাঁর গাড়িতে বসার জায়গা করার জন্য ওখান থেকে সরে গিয়েছিলেন, নইলে কথাটা তাঁর কানে গেলে হয়ত আমার গালে চড়ই কষিয়ে দিতেন। তিনি নিজ ঘরে ফিরলে বেগম সাহেবা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন, ওখানে কীসব হচ্ছে? সেনাবাহিনী কী করছে ওখানে? ভুট্টো সাহেবকে ঘরে ফিরে কান ধরে তোবা করতে করতে বলতে শোনা গেল তোবা, তোবা, ওখানে সবাইকে হত্যা, কতল করা হচ্ছে, বহুত

খুন-খারাবি ঘটছে ওখানে। বেগম ভুট্টোও, আমার খুব ভাল করে মনে আছে, সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বলছিলেন, তাহলে পাকিস্তান বাঁচবে কী করে? তিনি একথাও বলছিলেন, যা সব কথাবার্তা হচ্ছে তাতে এভাবে তো পাকিস্তান বাঁচবে না! আমারও তখনকার উপলব্ধি ছিল এই যে, ভুট্টো সাহেবের চাল-চাতুরি বড্ডো বেশি হয়ে গেছে। তবে পরে ভুট্টো সাহেব একথাও আমাকে বলেছিলেন যে, যা হচ্ছে সেটা একটা সামরিক পরাজয়! আর আমি বলেছিলাম— না, এ আসলে এক রাজনৈতিক পরাজয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সামরিক পরাজয়ে। এই সব কপট রাজনৈতিক নেতাদের...।

◆ এ ধরনের বড় বিয়োগান্তক পরিস্থিতিতে ২৫ মার্চের একটা যৌক্তিকতা আছে, যা...।

∆ তাদের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার একটা চেষ্টা ছিল। কেননা ভুট্টো সাহেব ঐ সময়ে বলতে চাচ্ছিলেন যে, ভাই, একটা সময় আমাদের হাতে দাও, সময় তারিখ বেঁধে দাও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্য, আগে আমাদের জন্য তিন মাসের মতো সময়ের ব্যবস্থা করো। তবে এসব যা-ই বলা হোক না কেন, দাল মে কালা কিছু যে ছিল না তা নয়। আমার নিজের ধারণা এগুলো নিছক তাঁদের...।

◆ তা পাকিস্তানে এসবের সাধারণ প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

∆ ভাল নয়।

◆ বিশেষ করে সংবাদপত্রের, যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের সুবাদে?

∆ সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে এর বৈরী প্রতিক্রিয়া হয়। এসব ঘটনাকে লোকে ভালভাবে গ্রহণ করেনি। এখানে সাধারণভাবে কোন রাজনৈতিক দলই স্বস্তির সাথে এসব ঘটনাকে নিতে পারেনি। ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি যেমন এসব মেনে নেয়নি, ধর্মীয় রাজনৈতিক দল মেনে নেয়নি, আসগর খানের তেহরিক-এ ইশতিকলাল গ্রহণ করেনি, মওলানা নুরানি করেননি, এমনকি জামায়াত-ই ইসলামী সব বিপর্যয়ের জন্য ভুট্টোকেই আসামী সাব্যস্ত করে, যদিও এই দলটি সামরিক বাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, অংশীদারী করেছে। তবে মওলানা নুরানি, মুফতি মাহমুদ ও আতাউল্লাহ মেঙ্গল ও গাউস বক্স বেজেঞ্জোর মতো বড় দরের রাজনৈতিক নেতারা যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই সাধারণ অভিমতের বিপক্ষে যাননি। তাঁদের কথা ছিল, এসব ঠিক নয়। তাছাড়া, আমাদের রাজনৈতিক দলের মধ্যেও ধীরে ধীরে এমন সব কথাবার্তা উঠতে থাকে, যার প্রতিপাদ্য ছিল এই—যে প্রক্রিয়া চলছে তাতে গলদ রয়েছে। আর আমার মনে আছে জে. রহিম এই পরিস্থিতির মূল্যায়নমূলক একটি লেখা তৈরি করেছিলেন, তাতে উনি বলেছিলেন, ওখানে সেনাবাহিনীর লোকেরা মানুষ মারছে, ধর্ষণ, লুটপাট, ডাকাতি চালাচ্ছে, লোকজনকে কতলে আম করছে... ফলত জে. রহিমও এ বিষয়ে খুবই বৈরী ছিলেন। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধে শেষ অবধি এই লেখা নিয়ে। তাঁর লেখাটি আগাগোড়া তৈরি করা হয়েছিল পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পড়া হবে বলে। সেটা ১৯৭১-এরই ঘটনা, তবে কোন্ মাস তা আমার সঠিক মনে নেই। মুবাশ্বির হাসানের তাগিদে ওটা বৈঠকে উপস্থাপিত করা হবে এরকম স্থির ছিল, হয়ও। কিন্তু ভুট্টো সাহেবের ওটা চোখে পড়তে মহা খাপ্পা হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, এই কি তোমাদের দলিল নাকি! এ রকম কিছু কি খোলামেলা হয়, আক্কেল আছে তোমাদের? আর এ ব্যাপারে দলের

অনুমোদনও তো নাওনি তোমরা! তোমরা কি আমাদের সেনাবাহিনীর লোকের হাতে খুন করাতে চাও? যা হোক, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ছিল। বস্তুত এ ব্যাপারে জে. রহিমের কোন কসুর ছিল না। আমরাই বরং তাঁর লেখার ফটোকপি করে এখানে-ওখানে চালান করে প্রচার করে দিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভুট্টোকে চাপের মধ্যে রাখা। কিন্তু যা হবার তাই হলো। ভুট্টো সাহেব নারাজ হলেন। তিনি ঐ দলিলের ওপর কোন কথাই বললেন না, জে. রহিমেরও কোন কথা কানে এলো না। আর তারপর থেকে জে. রহিম বদলে গেলেন। তিনি সামরিক বাহিনীর এ্যাকশনের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বলা শুরু করলেন। তিনি বললেন এসব কাজ বন্ধ করো, এসব ঠিক নয়। বসে বসে আলস্যে দেশকে কোন অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এরকম অভিসন্ধি চলতে পারে না। এসব আদৌ ঠিক নয়। দেখুন, ১৯৭১-এর মধ্যে যখন উপনির্বাচনের কথা এলো, তার আগে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের গ্রেফতার করা হলো, তারও পর ডিসেম্বরে যখন উপনির্বাচনের কথা উঠল তার আগে কোয়েটায় আমাদের পিপলস পার্টির এক বৈঠক বসে। আমার মনে পড়ে তখন নভেম্বর মাস, আর ওটা ছিল দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। ঐ বৈঠকে ভুট্টো সাহেব সিদ্ধান্ত নেন যে, আমরা উপনির্বাচনে শরিক হব। কিন্তু সেখানে দলের ভিতর মতভেদ দেখা দেয়। ওখানে আমাদের অভিমত ছিল যে, আমাদের এ উপনির্বাচন বয়কট করতে হবে। বয়কট করতে হবে এ কারণে যে, ট্যাঙ্কের ওপর সেনা বসিয়ে রেখে আর যা-ই হোক নির্বাচন হয় না। এখানে যা হচ্ছিল তা হলো, নির্বাচনী আসনগুলোর বানরভাগ। এ পার্টিকে কিছু ঐ পার্টিকে কিছু—এভাবে বাটোয়ারা চলছিল, অন্যদেরকেও দেয়া হচ্ছিল। ভুট্টো সাহেবের কাছে এ ব্যাপারে আমার মূল প্রশ্নটি ছিল এই যে, 'ভুট্টো সাহেব, ওরা আপনাকে কতগুলো আসন দিচ্ছে? আপনি ওদের সঙ্গে এ আসনগুলো নিয়ে কী রফা করেছেন?' তিনি তার জবাবে বললেন, 'আরে ইয়ার কী যে বলো, ঠিক এরকম কোন কথা হয়নি তবে ঠিক আছে, একটা প্রক্রিয়া, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তো হতে হবে? সামরিক এ্যাকশন তো রুখতে হবে? তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তো শুরু করতে হবে। শক্তি যত কমই হোক না কেন গণতন্ত্রের মাঠে তো থাকতেই হবে, নির্বাচনেও সে জন্য যেতে হবে।' আর তিনি উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশে বললেন, 'আমরা আমাদের কথা তুলে ধরব, আমরা একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে যাব পূর্ব পাকিস্তানে। ওখানে গিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশে বক্তৃতা করবেন, ভাষণ দেবেন মেরাজ মোহাম্মদ খান ও তারিক আজিজ।' আমি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি এ যুক্তিতে যে, ট্যাঙ্কের ওপর বসে আমরা নির্বাচনের সাফাই গাইতে পারব না। পূর্ব পাকিস্তানে একটা অর্থহীন নির্বাচনের পরিকল্পনা রয়েছে সেনাবাহিনীর, তাতে আমরা মদদ যোগাতে পারব না। আমরা মনে করি সামরিক ছত্রছায়ায় নির্বাচন ঠিক নয়। কাজেই এসব কিছু বন্ধ করতে হবে, আমরা এসব পছন্দ করি না। যা হোক, আমরা সেখানে হাজির হয়েছিলাম প্রকাশ্যে ও ঐ বৈঠকে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে আমিই যাব—কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল আমাকে ওখানে যেতে হবে। আমার অস্বীকৃতির পর ঠিক হয় কামাল আজফারকে পাঠানোর, পরে তাকে ও কাসুরীকে সেখানে পাঠানো হয়। সে যা-ই হোক, এরকম একটা পরিকল্পনার আওতায় সেনাবাহিনী ভুট্টো সাহেবকে বলেছিল, পূর্ব পাকিস্তানের ২৫টি আসন আপনাকে দেয়া হবে। আর ইতোমধ্যে যে আসনগুলো আপনার দলের বা

মিত্রদের হাতে রয়েছে সেগুলোর মিলিত ভিত্তিতে আপনার পরিষদীয় অবস্থান এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছবে, যে পর্যায়ে আমরা আপনার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেব। কিন্তু শেষাবধি দেখা গেল ভুট্টো পাঁচটির বেশি আসন পেলেন না। আর তখনই ভুট্টো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তখন আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হলো। বৈঠকও তাঁরা করলেন। আর ঐ বৈঠকে ভুট্টো সাহেব স্বীকার করলেন, কী বলব, মেরাজ আমার দোস্ত, সে-ই আমায় বলেছিল এটা একটা ধোঁকা, ওটার মধ্যে রয়েছে গলদ। ঠিকই বলেছিল সে। ওরা আমাকে ওয়াদা করেছিল ২৫ আসনের আর এখন পাঁচালি পাড়ছে মাত্র পাঁচ আসনের। আমি এসব মানি না। শুধু তাই নয়, তখন থেকে জনাব ভুট্টোর এরকমও মনে হতে থাকে যে, হয়ত আগামীতে সেনাবাহিনী তাঁর ওপরেও চড়াও হবে। সেনাবাহিনী মুজিবকে গ্রেফতার করেছে, এখন ভুট্টোকেও হয়ত ধরবে। এখন সেনাবাহিনী পুরো নিয়ন্ত্রণ তাদের মুঠোয় নিতে চায়। সবকিছু সামাল দিতে চায় নিজেরাই। জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর বোধোদয় ঘটতে থাকে যে, এ ধরনের বহু আপোসের কথাই তো হয়েছে নানা ধরনের রাজনৈতিক কর্মীকে তোয়াজ-তোষামোদ করার জন্য। বলা হয়েছে, ভাই মিলে-জুলে থাকাই তো ভাল, এটা করা দরকার, সেটা করা দরকার ইত্যাদি। কিন্তু আমরা এ ধরনের আলোচনা-বৈঠকে বসলেও কোনরকম পরিবর্তন আমাদের নজরে আসেনি। আমি যদ্দূর লক্ষ্য করেছি, অনেকে বলেছে যে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কটের জন্য ভুট্টো সাহেব দায়ী নন। কিন্তু আমি তো মনে করি, তাঁর দায়িত্ব অনেক বড়, জনাব ভুট্টোর রাজনৈতিক দায়িত্ব তো সবার চেয়ে বেশি!

◆ **ভুট্টোর ভূমিকার কথা বলছেন? এক্ষেত্রে আমার জিজ্ঞাসা জাতিসংঘে তিনি সেই সময়ে গেলেন কী করে? ইয়াহিয়া খান কি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন না তিনি এ জন্য পীড়াপীড়ি করেন, প্রেসার সৃষ্টি করেন?**

Δ না, ঠিক তা নয়। কেননা, গোড়া থেকেই ভুট্টো ইয়াহিয়ার শরিক বা দোসর হয়ে গিয়েছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে খুরশিদ আজিম মিরের বাড়িতে পিপলস পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা হয়। ঐ সভায় সরকারে দলের যোগদানের কথা ওঠে। বলা হয় যে, ঐ সময় সরকারে যোগ দেয়া দরকার। সে সময় ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে আমার যে যুক্তি-তর্ক হয় সেসব কথাবার্তার আলোকে আমার এরকম ধারণা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষ কোন আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা করছে।

◆ **আক্রমণ? কাকে?**

Δ ভারতের বিরুদ্ধে...।

◆ **মানুষের মনোযোগ অন্যত্র সরানোর জন্য?**

Δ জ্বি হাঁ। তাছাড়া আমার যে নানা ধরনের লোকজনের সাথে সম্পর্ক ছিল—যেমন, রাজনীতিক, আমলা ইত্যাদি পর্যায়ের যে ব্যক্তিবর্গের সাথে আমার যে যোগাযোগ ছিল সেসব থেকে আমার ধারণা গড়ে ওঠে যে, এখান থেকেও যুদ্ধের আওয়াজ উঠতে পারে, উঠতে যাচ্ছে। আর এর কোন বিকল্পও ইয়াহিয়ার জন্য ছিল না। তিনি ভুট্টোকেও এ ব্যাপারে একাট্টা করে নেন। আর এ জন্য ইয়াহিয়া ভুট্টোকে নিজের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বানান। বিষয়টি নিয়ে পার্টিতে আলোচনা হয়। দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও এ বিষয়টি ওঠে আলোচনার জন্য।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি ঐ দিন সকালে ওখানে কারও খোঁজখবর করিনি। তবে ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে আমার বড় রকমের ঝগড়া হয়। এখানে বলা দরকার, যা অবশ্য আগেও উল্লেখ করেছি যে, কমিটিতে ছিল পাঞ্জাব লবির প্রাধান্য। তারা ওখানে বসে বসে নানা কথা বলতে থাকে এ নিয়ে। বলে, ভুট্টো সাহেব খুবই কড়া চিজ! খুব ক্ষেপে আছেন তিনি। আপনি কী জবাব দেবেন? এখন কথা হলো আমি না হয় গেলাম। কিন্তু কী বলবেন ভুট্টো? বলার নেই। তিনি তো ইয়াহিয়ার উজির বনতে চাচ্ছেন। আর এ হলো সেই ইয়াহিয়া খান যিনি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক এ্যাকশন চালিয়েছেন। আর সেই সরকারে যদি ভুট্টো যান তাহলে জাতির সামনে আমরা মুখ রক্ষা করব কী করে? কীভাবে আমরা তাদের সাথে থাকব? চলব? ফলে, কমিটির অনেক লোকই সেদিন সরকারে ভুট্টো বা পিপলস পার্টির যোগ দেবার প্রবল বিরোধিতা করে। তারা বলে টেকনিক্যাল দিক থেকেও কাজটি ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু তবুও বাস্তবতা ছিল এই যে, তখন ওখানে আমাদের দলের বহু লোকই ভুট্টোকে রীতিমতো সমীহ করত, তাঁকে মান্য করত। তাদের কথা ছিল, ভুট্টো বড় দরের সফল নেতা। উনি আমাদের কায়েদ-ই-আওয়াম, ফখরে এশিয়া, নাসির-ই-পাকিস্তান, যিন্দা খাস.... কী নয়? এসব কথাবার্তার ইন্দ্রজালে বশীভূত এসব লোক ভুট্টোর কথা মেনে নিত। কিন্তু ঐ দলটিতে কর্নেল খুরশিদ আজিম মিরও ছিলেন। তাঁর বাড়িতেই সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ঘরে বসেই তাঁর সাথে আমার খুব ঝগড়া হয়। বলাবাহুল্য, কর্নেল সাহেব কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। আমি সেই বিতর্কে ইসলাম সম্পর্কিত বিষয় ছাড়াও তাঁকে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলাম যে, এইসব কায়েদ-ই-আওয়াম, ফখরে এশিয়া, নাসির-ই-পাকিস্তানওয়ালা—এদের কথা তো শুনলেন। এখন আমার কথাও তাহলে শুনুন। আমরা যদি আজ সকলে ঠিক ঠিক কথা বলি তাহলে আশা করি আপনারা এর সঠিক ফয়সালা দিতে সফল হবেন। ওঁরা তো বসে বসেই সব করেন। ওঁরা টেলিফোনে আলোচনা করেছেন, নানা বিরোধিতাও করেছেন। কিন্তু একটা ফয়সালায় আসতে পারেননি এই কথার। এখন আমি যা চোখে দেখতে পাচ্ছি তা হলো, পার্টির ভেতরে অগণতান্ত্রিক ভূমিকার কাজ-কারবার শুরু হয়ে গেছে। ভুট্টো কখনও এ জট খুলতে পারবেন না। কথা হলো, ওপরে ওপরে পূর্ব পাকিস্তানে যে বিপর্যয় ঘটেছে তাতে শরিক নেই বলেই সাধারণ লোক হয়ত ভাবে, সেই আইয়ুবী জামানার কাজল তাদের চোখে এখনও লেগে থাকার কারণে জিয়াউল হক ভুট্টোকে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়ান। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, তিনিও তখন ইয়াহিয়ার দোসর হয়েছিলেন, যার কারণে পাকিস্তান ভেঙেছে। তাঁদের কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কবলে পড়েছে, গণহত্যা ঘটেছে, হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আর গোটা দেশের চেহারা সারা দুনিয়ায় কলঙ্কিত হয়েছে। পাকিস্তানের শাসকরা বাংলাদেশে তাদের নিজের ভাইদেরকে ক্ষমতায় শরিক করেনি। আর এরাই একদিন ভারতের জেনারেল অরোরার পায়ে নিজ অস্ত্র সমর্পণ করেছে, নিজেদের সামন্তবাদী ব্যবস্থার হেফাজত করেছে। আর পাকিস্তানকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে, ওরা সাফাই গেয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান যাচ্ছে..., তাদের পদ্ধতি...।

◆ কিন্তু তাহলে এতদিন কেন আপনাদের এ বোধোদয় ঘটেনি, এই যে সামন্ত প্রথা—একে কেন প্রগতিবাদী শক্তিগুলো প্রতিরোধ করেনি? কেন তারা বাগাড়ম্বর করেছে এতদিন?

Λ প্রগতিবাদী শক্তি ছিল ঠিক। ঐ সময় পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল ঠিকই। তারা প্রদেশগুলোর জন্য স্বশাসনের দাবি তুলেছিল। পাকিস্তানের লোক প্রধানত ফেডারেশন পদ্ধতির রাষ্ট্রকাঠামোয় বিশ্বাসী, আর সে কারণেই আজও সিন্ধুর বিচ্ছিন্নতাবাদী লোকেরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থার অনুকূলে ভোট দেয় না। আজও তারা ফেডারেশনপন্থী দলগুলোকেই ভোট দিয়ে থাকে। তারা এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী, আর আমিও একই কারণে মনে করি, সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অনুকূলে ভোট দেয় না। আপনি যদি বেলুচিস্তানের অবস্থা লক্ষ্য করেন তাহলেও দেখবেন, তারা আন্তরিকভাবেই ফেডারেশনে বিশ্বাস করে ঠিকই তবে তারা এ প্রচলিত ফেডারেল ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়। আর সে কারণেই তখনও এ বিষয়ে চেতনা ঠিক এতখানি গড়ে ওঠেনি। যাঁরা ন্যাপের রাজনীতি করতেন, বুঝতেন—তাঁদের মাঝে এ ধরনের অগ্রসর চেতনা ছিল। মুফতি মাহমুদ, আসগর খান প্রমুখ ও তাঁদের দলে এ সচেতনতা ছিল। কিন্তু ভুট্টো সাহেব যে পদ্ধতিতে সমাজের নিচতলার গরিব মানুষের নেতা বনে বোলচালে বাজিমাত করেছিলেন, তাদের তিনি এই দর্শনের কথা জানতে দেননি যে, ক্ষমতার নিম্নাভিমুখী বিবর্তনে ক্ষমতায় যাওয়া উচিত ওপর থেকে নিচে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে একথার ওপর আলোচনা হতো সাধারণ পর্যায়ে। এতে বিতর্ক হতো সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে। এসব সভায় আপোসরফাও হতো। ওখানে মজদুর-শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাও থাকত, ছাত্র থাকত, তরুণ-যুবকদের সাথে যোগাযোগ চলত। এই হিসাবে পাকিস্তানকে সুরক্ষিত মনে হতো, মনে হতো চোখের সুমুখে যেন পাকিস্তানের জবরদস্ত সমর্থকদের দেখতে পাচ্ছি। প্রগতিশীল পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বশীল ছবি যেন ফুটে উঠছে বলে মনে হতো। আর এ কারণেই সে সময় জনগণের চেতনার মাত্রা এমন ছিল না। এ চেতনা ছিল বেলুচিস্তানে, সিন্ধুতে। কাজেই এ চেতনা দেশের এ অংশে জাগরূক হয় তাদেরও পরে। আমি আগেই বলেছি, ঐ চেতনা ছিল বলেই তারা লোকায়ত দলগুলোকে, সামন্তবিরোধীদেরকে ভোট দিয়েছে।

◆ ৬-দফা ছিল স্বায়ত্তশাসনেরই কার্যক্রম। আর আমরা এজন্য কথা বলছি যে, বলা হতো ৬-দফার নেপথ্যে রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ। অথচ ৬-দফায় কোন বিচ্ছিন্নতাবাদ নেই। শেখ মুজিবুর রহমান কখনও তা চাননি।

Λ ওটা আমি আর আপনি বুঝলেও পাকিস্তানীরা সবাই বোঝে না।

◆ তিনি কখনও বলেননি, তিনি...।

Λ ওটা বুঝত বুদ্ধিজীবীরা।

◆ আমি আসলে বলতে চাই, আমরা এখানে অনেক লোকের সাথে আলাপ করেছি। সমাজবিদ, জেনারেল, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, তরুণ প্রজন্মের পাকিস্তানী—এসবই আছে তাদের মধ্যে। তারা আমাদের জানিয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে ২৫ মার্চের পর তখন কী ঘটছে তার কিছুই তারা জানত না। বিষয়টি লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত হই। আমরা শীর্ষস্থানীয় জেনারেল ও পাকিস্তান সরকারের সচিবদের কাছে জানতে চেয়েছি, এটা কেমন কথা যে, সাধারণ লোকের কথা না হয় ছেড়ে দেয়া গেল কিন্তু তাঁরাও কিছুই জানলেন না, ওখানে, পূর্ব পাকিস্তানে, কী ঘটছে! আমি জানতে চাই, আপনিও তাদের মতের পথের পথিক?

Δ না, আমি এ অভিমতের সমর্থক নই।

◆ দ্বিতীয়ত...।

Δ গোটা আমলা ব্যবস্থা, শীর্ষ পর্যায়ের সকল নেতাই প্রতিটি বিষয় জানতেন।

◆ আমি সুনির্দিষ্টভাবে বরাত দেব জেনারেল উমরের। তিনি বলেছেন যে, তিনি একাত্তরের ২৫ মার্চে ঢাকায় ছিলেন, কিন্তু তাঁর জানা ছিল না যে, অনতিবিলম্বে এরকম একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। আপনি মনে করেন তিনি জানতেন এসব?

Δ তিনি পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলেছেন।

◆ এই হলো পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ লোকজনের অবস্থা, তারা আসলেও কিছু জানতেন না। কেননা, সাংবাদিকরা তাঁদের ভূমিকা পালন করেননি। আপনি কি এ কথার সাথে একমত যে, পশ্চিম পাকিস্তানের আম জনসাধারণ কিছু জানতেন না?

Δ পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জানত না, কিন্তু সব জেনারেল, সব শীর্ষ আমলারই জানা ছিল। আমার ধারণা, অনেক রাজনীতিকও জানতেন।

◆ আরেকটি অভিমত প্রচলিত রয়েছে। ওরা বলাবলি করে থাকে, বলে যে, ১৯৪৭ থেকেই ভারত পাকিস্তানকে ভাঙতে চেয়েছে। আর পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু অধিবাসীদের অনেকে ভারতে চলে গেলেও হিন্দু শিক্ষকরা থেকে যায়। তারা পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদেরকে প্রভাবিত করে। আর এ চক্রান্ত চলছিল ২৫ বছর ধরে। পরে ১৯৭১-এ সে চক্রান্ত পরিপক্বতা লাভ করে। তার মানে দাঁড়ায় এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের গোটা মুসলিম জনসমষ্টি কোন না কোনভাবে ভারতের হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে আর তার পরিণতিতেই...।

Δ এ প্রচারণা সেনাবাহিনীর, গোয়েন্দা সংস্থার, কোন কোন রাজনীতিকের, ধর্মীয় দলগুলোর, ডানপন্থী নওয়া-ই-ওয়াক্ত-এর। কিছু জেনারেল, সংবাদপত্রও এ প্রচারণায় শরিক হয়। এ প্রচারণার ফলে বহু লোক এসবে বিশ্বাস করতেও শুরু করে। তবে আমরা এসবে বিশ্বাস করি না। আমি তো সব সময়ই বলি, হিন্দু শিক্ষকরা ওদেরকে বদলে দিয়েছে কিন্তু ওরা তো তোমাদেরই ভাই—তোমরা কী করেছ?

রো য়ে দা দ খা ন

[রোয়েদাদ খান পাকিস্তানের প্রথম ব্যাচের সিএসপি। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন পাকিস্তানের তথ্য সচিব। পরবর্তীকালে মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তথ্য সচিব হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর পর তিনি ১৯ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় আসেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ ও তৎপরবর্তী সময়ে কিছুকাল তিনি ঢাকায় ছিলেন। সেই আলোকেই তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হয় ইসলামাবাদে তাঁর বাসভবনে।]

◆ ১৯৭০ সালে আপনি ছিলেন তথ্য সচিব। সে সময়কার কথা কিছু বলবেন?

Δ ১৯৭০-এ আমি পাকিস্তান টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলাম। টেলিভিশনে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের কভারেজ সংগঠনের দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। এ কাজটি ছিল পাকিস্তান টেলিভিশনের জন্য প্রথম নিরীক্ষামূলক প্রয়াস। আমরা এ নির্বাচন, নির্বাচনকালের কার্যপ্রণালী, ঘটনাপ্রবাহ ও নির্বাচনের ফল কভার করার সিদ্ধান্ত নিই। স্থির হয়, চট্টগ্রাম থেকে করাচী-পেশোয়ার অর্থাৎ গোটা পাকিস্তানের নির্বাচন কভার করা হবে। এ ধরনের কাজে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। তদুপরি আমাদের দেশে টেলিভিশন সম্প্রচার তখনও ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। এজন্য এ ধরনের প্রকল্প হাতে না নেবার জন্য আমাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। তবে অত্যন্ত সুখের বিষয়, টেলিভিশনের সবাই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখে। আমরা শেষাবধি একটানা ৩৬ ঘণ্টা ধরে সফলভাবে ১৯৭০-এর নির্বাচন কভার করতে সক্ষম হই। আমরা চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, পেশোয়ার, কোহাটের মতো প্রত্যন্ত, দূরবর্তী এলাকা থেকেও নির্বাচনের ফল দর্শকদের জানাতে সক্ষম হই। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ রেডিও না শুনে টেলিভিশনের ওপরই নির্ভর করেছে। কাজটা আমাদের জন্য ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, আর কাজটি করতে পারার জন্য আমরা অত্যন্ত গৌরববোধও করেছিলাম সেদিন।

তখন সামরিক শাসনামল, তবু আমার মতে, নির্বাচন ছিল সবচেয়ে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুন্দর ও পক্ষপাতমুক্ত। সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

কোন রকম হস্তক্ষেপ করেনি। আমাদের পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হয়েছে। নির্বাচন প্রচার করার সময় একটি বিষয় আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। আর সেটি হলো, আমরা সেদিন আমাদের কর্মপরিকল্পনার ধারণাটির অনুমোদন অটুট ও অপরিবর্তিত অবস্থায় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছিলাম। আমাদের কাছে সেদিন কোন দিকনির্দেশনা ছিল না, কোন রকম আদেশ-নির্দেশও দেয়া হয়নি। কীভাবে নির্বাচনী ঘটনাবলী কভার করতে হবে না হবে, কাকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে না হবে তার কোন পরামর্শও আমরা পাইনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। আর সে কারণে ভাষ্যকাররা নির্বাচনের ফলাফলের ওপর সেদিন মন খুলে তাঁদের মন্তব্য, টীকাভাষ্য করতে পেরেছেন। তাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন অমুক কেন পরাজিত হলেন, কোন্ কোন্ শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করেছে ইত্যাদি। আর সেটিই ছিল কাম্য। এই নির্বাচনে কী হচ্ছে না হচ্ছে প্রত্যক্ষ করার জন্য এসেছিল বিবিসি থেকে এক পর্যবেক্ষক দল। ঐ সময় তাঁরা আমাদের সাথে ঘুরেছেন, দেখেছেন সবকিছু। তাঁরা দেখেশুনে চমৎকৃত হয়েই দেশে ফেরেন। আর তারপরই *লন্ডন টাইমসে* ছোট একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, পাকিস্তান টেলিভিশন যুগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ১৯৭০-এর নির্বাচনের দিনগুলোতে। আর আমরা তাতে অত্যন্ত গৌরব বোধ করেছি। আমার এক ভাই এ নির্বাচনে সীমান্ত প্রদেশে পিপলস পার্টির টিকিটে অন্যতম নির্বাচনপ্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও প্রকারান্তরে ছিলেন এ নির্বাচনের একজন পর্যবেক্ষক। বলা দরকার এই প্রদেশটিতে তিনিই একমাত্র পিপিপি প্রার্থী যিনি জয়ী হন, আর সব পিপিপি প্রার্থী এখানে পরাজিত হন। তাই এ নির্বাচন ছিল আমাদের দৃষ্টিতে এক বিরাট ঘটনা। আর এ জন্য আমরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করেছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম, এ ঘটনা আমাদের দেশের জন্য শুভ হবে।

নির্বাচনের পর আমি ছিলাম করাচীতে। সেখানে এক টেলিফোন-বার্তায় আমাকে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট আমাকে তথ্য সচিব নিয়োগ করেছেন। আমাকে এই পদের দায়িত্বভার বুঝে নিতে হবে সয়্যুদ আহমদের কাছে থেকে। আমি রাওয়ালপিণ্ডিতে আসি। সেখানে তিন দিন থাকার পর আমাকে ঢাকায় যেতে বলা হয়। সম্ভবত আমি ১৯ মার্চ বিমানে ঢাকায় পৌছি। বিমানবন্দর থেকে আমাকে সরাসরি সেনাবাহিনীর রেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়।

এখন আমি ১৯৭১-এর কথা বলছি। তখন কয়েকদিন যাবত, আমার অনুমান ৫/৬ দিন যাবত, ঢাকায় ছিলেন ইয়াহিয়া খান, ছিলেন সিজিএস জেনারেল পীরজাদাও। সিদ্দিক সালিকও ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ তথা আইএসপিআর-এর কাজ তদারক করা। তাঁর ওপরওয়ালা ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকীও ছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না।। ২৩ মার্চে আমাকে প্রেসিডেন্ট সকাশে ডেকে পাঠানো হয়। আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে টিক্কা খানের বাড়িতে। সেখানে ইয়াহিয়া খানের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ঐ সময়ে তাঁর সাথে সেনাবাহিনীর আরও কয়েকজন সিনিয়র জেনারেল ছিলেন। আমার মনে আছে, আমরা বারান্দায় বসে ছিলাম। প্রেসিডেন্ট আমাকে বললেন, 'দ্যাখো, আলাপ-আলোচনা চলছে। আমরা একটা নিষ্পত্তিতে পৌছানোর চেষ্টা করছি।' কিন্তু তিনি আমায় বলেননি যে, ঐ আলাপ-আলোচনা আসলে ভেঙে গেছে। তিনি কেবল আমাকে সব রকমের পরিণতির জন্য তৈরি থাকতে

বলেন। আমি ঐ দরকষাকষিমূলক আলোচনায় জড়িত ছিলাম না। ঐ আলোচনা হয় সরাসরি ইয়াহিয়া খান, জেনারেল পীরজাদা ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে। কাজেই সর্বশেষ পরিস্থিতি কী তা আমার জানা ছিল না। আপনারা জানেন, ঐ সময় ঢাকায় অনেক বিদেশী সাংবাদিক ছিলেন। তাঁদেরকে আমি সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে পারিনি। আর সত্যি বলতে কী, ওখানকার (ঢাকার) লোকজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ তখনও পর্যন্ত ছিল না। ৩ মার্চ অবধি আমরা আলাপ-আলোচনার সরকারী ভাষ্য প্রকাশ করছিলাম। সূত্র, বলাবাহুল্য, আইএসপিআর এবং সেখান থেকেই এ বিষয়ে ব্রিফিং দেয়া হচ্ছিল। আর আইএসপিআর-এর কোন বিষয়ে যোগাযোগ করার থাকলে সেটি আমাদের মাধ্যমে করা হচ্ছিল। এ জিনিসটি হচ্ছিল ছবির বেলায় ও জাতীয় টেলিভিশনের মাধ্যমে কিছু বলার থাকলে সেক্ষেত্রে। কিন্তু প্রেস ব্রিফিংয়ের কাজটি আইএসপিআর সরাসরি নিজেরাই করছিল। আর আমার ধারণা, এটি করা হচ্ছিল প্রেসিডেন্টের নির্দেশে। ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী ও সিদ্দিক সালিক এসব কাজ দেখাশোনা করছিলেন।

◆ ২৩ মার্চে আপনার সাধারণ অনুভূতি কী ছিল?

∆ আমার পুত্রবধূ তাসিন ও তার দুই বাংলাদেশী বান্ধবী একটা বই লেখার কাজ হাতে নিয়েছিল। তারা ওখানকার মানুষের মনোভাব যাচাই করতে চেয়েছিল। আপনি জানতে চান যুদ্ধাপরাধ কী, কী রকম সে কাজগুলো তাই না? আমি সে কথাতেই আসছি।

◆ যা হোক আপনি আমাদেরকে আপনার ২৩ মার্চের উপলব্ধির কথাই বলুন।

∆ সানাউল হক ছিল আমার বন্ধু মানুষ। ২৩ মার্চে সে আমাকে বলে, আরে আমার বাসায় একদিন এসো। আমি এসে তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাব। দু'জনে একসাথে বসে একবেলা খাওয়া যাবে। তবে সে বলল, তুমি তোমার সেনাবাহিনীর রেস্ট হাউস থেকে নিজের ব্যবস্থায় হোটেল কন্টিনেন্টালে আসবে, আমি সেখান থেকে তোমাকে পিক-আপ করব। আমার কারে করে তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাব। এর কারণ, ২৩ মার্চের দিকে গাড়িতে পাকিস্তানী জাতীয় পতাকা লাগিয়ে আশপাশে কোথাও যাওয়া যেত না। তখন সংঘাত বেধে গিয়েছিল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছিল। ঐ সময় পাকিস্তান সরকারের কোন প্রতিনিধির কোন কার্যকারিতা কার্যত আর ছিল না। আগে সামাজিক পর্যায়ে আমরা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও আস্থার সাথে পরস্পর মিলিত হতাম, দেখা-সাক্ষাৎ করতাম। আগেকার মতোই আমি সানাউল হকের পরিবারের সকলের সাথে মিলিত হলেও ঐ দিন আমার উপলব্ধি ঘটল, পাকিস্তান তার মৃত্যুশয্যায় রয়েছে।

◆ কেন আপনার ও রকমটা মনে হলো?

∆ কারণ...।

◆ সানাউল হক কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন?

∆ না, না, তা কেন। সানাউল হক আমায় কিছু বলেনি। তার ব্যবহার-আচরণ আগের মতোই বন্ধুসুলভ, উষ্ণ চমৎকার ছিল। তবে গোটা পরিবেশ, তাদের বাড়ির গোটা পরিবেশ আর আগের মতো ছিল না। নিজ দেশে তখন নিজেকে নিরাপদ বলে মনে হচ্ছিল না। আপনি

আপনার নিজ জাতীয় পতাকা ঢাকায় ওড়াতে পারছিলেন না। অথচ ঢাকা ছিল আমার দেশেরই অংশ। আমি আগে আর কখনও এ রকম পরিবেশের মাঝে গিয়ে পড়িনি। আমি এক নিদারুণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়ি, আর তাতে আমি দুঃখিতও হই। আমরা তো একসাথে পাকিস্তানের স্বাধীনতার উষার উদয়, তার অভ্যুদয় দেখেছি, অভিষেকের সাক্ষী হয়েছি। আমরা জানতাম না এত শীঘ্রই এর পতন ঘটবে, আমাদের সেই স্বপ্ন চুরমার হতে দেখব।

'৭১-এর ২৫ মার্চে আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ছিলাম। কায়সার রশিদ আমার খুব পুরনো ও প্রিয় বন্ধুদের অন্যতম। ভুট্টোর সাথে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঐ সময়টায় সে বরাবর আমার সাথে যোগাযোগ রাখত। সে ঐ বিভীষিকাময় দিনটিতে ইন্টারকন্টিনেন্টালে এসে বলে যে, যদি আমার হাতে তেমন কোন কাজ না থাকে তাহলে সে আমাকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে ডিনার খেতে নিয়ে যাবে। আমি সেই অনুযায়ী কায়সার রশিদের সাথে গেলাম মগবাজারে ইস্পাহানির বাড়িতে। ওখানে ইস্পাহানি বেশ কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিককে তাঁদের বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সেই আসরে টেলিফোনের রিং বাজতে কে একজন বললেন, আমি এসোসিয়েটেড প্রেসের লোক। টেলিফোনের কল বাজল, আর তখন গোলযোগও শুরু হয়ে গেল। ঐ ভদ্রলোক জানালেন, সেনাবাহিনী অভিযান শুরু করেছে। আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি যে আমি সত্যিই জানতাম না... ওরা কখনও আমাকে বলেনি যে, আলাপ-আলোচনা ভেঙে গেছে। জনাব ভুট্টো ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রধান রাজনৈতিক নেতা তখনও ঢাকায় ছিলেন। আপনারা জানেন, ইয়াহিয়া খান এবং শেখ সাহেব ও তাঁদের দলের লোকদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা চলছিল তাতে আমরা, অন্তত আমি কোনরকম অংশীদার ছিলাম না। আমরা অতি আশাবাদী হয়ে মনে করছিলাম, হয়ত তাঁরা শেষ পর্যন্ত কোন একটা রকমের নিষ্পত্তিতে পৌঁছতে সমর্থ হবেন, হাঙ্গামা চুকে যাবে। ইয়াহিয়া খানের সাথে আমার সর্বশেষ ঢাকায় দেখা হয় ২৩ মার্চ। তিনি আমাকে ইশারায়ও জানাননি যে আলাপ-আলোচনা সত্যিকার অর্থেই ভেঙে গেছে। তাই আমি মনে করি

◆ জনাব ভুট্টো ঐ সময়ে কী চেষ্টা করছিলেন সে বিষয়ে কি আপনার কিছু জানা আছে?

∆ সেকথা বলছি। আমার সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল, তবে ঢাকায় নয়। আমি নিজে একজন সরকারী আমলা বলেই তাঁর সাথে দেখা করিনি। আমরা বরং রাজনৈতিক দলগুলো থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছিলাম। যেহেতু আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি না সেহেতু জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথেও দেখা করার কারণ থাকতে পারে না। এ নিয়ে জনাব ভুট্টো আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ক্রিকেটার বন্ধু হাফিজ কারদারের কাছে অনুযোগ করেন। এই হাফিজ কারদার এসেছিলেন ভুট্টো টিমের অন্যতম সদস্য হিসাবে। কারদার আমার সাথে যোগাযোগ করে বলল, জনাব ভুট্টো তোমার ওপর বেশ বিরক্ত হয়ে আছেন। তুমি তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ না করে দূরে দূরে থাকছ কেন! তারই জবানিতে সে ভুট্টোর কথা বলল: কেউ আমার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসছে না, ব্যাপার কী? আমার কি কোন অসুবিধে আছে নাকি?

সেই ভয়ঙ্কর রাতে আমি আমার রেস্ট হাউসে ফিরে গেলাম। পথে আমাকে সেনাবাহিনীর বেশ কিছু ব্যারিকেডের পাশ দিয়ে যেতে হলো। দেখা গেল, এ রকম আরও ব্যারিকেড তৈরি হচ্ছে। প্রথমেই আমি যে কাজটি করলাম তা হলো, ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার নিশ্চিত করা। এটি করতে আমরা খুব ভোরের দিকে কিছু বেতারকর্মীকে যোগাড় করে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে গেলাম। তারিখটা ছিল ২৬ মার্চ। ওখানে পৌছানোর পথে অনেকে আটকা পড়েছিল। আমিও কিছুক্ষণের জন্য আটকে পড়েছিলাম। যা হোক, সবাই মিলে রেডিও সচল রেখেছিল। আমার এসব ঘটনা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার বইতেও এসবের উল্লেখ আমি করেছি। রেস্ট হাউস ছেড়ে গাড়িতে রওনা হওয়ার সময় অস্বাভাবিক কোন কিছু আমার নজরে পড়েনি। রেস্ট হাউস ও রেডিও স্টেশনের মধ্যে কোন বিস্ফোরণের আওয়াজও আমার কানে আসেনি। যদি কিছু ঘটেও থাকে তাহলে তা ঘটে থাকবে আমি ওখানে পৌছানোর আগে। কিন্তু ইস্পাহানি কলোনি থেকে বাসায় ফেরার আগে যা কিছু হয়েছিল আমার তা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। মধ্যরাতের সামান্য কিছু আগে সেনাবাহিনীর এ্যাকশন শুরু হয়। ইস্পাহানি আমার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি আমাকে সতর্ক থাকার জন্যও হুঁশিয়ার করে দেন। অনেক খবর তাঁর জানা ছিল। আমারই বরং এসব জানার কথা, কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। তাই বহু লোকই... ।

◆ আপনি কখন এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারেন?

Δ আমার অনুমান ৪টার দিকে।

◆ না তা হতে পারে না, কেননা সেনাবাহিনীর এ্যাকশন শুরু হয় মাঝরাতের দিকে আর আপনি রেডিও স্টেশনে যান ভোর চারটার দিকে। মধ্যরাত আর ভোর চারটার মাঝে এই সময়, আমার নিশ্চিত ধারণা যে, আপনি ফোন করেছিলেন ট্রান্সমিশন বা অন্যান্য বিষয়ে জানার জন্য...

Δ ঠিক বলেছেন আপনি। আমি সাবিতকে টেলিফোন করেছি, তাকে বলেছি কিন্তু আমাকে সে কিছুই জানায়নি। অথচ তাকে নানা নির্দেশ দিচ্ছিলাম আমি। আর আমি হলাম পাকিস্তান সরকারের তথ্য সচিব। ওরা আসলেই আমার কাছে কথা গোপন রেখেছিল। আমার মগবাজার থেকে রেস্ট হাউসে ফিরে যাওয়া ও চারটায় রেডিও স্টেশনে রওনা হওয়ার মাঝখানের সময়টায় আমরা টেলিফোনে রেডিও স্টাফদের খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করছিলাম। আর তাতে কিছুটা সফলও হয়েছিলাম। আচ্ছা দেখুন, ঐ মুহূর্তে রেডিওতে আমরা কী করতে পারতাম? আমাদের কি একটা ঘোষণা প্রচার, ঘটনার রেকর্ড করার দরকার ছিল না? যা কিছুই হোক, আমাদের বোবা হয়ে থাকা উচিত ছিল? আর যদি কিছু করতেই হয় তো তাহলে ঐ মুহূর্তে কোথায় পাওয়া যেত সেই অনুমতি?

◆ জনাব রোয়েদাদ, ছিল, ছিল। সামরিক আইন, লাইসেন্স, ফটোগ্রাফ সবই থাকে... সেনাবাহিনী এগিয়ে যাবার পর সামরিক আইনবিধির সাথে এগুলো ছিল।

Δ ঐ নিশুতি মাঝরাতে? তক্ষুণি! না তা নয়। ওরা চেয়েছিল তাদের ওসব সম্প্রচার করতে। তবে আমরা সকালে রেডিও স্টেশনে যাবার পরই কেবল সেগুলো সম্প্রচারিত হয়। তার আগে

নয়। আর সেগুলোই ছিল আশু কাজ যা আমাদের করতে দেয়া হয়েছিল। আমরা জানতাম না কেন এই সামরিক এ্যাকশন হলো। আমরা তখনও জানতে পারিনি কেন আলাপ-আলোচনা ভেঙে গেল। আর তাই যদি হয় তাহলে তার সরকারী ভাষ্যটি কী তাও জানতাম না আমরা। বস্তুতপক্ষে শুধু আমরা কেন, গোটা জাতি ঐ ঘটনার সরকারী ভাষ্য জানতে পারে ইয়াহিয়া খান করাচীতে ফিরে যাবার পর। তার আগে নয়। এরপর আমি রেস্ট হাউসে ফিরে আসি। আমি ঠিক করি যে, ইয়াহিয়া খানকে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে, তাঁর কাছে আমি যাব, তাঁর সাথে আমাকে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। টিক্কা খানের সদর দফতরে যাবার পথে আমাকে বলা হলো, আমার যদ্দূর মনে পড়ে ব্রিগেডিয়ার জাহানযেব আমায় বিমানবন্দরের টারম্যাকে বলেছিলেন...। আর তখনই আমার খেয়াল হয় যে, ইয়াহিয়া খান চলে গেছেন। জাহানযেব আমাকে বলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চলে গেলেও জনাব ভুট্টো এখনও আছেন, আর এখানে ভিআইপি লাউঞ্জেই তিনি রয়েছেন তাঁর দলবল নিয়ে। আপনি ইচ্ছা করলে ওখানে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে পারেন। আমি আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত গেলাম। তাঁর সাথে দেখলাম ড. মুবাশ্বির রয়েছেন। মুজাফফর হুসেনও বসে আছেন। ভুট্টোর পরিধানে রয়েছে ডাবল ব্রেস্টেড স্যুট। আমাকে তাঁর পয়লা প্রশ্ন ছিল, নিহত হয়েছে ক'জন? বললাম, আমার কোন ধারণা নেই, আমার জানা নেই। আমি তা জানতেও চাইনি। ওটা আমার জন্য প্রীতিকর নয়। আপনারা তো জানেন, বহু লোক নিহত হয়েছিল। এরপর ভুট্টো যে কথা বলেছিলেন আমি সেটি আমার বইয়ে উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছিলেন, এতে কাজ হবে না, এর ফলোআপ হিসাবে রাজনৈতিক এ্যাকশনের দরকার আছে। আর এ কথা বলেই জনাব ভুট্টো পিআইএ-র বিমানে গিয়ে উঠলেন, রওনা হয়ে গেলেন করাচীতে। আমাকে তো আগেই বলা হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট চলে গেছেন। আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম আরও কয়েকটি দিন থেকে যাবার জন্য যাতে করে অবস্থাটা অন্তত কিছুটা কাটিয়ে ওঠা যায়। কেননা, যা ঘটে গেছে গোটা বিশ্বের কাছে তার একটা ব্যাখ্যা তো দেয়া দরকার। সেটা অন্যের পক্ষে কেমন করে সম্ভব? আর তাই কর্তাব্যক্তিরা ভাবলেন আমার কিছুদিন ঢাকায় থেকে যাওয়াই ভাল হবে। তাই আর কি! গেলাম টিক্কা খানের সদর দফতরে। সেখানে প্রথমেই সাক্ষাৎ হলো ব্রিগেডিয়ার জিলানির সাথে। সামরিক গোয়েন্দা দফতরের জিলানি ওখানে ছিলেন। আমার মনে হয় সেই সময়টায় পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন শফিউল আযম। গোটা অসামরিক প্রশাসন তখন ভেঙে পড়েছিল। গোয়েন্দা এজেন্সিগুলোও ভেঙে পড়েছিল। আর তথ্য মন্ত্রণালয়ে আমার বাঙালী স্টাফদের কেউ ছিল বলে আমি মনে করতে পারছি না। তাই সত্যিকার অর্থে সেখানে শুধু আমরাই ছিলাম। নিজেদেরকেই সব কাজ করতে হচ্ছিল।

◆ তা ব্রিগেডিয়ার জিলানির সাথে কী কথা হলো আপনার?

∆ হাঁ, উনি সেখানে ছিলেন। তিনি...।

◆ টিক্কা খান...।

∆ আমি জানতাম জিলানি ছিল খুবই টগবগে অথচ অযোগ্য লোক। তার রসবোধ, কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু ছিল না, বিশেষ করে সঙ্কটকালে, টিক্কাও তাই। আমার মনে পড়ে সালিক আমাকে সে কথা বলেছিল।

◆ তিনি কি তখন ছিলেন, কখন সেটা?

▲ তিনি ঢাকায় ছিলেন না, তিনি ছিলেন...।

◆ টিক্কা খানের সাথে আপনার কী আলাপ হয় আমরা তা জানতে চাই। আপনার জন্য তো নির্দেশ ছিল যে, আপনি তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন।

▲ হাঁ, তাই তিনি বলেছিলেন। সালিক আমায় সে কথা জানায়। টিক্কা বলেছিলেন, আমরা রাঘব বোয়ালটাকে পাকড়াও করেছি, বাদবাকি সব হয় উধাও হয়েছে, নয় পালিয়েছে। তখন টিক্কা খান আসলে সেনা তৎপরতার নানা আয়োজনে, অপারেশনাল কাজে ও আদেশ-নির্দেশ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। সে সব আদেশ-নির্দেশ ছিল সামরিক প্রকৃতির। কাজেই ওসবে আমার সত্যিকার কোন আগ্রহ ছিল না। আমার মনে আছে, বিদেশী সংবাদদাতাদেরকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বের করে দেয়ার একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল আমার সাথে কোন রকম আলাপ-আলোচনা না করেই। আমি সে কথা আমার বইয়ে লিখেছি। পরে আমাকে অবশ্য বলা হয়, বিদেশী সাংবাদিকেরা বেসামাল হয়ে ওঠায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমার ধারণা টিক্কা খানের পর্যায়ের সিদ্ধান্ত এটি। আমার মনে হলো, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমার এখন রাওয়ালপিন্ডিতে ফেরা উচিত। কেননা, আমি অতিসম্প্রতি মাত্র তথ্য সচিবের দায়িত্ব তুলে নিয়েছি।

◆ টিক্কা খান আপনাকে কী বলেছিলেন?

▲ টিক্কা খানের কথা ছিল, সমস্যার কোন সমাধান নেই। ওরা আমাদের জন্য কোন বিকল্প রাখেনি। ওরা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছে। আর এ হলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আমাদেরকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে। তাঁকে বেশ আস্থাবান মনে হয়েছিল, পরিস্থিতির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে তিনি ছিলেন, আমার অন্তত ধারণা সে রকমই। আপনারা হয়ত জানেন যে, সৈনিক কখনও সব খুলে বলে না। তারা কেন এটা করল, কেন সেটা করল না তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তারা যায় না। ওরা যা কিছুই হোক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের বরাত দেয়। সে যা-ই হোক, চার দিন পর, ঢাকায় সেনাবাহিনীর এ্যাকশনের বড় জোর চারদিন কাটানোর পর আমি রাওয়ালপিন্ডি রওনা হয়ে যাই।

◆ ঐ সময়ে সেনা এ্যাকশনের ব্যাপ্তি কতটা সে সম্পর্কে কি আপনার কোন ধারণা ছিল?

▲ আমি জানতাম না।

◆ জানতে চেয়েছিলেন? সে চেষ্টা করেছিলেন?

▲ আমি জানতে চাইনি। ওরাও আমাকে বলেনি। আর আমি যা কিছু জানতাম তা হলো আলাপ-আলোচনা ভেঙে গেছে। সেনাবাহিনীর এ্যাকশন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ওরা বলছিল, ওখানে আইন-শৃঙ্খলা, বেসামরিক প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী প্রশাসন নিজ হাতে তুলে নিয়েছে। আমাদের কর্তব্য হলো সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আমি যা জেনেছি তা এর বেশিও নয়, কমও নয়।

◆ সে সময়েও কি আপনার অনুভূতি এ রকমই ছিল?

∆ দেখুন, আমি বলেছি, ২৩ মার্চে আমি খুব বিমর্ষ বোধ করেছি। আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ ও দাবির প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। আমি ৬ দফার ঘোরপ্যাঁচ বুঝতাম না। আমি এর অলিগলিও ঘেঁটে দেখিনি। আর এও মনে করি না যে এর সবকিছু মেনে নিতে হবে কিংবা হবে না। আসলেই আমি এতকিছু ভেবে দেখিনি। তবু যেহেতু আমি পশ্চিম পাকিস্তানের একটি ছোট, অবহেলিত প্রদেশেরই মানুষ সেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির কথা সাধারণত আমার উপলব্ধি না করার নয়।

◆ কিন্তু আপনি তো একজন সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তা। আপনি যদি বুঝেই থাকেন তাহলে ২৫ মার্চে আপনার কাজ তো অন্য রকমই হওয়ার কথা।

∆ আমি সে কথায় আসব। এরপর, এমনকি সেনাবাহিনীর এ্যাকশনের পরেও আমার মনে যে ধারণা তৈরি হয় সেটিই কথা। আমার সে বিশ্বাস শেষ অবধি অটুট ছিল, এমনকি সেনাবাহিনীর এ্যাকশনের পরেও আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যা চেয়েছিল তা এটা নয়। তারা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক স্বশাসন চেয়েছিল। কিন্তু এটিও নিশ্চিতভাবে চেয়েছিল যে, তা হবে অবিভক্ত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই। ঐ সময়েই এ বিষয়টি আমার মনে ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। বন্ধু আলতাফ গওহরকেও আমি স্পষ্ট করেই সে কথা বলেছি। আমি ঢাকা থেকে ফেরার পর সে আমার সাথে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত। আমি কখনও করাচীতে গেলে তার সাথে দেখা করতাম। আমি পাকিস্তান ভাঙার অনুকূলে নই। পশ্চিম পাকিস্তানে যার সাথেই কথা হয়েছে তার কাছে বিষয়টি আমি খুব পরিষ্কার করেই তুলে ধরেছি। আমি তাদের বলেছি—যারা পাকিস্তান ভাঙার কথা ভাবে তাদের অভাব-অভিযোগ যা-ই হোক, তাদের দাবি-দাওয়া যা-ই থাক, তা তারা পূর্ব পাকিস্তানী, সিন্ধী, বালুচী বা পাঞ্জাবী যে-ই হোক না কেন, আমি তাদের সাথে নেই।

◆ তা না হয় হলো, কিন্তু পাকিস্তান তাহলে ভাঙছে কেন?

∆ ধরে নিন সে একজন পাখতুন। আপনারা ৬-দফার কথা ভেবেছেন অনেক পরে! কিন্তু জানেন তো পাখতুন সমস্যার শুরু হয়েছে বহুকাল আগে। যেদিন পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে সেই সাতচল্লিশের ১৪ আগস্ট থেকেই। আপনারা জানেন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের সাথে পাকিস্তানের জন্মের সময় থেকেই আমাদের সমস্যা ছিল। যখন উপমহাদেশ ভাগ হয় তখন আমাকে একাধিক বিকল্প দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল আমাকে ঠিক করে নিতে, আমি হিন্দুস্তান না পাকিস্তানকে বেছে নেব। আমি কী স্থির করব সে বিষয়ে আমার মনে কোনই সংশয় ছিল না সেদিন। আমি জানতাম আমাদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগ রয়েছে, সমস্যা রয়েছে, এখনও যে নেই তা নয়। আর সে সমস্যা খুবই গুরুতর রকমের সমস্যাই বটে, তবু আমি কাউকে পাকিস্তান ভাঙার অধিকার দেব না—যে পাকিস্তানের জন্য আমরা এক সাথে তাদের বিরুদ্ধে লড়েছি।

◆ কে পাকিস্তান ভেঙেছে বলে আপনি মনে করেন?

∆ আমি সে কথাতেও আসছি। তবে ঐ সময়ে কোন অসামরিক আমলা হিসাবে নয়, পাকিস্তানের একজন নাগরিক হিসাবে আমি বলব, কেউ যদি পাকিস্তান ভাঙার কথা চিন্তা করে নিশ্চয়ই সে আমার সমর্থন পাবে না। আসুন, আমরা পিছনে ফিরে যাই, আসুন ফিরে যাই কিছুকাল আগে। আমি তখন পাকিস্তান টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার দিন-তারিখ স্থির হয়ে গেছে। তখন আমি একবার করাচীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে জনাব ভুট্টোর সাথে দেখা করতে যাই। দেখা গেল জনাব ভুট্টো মেজাজ খাট্টা করে বসে আছেন। আমি সমস্যাটি কী জানতে চাইলে তিনি বললেন ইয়াহিয়া খান এক ভয়ঙ্কর কাজ করতে চলেছেন। ইয়াহিয়া খান আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিন স্থির করেছেন। আর সে কারণে আমি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় পড়েছি। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ দেখার কথা আমার, অথচ এ কাজ করার জন্য এখন ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটের মুখে তাঁর করুণার ভিখারী হতে হবে আমাকে। ওদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটের মুখে পড়তে আমি কেন ঢাকায় যাব? জাতীয় পরিষদে অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য একটা দিন-তারিখ কেমন করে নির্ধারণ করা যায় সে ব্যাপারে আমার সাথে আওয়ামী লীগের একটা খোলাসা চুক্তি ছাড়া?

◆ জনাব ভুট্টো আগে থেকে এই যে চুক্তির কথা বলেন সেটি আসলে কী?

∆ আমি শুধু তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তারই পুনরুক্তি করছি মাত্র।

◆ আমি বলতে চাই, এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানতেন না? পরেও তো আপনার...?

∆ তিনি যা চেয়েছিলেন আমি যদ্দূর বুঝি তা হলো, দেশের আগামী শাসনতন্ত্রের কাঠামোটি কী হবে সে ব্যাপারে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের বাইরে সম্মত একটি নীতিমালার ভিত্তিতে হতে হবে। আর সে কারণেই তাঁর মনে হয় যে, ইয়াহিয়া খান তাঁর সাথে কথা না বলে, তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা করে ঐ তারিখ নির্ধারণ করে বড় রকমের ক্ষতি করেছেন। এরপর তিনি যে কথা উচ্চারণ করেন তা খুবই অশুভ। আমি বললাম, তারিখ নিয়ে হয়েছে কী? তিনি বললেন, এ তারিখ বদলাতে হবে। আমি বললাম, তারিখ কী করে বদলানো যাবে? তারিখ তো স্থির হয়ে গেছে! কোন সঙ্গত কারণ ছাড়া তারিখ কী করে বদলানো যাবে বলে আপনি আশা করেন? কেন তা করা যাবে না?... তিনি বললেন। একটা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঢাকায় বানালেই তো হয়! লাঠিচার্জ কর, তাতে কাজ না হলে কাঁদানে গ্যাস ছাড়, গুলি চালাও। আর তাতে কিছু লোক মারা গেলেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করাটা জায়েজ হয়ে যাবে। কর্মরত একজন সরকারী আমলা হিসাবে এসবের যে কী মেকিয়াভেলিয়ান শয়তানী রয়েছে তা বোঝা আমার বুদ্ধিতে কুলায়নি। দেখুন, তখন পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান যা যা করেছিলেন আমরা তাতে সত্যিই অত্যন্ত তুষ্ট বোধ করেছিলাম। এক. পাকিস্তানের ইতিহাসে, না শুধু পাকিস্তানের ইতিহাসেই নয় বরং আমি বলব অন্তত উপমহাদেশের ইতিহাসে, তিনি রাজনৈতিক নেতাদেরকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ মাধ্যম বেতার ও টেলিভিশনে বক্তব্য দিতে দিয়েছিলেন। তাঁরা যা বলতে চান তা বলতে দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনা এর আগে কখনও উপমহাদেশের ইতিহাসে ঘটেনি। টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে আমি তাঁদের কাছে গিয়েছি। রাজনৈতিক নেতারা টিভিতে ভাষণ দেবার আগে তাঁদের স্ক্রিপ্ট নিয়ে

আলোচনার জন্য আমাকে যেতে হয়েছে। আমরা জানতে চেয়েছি তাঁরা কী বলবেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। আমি প্রত্যেকের সাথে দেখা করেছি। ভুট্টো, কাইয়ুম খান, মমতাজ দৌলতানা সকলের সাথেই দেখা হয়েছে আমার। আমি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছি। আমি ঢাকার ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে গিয়েছি। আমি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেছি। শেখ সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা আমার এখনও মনে আছে। তাঁর ওখানে তখন বহু লোকের ভিড়। দলের বহু লোক ও কর্মী উপস্থিত রয়েছে সেখানে। তিনি আমার সামনে বসে চা ও মিষ্টি আনতে বললেন। এরপর আমার আলোচ্য প্রসঙ্গ। তিনি তাঁর স্ক্রিপ্টে 'বাংলাদেশ' এ কথাটি লিখেছেন, কোথাও পূর্ব পাকিস্তান লেখেননি। তিনি এ কথার উল্লেখ করতে আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি নিশ্চিত স্যার, এ শব্দটি ব্যবহার করবেন? আমার মনে হয় আপনার 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। তিনি বললেন—না, আমি বাংলাদেশ শব্দটিই ব্যবহার করতে বলছি। তাতে আমি বললাম, 'পূর্ববঙ্গ' এই শব্দটি ব্যবহার করলে কেমন হয়? তিনি বললেন—না, পূর্ববাংলা/পূর্ববঙ্গ আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। শব্দটি বাংলাদেশই হতে হবে, আর বাংলাদেশ কথাটি যদি রাওয়ালপিন্ডির লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তা হলে আমি টেলিভিশনে ভাষণই দিতে যাব না। ফলে আমাকে বিষয়টি রিপোর্ট করতে হলো, তাঁরা আমাকে বললেন—ঠিক আছে, ওভাবেই যেতে দাও। ফলে তাঁর ভাষণের স্ক্রিপ্টে কোন পরিবর্তন করা হলো না।

◆ এই অনুমোদনের কথাটি কে বললেন?

▲ জেনারেল পীরজাদা, চীফ অব জেনারেল স্টাফ। ব্যাপারটা এভাবে নিষ্পত্তি হওয়ায় উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলো। তাই আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এত বড় একজন নেতা, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশেই আপনার গুণগ্রাহী রয়েছে, আপনার মর্যাদাও অনেক উঁচু। শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও আপনার কত গুণগ্রাহী আছে আপনি জানেন না। ওখানকার সবাই আপনার বিরোধী নয়। তা আপনি একবার পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে আসুন না কেন? সিন্ধুতে যান, সীমান্ত প্রদেশে যান, পাঞ্জাব-বেলুচিস্তানে যান। কিন্তু শেখ সাহেব জবাবে যা বললেন আমার বইয়ে আমি তার বরাত দিয়েছি। তিনি বললেন, 'পশ্চিম পাকিস্তান অনেক দূরে, ওখানে যেতে অনেক টাকা-পয়সা লাগে।' আর সেই দিনই আমি বুঝলাম, অন্তত শেখ মুজিবুর রহমান অবিভক্ত পাকিস্তানের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ হারিয়েছেন, তাঁর কার্যসূচী ভিন্ন। ঠিক ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের অনুভূতি যা-ই থাক শেখ মুজিবুর রহমান খুব পরিষ্কার করেই জানিয়ে দেন, তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যাবেন না। তিনি কোন উপকারী উদ্দেশ্য পূরণ করবেন না। কাজেই সেনাবাহিনী যখন এ্যাকশনে যায় তখনকার পরিস্থিতি ছিল এ রকম। আর এর আগে ও পরে যে ক'দিন আমি ঢাকায় ছিলাম আমি সেই সময়কার কথাই বলছি। এরপর আমি রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে আসি।

◆ আপনি ফিরে এলেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে, পাকিস্তানের ব্যাপারে শেখ মুজিবের কোন আগ্রহ নেই?

▲ ঐ সময়টায় সে রকমই অনুভূতি ছিল আমার। তবে এ রকম ধারণা কিন্তু এর কিছুকাল আগে পর্যন্ত ছিল না। সময়টা সেনাবাহিনীর এ্যাকশনে যাবার বেশ আগের। আমরা যে সময়কার কথা আলোচনা করছি তা আসলে অন্য আরেক সময়ের। আমরা স্ক্রিপ্টের কথা নিয়ে আলোচনা করছি আর সেটি ছিল সত্তরের নির্বাচন সম্পর্কিত।

◆ না, মানে আমি বলতে চাই স্পষ্টতই একটা জায়গাতো আছেই যেখান থেকে কেউ কিছু শুরু করে। কিন্তু ৩০ মার্চ আপনি যখন পিন্ডিতে ফিরে গেলেন, সেনাবাহিনীর ক্র্যাকডাউনের কয়েকদিন পরে...।

▲ জ্বি।

◆ আপনি চলে গেলেন আর সেনাবাহিনীর এ্যাকশনও নেয়া চলছিল, যার অর্থ আমরা ধরে নিতে পারি, কত লোকের প্রাণ গেল সে ব্যাপারে আপনার কোন আগ্রহ ছিল না। জনাব ভুট্টো আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কত লোক মারা গেছে।

▲ সেদিন সকালের পর...।

◆ এমনকি তাতেও আপনার বোধোদয় ঘটেনি, তিনি কী বললেন তা তলিয়ে দেখার? কিন্তু কেন? কেন আপনি জানতে চাইবেন না কত লোক প্রাণ হারাল?

▲ আমি ওতে আগ্রহী ছিলাম না।

◆ কিন্তু সম্ভবত আপনি জানতেন বহু লোক মারা গেছে!

▲ আমি জানতাম সেনাবাহিনী এ্যাকশন নিয়েছে।

◆ ঠিক, তবে সেনাবাহিনী যখন এ্যাকশন নেয় তখন স্পষ্টতই কিছু...

▲ বহু নিরীহ, নির্দোষ লোকের প্রাণ গেছে, তবে আমি তার সংখ্যা জানতে আগ্রহী ছিলাম না।

◆ ঐ সময়টায়ই তো আপনি ইসলামাবাদে ফেরেন?

▲ তাই।

◆ এরপর আপনি কী করলেন?

▲ আমি এখানে বিকালে ফিরি। আমি বাড়ি ফিরে দেখলাম তখন প্রধান কেবিনেট সচিব গোলাম ইসহাক খান আমার বাড়ির লনে বসে অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাকে বললেন, বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলো এই বলে সাইফার মেসেজ পাঠাচ্ছে যে, দেশে কী হচ্ছে তা তাদেরকে জানানো হোক। কেননা, দুনিয়া জুড়ে সবাই সেটা জানতে চাচ্ছে। এখন তারা তাদেরকে কী ব্যাখ্যা দেবে এ ব্যাপারে জানানো হোক। আমি তাঁকে বললাম, কী যে হচ্ছে তা আমি নিজেও জানি না। আমি যতটুকু জানি তা হলো, ইয়াহিয়া খান যে বেতার ভাষণ দিয়েছেন সেটাই। আর সেটা কারও অজানা নয়। যা হোক, আমাকে পরদিন সকালে সেনাবাহিনী সদর দফতরে রিপোর্ট করতে বলা হলো। আর সে অনুযায়ী খুব সকালেই জিএইচকিউতে বৈঠক শুরু হলো। ঐ সভায় মাত্র দু'জন সিভিলিয়ান অফিসার উপস্থিত ছিলেন। আমি নিজে আর পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খান।

◆ ২৫ মার্চের পর ইসলামাবাদে জিএইচকিউতে বৈঠক হয়। কী নিয়ে ঐ বৈঠক? ওরা কি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছিল? না আপনাকে ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি পরিস্থিতির ব্যাপারে কী মনে করছেন?

Δ আমি... আমি জীবনে কখনও আগে এ ধরনের বৈঠক করিনি। দেখিওনি। আমি তো মনে করেছিলাম এ বৈঠকের আলোচনার আলোকে হয়তো বা বিরাট কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে। আমরা যেহেতু এক বিরাট সঙ্কটের মোকাবিলা করছি, আমি মনে করলাম, এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। কেননা আমার চারপাশ ঘিরে দেখলাম নীতিনির্ধারক কর্মকর্তারা বসে আছেন। মনে করলাম যে, এ আলোচনা বৈঠক অন্তত কয়েক ঘণ্টা ধরে চলবে। কিন্তু আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, এ বৈঠকের কোন অধিবেশনই ৩০ থেকে ৪৫ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি।

◆ কী ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ঐ বৈঠকে?

Δ জেনারেল গুল হাসান ঐ বৈঠকে ছিলেন। সিজিএস ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি জানতে চাইলেন। বৈঠকে মোটামুটি বলা হলো যে, সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। আর ঐ পর্যন্তই। বিস্তারিত আর কিছুই নয়। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী বলার আছে আপনার? আর নিজেই উদ্যোগী হয়ে বললেন, ঢাকায় কী সব করা হয়েছে বলে বাইরের দুনিয়ার ধারণা? আমি আর কী বলব, বিভিন্ন দেশের বেতার সম্প্রচারে বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব খবরাখবর প্রচার করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু কাগজপত্র ছিল, বের করলাম। বললাম, বিবিসি এই বলেছে, ভিওএ এ খবর দিয়েছে ইত্যাদি। এসব কিছুক্ষণ ধরে চলল। কিছু পরে এ পর্বও শেষ হলো। আর পশ্চিম পাকিস্তানে তেমন কিছু এ নিয়ে খুব একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে মনে হলো না। সব গতানুগতিকভাবেই চলতে দেখা গেল। সব কিছু আগের মতো...।

◆ ঐ সময়ে তথ্য মন্ত্রণালয় কী নীতি অনুসরণ করছিল? আসলে আমি এটিই আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি। আপনাকে কি ব্রিফ করা হয়েছিল এই মর্মে যে, এটিই হবে নীতি কিংবা আপনাকে কি নীতি প্রণয়ন করার জন্য বলা হয়েছিল?

Δ না। বলা হয়নি। শুধু ওরা বলেছিল, দেখুন, এখন জরুরী অবস্থা চলছে, এটা একটা বিদ্রোহ, একটা অভ্যুত্থান চলছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতার ওপর হামলা হয়েছে।

◆ এর সব কথাই তো জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর বেতার ভাষণে বলেছেন?

Δ ঠিক। আর ওরা আরও বলেছিল যে, সেনাবাহিনী এ্যাকশন নিয়েছে। আমি মনে ...।

◆ আপনি কি কোন সময়ে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ, জেনারেল পীরজাদা বা জেনারেল গুল হাসানের মতো লোককে বলেছিলেন যে, কী সব ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে জানার অধিকার পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের আছে?

Δ ওরা তো সকল তথ্য একটি চ্যানেলে ছাড়ত, সে কথা আমি আগে বলেছি। ওরা বলত যে হ্যাঁ, আমরা আপনাকে বলি...।

◆ পূর্ব পাকিস্তানে তখন যা ঘটছিল তারা কি সেসবের তথ্য ও খবরাখবর আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে পাচ্ছিল?

∆ পাচ্ছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানে যা কিছু ঘটছিল তার সরকারী পর্যায়ের তথ্য পাচ্ছিল কেবল আইএসপিআরের মাধ্যমে।

◆ আর আপনার কোন বিকল্প ছিল না...

∆ না, শুধু ওরা যা বলত...।

◆ এখন আসুন যেসব ভাষ্য প্রচার করা হতো তখন সে বিষয়ে। তখন তো বেতার ও টিভিতে সংবাদ ও অন্যান্য ভাষ্য সম্প্রচার করা হতো। আপনি জানেন তখন এসবের পর রেডিও-টিভিতে আলোচনা সেশনও প্রচার করা হতো। আর এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সেনাবাহিনীর এ্যাকশন কেন দরকার ছিল তার পক্ষে যুক্তিও হাজির করত। আমি বলতে চাই, স্বাভাবিকভাবেই এসব আগে থেকে ব্রিফ করা ছাড়া তো সম্ভব নয় । তাহলে এ্যাকশনের জন্য কী লাইন বা নীতি নেয়া হয়েছিল?

∆ তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, যত বিকল্প পথ খোলা ছিল প্রেসিডেন্ট তার সবই কাজে লাগিয়েছেন। তিনি তাঁর সর্বোত্তম চেষ্টা করেছেন কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁকে বসেছেন, দেশ তিনি ভাঙবেনই। এই ছিল মূল ভাব, মূল প্রতিপাদ্য। আর আমার ধারণা, কতিপয় বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া গোটা পশ্চিম পাকিস্তানই এ বক্তব্য মেনে নেয়। মেনে নেয় গোটা পশ্চিম পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রধান রাজনৈতিক নেতা। তাদের বিশ্বাস জন্মায় যে, শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা দেবার ভিলেন হলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

◆ বেশ, তাহলে ওয়ালী খান, ওখানকার আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ন্যাপ নেতা... এঁদের গ্রেফতার করা হলো কেন?

∆ তাঁদের গ্রেফতার করার কারণ ভিন্ন। তাঁরা গুরুতর আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা সৃষ্টির হুমকি দিচ্ছেন... এ ধরনের কোন কারণে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়নি। তবে আমি যা মনে করি তা হলো, এমনকি ওয়ালী খানের মতো লোকও... আমি তাঁর বক্তব্য শুনেছি... যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারেননি। অথচ যা ঘটেছিল তা এক বিরাট, মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। তাই আমার কথা হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন রাজনৈতিক নেতা তখন যদি বুঝে থাকেন যে, শেখ মুজিব, ইয়াহিয়া খান বা জুলফিকার আলী ভুট্টো... এঁদের কেউ কোন অপরাধ করেছেন তাহলে তাঁদের উচিত ছিল প্রকাশ্যে, জনসমক্ষে তা বলা। কিন্তু তখন যে ধারণা আমি পেয়েছি তা হলো, ঘরোয়া মনোভাব বা অনুভূতি যাই হোক, কিছু রাজনীতিকের একান্ত কিছু অনুভূতি ছাড়া সত্যিকার অর্থে কেউই প্রকাশ্যে কথা বলতে বেরিয়ে আসেননি। কেউ বেরিয়ে এসে সেনাবাহিনী যে এ্যাকশন নিচ্ছে বা নিয়েছে তার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাননি। সেনাবাহিনী নিজে যেহেতু এ্যাকশন নিয়েছে সেহেতু এই এ্যাকশনের প্রতি সেনাবাহিনীর স্বাভাবিক সমর্থন ছিল। আমি মনে করি না, অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে, ওয়ালী খান বিষয়টিকে সত্যিকার অর্থেই ইস্যু করেছিলেন। তাঁর ঘরোয়া মনোভাব আমি জানতাম আর সেটি এ পর্যন্তই। ওরা সবাই এ নিয়ে খোশ মেজাজেই ছিল যে, ইয়াহিয়া আর

কিছু না করুন এক ইউনিট তো ভেঙে দিয়েছেন! নির্বাচনের আগের এই বিষয়টি আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি। প্রদেশের এই নবপরিবর্তিত মর্যাদার কারণে ইয়াহিয়া ওঁদের কাছে নয়নমণি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সবাই অত্যন্ত হৃষ্টবোধ করেছিলেন এই ভেবে যে, ইয়াহিয়া প্রদেশগুলোকে নতুন করে সংগঠিত করে সেগুলোকে পুনর্বহাল করেছেন। তাঁরা অন্তরে ইয়াহিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন, আর তাই এমন একটা ভাব দেখিয়েছিলেন যে, এ অবস্থায় তাঁরা কী করতে পারেন! এদিকে পাকিস্তান ভাঙা ছাড়া তো আর কিছুই শেখ মুজিবকে তুষ্ট করতে পারবে না। নির্বাচনের সময়ে...

◆ না, আমি বলব এ ধরনের ধারণা গড়ে তোলা হয় যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে। আপনি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান। আপনার সাথে সলাপরামর্শ করা না হয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন বিষয়। সামরিক আইনের নিচে আপনাকে সবকিছু ডিক্টেট করাও হতে পারে। কিন্তু তাও ভিন্ন বিষয়।

Δ আপনি জানেন, আমাদেরকে শুধু সরকারী তথ্য নির্ভর করেই কাজ করতে হয়েছে। সেটিই আমরা পেয়েছি। ঠিক কী হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলাপ-আলোচনার সময়ে তাতে আমাদের কোন নাগাল ছিল না। সরকারীভাবে আমি তথ্য সচিব ছিলাম বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে ঐ আলাপ-আলোচনায় রাখা হয়নি। আমি ছিলাম বাইরের লোক। আমি তাতে অংশীদার ছিলাম না।

◆ আসল কথা সেটিই। আপনি চাইলেও তা হতো না। আপনার একান্ত নিজ অনুভূতি ভিন্ন হলেও সামরিক আইনের কারণে কিছুই করতে পারতেন না আপনি, তা আপনি তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান হলেও। সে যাক। কিন্তু আমি জানতে চাই আপনার সেই নিজের অনুভূতি কী ছিল?

Δ আমি আমার অনুভূতির কথা বলব...।

◆ বলবেন, কেননা এখন আপনার অনেক অন্তর্দৃষ্টি লাভ ঘটেছে। মানে আমি বলতে চাচ্ছি, ঐ সময়ে কারও কোন কিছুর ব্যাপারে একটা ভিন্ন ধারণা থাকা স্বাভাবিক। তখন হয়ত তথ্য পেয়েছেন অন্য আকার, প্রকার ও চেহারায়... এখন...।

Δ সেই সময়টায়—আন্তরিকতা, সততা নিয়েই আপনাদের বলছি—আমি কার্যত বলতে গেলে সেনাবাহিনীর এ্যাকশন শুরু হবার আগেই চলে আসি। আসি এ অনুভূতি নিয়ে যে, অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে, আওয়ামী লীগের নেতাদের কারণে বিচ্ছেদের সময় এসে পড়েছে। আমরা আলাদা হতে চাইনি। আমি আমার বইতেও লিখেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে আমার থাকাকালেও এমন ধারণা আমার জন্মায়নি যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণও আলাদা হতে চেয়েছে। একটি সামান্য ঘটনার কথা আমি আমার বইতে উল্লেখ করেছি। তা হলো, আমি সেনাবাহিনীর এ্যাকশনের ঠিক পরপরই ঢাকা থেকে ট্রেনে যশোরে যাচ্ছিলাম। বিকালে শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধকে চোখে পড়ল। তিনি অজু করার পর নামাজে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, ঐ লোকটি অনেক উত্তম মুসলিম, অনেক উত্তম পাকিস্তানীও....আমার তুলনায়। কিন্তু তাহলে আজ আমরা কেন এই বিপর্যস্ত

বিভীষিকায় পড়লাম! কে আমাদেরকে এই বিয়োগান্তক পরিস্থিতিতে টেনে নিয়ে এলো? আসলেই কি এটি এড়ানো যেত না? এ হলো আমার উপলব্ধি। আমার ধারণা হলো দু'টি আমি আপনাকে তো বলেছি, ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতায় আসেন তখন যে কাজগুলো করেছিলেন তা সকলেই প্রশংসা করেছিল। আমরাও স্বস্তিলাভ করেছিলাম এই ভেবে যে, জনসাধারণ আইয়ুব খানকে নিয়ে ক্লান্ত, পীড়িত, বিরক্ত হয়ে পড়েছিল, তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছিল। আমার ধারণা, ইয়াহিয়ার সামরিক আইন সেদিন তাই সাধারণভাবে নন্দিতই হয়েছিল, অন্তত এর বিরোধিতা সত্যিকার অর্থে কেউ করেনি।

◆ আর কোন উপায়ান্তর কি ছিল? সামরিক অইন সব সময় স্বাগতই তো হয়ে থাকে গোড়াতে!

▲ বলছি আমি। একটু ভিন্নভাবে সে কথায় আসব আমি। ১৯৫৯ সালে আমি পেশোয়ারের ডেপুটি কমিশনার ছিলাম। সে সময় ভারতের মোরারজি দেশাই আসেন পেশোয়ারে। তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছে অনুরোধ জানান যে, তিনি বাদশাহ খান অর্থাৎ খান আব্দুল গাফফার খানের সাথে দেখা করতে চান। তাঁকে সে অনুমতি দেয়া হোক। কর্তৃপক্ষ এর আলোকে আমাকে গাফফার খানের নিবাস কোট মানযাই পর্যন্ত মোরারজির সঙ্গী হতে ও তাঁকে আবার পেশোয়ারে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। আমরা পেশোয়ার থেকে গাড়িতে রওনা হতে মোরারজি শহরের বাইরে এসে আমায় বললেন, দেখুন, আমরা একত্রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছি। আপনি জানেন এই সীমান্ত প্রদেশের মানুষের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের কথা। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদান রয়েছে। ১৪ আগস্টে আমরা উভয়ে স্বাধীন হয়েছি, আর আপনারা গিয়ে পড়েছেন সামরিক আইনের কবলে। বলা যায়, আপনারা আপনাদের দেশকে সামরিক আইনের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই কি ছিল আপনাদের চাওয়া? আমি এসব কথা শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে কিছুটা রাগতস্বরেই বললাম, আমরা এই সেদিনও এক দেশ ছিলাম। ফারাক হায় তো উন্নিশ-বিশ কা। হামারা ইহাঁ আজ মার্শাল ল আগিয়া, আপ কি ওহাঁ মার্শাল ল কাল আ জায়েগা। তিনি একথা শুনে বললেন, যেদিন ভারতে সামরিক আইন আরোপ করা হবে সেদিনই ভারতীয় বুলেটের মুখোমুখি সবার আগে হব আমি। যা হোক, আপনি বলছিলেন, সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আপনারা কী করতে পারেন? অনেক কিছুই করা যায় আমি বলব। এখন এটি নির্ভর করবে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনার অঙ্গীকার কতটুকু তার ওপর। আপনাকে সত্যিকার অর্থে ভাবতে হবে আপনার দেশের সাধারণ পরিবেশ কী, কী আপনার দেশের মানুষের অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা! দেখতে হবে আপনাদের বিচার বিভাগ স্বাধীন কি না। আর এসব শর্ত পূরণ হলে মানুষ নিশ্চয়ই তাদের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য জীবন দিতে তৈরি থাকবে। কিন্তু কোন ভুয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য তা করবে না। আর তাই সামরিক আইন সর্বত্রই ফাঁকা গণতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবেই।

◆ তাহলে এ আপনার একান্ত নিজের ভাব প্রকাশ আমি ধরে নেব?

▲ দেখুন এটি কোন নিজস্ব অভিমতের ব্যাপার নয়! একটা বিষয় কাচের মতো স্বচ্ছ যে, জুলফিকার আলী, ইয়াহিয়া খান, আর শেখ মুজিব... এই ত্রিমূর্তি—যাঁরা পাকিস্তানের

বুনিয়াদ ধ্বংস করেছেন। করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, করেছেন এমনকি, আমি দাবি করি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে। জনাব ভুট্টো বিরোধী দলের নেতা হতে চাননি। তিনি তাঁর বাঞ্ছিত ভূমিকা পালন করেননি, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে নিকৃষ্ট ভূমিকা নেবেন না... এমন ভাব দেখিয়েছেন।

◆ তিনি (ভুট্টো) কি একথা বলেছেন? আপনাকে বলেছেন?

Δ না, তিনি আমায় বলেননি।

◆ কোন পিপিপি নেতা আপনাকে বলেছেন?

Δ কী বললেন...?

◆ বলছি, ভুট্টো বিরোধী দলে বসতে তৈরি ছিলেন না।

Δ না, না।

◆ তাহলে এ আপনার ধারণা?

Δ বিষয়টি পরিষ্কার! একেবারেই পরিষ্কার। আমি বলতে চাই, লোকটা আমায় বলেছে আপনাকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার জন্য শুধু যা করতে হবে তা হলো কৃত্রিমভাবে ঢাকায় একটা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি করা, ব্যস!

◆ তাহলে ভুট্টোই তো দায়ী...

Δ সে দায়ভাগ তাঁর রয়েছে... তাঁকে তাঁর দায়িত্বের ভাগ নিতেই হবে।

হাসান জহির

[হাসান জহির—প্রাক্তন সিএসপি। চাকরি জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালে ঢাকায় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসাবে তাঁকে পাঠানো হয়। হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর তাঁকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানে ফেরার পর আবার পুরনো চাকরিতে যোগ দেন এবং ফেডারেল সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম 'দি সেপারেশন অব ইস্ট পাকিস্তান।' একাডেমিক মহলে গ্রন্থটি বেশ আলোচিত হয়েছে। হাসান জহিরের সাক্ষাৎকার আমরা গ্রহণ করি ইসলামাবাদে তাঁর বাসগৃহে। এ সাক্ষাৎকার গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি পরলোক গমন করেন।]

◆ জনাব হাসান জহির, আপনার লেখা বইটি পড়েছি ইতোমধ্যে। আমরা তাই মূলত আপনার কাছে জানতে চাই, আপনি যখন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন, তখন আপনি কী দেখেছেন, আপনার কী উপলব্ধি ঘটেছে সেখানে, আর সেই সময়ে সেখানকার আমলাতন্ত্র তথা আমলা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী হয়েছে? আমরা বাঙালী জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় সম্পর্কে আপনার অভিমত আপনার বই থেকে পেয়েছি। তবে আজকের এই আলোচনায় সেটি আমাদের বিষয় নয়। বরং মূলত তখনকার সেই আমলাতান্ত্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মনে গড়ে ওঠা ধারণার কথাই আমরা জানতে চাই। তখন মাসুদ মুফতি ও আপনার আরও অনেক সহকর্মী পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। আর ১৯৭১-এ সামরিক বাহিনীর এ্যাকশন সম্পর্কেই বা কী আপনি দেখেছেন, জেনেছেন সেকথাও বলুন।

∆ ১৯৭১-এ আমার পূর্ব পাকিস্তানে পোস্টিং হয়। তবে সে পোস্টিং ছিল পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো। তবে আমার সেখানে সত্যিকারের জানাশোনা, দেখা-পরিচয়—স্থানীয় লোকজনের সাথে মেলামেশা বলতে যা বোঝায় তা মূলত ঘটে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে। পূর্ব পাকিস্তানে আমার প্রথম পোস্টিং ১৯৫৬-তে। তখন আমাকে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের এসডিও নিয়োগ করা হয়। সেখান থেকে বদলি হয়ে যাই চট্টগ্রামে। পরে পাবনা, ঢাকা সেক্রেটারিয়েট ও সবশেষে ১৯৬২-তে যশোরে, যশোর জেলার ডেপুটি কমিশনার হিসাবে। এই গোটা সময়টা ছিল লক্ষণীয়ভাবে শান্তি ও সম্প্রীতিময়। তবে সে যা-ই হোক, প্রথমে আমি যখন চাঁপাইনবাবগঞ্জে তখন সেখানে একেবারেই আগন্তুক ব্যক্তিই ছিলাম বটে! তবে ওখানকার লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতেই আশ্চর্যজনকভাবে নিজেকে আর সেখানকার অজ্ঞাতকুলশীল বলে মনে হলো না। আমাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ সেখানে ছিল না। ওরা সবাই তাদেরই একজন হিসাবে গ্রহণ করল আমাকে। আমিও ওদের সবাইকেই পাকিস্তানী বলেই জানলাম। এ ছিল আমার তখনকার গোটা উপলব্ধি। সেখানে আমার সাথে সরকারী কর্মকর্তা ও অন্য কর্মচারীদের সাথে, লোকালয়ের মুসলিম, গণ্যমান্য মুসলিম, এমনকি হিন্দুদের সাথেও আমার ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওদের সকলেই আমার প্রতি বেশ সহযোগিতা করছে বলে মনে হলো। আমারও তাতে সুবিধে হলো তাদের নেতৃত্ব দেবার। সবকিছুই চলতে লাগল চমৎকার, কোন সমস্যায় তেমন পড়তে হলো না আমাকে। আমরা ওখানে জল্পনা-কল্পনা করতাম এই করাচী বা ঢাকায় কী ঘটছে, শাসনতন্ত্র রচিত হচ্ছে কি না, পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার সমস্যাগুলোর ব্যাপারে কী হচ্ছে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে আওয়ামী লীগ মেনিফেস্টো নিয়েই বা কদ্দূর কী হলো, এইসব। তবে যা-ই ঘটুক, সে সব ছিল আমাদের কাছ থেকে অনেক-অনেক দূরে, আর তাই আমাদের জেলা-মহকুমা পর্যায়ের নিত্যদিনের কাজ-কারবার ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে পর্বের প্রভাব তেমন পড়েইনি বলা যায়। এসব ছিল আসলেই বিরাট বিরাট ইস্যু যা নিয়ে তখনকার বড় রাজনীতিবিদরা মাথা ঘামাচ্ছিলেন, সে সবের মোকাবিলাও করছিলেন। এ নিয়ে হচ্ছিল নানান বিরোধ-ফ্যাসাদ। তবে এসবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অন্তত ১৯৬২ পর্যন্ত কোন তাৎপর্যপূর্ণ স্তর অবধি গড়ায়নি। তখন অপরাধের ঘটনা বা হার ছিল তুলনামূলকভাবে কম, মূল্যস্ফীতির হারও ছিল খুবই অল্প, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল শান্তিপূর্ণ, বেশ ভালই বলা যায়। কিন্তু ১৯৭১-এ এসে চিত্র বদলে যায় ১৯৫৬-র তুলনায়। আমি ওখানে যেতে চাইনি স্বেচ্ছায়, সরকারের নিয়োগক্রমে আমি সেখানে যাই। ১৯৫৬-তে আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীদেরই একজন ছিলাম। আমি ওখানে গিয়েছিলাম সরকারী পদে সাধারণের সেবা করতে। আমি ছিলাম দেশের সেরা সার্ভিসের একজন, সেজন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম। আর সে গৌরববোধে শুধু আমি নয় বরং আমার বাঙালী সহযোগীরাও ঐ সার্ভিসের সদস্য হিসাবে নিজেদেরকে সমান গৌরবান্বিত ভাবতেন। কিন্তু ১৯৭১-এ জোর করে আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়। তখন সেখানে পরিস্থিতি কী চলছে সে ব্যাপারে আমার একটা মোটামুটি ধারণা ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওখানে এমন অবস্থা চলছে যে অবস্থার সাথে আর যা-ই হোক বেসামরিক শাসনের খুব একটা সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। ঐ মেয়াদটির সাথে আমারও কোন সম্পর্ক নেই। আমার কাজের জন্য সেখানে কার কাছে আমি জবাবদিহি করব তাও বুঝতে পারিনি। কাজেই নানা চেষ্টা-তদ্বির করে আমি ঢাকায় থেকে যাই আর নিজেকে যদ্দূর সম্ভব অফিসিয়াল কাজে কম সম্পর্কিত রাখার চেষ্টা করি। সেদিকে খেয়াল রেখেই ওরা সদস্য, পরিকল্পনা—এই নামে একটা বিশেষ পদ সৃষ্টি করে। আমার এ পদে কাজ ছিল জরুরী বা সঙ্কট পরিস্থিতির মোকাবিলা বা ব্যবস্থাপনা। তাই তখন যা কিছু

বিদেশ থেকে সাহায্য-সহায়তা আসছিল সেই সঙ্কটকালে আমি পরিকল্পনা বোর্ডের সদস্য হিসাবে সে সবের দেখাশোনা করছিলাম।

◆ আপনাকে এজন্য রিপোর্ট করতে হতো কার কাছে? গভর্নরকে?

▲ না, এজন্য পরিকল্পনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি পরিকল্পনা বোর্ডের সদস্যও। তাঁর নাম এএমএস মূসা। এর আগে ঐ পদে কিছুদিনের জন্য ছিলেন কফিলুদ্দিন মাহমুদ। তারপর আসেন মূসা। মূসার পরে আমার কাজের জন্য আমাকে চীফ সেক্রেটারির আওতায় থাকতে হয়। তবে আমি টিক্কা খানকে গভর্নর পদে কাজ করতে দেখেছি। দেখেছি টিক্কা খান সেই সকাল থেকে সন্ধে অবধি আলোচনা বৈঠক করেই চলেছেন। বৈঠক হচ্ছে শিপিং কোম্পানি, ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি, দোকানদারদের সঙ্গে। ৩০-৪০ জনের মতো লোক আলাপ করেই চলেছে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য। আসলে তো তখন স্বাভাবিক অবস্থা ছিল প্রায় মায়ামরীচিকার মতোই। কীসের স্বাভাবিকতা? যে অবস্থায় সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে, আগামী কাল কী হবে সে চিন্তা করে না, সেটাই তো স্বাভাবিক অবস্থা! কিন্তু হলে কী হবে, টিক্কা ব্যাপারটা ঘটাতে চান অন্যভাবে। সেটাই তাঁর স্টাইল। তিনি কখনও বুঝতে পারেননি, সত্যিকার অর্থে স্বাভাবিক অবস্থা কী করে আসতে পারে, আর সেটা কেমন জিনিস! তাই সব কিছু চলতে থাকে দিনের পর দিন অন্ধ আবেগ আর গোঁয়ার্তুমির ওপর ভর করে। অবস্থার অবনতি হতে থাকে দিনকে দিন। মার্চে সেনাবাহিনীর ক্র্যাকডাউন এ্যাকশনের পর এমন কোন মুহূর্ত কেটেছে বলে আমি জানি না যখন অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে, আর অবনতি হয়নি। এর মূল গলদ এই যে, মার্চে সেনাবাহিনী যে ব্যবস্থা নেয় তার কোন উদ্দেশ্য ছিল না—উদ্দেশ্যবিহীন, বেধড়ক, নির্বিচার ব্যবস্থা ছিল সেটি। কেন এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, কী ছিল এর উদ্দেশ্য? সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিল, যাকে হিটলারি ভাষায় বলা যায়, ফাইনাল সলিউশান! কিন্তু এ বেধড়ক কারবার না করে, অন্যভাবে যদি কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়া হতো তাহলে হয়তবা ফল অনেক ভাল পাওয়া যেত। কেননা, আসল লোক তো ওদের কজায়ই ছিল। আর আমি শুধু কজায় বা নিয়ন্ত্রণে ছিলই বা বলি কেন, বরং বলা উচিত শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সাথেই ছিল। কাজেই ব্রিটিশ একদা যে কৌশল কাজে লাগিয়েছে সেই ধরনের ত্বরিত কোন এ্যাকশন নিয়ে তারপরই দরকষাকষির আলোচনায় বসে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু কোথায় কী! বরং যা চলছিল তা চলতেই থাকে। কারুর কোন আলাপ-আলোচনার গরজের তখন বালাই আছে বলে দেখা গেল না।

◆ সেনাবাহিনীর এ্যাকশনের পরিকল্পনা যখন চলছে তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

▲ না, আমি সে সময় সেখানে ছিলাম না, আমি তখন ছুটিতে গিয়েছিলাম। এ্যাকশন নেয়া হয় মার্চে। কিন্তু আমার ধারণা, এখানকার লোকজন আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল কোন রকমের একটা এ্যাকশন সম্ভবত নেয়া হতে যাচ্ছে, আর পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজনের ধারণা ছিল এ রকম ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

◆ ২৫ মার্চের পর ঢাকা বা গোটা বাংলাদেশে কী ঘটছিল তা কি আপনি জানতেন?

▲ এ বিষয়ে আমার ধারণা ছিল একান্তই ধোঁয়াটে। আমি কেবল ঢাকায় গিয়ে বিমান থেকে অবতরণ করার পরই আসল ধারণা পাই। আমি সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে বিস্তারিত জানতে

পারি। তখন বা তারপর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার সেনা এ্যাকশনের কারবার শুরু হয়ে যায়। ড. দানী নাকি বলেছিলেন, যে শ্রেণী (শ্রেণীগুলো) শাসন করে এসেছে, সেইসব শ্রেণী, এমনকি পাঠানরা অবধি (সিএসপি আমলারা) তা করেছে নিতান্তই বিজাতীয়ভাবে। তবে মে মাসে যখন আমি গেলাম তখন আমাদের সহকর্মী শফিকুর রহমান মালিক, কাজী জালাল, মুজিবের কাছ থেকে আসল কাহিনী জানা গেল। ওরা সকলেই আমাদের সতীর্থ। সহকর্মী। আমরা সকলে সকলের সাথে প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারতাম। আলাপ করতামও। তাছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ের ঘনিষ্ঠতা তো ছিলই। অবশ্য সাধারণ নাগরিকদের কথা আলাদা। আমরা যারা সেই দিনগুলোতে ঢাকায় ছিলাম তাদের চেয়ে সাধারণ নাগরিকের ঢের বেশি ভুগতে হয়েছে।

◆ না, আমি বলতে চাই আপনি নিশ্চয় ড. দানীর এই বক্তব্য খণ্ডন করতে চাচ্ছেন যে, নিধন পর্বে আমলাতন্ত্র একটা বড় কারণ হিসাবে কাজ করে?

∆ দেখুন, আমি বলি, আমলাদের একটা অবদান এতে থাকতে পারে। কিন্তু আসুন দেখা যাক তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্বাপর কী ঘটেছে? সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান শুরুতেই ছিল, তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল গণপরিষদে। তাতে ওরা আপত্তি তোলে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানবে না। এরপর ১৯৫০-এর আপোসরফা প্যারিটির বা সমতার। ওরা জানায়, ওরা প্যারিটি মানবে না। এও নয়, সেও নয়—কাজেই এসবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন হয়, আন্দোলন হয় প্যারিটির বিরুদ্ধেও। কেন প্যারিটি? পূর্ব পাকিস্তান তাতে অভিযোগ তুলবে, এর পাকে-চক্রে তাকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় সংখ্যালঘু প্রদেশে পর্যবসিত করা হবে। আর তাই তারপর এলো ওয়ান ইউনিটের কলকাঠি। পূর্ব পাকিস্তান এই ওয়ান ইউনিটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৫৬ পর্যন্ত এরকম একটা পরিস্থিতি বজায় থাকে। পরিহাসের বিষয় এই যে, জনসাধারণ তখন বিষয়টি বুঝত না। ঐ সময় গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়। তবে এই গণপরিষদ ভেঙে দেয়া সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা প্রচলিত তার সাথে আমি একমত নই। গণপরিষদ ভাঙার সত্যিকারের পথ তৈরি করেন পূর্ব পাকিস্তানের সত্যিকারের প্রতিনিধিরা। কোন উপায়ান্তর ছিল না। মুসলিম লীগকে তাদের আসন ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁর স্বকীয় কারণে পাকিস্তানের গণপরিষদ ভেঙে দেন। তার ফলে আবার এক নতুন গণপরিষদ গঠিত হয়। নতুন একটি শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এ দলিলটি ছিল গণপরিষদে সর্বসম্মত, যদিও আওয়ামী লীগ ঐ দলিলে সই করেনি। তবে তারা এই শাসনতন্ত্রের আওতায় কাজ করে। সোহরাওয়ার্দী এ শাসনতন্ত্রেরর আওতায় দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভাও এ শাসনতন্ত্রের আওতায় শপথ নেয়। তাঁরা আবার নির্বাচনের প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই ১৯৫৬-র শাসনতন্ত্রের দলিলটি ছিল সর্বসম্মত, প্রয়োজনে তা সংশোধনও করে নেয়া যেত।

◆ এ পর্যায়ে আমি বলতে চাই, আমরা ঠিক এসবের বিস্তারিত আলোচনায় এ মুহূর্তে যেতে চাই না। বরং আমি প্রস্তাব করতে চাই, আমরা কি শুধু ওয়ান ইউনিটের কথায়ই আলোচনা সীমিত রাখতে পারি? ঠিক কখন আপনার এ উপলব্ধি জন্মায় যে, এসবে আর...

▲ একেবারে গোড়া থেকেই। আমি ওখানে যাবার...

◆ তাহলে কি সুনির্দিষ্ট যে ব্যবস্থাদি গৃহীত হয় তার আলোকেই আপনার ঐ উপলব্ধি ঘটে?

▲ সবকিছুই তো আমার চোখে ভাসছিল।

◆ আমি বলতে চাই, আপনি হয়ত বা তখন এ রকমটা বুঝতে পারেননি। পরে নেপথ্যের অনেক কিছু এখন জানার পর, পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে হয়ত...

▲ না, না, মাত্র গত সন্ধ্যায়ও রোয়েদাদ খানের সঙ্গে আমার আলাপ হচ্ছিল। তাকেও তো পূর্ব পাকিস্তানে যেতে হয়েছে। আমরা সেদিন একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে আলাপে বসে তাকে বলেছিলাম, আল্লাহর ওয়াস্তে একটা কিছু কর। আমরা জানতাম যে এসব টিকতে পারে না। অবশ্য এমনটি কল্পনা করিনি যে, এমন হেনস্থার একটা আত্মসমর্পণ ঘটবে, আর সে অবমাননাকর দিনটি এত কাছে! তবে আমি যেদিন বিমান থেকে ঢাকার মাটিতে পা দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই নিশ্চিত ছিলাম যে, এ পরিস্থিতি আর যা-ই হোক চিরকাল বজায় থাকতে পারে না। এত সব হত্যা, এত ত্রাস-বিভীষিকা—যা এ নগর, এমনকি গোটা প্রদেশ গ্রাস করতে চলেছে তার আলোকে পরিণতি সম্পর্কে আমার সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। ঘরের বাইরে কোথাও পা দেবার মতো অবস্থা ছিল না। সন্ধ্যার পর যেখানে আপনি রয়েছেন সেখান থেকে আর কোথাও যাবার উপায় ছিল না। বোমা, বিস্ফোরণ... ইত্যাকার সবকিছু মিলে...।

◆ তাহলে কি আপনি বলছেন যে, এসব কিছুই একটা গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল, না এ ছিল একটা নৈরাজ্য? ধারা বা গতানুগতিকতা বলতে আমি একথা বোঝাতে চাই যে, এ ধরনের আদেশ আপনাদের ওপর ছিল কি না যে একটা নির্ধারিত সময় পর আপনারা কাউকে দেখা মাত্র গুলি করবেন?

▲ না, না, আমাদের কাছে সে রকম কোন আদেশ ছিল না...

◆ আপনাদের আদেশ ছিল... আমরা ঠিক একথা বলতে চাইনি, আমি বলতে চেয়েছিলাম যে...

▲ সেনাবাহিনীর এ রকম আদেশ ছিল হয়ত... আমি মাঝে মাঝে সেনানিবাসে যেতাম ওখানকার অফিসার্স ক্লাবে। জায়গাটাকে শান্তির বা সৌন্দর্যের একটা কেন্দ্র বলা যায়। ওখানে ভাল পার্টি, লেট নাইট পার্টি হতো। ওখানে আমরা ঘরোয়া আলোচনাতেও বসতাম। আর সেসব আলোচনা থেকে বোঝা যেত এরকম কোন পরিকল্পনা, মানে এই ধরুন... এমন কিছুর পরিকল্পনা ছিল না।

◆ আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্থানীয় সহকর্মীদের সাথে এ ধরনের মতবিনিময় করতেন?

▲ নিশ্চয়ই। আমি আমার সকল সহকর্মীর সাথেই আলোচনা করতাম। তাঁদের বেশির ভাগই সিএসপি, তাঁরাই দেশ শাসনের কাজটিও করতেন...

◆ আপনি কি বুদ্ধিজীবী হত্যা বা এরকম কিছু ঘটনার কথা জানেন?

▲ না, গভর্নর হাউসের কর্তাদের সম্পর্কে আমার তেমন কোন আইডিয়াই নেই, কালেভদ্রে তাঁরা ইন্টারকন্টিনেন্টালে তশরিফ আনতেন...

◆ আর তথ্য দিতেন?

▲ না, আমার এ বিষয়ে কোন ধারণাই নেই।

◆ রাও ফরমান আলী আমাদের বলেছেন, তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে তেমন বেশি কিছুই জানতেন না। মানে আমরা বলতে চাই যে, বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে বা এ ধরনের আরও বিষয়ে তিনি জানতেন না এ কারণে যে, তিনি কাজ করতেন সিভিল বিষয়াদি নিয়ে, আর জেনারেল নিয়াজী নাকি সব সিদ্ধান্ত নিতেন, প্রতিটি সিদ্ধান্তই নাকি নিতেন তিনিই। তাই রাও ফরমান আলী...

▲ একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যে তখন ঢাকায় ছিল, কী করে এমন ভান করতে পারে... নাক টিপলে দুধ বেরোয় এ রকম নালায়েক শিশুর মতো সে কি দিব্যি বলতে পারে যা ঘটছে তার কিছুই জানে না সে! আর আমি তো কোন গবেটের কথা বলছি না, একজন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বোঝে এমন বালেগ মর্দের কথাই তো বলছি! কেন সে এমন মিথ্যাচারের আশ্রয় নেবে? এ সবের কী আর দরকার? আমরা নুরুল আমিনের আমলে এটা দেখেছি, দেখেছি গোলাম মোহাম্মদের সময়ে। এসবে তাঁদের নির্বিকার থাকতে, এরকম নির্বিকার হয়ত বা ছিলেন দেশের একজন প্রেসিডেন্টও। তিনি হয়ত বলতেন, পূর্ব ও পশ্চিম যেদিন বিচ্ছিন্ন হবে, ঐক্যের বন্ধন যেদিন ভেঙে পড়বে আমি যেন সেদিন অবধি বেঁচে থাকি! তিনি হয়ত বলতেন, আমি যখন ব্যবস্থা নিয়েছিলাম সবাই আমাকে সমর্থন জানিয়েছে। তবু হয়ত বা তার নেয়া ব্যবস্থা সফল হবে না! অন্য কথায়, তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হলো, বিচ্ছিন্নতা সম্ভবত অনিবার্য কিন্তু সেটি আসতে হবে লড়াইয়ের মাধ্যমে, কূটাঘাত দিয়ে নয়, বরং গৃহযুদ্ধ পেরিয়ে বিচ্ছিন্নতার পথ দিয়ে।

◆ এটি কি জেনারেল রাও ফরমান আলীর ধ্যান-ধারণা হওয়া সম্ভব?

▲ সম্ভবত আমি তাঁকে পেয়েছি একজন বেশ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে। যখনই আমি তাঁর কাছে গিয়েছি তাঁর সহযোগিতা পেয়েছি। আপনি তো জানেন, আমি বিদেশী সাহায্য-সহায়তার কাজে জড়িত ছিলাম। আমার কাজ প্রধানত ছিল বিশ্বব্যাংক মিশনের সঙ্গে। বিশ্বব্যাংক থেকে যেসব মিশন আসত আমি সেসব মিশন বা প্রতিনিধিদলকে দেশের ভিতরে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যেতাম। এসব কাজে যখনই আমি রাও ফরমান আলীর কাছে নানা সুযোগ-সুবিধের জন্য সহযোগিতা চেয়েছি তিনি আমাকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি সব সময়েই তাঁকে এমন এক মানুষ মনে করতাম যাঁর সাথে সেই সময়কার ঢাকার অন্য সব সেনা অফিসারের তুলনায় ঢের যুক্তি দিয়ে কথাবার্তা বলতে পারা যায়। আমার একটা ঘটনার কথা মনে আছে। লোকটা পদমর্যাদায় একজন ব্রিগেডিয়ার। সেদিন সেনানিবাসে একটা বেশ বড় আকারের পার্টি চলছে। আর আমি মৃদু আলাপচারিতায় বলতে চেষ্টা করছিলাম, আপনারা কেন এই সেনানিবাসে উপস্থিত সিভিল

অফিসারদের বকাঝকা করছেন! সেই ব্রিগেডিয়ার সাহেব জবাবে জানালেন, এটাই তো কালো থেকে ছাইরঙা এবং তা থেকে সাদা হবার সময়। আমি বললাম, বরং এ সময়টা হলো দরজা বন্ধ করে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক হওয়ার। তিনি টানা জবাবে জানালেন, সেটা এর পরে। সাধারণত কথা কাটাকাটিতে যাওয়া আমার স্বভাব নয়। তবে তখনকার বরাবরের প্রতিক্রিয়াটি ছিল এরকম যে, ব্রিগেডিয়ার বাবাজিকে একটা পোষা ভেড়া বলেই মনে হচ্ছে। আসলেও এহেন ব্রিগেডিয়ার কাদেরই হলো প্রথম রত্ন যে অবতরণরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে প্রথম আত্মসমর্পণ করে! যখন ভারতীয় ছত্রীসেনারা অবতরণ করছিল এই ব্রিগেডিয়ার বাহাদুরই প্রথম মূল্যবান সংবাদটি দেন যে, চীনা ছত্রীসেনা অবতরণ করছে। আর যেখানে ওরা অবতরণ করছিল ব্রিগেডিয়ার কাদের সদলবলে তাঁর গাড়িগুলোর সব হেডলাইট পুরো জ্বেলে দিয়ে আলোর দেওয়ালিতে বোধ করি তাদের অভ্যর্থনা জানাতে গেলেন। কিন্তু পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে। ওরা ছিল ভারতীয়, ঘেরাও হলেন তিনি আর পত্রপাঠ আত্মসমর্পণ! ব্রিগেডিয়ারের মাথা বিগড়ে যাবার মতোই তখন গোটা প্রশাসনের বেহাল দশা, সবকিছু এলোমেলো। প্রশাসনে যুক্তি বলে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ তখন পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে বলার ছিল না, ওখানে যা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদের কণ্ঠ শোনা যায়নি। ওখানকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকার লম্বা লম্বা ফিচারে আবেগাশ্রয়ী নানা কাহিনী ফাঁদা হচ্ছিল এ্যাকশনের সপক্ষে। সবকিছুতেই চলছিল কপটাচার। উর্দু পত্রিকাগুলোতে তো বটেই, *নওয়া-ই-ওয়াক্ত*-এর কথা শুধু আলাদা, এমনকি *ডন*-এর মতো নিরপেক্ষ কাগজও মুখ খুলছিল না পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে তা নিয়ে। তখন ভারত ছাড়া আর কোন ইস্যু ছিল না। ভারত ছিল এই সঙ্কট উদ্ভূত ভস্মপাতের শামিল। ভারত এ সমস্যা তৈরি করেনি। ভারত কেবল এ সমস্যার সুযোগ নিয়েছে। নির্বাচিত কোন নেতাই এ নিয়ে সরব হয়নি। দেশ জুড়ে কোন আদালত, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, মায় শাসনতন্ত্র, আইন, এটা-ওটা কোন কিছু থেকেই কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। প্রকাশ্যে তখন নরহত্যা চলেছে, নানা অঘটন, ত্রাস ঘটছে... প্রতিক্রিয়া কিছুই হচ্ছে না। কারও গলায় কোন প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে না। এমনি পরিস্থিতিতে যখন আইন পরিষদের ৮২টি আসন শূন্য হলো তখন সবাই নেমে এলো চিল, শকুনের মতো, হামলে পড়ল খালি আসনগুলোর ওপর। আসন নিয়ে ঘোর লড়াই শুরু হলো। ফরমান কথাটা জানালেন। তিনি প্রার্থীদের আসন, মার্কার বিলি-বণ্টন করছিলেন। জামায়াত-ই-ইসলাম, পিপিপি, মুসলিম লীগ... এসব দলকে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছিল। পিপিপি মার্কা হিসাবে চাচ্ছিল 'ট্যাঙ্ক' বা এ জাতীয় কিছু, জামায়াত অন্য আরেকটা, মাহমুদ আলী কাসুরী চাচ্ছিলেন 'ডিনামাইট'। এসব দেখেশুনে ফরমান আলী মশকরা করলেন, আপনার তো ট্যাঙ্ক প্রার্থী রয়েছেই, আমি তো আপনাকে আর... দিতে পারি না!

আসলে ওরা সব বেহায়া লোক, নির্লজ্জ! ওদের কথাবার্তা এরকমই! ঐ রকমই কাজ-কারবার ওদের।

◆ তিনি আহম্মদ রাজা কাসুরী নয়তো?

∆ না, একেবারে নির্ভেজাল মাহমুদ আলী কাসুরী! তিনি তখনকার দিনে পিপিপি নেতা ছিলেন। হ্যাঁ, আরও একটা কথা মনে রাখার মতো! তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে মানবাধিকার

কমিশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন। তিনি যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন তা তাঁর বরাত হিসাবেই বলা হয়েছে। তাঁদের মতো 'চিজের' মুখ দর্শন আমি করতে চাই না। মওদুদী, দৌলতানার বরাত আমি দিয়েছি—তিনি তাঁদের সমগোত্রীয়। তিনিই বলেছিলেন : পূর্ব পাকিস্তান বিলকুল ঠিকঠাক, সেনাবাহিনী সেখানে বেশ ভালই করছে। মানবাধিকারও রয়েছে বহাল তবিয়তে। এসবের কারণেই আমি তাদের চেহারা তুলে ধরতে চাই, আমি তাদের কপটচারী বলি। কেউ সেদিন কথা বলেনি।

◆ তা এখনকার অবস্থা কী? মানে বলতে চাই কোন কিছু প্রতিক্রিয়া এতদিনে বেরিয়ে এলো কি না?

▲ হ্যাঁ, এরকম কিছু হয়েছে তবে তা ভিন্ন ধরনের। হয়েছে, নানা রকমের নাটাইয়ের সুতো চালাচালি হয়েছে, আবেগের ঘোঁট পাকানোও হয়েছে... এসব আর কি!

◆ কিন্তু এসবে শেষ পর্যন্ত কিছু হচ্ছে কি? এখন তো এক ধরনের বিতর্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখানে? কী সব বিতর্কের কথা আপনি জানেন?

▲ এখন সবাই তার নিজের নিজের বয়ান ফাঁদছে। আর নিয়াজীর বইটা বেরোবার পর অনেক কথার খৈ ফোটা শুরু হয়েছে। খবরের কাগজে সব লেখা বেরোচ্ছে। কেউ নিয়াজীকে সমর্থন জানাচ্ছে, কেউবা রাও ফরমানকে, কেউ বলছে এটা, কেউ বলছে ওটা ঠিক নয়। এর আরও একটা দিক আছে। *নিউজলাইন* পত্রিকায় আই এ রহমানের নিবন্ধের কথাই আমি বলছি। তিনি ওতে বলেছেন, বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ওদের কাছে আমাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। এতে কেউ বলছে—না, আমরা এমন কিছু করতে পারি না। তবে সে যা-ই হোক, যা কিছু আমি বললাম তার সবই আপনাদের সংবাদপত্রের ব্যাপার। এ রকম ব্যাপার সবসময়েই ঘটবে। তবে ডানপন্থীদের কিছু অভিমত রয়েছে। তাঁদের মতে, এসবের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয় হলো, ওখানে হিন্দু প্রভাব অতি বেশিমাত্রায় ছিল যা ঐ জনসমাজের জন্য ক্ষতিকর। মূলত এ হলো মানসিক অবস্থা। তবে সে যা-ই হোক, বাড়াবাড়ি, অত্যাচার ঘটেছে। লোকজনের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে। তারা (পাকিস্তানীরা) সুআচরণ করেনি। তাদের মাঝে সদিচ্ছা ছিল না। আর ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলছেন? আমার মনে হয় তার সময় হতে এখনও অনেক দেরি। কেননা, জখম এখনও তাজা। বিশেষ করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জন্য তো বটেই। সেনাবাহিনী পাকিস্তানীর জীবনের এক বাস্তবতা। এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী। ক্ষমা চাওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে ঠিকই তবে এরকম বিতর্কিত বিষয় এখনি অবতারণার নয়! এটি হবে, তবে রয়েসয়ে।

● জনাব হাসান জহির, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার বইয়ের মতামত তো আমাদের আগেই জানা ছিল, আজ আরও নতুন কিছু জানা হলো।

সৈয়দ আলমদার রাজা

[সৈয়দ আলমদার রাজার জন্ম রায়বেরেলীতে, শিক্ষা লাভ করেন আগ্রায়, পাকিস্তানে আসেন ১৯৪৭ সালে। ১৯৫০ সালে যোগ দেন সামরিক বাহিনীতে। ১৯৫১ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করেছেন পাঁচ বছর। ১৯৭১ সালের মে মাসে ঢাকার কমিশনার পদে নিয়োগ লাভ করেন। যুদ্ধবন্দী হিসাবে ভারতে অবস্থান করেন তিন বছর। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে ফেরত যান। ১৯৮৮ সালে তাঁকে চাকরি থেকে অবসর দেয়া হয়। ১৯৯০ থেকে লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা তাঁর "ঢাকা'স ডিবাকল" প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় ইসলামাবাদে তাঁর বাসভবনে।]

◆ জনাব রাজা, ঢাকায় বেসামরিক প্রশাসনের একজন কর্তাব্যক্তি হিসাবে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কি মেহেরবানি করে আমাদের বলবেন?

Δ '৭১-এর মে মাসে ঢাকায় চাক্ষুষ কিংবা অন্য কোনভাবে কোন বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব কার্যত ছিল না। অবস্থা তখন বেশ বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহ তখনও চলছিল; যদিও বিদ্রোহীরা তখনও পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারেনি, অস্ত্র ধারণের সমর্থ হয়ে ওঠেনি। তবে ওরা তখন চোরাগোপ্তা আঘাত হানার কৌশল অনুসরণ করছিল। বেসামরিক লোকজনের হাতে তখন যদি আইনসম্মতভাবে ও প্রশাসনিক উপায়ে কর্তৃত্ব তুলে দেয়া হতো তাহলেও সেই কর্তৃত্ব অনুশীলনের মতো অবস্থা তখন ছিল না। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব অফিসারকে পূর্ব পাকিস্তানে তলব করে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়—যারা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, বাঙালীদের সমর্থক ও শ্রদ্ধাভাজন—এমন লোকদেরই তখন পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করা হয়। আমরা জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি। তবে দেখা যায়, আমাদের প্রতি যারা বন্ধুভাবাপন্ন তাদের সাথেও আমাদের একটা ব্যবধান রয়েই গেছে। অবস্থা দাঁড়ায় এমন যে, একটা বেসামরিক প্রশাসন কায়েম করতে হলে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

বিদ্রোহের যা কিছু অবশেষ তখনও রয়ে গেছে, সেগুলো সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসার পরেই কেবল বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

◆ তখনকার দৈনন্দিন হালচাল সম্পর্কে বলবেন কি? কী ঘটছিল ঐ সময়?

Δ আমরা বলেছিলাম, আমাদেরকে আইন ও শৃঙ্খলা প্রথমে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আমার হাতে সেটি যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে আসে। একটা স্থিতির ভাবও ফিরে আসে। এ সময় দরকার ছিল

ক) সাধারণ ক্ষমা মঞ্জুর করা এবং

খ) কোন এক ধরনের একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাও চালু করার দাবি করা হচ্ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা চান। এই ছয় দফার পৌনে ছয় দফা ইতোমধ্যেই মেনে নেয়া হয়েছিল। এই ছিল মোটামুটি আইনসম্মতভাবে মেনে নেয়া অবস্থান। এই অবস্থান মেনে নেয় সকল রাজনৈতিক দল। শুধু দু'টি মাত্র ছোট বিষয় অমীমাংসিত ছিল। এ দু'টি বিষয় হলো—বিদেশী সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য। ঠিক এ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ভেঙে যায়। সামরিক ব্যবস্থা নিতে হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শেখ মুজিবুর রহমান পালিয়ে যাননি, আর সবাই যান। তিনি পালানোর সিদ্ধান্ত নিলে তাঁকে প্রতিহত করার কেউ ছিল না। অনেকের মতো আমারও বিশ্বাস, তিনি সহজেই পালিয়ে যেতে পারতেন। আমি মনে করি, তিনি পালিয়ে যাননি এ কারণে যে, তিনি যদি পালিয়ে যান তাহলে প্রচুর লোকের জীবনহানি ঘটবে, অনেক ভাংচুরের ঘটনা ঘটবে। যেন তাঁকে পাওয়া যায় এটাই তিনি চেয়েছিলেন। আমি মনে করি, আলোচনা যে ধরনেই হোক না কেন শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশী সাহায্য ও বাণিজ্যের ব্যাপারে ছাড় দিতে তৈরি থাকতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজেই আলোচনা আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। অবস্থা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, দু'জন লোক, একজন জহিরুদ্দিন ও অন্যজন (আপনাদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, কী নাম যেন তাঁর?) শাহ আজিজুর রহমান—এঁরা থেকে যান। এঁরা দু'জনই ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থাভাজন। কাজেই মোটামুটি সব কিছু ছিল ঠিকঠাক। কোন রাজনৈতিক ইস্যু কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন সমাধান যদি তাঁদের মাথায় থেকে থাকে এবং তা আলোচনা করতে চান তাও হতে পারে। এই তিনজনে এ বিষয়ে একটা কিছু নিষ্পত্তিতেও আসতে পারেন। কিন্তু আন্তরিকভাবে কখনও এটি বাস্তবায়িত করা হয়নি। জহিরুদ্দিন ও শাহ আজিজুর রহমান উভয়েই আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন, আমি এ বিষয়ে উদ্যোগ নিই আর তাঁদের দেয়া সমাধানের বিষয় কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ উভয় তরফের গোচরে আনি। আমি তাঁদেরকে এই মর্মে পরামর্শ দিই যে, আমি তো রাজনীতিবিদ নই, একজন প্রশাসক মাত্র। কেননা, রাজনীতির এমন কিছু সূক্ষ্ম ব্যাপার-স্যাপার আছে যা তাঁদেরই ভাল জানা। আমি সেসব বুঝে উঠব না। সেজন্য আমি তাঁদেরকে জানালাম, নূরুল আমিন এখন ঢাকায় রয়েছেন। তাঁর সাথে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে তাঁদের আলোচনা করা উচিত। তবে যদি কোন প্রশাসনিক বিষয় থাকে, তাহলে সে আলোচনায়

সানন্দে আমি সম্মতি জানাব। তাঁরা বললেন, নূরুল আমিন তাঁদের প্রতিপক্ষ, কাজেই তাঁদের সাথে আলোচনা করা যাবে না। তাঁরা আরও বললেন, আপনি কোন রাজনীতিক নন এ কথা মেনে নিয়েও আমরা বলব, আমাদের বক্তব্যটুকু আপনি কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করবেন। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে। আপনাদের বার্তা আমি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছে দেব। তাঁরা আমাকে যে বার্তা দিলেন, তা হলো একটা প্রস্তাবিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা। আমি বললাম এটা নিয়ে কী করতে হবে? তাঁরা বললেন, এটি টিভিতে ঘোষণা করতে হবে। টিভিতে এটি প্রচারিত হলে লোকজন আসবে, তারা সরকার গঠন করবে। আমি ওদের বললাম, আমার কাছে খবর রয়েছে তারা ইতোমধ্যেই ভারতে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা আমার এ কথার প্রবল প্রতিবাদ জানালেন, বললেন কথাটি আসলে সত্যি নয়। কিছু লোক পালিয়ে গেছে একথা ঠিক, তবে বহু লোক এখনও তাদের গ্রামেই রয়েছে, বনে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। এখন আপনারা ওদের কিছু রাজনৈতিক উপায়ের ব্যবস্থা করুন। ওরা বেরিয়ে এসে সরকার গঠন করবে। আর এর একটা পূর্বশর্ত হিসাবে সাধারণ ক্ষমার কথা ঘোষণা করতে হবে। এ বার্তা গভর্নরসহ সকল স্তরে ও সবাইকে পৌঁছে দেয়া হলো, আর এর ফলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমা ঘোষণাও করলেন। তবে সে ঘোষণা 'যদি' ও 'কিন্তু'তে এতই কণ্টকিত ছিল যে ঐ ঘোষণা কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে। কারও কিছু সুবিধা হলো না এতে। আমাদেরও মনে হলো, কোন উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হবে না এ ঘোষণায়। এরপর থেকে যায় রাজনৈতিক পর্যায়ে ছাড় দেবার মতো কিছু উপায়, যেটায় কিছু কাজ হতেও পারে। এভাবে দেখা যাবে, যে দু'টি মৌলিক উপাদানের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতে পারত সে দু'টির কোনটিকেই কাজে লাগানো হয়নি। অনেকে বলেছে, ছয় দফার মাত্র সিকি দফার নিষ্পত্তি হয়নি। তাই যদি হয় তাহলে আর কী! ঐ সিকিভাগটা বাদ দিয়েই গোটা নিষ্পত্তির ব্যাপারটা ঘোষণা করে দিলেই তো হতো। আপনারা যা কিছুই বলেন, যে রাজনৈতিক পদ্ধতিই আপনাদের বাঞ্ছনীয় হোক না কেন আপনারা সেটির জন্যও ঐ কাজটি করেননি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হতে থাকে। মে মাসেও মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা তেমন সুগঠিত হতে পারেনি। আমি বরং বলব এমনকি জুন-জুলাই মাসেও মুক্তিবাহিনী তেমন সুসংগঠিত ছিল না। আমার ধারণা, জুলাই মাসের শেষ নাগাদ একটা রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করা হবে, সত্যিকার অর্থে সাধারণ ক্ষমার কথা ঘোষণা করা হবে—এ রকম আশা-ভরসা শেষ হয়ে যায়। মানুষ নিজেরা সংগঠিত হতে শুরু করে। ভারতও বড় আকারে সাহায্য সহায়তা দিতে শুরু করে। তারা সম্ভবত মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করে এই বাহিনীকে তাদের নিজ সামরিক বাহিনীর কমান্ড কাঠামোতে সম্পর্কিত করে নেয়। সেপ্টেম্বরের পর থেকে খুব বড় আকারে হামলা শুরু হয়। আর সময় এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ ধরনের আক্রমণ আরও তীব্র হতে থাকে।

◆ ওরা কি সামরিক বিকল্পের জন্য গোড়া থেকেই তৈরি ছিল? এ ব্যাপারে আপনার অনুমান বা ধারণার কথা বলবেন?

Δ দেখুন, এটা কোন বিকল্প ছিল কি না, আর সেজন্য গোড়া থেকেই তৈরি ছিল কি না সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই।

◆ আমাদের এ ধারণার কারণ, ২৫ মার্চে গৃহীত ব্যবস্থাদি থেকে মনে হয় এই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর আসবে এক দমনমূলক শাসন। তাই...।

∆ আমি এর অত্যন্ত সদুত্তরই দেব আপনাকে। অমি বলতে পারছি না এটা ওদের মনে আগের থেকেই ছিল কি ছিল না। তবে এ বিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে—সেগুলো সম্পর্কে মানুষের বেশ ব্যাপক পর্যায়ে বিশ্বাসও রয়েছে। প্রথম অভিমতটি হলো—পশ্চিম পাকিস্তানে বহু লোক পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাচ্ছিল। তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল, দেশের দুই অংশ একত্রে থাকলে কাজ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় ধারণাটি এই যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে ইসলামের ভিত্তিতে। আর সে কারণে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা গ্রহণযোগ্য ইসলামের অনুসারী এবং তেমন এক শাসনব্যবস্থা বলবত করতে হবে। আর সেজন্য যা প্রয়োজন হোক তেমন ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। তৃতীয় ধারণা ছিল এই যে, এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকতে হবে যা প্রতিষ্ঠিত থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সম্মতির ওপর। এ রকম একটা পদ্ধতি বাস্তবায়িত করতে হবে। আমার মতে, এই তৃতীয় বিকল্পটি ছিল সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান। তাই, ছয় দফার যা কিছু অমীমাংসিত বিষয় থেকে যায়, তার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল দেশের দুই ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। আর পূর্ব পাকিস্তানে তখন তাঁরা ছিলেনও। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এই আপোস নিষ্পত্তির কাজটি করা হয়নি। এখন ইসলাম কী চায়, কী নির্ধারণ করে—শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা আরোপ করার বিষয়টি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এ কারণে যে, এ ধরনের প্রয়াস নিছক এবং তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। কোন কোন লোকের বিশ্বাস ছিল যে প্রতিটি জিনিস নিয়েই তাঁরা ঝামেলায় পড়ছেন। প্রশাসনের কাজ ঠিকমতো চলছে না। সম্পদের বণ্টন যথাযথ হচ্ছে না, রাজনীতিও চলছে না সঠিক পথে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মহলের লোকজন যখন এক জায়গায় বসেছে তখন দেখা গেছে প্রায় অবিকল সেই ১৯৪৭ সালের পরিস্থিতি। তখন মুসলিম ও হিন্দুরা দেখা যেত একত্রে বৈঠকে বসছে কিন্তু প্রচুর হৈহল্লা ও গোলমাল ছাড়া কাজের কিছুই হচ্ছে না, নিষ্পত্তি হচ্ছে না কোন কিছুরই। উন্নয়ন কার্যক্রমের বিষয় হোক, প্রশাসনের ব্যাপার হোক—কোন সুরাহা ছাড়াই প্রতিটি সভাই ভণ্ডুল হতো। এভাবে সেনাবাহিনীর ইস্যু হোক কিংবা প্রতিরক্ষা বাহিনী হোক, কিংবা পাকিস্তানের দুই অংশে বিভিন্ন সংস্থার সদর দফতর স্থাপনের বিষয় হোক, মোটকথা যাই হোক, তাতে সমস্যা দেখা দেবেই। এ রকম একটা অসহনীয় পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন মহলে এ রকম কথাবার্তা ওঠে যে, যা হবার নয়, তা করারও দরকার নেই। এ রকমই অভিমত ছিল ওদের। তবে এ ধরনের চিন্তাভাবনা মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ও কর্মকর্তার মধ্যে সীমিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মমত্ববোধ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজনের যদি কখনও কেউ বলে থাকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের বোঝা নামাতে চাই তখন তাকে ওরাই বলেছে তোমার দেহের হাড্ডি আস্ত রাখব না। এ হলো যা কিছু বলার। এখন আপনি আমাকে প্রথম অভিমতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চান তো? আমি আপনার জিজ্ঞাসার জবাব নিশ্চয়ই দেব।

◆ **আর সব বিকল্প যদি নিঃশেষিত হয়েই থাকে সেই পটভূমিতে এ প্রশ্ন আমি আপনাকে করছি। কেননা দৃশ্যত মনে হয় সামরিক বিকল্প বেছে নেয়া হয় ২৫ মার্চে। সেদিন ওরা সামরিক কার্যব্যবস্থা নেয় যার অর্থ ও তাৎপর্য ছিল এ ব্যবস্থা পরেও চলবে, আর এ অনুসৃতির কাজটি করবে এক বেসামরিক কর্তৃপক্ষ। যে সব অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার রিপোর্ট হয়েছে সেই সব ঘটনায় আসলে অত্যাচার-নিষ্ঠুরতা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে আপনি কি খোঁজখবর নিয়েছিলেন? এ সব খবরাখবর কতটু সত্যতাভিত্তিক?**

∆ পূর্ব পাকিস্তানে আমাকে নিয়োগ দেবার সময় আমি আমাদের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠি দিয়েছিলাম এই বলে যে, আপনারা যে উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন তা আমার বোধগম্য নয়, আমার মাথায় আসছে না এ সব। আমি মনে করি, পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমি এখন ওখানে যেতে অস্বীকার করতে পারতাম। তবে সে ক্ষেত্রে আপনারা ধরে নিতেন যে আমি একজন কাপুরুষ; আমি সেখানে যাচ্ছি না কারণ ওখানকার পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এদের আমি জানিয়ে দিই আমি যাচ্ছি ওখানে তবে এ জন্য নয় যে, আমি আপনাদের কাজে লাগব। আমি যাচ্ছি এ জন্য যে, আমি এমন বদনাম নিতে চাই না যে আমি একজন কাপুরুষ, আমি ওখানে যেতে ভয় পাই। তবে আমি ওদেরকে অত্যন্ত পরিষ্কার জানিয়ে দিই যে, ১৯৭১-থেকে আমি বরাবর একটা ধারণা পোষণ করে আসছি। আমার সে ধারণা হলো, গোটা ব্যাপারটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই হতে পারে। সৈনিকের হাতে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তবু এমন কিছু লোক ছিল যাদের ধারণা ছিল, বিদেশী সাহায্য ও বাণিজ্যের ব্যাপারে সম্মত হওয়ার জন্য যে চাপ দেয়া হচ্ছে সে জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের পেটানো উচিত, ওদের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়া উচিত। আমি অবশ্য এ ধরনের ধ্যান-ধারণা সমর্থন করতে পারি না। আর তাছাড়া এ পর্যায়ে তো নয়ই কেননা আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছাই তখন ইতোমধ্যেই সেখানে সেনাবাহিনীর অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু করা আমার সাধ্যে ছিল না। তাছাড়া, এও কোন বাস্তবসম্মত ধারণা নয় যে, সেনাবাহিনীর অভিযান বন্ধ হওয়া উচিত। সামরিক অভিযান, আগেই বলেছি, ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ও তার ফলাফল খুবই গুরুতর। এখন যা করণীয় তা হলো যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তার নিরাময়ে পরিচর্যা করা যায়। আর সার্বিকভাবে যা করা যায় তা হলো, ক্ষত যাতে ক্যান্সারে না গড়ায় তা দেখা। তাই আমার প্রথম প্রয়াস ছিল এ ক্ষতের চিকিৎসার। ক্ষতে মলম লাগানো দরকার। আর তাই আমি এ জন্য দু'টি প্রস্তাব করেছিলাম—(১) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে হবে ও (২) একটা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান বের করতে হবে। আর যারা নির্বাচিত ও গা-ঢাকা দিয়ে আছে বনে-জঙ্গলে কিংবা তাদের নিজ গ্রামে তাদেরকে এনে তাদের দিয়ে সরকার গঠন করতে হবে। তখন কেন সামরিক বিকল্প বেছে নেয়া হয়েছিল, সে কথা আমি বলতে পারি না। কিন্তু এতকিছুর পরেও বাস্তব সত্যটি হলো এই যে, সামরিক বিকল্প ব্যবহার করা হয়েছিল। আর তা থেকেই পরিষ্কার—কারা এ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য দায়ী ছিল।

◆ **অসামরিক লোকজনের ওপর অত্যাচার দমনমূলক কোন ঘটনা ঘটানো হয়েছিল কি?**

∆ প্রচুর অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটেছে নিঃসন্দেহে। সামরিক অভিযান আর যা-ই হোক কোন তামাশা নয়। সৈন্যদের শাসনে একজন সাধারণ সৈনিকের যা খুশি তা-ই করার অধিকার থাকে। আর সে অধিকার প্রয়োগের বেলায় কোন নিয়ন্ত্রণই থাকে না। ঐ সৈনিকটি যা খুশি করতে পারে, যে কাউকে হত্যা করতে পারে, যে কারও ওপর গুলি চালাতে পারে, যে কাউকে ধর্ষণ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাই ঘটেছে। রাশিয়ায় জার্মান বাহিনীর অগ্রাভিযানের কাহিনী তো ভোলার নয়। অপারেশন বারবারোসা'র কথা কি আমরা ভুলে গেছি! বার্লিনের ওপর আক্রমণ অভিযানের কথা কি কারও মনে নেই! সে সময় বার্লিনে কার্যত এমন কোন মহিলা ছিল না যাকে ধর্ষণ করা হয়নি। ওখানে তখন আক্রমণকারী তিনটি বাহিনী পৌঁছায়। কসাক সৈন্যদের মাঝে এ রকম একটা বিশ্বাস ছিল তারা যদি তাদের বয়সী মহিলাদের ধর্ষণ করে তাহলে তারা ওদের মতো ৮০-৯০ বছরের আয়ু লাভ করবে, দীর্ঘজীবী হবে। একবার সেনাবাহিনীকে ছেড়ে দেয়া হলে, একবার তাদেরকে অভিযানে নামানো হলে এসব জিনিস এড়ানো যাবে না। আর সে জন্যই দরকার ছিল যত শীঘ্র পারা যায় সেনা অভিযান বন্ধ করা ও আইনসিদ্ধ অসামরিক কর্তৃপক্ষের শাসন বলবত করা যাতে এসব ঘটনার কার্যকর প্রতিকার সম্ভব হয়।

◆ তা উনিই তো, রাও ফরমান আলী, আমাদের জানিয়েছেন কোন অত্যাচার-নিপীড়নের ঘটনা ঘটে থাকলে সেটা আপনারই নাকি জানার কথা?

∆ তিনি যদি তা বলে থাকেন, আমি বলব সেটা তাঁর অভিমত। তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন সেভাবে তিনি বলতে পারেন। আমি তাঁর সাথে একমত নই। আমি '৭১-এর ঘটনা সম্পর্কে বই লিখেছি *Dhaka's Debacle* নামে। আমি ঐ বইয়ের একটা কপি আপনাকে দিয়েছি। ঐ বইতে আমি উল্লেখ করেছি এ সব ঘটনা ঘটেছে। কেনইবা ঘটবে না এসব! সেনাবাহিনীকে একবার কোন অভিযানে নামানো হলে এসব ঘটনা ঘটবেই।

◆ আপনি কি দৃষ্টান্ত হিসাবে এমন কিছু ঘটনার কথা বলবেন?

∆ দেখুন এজন্য সবচেয়ে ভাল হবে আমার বইটি দেখা। তবু আমি আবারও বলি। আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তখন উপসচিব ছিলাম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক ভদ্রমহিলা কাজ করতেন। তাঁর নাম মিসেস হোসেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন। পরে (আমি তাঁর স্বামীর নাম মনে করতে পারছি না) তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। আর কখনও তিনি ফিরে আসেননি। আমি ঢাকায় দায়িত্বে ফিরে এসেছি (বইতে আমি এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। সেখানে নামগুলো দেখা যেতে পারে।) জেনে ঐ ভদ্রমহিলা আমার সাথে দেখা করতে আসেন ও তাঁর স্বামী কোথায় সে কথা আমার কাছে জানতে চান। তাঁর স্বামীকে তাঁদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি তাঁকে বললাম, সেনাবাহিনীর লোকজনের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন? তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা জানান, বলেছেন। ওরা বলেছে, আমরা আপনার স্বামীকে ধরে এনেছিলাম। তবে প্রয়োজনীয় জেরা করে দেখার পর আমরা তাকে বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। গাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতে ওরা আরও বলেছে, ওর যে গাড়ি ছিল সেটি অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয় ও তদন্তের পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। অথচ তিনি কখনও বাড়ি ফেরেননি। বরং মহিলার খবর হলো, তাঁর স্বামীকে হত্যা করে তার লাশ কবর দেয়া হয়েছে।

এই ভদ্রমহিলার জামাই ছিল আমার ব্যক্তিগত সহকারী। আমি এ সব বিস্তারিত লিখেছি আমার বইয়ে।

◆ এই বইয়ে আপনি যেসব বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তার বাইরেও তো বিভীষিকাময়, বীভৎস, ভয়ঙ্কর আরও ঘটনার নজির ছিল, যার বিবরণ আপনার কলমে আসেনি?

▲ আমার কিছুতে ভয় নেই। আমি একজন পাকিস্তানী। পূর্ব পাকিস্তানকে আমিও ভালবাসতাম। ওরা আমাকে সেখানে পাঠায়। আমি কেন কোন কিছু নিয়ে ভয়-ভীতিতে থাকব? আমি যখন এ সব কথা লিখেছি, তখন ওরকম কাজ ছিল রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ। তবু আমি কথাগুলো বলেছি, আর বলার জন্য আমি আমার চাকরি হারিয়েছি। তাহলে আপনার কেন মনে হচ্ছে আমি কিছু বলতে ভয় পাচ্ছি? আমি বলতে ভয় পাই না। তবে যখন ওসব ঘটনা ঘটছিল তখন বাঙালী বন্ধুদের কাছে আমার যাওয়া-আসা ছিল। ওরা আমাকে এ ধরনের অনেক ঘটনার কথা বলেছে, যদিও এ সবের সুনির্দিষ্ট তথ্য আমাকে দিতে পারেনি। তবে ওরা সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে থাকলে সেগুলোর উল্লেখ করেছি। আমি এ ধরনের কোন কিছু গোপন করিনি। কেন তা করব?

◆ আমাদের প্রশ্ন কিন্তু তা ছিল না। আমরা পরোক্ষেও বলতে চাইনি যে, সব কিছু বলার মতো সাহস আপনার ছিল না। আমি বরং বলতে চেয়েছি এ কথাই যে, ও ধরনের আরও ঘটনা ঘটেছিল কি না?

▲ এ রকম শত শত ঘটনাই ঘটেছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে সে সব ঘটনার কথা আমি অবগত নই। মোটামুটিভাবে কানে আসছিল এসব ঘটনা ঘটছে। তবে কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে আমার মনোযোগে এলে যেখানেই তা ঘটুক আমি তার উল্লেখ করছি। আমার অধীনে যে সব লোক কাজ করত তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। একটা নজির দিয়ে বলি। একবার আমি টাঙ্গাইলে যাই। এ সময় একজন অফিসারকে এভাবে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখা গেল সহকর্মীরা দাঁড়িয়ে ঐ অফিসারের অপেক্ষা আছে।

◆ ঠিক কোন্ সময় আপনার এই উপলব্ধি জন্মায় যে, যে জন্য যুদ্ধ সেই যুদ্ধের কোন যুক্তির অস্তিত্বই আর নেই?

▲ যখন ওরা আর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করল না, যখন ওরা বাঙালীদের সমর্থন যোগাড়ের স্বার্থেও কোন রাজনৈতিক সমাধানের ঘোষণা দিল না, তখন আমি বুঝতে পারি যুদ্ধ নিরর্থক। এ সময়টা সেপ্টেম্বরের শেষে আর অক্টোবরের প্রথম দিকে। যুদ্ধ তখনও শেষ না হলেও আমি সিদ্ধান্তে আসি, যুদ্ধে পাকিস্তানের আশা শেষ হয়ে গেছে। নভেম্বরের শেষের দিকে ভারত তরুণ ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের ভিতরে পাঠায়। ওরা পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে থাকে। হাজার হোক এ তরুণ ছেলেরা পেশাদার সৈনিক না হওয়ায় গোড়ার দিকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে থাকে। এ সময় মুক্তিবাহিনীর সদস্য তথা বাঙালী তরুণদের মাঝে এক ধরনের হতাশা দেখা দেয়। নভেম্বরের শেষ নাগাদ ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণাত্মক হামলার সময় ভারতীয় বাহিনীর সাহায্য-সমর্থন দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এ জন্য যশোর, কুষ্টিয়া ও আরও কয়েকটি জেলার সীমান্ত বরাবর সেনাসমাবেশ করে। এ ধরনের

আক্রমণের মহড়াস্থল হিসাবে তারা বয়রা সীমান্ত বরাবর এলাকা বেছে নেয়। এই বয়রায় ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। প্রথমে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা আক্রমণ করে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণে তাদের পিছু হটিয়ে দিলে এবার ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে আসে। এ যুদ্ধে সাঁজোয়া যান, সবকিছু নামায়। এ বিষয় খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তারা আর ফিরে যাবে না। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই পর্যায়ে পরিস্থিতি কতখানি গুরুতর বুঝতে পারে। তারা বিমানবাহিনীর সাহায্য চেয়ে পাঠালে তিনটি স্যাবার জেট জঙ্গী বিমানকে ভারতীয়রা গুলি করে নামায়। বস্তুত তখন আর ভারতীয়দের যুদ্ধের ময়দান থেকে সরানো সম্ভব হলো না। এখানে একটি বিষয় খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে, সত্যিকার অর্থে যথাযথ আক্রমণ পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষ থেকে চালানো হয়নি। অন্তত আমি তাই মনে করি। আর এও সত্যি, ভারতীয় বাহিনী ভিতরের দিকে এগিয়ে এলেও যুদ্ধের কোন ঘোষণা দেয়নি। কেন তারা বিষয়টিকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করেনি? যে সব ব্যবস্থা নেয়া দরকার ছিল কেন তারা নেয়নি—এ যেমন প্রশ্ন, তেমন দুশমনও কেন আইনবিরোধী অনৈতিকতার পথে এগিয়ে আন্তর্জাতিক আচরণ লঙ্ঘন করেছে, সেও এমন এক রহস্য যা আমার মাথায় আসে না।

◆ ঘটনার নেপথ্যের দিক সম্পর্কে আপনি অনেক কিছুই জানেন। তাহলে বলতে পারেন কারণগুলো কী?

Δ অনেক কাহিনীই প্রচলিত আছে। তবে সবচেয়ে বহুল প্রচলিত কাহিনী বা ধারণা হলো এই যে, সম্ভবত ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল এই মর্মে যে, পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত ভুট্টো ক্ষমতায় আসতে পারবেন না। এটি অন্যতম কারণ হতে পারে, কেননা ঐ সময় নাগাদ বাস্তবিক পক্ষেই দেখা যায়, ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে, আর মুজিবুর রহমান সেখানে নেপথ্যে পড়ে গেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনীর কব্জায় থাকলেও তাঁর সাহায্য কখনও কাজে লাগানো হয়নি, তাঁর সাথে কখনও অলোচনা, সলাপরামর্শ করা হয়নি। এ হতে পারে একটা কারণ, তবে সম্ভবত এ ছিল সমস্যার একটি দিক মাত্র। এর ওপর সম্ভবত আলোকপাত করে থাকতে পারে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট। আর এও হতে পারে, ঐ রিপোর্টে কিছু বিষয় ছিল এত সংবেদনশীল যে ঐ রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, রিপোর্টের কোন কোন অংশ প্রকাশ করা উচিত হবে না। এই যে এসব কথা বললাম এগুলোর ভিত্তি গুজব। আমি নিজে এ বিষয়ে জানি না। হয়ত আমার মতো সাধারণ মানুষের কাছে মনে হচ্ছে, ওটা প্রকাশ করা হয়নি এ কারণে যে, ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আঁতাত আসলেই ছিল, আর সেই বোঝাপড়া অনুযায়ী ওটার বিষয়বস্তু ফাঁস করা হয়নি। তবু আমার মতে এ যুক্তিও যথেষ্ট নয়। তখন যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন আমি তাঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে দেখেছি। এখন তাঁদের অনেকেই সরকারী দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। দেখা গেছে, তাঁরা মুখ খুলতে চান না। তাঁরা এটুকু বলেছেন, হতে পারে। আর স্রেফ ঐ পর্যন্তই। যিনি বা যাঁরা এটা প্রকাশ করেননি তাঁরা কর্তব্য পালনে ভীরু ছিলেন। আমি মনে করি এটিই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য জবাব।

◆ আপনি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের জন্য রিট করেছিলেন?

▲ করেছিলাম। তবে কেবল এ রিপোর্ট প্রকাশের জন্যই নয় বরং আমি দাবি জানিয়েছিলাম, যারা এসব অত্যাচার, ধর্ষণ, নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাদের সকলের বিচার হতে হবে। খোদ বাংলাদেশের হাতেই এ ধরনের ২০০ লোকের একটা তালিকা আছে। ফলত এগুলো কয়েকটি মাত্র করণীয়। যারা মারা গেছে সেই মৃত্যু যদি তাকে তার অপরাধের দায় থেকে মুক্তি না দেয় তাহলে সকল মৃত ব্যক্তিকেই অপরাধী ঘোষণা করতে হবে এবং তারপর এর আইনগত ফলাফল সেভাবে কার্যকর হতে থাকবে যেটা এখনও করা যায়।

◆ অনেকে বলেছেন, '৭১-এর ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একটা ট্রুথ কমিশন গঠন করা দরকার। এ ধরনের কমিশন গঠিত হলে যেসব ব্যক্তি সাক্ষ্য হিসাবে সত্য প্রকাশ করতে এগিয়ে আসবে কমিশন তাদেরকে ক্ষমা মঞ্জুর করবে। এই লোকেরা প্রকাশ করবে কী সব কুকীর্তি তারা করেছে! আপনি কি মনে করেন, এতে কোন কাজ হবে?

▲ আমার বিশ্বাস আমাদের বিচার বিভাগ এখনও চমৎকার। এখন পাকিস্তান সরকার ইচ্ছা করলে...।

◆ যারা অত্যাচার চালিয়েছে তাদের শাস্তি দেবার প্রস্তাব করছেন আপনি?

▲ আমাদের বিচারকরা সে কাজটা করতে পারেন। অবশ্যই।

◆ দণ্ডবিধান না করে আপনি যদি লোককে আসল কথা ফাঁস করতে দেন, তাদেরকে ক্ষমা করতে দেন সেইতো ভাল। তবে হ্যাঁ, ক্ষমা তারা পেতে পারবে কতদূর তারা গোটা সত্যি ট্রুথ কমিশনের কাছে তুলে ধরে সেই ভিত্তিতে।

▲ এটা করা যায়। এ সব লোককে সেক্ষেত্রে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে হবে—১. যাদের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের লেশমাত্র নেই, তাদের ব্যাপারে কোন সহানুভূতিসূচক বিবেচনার অবকাশ থাকবে না। তাদেরকে তাদের প্রাপ্য দণ্ডবিধান করতে হবে; ২. কিছু লোক পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় পড়ে বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু কাজ করেছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তারা তা করত না। এরা ভাল, চমৎকার লোক। এসব ক্ষেত্রে কিছু বিবেচনায় রাখা যায়, তাদেরকে কিছু একটা ছাড় দিতে হবে; ৩. যে সব ক্ষেত্রে সংশয়, সন্দেহ ও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে তাদের বেলায় আমাদের প্রচলিত আইনে বেনিফিট অব ডাউট বলে যে অবকাশ রয়েছে সেই অবকাশের সুবিধা দিতে হবে। এ সুবিধা আফ্রিকার মানুষের জন্য তেমন উপকার দর্শায়নি, কেননা ঐ আফ্রিকানরা নিরক্ষর, আর তাদের নৈতিকতা ও বিবেকের মানও তেমন নয়। পাকিস্তানের বিচারকরা এ মামলা তৈরি করবেন অত্যন্ত ন্যায্য ও নিরপেক্ষভাবে। আমি পাকিস্তানের হাই কোর্টে রিট আবেদন করলে মহামান্য হাই কোর্ট একদিনের মধ্যেই আমার সে আবেদন গ্রাহ্য করে। আমি আমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি পেশ করার পর অনতিবিলম্বে বিচারক তাঁর রায় লিখতে শুরু করেন। তাই মনে করি, এতে কোন সমস্যা হবে না। পাকিস্তানের বিচার বিভাগ দুর্বলচিত্তের নয়। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি, এই ২৬০টি মামলা বাংলাদেশের সরকার আনতে পারে।

◆ এ যে আসলেই ঘটবে তার সম্ভাবনা কতটুকু?

▲ এ ধরনের সম্ভাবনা নেই, কেননা আমার রিট আবেদনের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। কী এমন পরিস্থিতির চাপ যে এ বিষয়ে নিষ্পত্তি এখনও হতে পারল না? আমি তাই আশু নিষ্পত্তির আশা দেখি না, তবে এটি একদিন হবেই। এ এক অপরাধ। এ হলো আমাদের কপালের কলঙ্করেখা, কালো দাগ। যত শীঘ্র সম্ভব এ দাগ দূর হওয়া দরকার। মর্যাদাবান জাতি হিসাবে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এটি করতে হবে। আর যত তাড়াতাড়ি তা হয় ততই মঙ্গল। অন্তত আমি মনে করি, এটি না করলে অপরাধ চেতনা আমাদের সবসময় তাড়া করে ফিরবে।

◆ আপনাদের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ '৭১-এর ঘটনায় অনুশোচনা প্রকাশ করে বলেছেন, '৭০-এর নির্বাচনের রায় মেনে নেয়া হলে ইতিহাস ভিন্ন হতে পারত।

▲ প্রধানমন্ত্রীর এ বিবৃতি অত্যন্ত সুবিবেচনাপ্রসূত। নির্বাচন হলো জনগণের রায়ের বাহক। কেউ সে রায় বদলাতে পারে না। সে এখতিয়ার তার নেই। নির্বাচনে অনেকে জয়ী হয়ে নির্বাচিত হয়, আমি তাদের পছন্দ না করতে পারি, আমার বিবেচনায় তারা অনুপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু লোকে তাদের ভোট দিয়েছে। কাজেই আমি নির্বাচিত লোকদের খারাপ, অনুপযুক্ত বললেও কিছু আসে যায় না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ১৯৭০-এর নির্বাচনের রায় অনুযায়ী চললে তার ফল হতো ভিন্ন, কেউ তাঁর কথার সারবত্তা অস্বীকার করতে পারবে না। অত্যন্ত সুবিবেচনাপ্রসূত এ বক্তব্য। আমার বিশ্বাস, '৭১-এর পরিণতি তথা বিভীষিকা যত তাড়াতাড়ি ধুয়ে মুছে যায় তত তাড়াতাড়ি ক্ষত নিরাময় সম্ভব হবে, দু'দেশের সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ফিরে আসবে। সেটা সবার জন্যই শুভ। আমি আপনাদের বলেছি, আমি আমার যৌবনের পুরোটা সময় সেখানে কাটিয়েছি। সেখানে আমি অবাধে যেতে চাই। আমাকে এখন ভিসার জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসে যেতে হয়। এটা করতে হয়, সেটা করতে হয়। আমি এ সব চাই না। আমি ওখানে যেতে চাই। সেখানে বাস করতে চাই। এই ধরুন, আপনাদের সাথে, আমার বন্ধুদের সাথে। ওখানে যেতে চাই সেভাবে, যে অবস্থায় আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না, কেন এসেছেন? আমি আমার জায়গায় যাব যেখানে আমি আমার জীবন কাটিয়েছি। এই আমার চাওয়া, তা বাস্তবে এক বা দুই দেশ যা-ই হোক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এমনকি যদি দুটি দেশ হয়ও সে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক হতে হবে ইংল্যান্ড ও কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো। অবাধে যাওয়া আসা করা যাবে দু'দেশের মধ্যে। আমার অনুভূতি ঠিক এ রকম। এ হবে খুবই সুবিবেচনাপ্রসূত।

◆ আপনার বইয়েতো লিখেছেন, কিন্তু এর বাইরেও কি কিছু বলার আছে যা আপনি চান রেকর্ডে আসুক?

▲ আমি যা বইয়ে লিখিনি তা আমার হাই কোর্টের রিট আবেদনে উল্লেখ করেছি। আমার বইয়ের উপকরণ নেয়া আমার ডায়েরি থেকে। বলা যায়, আমার বই ঐ ডায়েরিরই পুনরুৎপাদন। তারপরেও অনেক জিনিস ঘটেছে। সেগুলোর বিষয়ে আমি রিটে বলেছি। আমার বিশ্বাস, এ সবের পরেও অসততা চলেছে। এর নজিরও আমি দিয়েছি।

এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান

[পাকিস্তান বিমানবাহিনীর এককালীন প্রধান এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান। তাহরিক-ই-ইশতেকলাল পার্টি গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে ধারা প্রবর্তনে তিনি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন। '৭০-এর নির্বাচন-পরবর্তীকালেও তাঁর ভূমিকা ছিল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় তাঁর বাসভবনে।]

◆ আমি ১৯৭০-এর ঘটনাবলীর ওপর আপনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। প্রথমে ১৯৭০-এর নির্বাচন ও পরে অন্যান্য প্রসঙ্গ।

∆ পাকিস্তানের নির্বাচনে আমাদের কারচুপির রেকর্ড রয়েছে। আমি মনে করি সে হিসাবে বিগত ৩০ বছরে এটা ছিল শেষ ও এমন নির্বাচন যাতে কারচুপি হয়নি। অবশ্য ইয়াহিয়া খান মনে করেছিলেন, এই নির্বাচনের পরিণামে একটা বিভক্ত সংসদ পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক দলাদলির অবস্থাও হবে তথৈবচ। ফলে নির্বাচনের ব্যালট ঘুরে রাজনৈতিক দলগুলো আসবে অল্পস্বল্প ক্ষমতা নিয়ে। কোন দলই নিরঙ্কুশ রায় পাবে না। আর সেই ফাঁকে তিনি তাঁর প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকবেন। প্রধানত আমি এ সবের আলোকেই মনে করি, ইয়াহিয়া খান সচেতনভাবেই নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন হতে দিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আমাদের আদর্শ। এখন সে আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ায় তার ফলও পাওয়া যায়। অথচ সে ফল ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না।

◆ নির্বাচনী ফলাফল তাঁর জন্য সমস্যা ছিল?

∆ আমার তো তাই মনে হয়। এটিই ছিল প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার জন্ম হয় নির্বাচনের ফলে। নির্বাচনে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল অধিকাংশ আসন জয় করে জাতীয় পরিষদে বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। এটি ইয়াহিয়ার জন্য ছিল সমস্যা। তিনি তাঁর নিজস্ব পথে সে সমস্যা কাটানোর চেষ্টা করেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

◆ আপনি আপনার আগেকার লেখা একটি বই *জেনারেলস ইন পলিটিক্সে* এবং তার পরের অন্যান্য বই ও লেখাতে সে কথাই বলেছেন। আপনার অভিমত ও দৃষ্টিকোণ বেশ পরিচিত। সে জন্য এসবের বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে ১৯৭০-এর সেই সময়ে যে কোটারি বা চক্র ক্ষমতা তথা শাসন পরিচালনা করত তাদের চিন্তাধারায় মূলত গলদটা কোথায় ছিল? সেটি কোথায় বলে আপনি মনে করেন? আপনি এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতোমধ্যেই দিয়েছেন। তবে আজকের এই সময়ে নানা নতুন অন্তর্দৃষ্টিমূলক নেপথ্য জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে আপনি কি এ বিষয়ে স্মৃতির আলোকে কিছু বলবেন?

▲ প্রথমেই ওদের যা দরকার ছিল সেটি হলো ক্ষমতায় থাকা। দ্বিতীয় জিনিসটি পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায়ও সত্যি। তারা বাঙালীদেরকে ক্ষমতা দেবার কথা ভাবতেই পারেনি। আমরা এখানে ছিলাম একটা সামন্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু আপনাদের পূর্ব পাকিস্তানে এই সামন্তের সংখ্যা ছিল নিহায়তই নগণ্য। সামন্ত প্রভুরা এখানে ছিল গভীর শিকড় গেড়ে, প্রভাব প্রতিপত্তি কায়েম করে। এখানকার বিরাজমান সামন্তবাদী মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্রের সরকারকে ক্ষমতায় আসতে দেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের এই প্রভাবশালী সামন্তবাদী মানসিকতায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য। শুধু তাই নয়, তাদের এ রকম অনুভূতিও ছিল যে, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া হলে এক মধ্যবিত্ত চরিত্রের সরকার ক্ষমতাসীন হবে। আর এ চরিত্রের সরকার ক্ষমতায় এলে তাদের এখানে কী সব পরিবর্তন হতে পারে সে নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন ছিল। কারণ তেমন পরিবর্তন হলে তারা তাদের বিরাট বিরাট জমিদারী হারাবে। আর যা-ই হোক এটা তারা মেনে নিতে পারে না। এ এক আংশিক কারণ, যে জন্য সেনাবাহিনীর হাতে ছিল নিয়ন্ত্রণের লাগামটি। সামন্তরাই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভোগ করছিল—ওটা তারা ছেড়ে দিতে পারে না। আমার ধারণা, এই দু'টি জিনিস সম্মিলিতভাবে তাদের সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণ তৈরি করে।

◆ তাই আমরা এখন সবার আগে জানতে চাই, পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? আমরা জানতে চাই ২৫ মার্চে যেসব ঘটনা ঘটে সে ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কী?

▲ আমার মনে হয়েছিল যা কিছু ঘটেছে তা একান্তই গোঁয়ার্তুমি ছাড়া কিছুই নয়। এসব অর্থহীন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্ষমতা চেয়েছে, যে ক্ষমতা তারা কখনও ভোগ করেনি। আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বেশ কয়েক দফা কথা বলেছি। তাঁর সাথে আমার একটা ভাল সম্পর্কই ছিল। নির্বাচনের আগে যে কারণেই হোক তিনি ছয় দফা কার্যক্রম নিয়ে হাজির হন যা বহু পশ্চিম পাকিস্তানীর কাছে বিচ্ছিন্নতার এক কর্মসূচী বলেই মনে হয়। আসলে সেগুলো তা ছিল না বরং আমার ধারণা, নির্বাচনের পর সেগুলো তিনি সংশোধন করতেন গোটা পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ হাতে পাওয়ার পর। তিনি পাকিস্তানের মাত্র অর্ধেকটা চাইবেন—এর কোন অর্থ হতে পারে না। ব্যাপারটি তিনি বেশ কয়েক দফা স্পষ্ট করেই বলেছেন আমাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা এক ধরনের প্রচারণার প্রভাবে এমনই আচ্ছন্ন ছিল যে, তারা ক্ষমতাই ছাড়তে চায়নি। তারা মনে করতে থাকে, ওরা বিচ্ছিন্নতা চায়। তাই ওরা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের ধারণার পক্ষপাতী ছিল।

সাধারণভাবে লোকজন এটাকে বেশ একটা ভাল আইডিয়া বলে বিবেচনা করতে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবিকপক্ষেই ছিল এক ভয়ানক পাগলামি। এমনকি, সামরিক দিক থেকেও এসব ছিল একান্ত অর্থহীন। এ ছিল করাচী-চট্টগ্রামের মধ্যকার ব্যাপার, যা ছিল সাগরপথে প্রধান যোগাযোগ পথ। কেননা আমাদের দেশের দুই অংশের মধ্যে আকাশপথে সরাসরি কোন যোগসূত্র ছিল না। এটা কতকটা ছিল করাচীর মতো দূর যেন ফ্রান্সের দক্ষিণ থেকে এক সামরিক অভিযান চালানোর মতো যা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। পাকিস্তানের মানুষকে এ ধরনের প্রচারণার আপ্তবাক্যে ভোলানো হয়—বোঝানো হয় অবস্থা তেমন বেগতিক হলে চীন, চাই কি মার্কিন সপ্তম নৌবহর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। এসব কথাবার্তা নিহায়তই মোটা মাথার উর্বর কল্পনা। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কোনই অঙ্গীকার ছিল না। চীনের বিশ্বাস ছিল আমরা এমন এক ব্যক্তির শাসনে আছি যার মাথায় গোবর ভরা, অপদার্থ এক কাণ্ডজ্ঞানহীন বদমাশ, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে একটা নরপশুও বটে। এখানে ক্ষমতায় যারা ছিল তাদের কিছু বাস্তবতার উপলব্ধি দেবার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। কিন্তু নিরেট গর্দভের মতো ওরা সব কিছুকে লেজে-গোবরে করে ফেলে।

◆ আমরা জানি, আপনি কাজটা করছিলেন একান্তই একা একা।

▲ প্রায় তাই। আমার ওপর ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। আমাকে মারধর করা হয়। আমাকে বলা হয়, আমি নাকি এখানে বাঙালীদের চর। এখানকার মানুষ যেন বদ্ধ পাগল হয়ে যায়। ওরা বুঝতেই পারেনি।

◆ এখানকার পত্রিকা তখন কী ধরনের ভূমিকা পালন করে বলে আপনি মনে করেন? কেননা, যোগাযোগ মাধ্যমগুলো—সরকারী ইলেকট্রোনিক মাধ্যমগুলো ও ট্রাস্ট পত্রিকাগুলো সরকার নিয়ন্ত্রিত হলেও কিছু স্বাধীন মতামতসম্পন্ন সংবাদপত্র ছিল। তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

▲ ঐ সময়ে পত্রপত্রিকা খুব একটা ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী ছিল বলে আমি মনে করি না। তবে এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পত্রপত্রিকা তাদের ভূমিকা পালন করেছে বা করেনি—সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। তারা একটি ভূমিকা পালন করেছে ঠিকই। তবে তাদের ভাবখানা ছিল এই যে, ২৫ বছর ধরে যে পূর্ব পাকিস্তান কখনও ক্ষমতার অবস্থানে ছিল না, সেই পূর্ব পাকিস্তান ও শেখ মুজিবুর রহমান কেমন করে পশ্চিম পাকিস্তানকে শাসন করবে তা বোধগম্য নয়। তাদের এ মনোভাব বড়ই বিচিত্র। দেশের জনসংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের বাঙালী তথা পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করতে দেয়া হচ্ছে না—বিষয়টি বিব্রতকর। কিন্তু ওরা তাদের মনস্তত্ত্বের বিশেষ গঠনের কারণে বাঙালীর শাসন মেনে নিতে পারেনি।

◆ আপনি রফি রেজার উল্লেখ করেছেন। আমরা এর আগে তাঁর সাথে কথা বলেছি। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, তিনি যেন সেনাবাহিনীকে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সেনাবাহিনীর ধারণা ছিল, এই বেঁটে চেহারার লোকগুলো আর যা-ই হোক সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় যাওয়াকে ঠেকাতে পারবে না। এর পিছনে আরও একটা ধারণা ছিল

এই যে, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ঐ সময়ে সামরিক আইন দিয়ে ঠেকানো গিয়েছিল। আইয়ুব খানের ক্ষমতা থেকে বিদায় নেবার প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া সামরিক আইন জারি করে। তাদের ধারণা, তা যদি ১৯৬৯-এ সম্ভব হয়ে থাকে তবে ১৯৭১-এ বা একই জিনিস সম্ভব কেন হবে না! এ ছিল তাদের যুক্তি। ২৫ মার্চে সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট শুরু করার নেপথ্যে এ ধরনের চিন্তাধারাই ক্রিয়াশীল ছিল। আপনি কি এ রকম আলোকেই ঘটনাগুলোকে দেখতে চান?

▲ মোটেও না। আমি তো বলি অন্য কথা। সেনাবাহিনী আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল? এ কথাই কি রফি রেজা বলতে চেয়েছেন? তাঁর এ গোটা ধারণাই ভুল। আদৌ ঠিক নয়। আমি নিজে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, সে কথা বোধহয় আপনাদের মনে আছে। সেনাবাহিনী আমাকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। আর আন্দোলন তো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, তারা গণতন্ত্র চেয়েছিল। তারা ছিল আইয়ুববিরোধী, আর...

◆ আইয়ুব শাহীর পতনের সাথে সাথে আন্দোলন আপনা আপনি...?

▲ রাওয়ালপিণ্ডির ইসলামাবাদে তখন আমরা গোলটেবিল বৈঠকে বসেছিলাম। বৈঠকে ওরা... আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে সম্মত হন। ইয়াহিয়া খান এ অবকাশে ক্ষমতায় গিয়ে অন্য জেনারেলরা গতানুগতিকভাবে যা করে থাকে সেভাবেই দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। জনগণও তা মেনে নিল এই ভেবে যে, ইয়াহিয়া তো তাহলে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকবেন না। কাজেই আন্দোলনটি ছিল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে, অন্য কারও বিরুদ্ধে নয়। আর এ কথাও আদৌ ঠিক নয় যে, এ আন্দোলনে সেনাবাহিনীর কিছু করার ছিল, কারও বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিছু লোক সব সময়ই থাকে যারা মনে করে এখানে যা কিছুই ঘটুক না কেন তার নেপথ্যে কোন এক জনের হাত রয়েছেই। আসলে এ আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। ঐ আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী যাঁরা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জনসাধারণই এ আন্দোলন চেয়েছিল। তারা তখনকার শাসকগোষ্ঠীর বিরোধী ছিল।

◆ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আপনি অনেকদিন কাটিয়েছেন। আপনি মাঝে মাঝেই সেখানে গিয়েছেন?

▲ জ্বি, আমি কয়েকবারই সেখানে গিয়েছি।

◆ এখন অন্য কথায় আসি। পূর্ব পাকিস্তানে অনেক হিন্দু শিক্ষক ছিলেন সে কথা বোধহয় আপনি জানেন। এখানে এ রকম একটা প্রচারণা সে সময়ে চালানো হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ভারতীয় চর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আপনি এ বিষয়টিকে কী চোখে দেখেন...?

▲ দেখুন, এখানে একটা যুক্তির বিষয়ও রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে অনেক হিন্দু ছিল এ কথা সত্যি। তাই সেখানে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বাস করবে—এও স্বাভাবিক। তবে আপনি এই যে প্রচারণার কথা বললেন, ওরা পূর্ব পাকিস্তানে যা করেছে তার যৌক্তিকতা খাড়া করার জন্যই এটা করা হয়েছে। আমাদের এখানকার সমাজে হিন্দুর তেমন অস্তিত্ব নেই। কাজেই এ ধরনের প্রচারণা এখানে পাত্তা পেতে সক্ষম হয়। যে ব্যবস্থা তখন ওখানে নেয়া হচ্ছিল তাকে

যৌক্তিকতা দেবার জন্যই এ প্রচারণার অবতারণা। ইয়াহিয়া খান যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার সমর্থনেই এ প্রচারণা চলে।

◆ **আপনার কি ধারণা, ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছিল সেসব ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানীরা জানত অর্থাৎ মার্চ থেকে ডিসেম্বর অবধি যা ঘটে?**

▲ সরকার ঐ সময়ে যতটুকু তাদের জানতে দিয়েছে ততটুকুই। কেননা তখনকার সংবাদপত্রের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে তা জনসাধারণকে বলা হয়নি। আর আমার মতো লোক—বলতে গেলে শুধু আমি একাই যখন সামরিক এ্যাকশন চলছিল সেই সময়ে চার-পাঁচবার পূর্ব পাকিস্তানে যাই। আমি সেখানকার অবস্থা দেখে ফিরে আসি ও এখানকার জনসাধারণকে জানানোর জন্য আমি জনসভা করার চেষ্টা করি। কিন্তু জনমত বদলানোর কাজটি অসম্ভব রকমের এক বিশাল কাজ। সংবাদপত্র আমার পক্ষে থাকলেও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত। আর পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে একটা অনড় ধারণা তো ছিলই। সেই সাথে ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের হাতে হস্তান্তর করা বাঞ্ছনীয় নয়—এ রকম মতবাদও ছিল। এক্ষেত্রে ভুট্টোর এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় বলেন যে, তিনি সংসদে বিরোধী দলের আসনে বসতে প্রস্তুত নন। আমি মনে করি, তিনি কিছুটা গণতন্ত্রসম্মত আচরণ করলে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হলে পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হতো। কিন্তু তিনি তা করেননি, করার মনোভাব ছিল না। ইয়াহিয়াও ছিলেন ক্ষমতা আঁকড়ে। এ দুয়ের সম্মিলিত কারণেই যা ছিল অনিবার্য তা ঘটে যায়।

◆ পাকিস্তানী সংবাদপত্রে এখন একটা বিতর্ক চলেছে সেটা বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন আপনি। নানা জিনিসই আলোচিত হচ্ছে। কোন কোন খবরের কাগজ ও সাময়িকীতে আমরা লক্ষ্য করেছি নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলোতে দুই দেশের মধ্যে কোন কোন ধরনের বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ার অনুকূলে লেখার চেষ্টা হচ্ছে। বলা হচ্ছে নিবিড়তর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে, আর সেজন্য কী কী করা যেতে পারে সে কথাও বলা হচ্ছে। আবার এ সম্পর্কে এও বলা হচ্ছে, যেমন কিছুদিন আগে আইএ রহমান এবং আরও অনেকে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে যা কিছু ঘটেছে একাত্তরে সেজন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

▲ তাতে উনিশ-বিশ তো আমি কিছু দেখি না। আমি তো মনে করি উভয়পক্ষই মন্দ আচরণ করেছে এই ধারণায় যে, উভয় তরফই নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে। আমি মনে করি ন্যায়ত একথা বলা যায় না যে, কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীই এমন আচরণ করেছে, তারাই সবকিছুর নিষ্পত্তি করেছে। তারা বিভিন্ন সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করেছে এমনভাবে যেগুলো কোন না কোনভাবে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার তাঁবেদার। তবে সে যা-ই হোক ওখানকার গোটা জনসাধারণ যথার্থই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ায়। আর এও ঠিক, তারা খারাপ আচরণও করে। আমি মনে করি, পূর্ব পাকিস্তানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

◆ **আমার তো মনে হয় পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ সে ধরনের একটা বিবৃতি দিয়েছেন ইতোমধ্যে।**

∆ তবে আমার জানা নেই কোন্ স্তরে তেমন দাবি জানানো হয়েছে। আমার তো মনে হয়, পররাষ্ট্র দফতরের কেউ এমন কথা বলে থাকবে, প্রধানমন্ত্রী বলেননি। আমি এ ব্যাপারে একটি লেখা লিখেছিলাম কর্তৃপক্ষীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে। কথাটা তুলেছিলাম হামুদুর রহমান কমিশনের অর্থহীনতা নিয়ে। আমাদের মতে, এ এক উদ্ভট, হাস্যকর প্রয়াস। আমাকে কমিশনে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কমিশনের এজলাসে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে অস্বীকৃতি জানাই। আমি এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতিকে লিখেছি এই বলে যে, আপনার তদন্তের ব্যাপারটির কোন সার্থকতা নেই। কেননা, আপনাকে তো কার্যত বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের কারণ বের করতে। তাহলে তার পিঠে আমি তো পাল্টা প্রশ্ন তুলতেই পারি, পশ্চিম পাকিস্তানে তাহলে সেনাবাহিনী কেন আত্মসমর্পণ করেছিল? সে প্রশ্নও তো থেকে যায়। ওর ভাল জবাব হয়ত রয়েছে, কেননা, পেট্রোল-গোলাবারুদে টান পড়েছিল। তবে সেটা কোন সমস্যা নয়। সঙ্কট কেন তৈরি হলো—সেটাই ধাঁধা। রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কী ছিল? সে যা-ই হোক, যেহেতু আপনাকে সে এখতিয়ার দেয়া হয়নি সেহেতু আপনার তদন্তের কোনই অর্থ নেই। আমি ওখানে গেলে কিছু ইউটোপিয়ার দেখা মিলবে মাত্র। তাই আমি কমিশনের এজলাসে গিয়ে দাঁড়াব না। আমি আমার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে জাস্টিস হামুদুর রহমান বললেন, 'ভাবছেন কেন, আপনার সবকিছুই তদন্ত করে দেখব।' আমি বললাম, 'মাই লর্ড, আপনি হয়ত সবকিছুই দেখবেন, মহাবিশ্ব নিরীক্ষণ হয়ত বা করবেন, কিন্তু সনদে আপনাকে যে এখতিয়ার ঠিক করে দেয়া হয়েছে সেখানেই যে ঠেকে যেতে হবে, আর এটি তখন নিশ্চিত ছিল যে কমিশনের রিপোর্ট কখনও আলোর মুখ দেখবে না। আর ঘটেছেও তাই। আমরা এ রকমের তদন্ত করেছি আর তাতে এই হয়েছে।

◆ **তদন্ত হবার কোন সম্ভাবনা আছে?**

∆ আমার ধারণা, নেই। আমরা দেশের অর্ধেক হারিয়েছি। ৯৩ হাজার সৈনিক আমাদের যুদ্ধবন্দী হয়েছে। আর এ সবের কোন তদন্ত হয়নি। আমি এসব বিষয়ের ওপর একটা লেখা লিখেছিলাম। তাতে বলেছিলাম, আমার মতে সামরিক পরাজয় নিয়ে কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল তার কোন ভবিষ্যৎ ছিল না। কোন সার্থকতা ছিল না সে অভিযানের, কেননা ঐ পরিস্থিতিতে কোন সেনাবাহিনীর পক্ষেই পূর্ব পাকিস্তান জয় করা সম্ভব নয়। বরং তদন্ত হতে হবে, যে সামরিক তৎপরতা চালানো হলো তার রাজনৈতিক হেতুগুলো কী, আর কী উদ্দেশ্যে তা করা হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোরই বা কী ভূমিকা ছিল সেইসব বিষয়ে। যে জাতি তার অতীত থেকে শিক্ষা নেয় না...।

◆ **স্বতন্ত্র গবেষণা এ বিষয়ে হয়েছে কি বলতে পারেন? কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা এ ধরনের কোন কিছু...?**

▲ এ ধরনের কোন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা-সমীক্ষার কথা আমার জানা নেই। এক্ষেত্রে অবশ্য সেনাবাহিনীর একটা প্রভাব কাজ করে। তারা এ ধরনের তদন্ত-গবেষণা হতে দেবে না এ কারণে যে, এতে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি কতখানি উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়বে সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত নয়। তাই আমি জানি না, কেউ এ বিষয়ে খোঁজখবর করেছে কি না বা করতে চায় কি না, জানতে চায় কি না তখন কীসব ঘটেছে, কেন ঘটেছে। আমি মনে করি, লোকে কী করেছে সে ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের তদন্ত করে দেখা উচিত। ওসব কাজ ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী ঘটনা ও মহড়া। আমার বিশ্বাস, আমরা কী কী ভুল করেছি সেগুলো অনুসন্ধান করে না দেখার মতো নির্বোধের কাজ করা আমাদের উচিত হবে না। নীতির দিক থেকে আমি বলব, এসব কাজ অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাসুলভ হয়েছে। আমরা এ কথাগুলোই তখনও জোরগলায় বলেছিলাম। আমি এ কথা বলি না যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা—বাংলাদেশীরা বিশ্বস্ত বা অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়... আমি মনে করি...

◆ তাহলে কীসের কারণে এ সঙ্কট দেখা দেয় বলে আপনি মনে করেন? আমরা বলতে চাই—ওরা এমন করেছে... কীভাবে এ সবের শুরু?

▲ আপনিই তো বলেছেন প্রচারণার কথা। বলেছেন, হিন্দু সংস্কৃতি ও আরও সব কথা... এক ধরনের মানসিকতা, মনোভাবের কথা। সেনাবাহিনী ছিল তখন সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে। এসব সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু আমার জানা নেই। কিন্তু প্রচারণা চলেছে, তেমন কথাবার্তা বলা হয়েছে। এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই যে, নিদারুণ দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, আর দু'তরফ থেকেই তা ঘটানো হয়েছে। কেউ এ কথা বুকে হাত রেখে বলতে পারে না যে, কোন পশ্চিম পাকিস্তানীকে হত্যা করা হয়নি, কোন বিহারী মারা যায়নি। উভয় তরফেই বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। আমি মনে করি, আমরা বেশি দায়ী কেননা আমরাই এসব কাজকারবার শুরু করেছিলাম। আমরা সেখানে ক্ষমতায় ছিলাম। আর তাই আমি আরও মনে করি, সেখানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। খারাপ আচরণ করেছি আমরা, আমরা আমাদের ধ্বংস করেছি, আর গোটা তথ্যমাধ্যম আমাদের সবকিছুই ছেঁকে তুলে দেখিয়েছে। যা হোক, আমি এসব নিয়ে তেমন ঘেঁটে দেখিনি, তার সূচনাও করিনি, তবে আলোচনা শুরু হয়েছে। আমি কিছু লিখেছি এ বিষয়ে। আমি বলি, আমি করিনি তবে এটা হলে ভাল কাজ হবে। আমাদের উচিত হবে সম্ভব হলে এসব ভুলে যাওয়া—তাতে পরস্পরের কাছে আসার হয়ত সুবিধা হতে পারে। দেখুন, আমার মতো অনেক মানুষ এখানে আছেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে সে সবের জন্য খুবই দুঃখিত। আর তাঁরা নিজেদেরকে পূর্ব পাকিস্তানীদের খুব ঘনিষ্ঠ বলেও মনে করেন। আমি নিজে অন্তত পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা দেশ বলে মনে করি না।

● আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এয়ার মার্শাল আসগর খান। আপনি আমাদেরকে অনেকখানি সময় দিয়েছেন।

ফারুক আহমদ লেঘারি

[পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমদ লেঘারি। বেশ কয়েক বছর তিনি অবস্থান করেছেন স্বাধীনতাপূর্ব তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে, আজকের বাংলাদেশে। তরুণ বয়সেই কর্মরত ছিলেন কুমিল্লার বার্ডে। তার পরই যোগদান করেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে। মানিকগঞ্জের এসডিও, সিলেটে এডিসি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সময়কাল ছিল ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯। বাংলাদেশে অবস্থানকালে তাঁর অভিজ্ঞতার কথাই মূলত আমরা জানতে চাই। ১৯৭১-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর ধারণা, অভিমতও তিনি ব্যক্ত করেছেন। এই সাক্ষাৎকারের বেশ কিছু অংশ জুড়ে আছে পরবর্তীকালের পাকিস্তান প্রসঙ্গ যার সঙ্গে একাত্তরের কোনযোগ নেই। কিন্তু সাক্ষাৎকারের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ঐ কথাটি বাদ দেয়া হয়নি। সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয় ইসলামাবাদে তাঁর বাসভবনে।]

◆ আপনি তো এক সময় বাংলাদেশে ছিলেন। মনে আছে সে সময়কার কোন কথা?

∆ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ আপনাদের বাংলাদেশে এক সময় আমি দায়িত্ব পালন করেছি। সেই হিসাবে আপনাদের সাথে এই দেখা, সাক্ষাৎ ও কথা বলার সুযোগের জন্য আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। সিভিল সার্ভিসে এসডিও হিসাবে আমি মানিকগঞ্জে কাজ করেছি। আমি সিলেটেও দায়িত্ব পালন করেছি এডিসি হিসাবে। কাজ করেছি কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসাবে। সে সময় খুব কাছে থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে—সেখানকার সমাজ ও অর্থনীতির অঙ্কুরোদগম ও বিকাশের নানা পর্যায় দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। একজন সরকারী আমলা হিসাবে তাই আমি সে ব্যবস্থায় স্বভাবত একজন অংশীদারও ছিলাম। এর আগেও আমি পূর্ব পাকিস্তানে আখতার হামিদ খানের কুমিল্লা একাডেমীতে ছিলাম শিক্ষার্থী হিসাবে। সেখানে আমি গ্রামীণ জনসমাজ, তাদের ঋণের ব্যবস্থার জন্য তাদেরকে সংগঠিত করে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

তোলার যেসব প্রয়াস তখন চলছিল সে সব সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখেছি, জ্ঞান লাভ করেছি। আমি তো মনে করি, কুমিল্লার সেই অভিজ্ঞতায় আমার প্রচুর জ্ঞানলাভ ঘটেছে। জানা হয়েছে উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার নানা অজানা, অভাবিত বিষয়। সিভিল সার্ভিসের চাকরির শর্ত ও প্রয়োজনেই আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে হয়েছে। ঐ চাকরির শর্ত ছিল দু'বছর কাটাতে হবে পূর্ব পাকিস্তানে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য মনে করি, আমার সে অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার বিস্তর অভিজ্ঞতা হয়েছে, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাদেশের জনসমাজকে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছি। ঐ সময়ে সেই সমাজে দারিদ্র্যের এক বিশাল বিস্তার প্রত্যক্ষ করেছি। সব কিছু দেখার পরও আমার মনে হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের পল্লী জনসমাজ পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজের তুলনায় বরং সুগঠিত ও সুব্যবস্থিত। থানাকেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যকলাপের ধারণাটি বাস্তবায়িত হচ্ছিল তখন নানা উন্নয়ন তৎপরতায়, যদিও সে উন্নয়নের হার পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে পাঞ্জাবের পল্লী উন্নয়নের কথা বলা যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক অঞ্চল যেমন, পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল, বেলুচিস্তান, এমনকি পাঞ্জাবেরও কোন কোন এলাকা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর বহু অঞ্চলই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি গরিব। তবে এ কথা ঠিক, পূর্ব পাকিস্তান ও পাঞ্জাবের মধ্যে বৈষম্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে তখন জনবিস্ফোরণ চলছিল, ছিল খাদ্য সঙ্কট, স্বাস্থ্য সমস্যা। এ ধরনের আরও সমস্যা ছিল সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বিরাট, বিশাল মাত্রায়। আমার বাড়ি পাঞ্জাব প্রদেশে, যদিও আমি বালুচ রক্তের লোক। আমি সেদিক থেকে বালুচ। আমার প্রতি কোন বৈষম্য করা হচ্ছে—এমন কিছুই আমি কখনও লক্ষ্য করিনি পূর্ব পাকিস্তানে। বাংলাদেশে অর্থাৎ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে আমার বেশ কিছু বন্ধু ছিল।

◆ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আপনার ব্যাচমেট যাঁরা ছিলেন তাঁদের কথা আপনার মনে আছে?

∆ আমি '৬৪-র ব্যাচের। আজকে... হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে খালেদ শামস, মুস্তাফিজুর রহমান ও আরও অনেকের কথা, ফরেন সার্ভিসের অনেকের কথা, যাঁরা বাংলাদেশ সরকারে যথেষ্ট ভাল করেছেন। ফারুক সোবহান রয়েছেন। মনে হয় তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন।

◆ তিনি এখন শিল্প বেসরকারীকরণ বোর্ডের প্রধান।

∆ এ ছাড়াও আরও অনেকে ছিলেন যাঁরা গৃহযুদ্ধের সময় প্রাণ হারিয়েছেন। তবে সিলেটে আমার এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা ঘটে, আর আমার ভবিষ্যৎ বিকাশে তার প্রভাব রয়েছে। সে কথাই এখন বলি। সিলেটে আমি তখন এডিসি। আমার সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য যা-ই হোক সেখানকার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘটনাক্রমে ভাল যাচ্ছিল না। তিনি ছিলেন গভর্নরের জামাতা। তখন গভর্নর ছিলেন মোনায়েম খান। তাঁরই জামাতা শফিউল আলম ছিলেন সিলেটের ডেপুটি কমিশনার। তাঁর মাঝে ছিল বসিংয়ের প্রবল ঝোঁক। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর প্রতিটি নির্দেশ আমাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে—সে আদেশ-নির্দেশ বৈধ-অবৈধ যা-ই হোক। আমি তাঁর অকারণ, অবৈধ নির্দেশ মানতে তৈরি ছিলাম না, প্রয়োজনে সে কথা তাঁর নাকের ডগায় বলেও দিতাম। এতে আমি যেমন একটা বিব্রতকর

অবস্থায় পড়তাম তেমনি তিনিও আরও বেশি বেসামাল হতেন। তিনি আমাকে এই বলে হুমকি দিতেন, তোমাকে আমি তোমার পদ থেকে সরিয়ে দেব। আমি বলতাম, খুব ভাল, আমি সেটাকে খোশ আমদেদ জানাব। এর পর থেকে তিনি আমার সাথে কথা বন্ধ করে দেন, আমিও। দু'মাস ধরে আমরা এভাবে একে অন্যের সাথে কথা বলিনি। এই সময় হঠাৎ করে সিলেটে আইয়ুব খান, মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে মারদাঙ্গা বেধে যায়। আর এসব মারদাঙ্গায়, আমি আসলে ভুল বলছি, দুঃখিত—এসব জনবিক্ষোভের সময় একদিন দেখা গেল কিছু ছাত্র ও জননেতা বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। ইপিআর এদের মধ্য থেকে তিন-চারজন লোককে আটক করে। এতে মিছিলের লোকজন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। ওদের তখন ধারণা হয়, ইপিআর তাদের ঐ লোকগুলোকে মেরে ফেলেছে। তারা মিছিল করে আসে ডিসির অফিসে। বলাবাহুল্য, আমার অফিসও ছিল সেখানেই। তারা আমাদের অফিস লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। একটা পর্যায়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠে। তখন ডিসি মহোদয় আমার কাছে এসে বললেন যে, জানেন, ইপিআর কয়েকজন লোককে গ্রেফতার করেছে আর সেই কারণে লোকজন এখন আমাদের অফিস ঘেরাও করেছে। বহু লোক এই অফিস চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে। এখন কী করা যায় বলতে পারেন? আপনি কি ইপিআর কমান্ডারকে একবার টেলিফোন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন তাদের হাতে কেউ মারা গেছে কি না? অমি বললাম, ঠিক আছে, আমি দেখছি। আমি ইপিআর কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করতেই বলা হলো না, আমাদের হাতে কেউ মারা যায়নি। লোকজন আমাদের ওপর চড়াও হবার, আমাদের মাঝখানে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল। 'কাউকে পিটিয়েছেন?' 'জ্বি হ্যাঁ, আমরা তা করতে দিতে পারি না বলে কয়েক জনকে গ্রেফতার করি। কয়েক জনকে পেটাতেও হয়েছে তবে আমরা কাউকে হত্যা করিনি।' সে যা-ই হোক, ডেপুটি কমিশনারকে সে কথা জানিয়ে আমি অফিসের চারদিকে জমায়েত লোকজনের উদ্দেশে বললাম, আপনাদের কেউ মারা যায়নি। এখানে আমি বলে রাখি, তখন সিলেট শহরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি ছিল খুবই খারাপ। তার ওপর তখন আবার গরমকাল। চারদিক শুকনা, খটখটে। তখন সিলেটে বাড়িঘর ছিল প্রধানত বাঁশ, কাঠ বা এ ধরনের উপকরণ দিয়ে তৈরি। এসবে অতি সহজেই আগুন ধরে যায়। আর আগুন ধরলে মুহূর্তেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমার দারুণ আশঙ্কা ছিল, এ রকম হয়ত বা কিছু একটা ঘটে যাবে। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা পাহারা দেবার জন্য পুলিশের সংখ্যাও ছিল তখন খুবই কম। আর সে পাহারা দেবার কাজও ছিল খুবই কঠিন। তাই আমি ডিসি সাহেবকে বললাম, বাইরে এসে নিজেই জনতার কাছে গিয়ে ঘটনা খুলে বলুন। পরিস্থিতির খাতিরেই এটা করা উচিত। কিন্তু তিনি বাইরে আসার সাহসই পেলেন না, কন্ট্রোল রুমের ভিতরেই বসে রইলেন। তখন আমি তাঁকে স্পষ্ট করে বললাম, দেখুন ওদের ভাষায় কথা বলতে পারি না আমি, ওদের সাথে তাই যোগাযোগ করাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বড় জোর ইংরেজী বা উর্দুতে কথা বলতে পারি। সে কারণেই উচিত আপনার ওদের কাছে যাওয়া ও ওদের এ কথা জানিয়ে শান্ত হতে বলা যে, নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের কেউ মারা যায়নি। তাঁদের এও বলুন, এ ঘটনায় কেউ অন্যায়, অপরাধ করে থাকলে তার যথারীতি বিচার হবে। কিন্তু তিনি আমার কথামতো কাজ করতে সম্মত হলেন না। বললেন, আমি কন্ট্রোল রুম ছেড়ে যেতে

পারি না। উপায় না দেখে বললাম, ঠিক আছে, আমিই যাব, যা পারি ওদের ব্যাখ্যা করে বলব। এর পর আমি ডিসি অফিসের চতুর্দিকে সমবেত জনতার উদ্দেশে বললাম, দেখুন, আমি বাংলায় কথা বলতে পারি না। এ জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আমি উর্দু না ইংরেজী বলব? তারা বলল, ইংরেজীতে। আমি তখন বললাম, আমি সব কিছু তদন্ত করে দেখেছি, কেউ মারা যায়নি। কিন্তু ওরা জানাল, খবর ঠিক নয়। ওরা মিথ্যা কথা বলেছে। আর তারপর তারা আমাদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়া শুরু করে দিল। কিন্তু আমি সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে ধীরে ধীরে ইটপাটকেল ছোড়া কমে এলো।

◆ আপনি যখন কুমিল্লা একাডেমীতে ছিলেন তখন কি আপনাদের বাংলায় কথা বলতে উৎসাহিত করা হয়নি?

Δ খুব একটা নয় বললেই চলে।

◆ প্রশিক্ষণের ভিতর কি ছিল না বাংলা ভাষা শেখার বিষয়টি?

Δ না, প্রশিক্ষণ কোর্সে ছিল না।

◆ ঠিক প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলা ভাষা শেখার বিষয়টি থাকার কথাই বলছি না। যা বলতে চাই তা হলো আপনাদের পোস্টিং হবে পূর্ব পাকিস্তানে সে জন্য কি বাংলা ভাষা শেখানো হয়নি?

Δ না, আর তখন তো আমার পোস্টিং হবারও কথা নয়! এটি তো ছিল...

◆ মাফ করবেন, এটি ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক।

Δ না, আমরা কখন কোন্ চাকরিতে যোগ দিই বা তা থেকে ইস্তফা দিই তার সাথে বিষয়টি সম্পর্কহীন।

◆ আমার তো মনে পড়ে...।

Δ ঠিক বলেছেন, আমার প্রথম পোস্টিং হবার পরে, ঐ সিদ্ধান্ত হবার পর। ১৯৬৩-তে প্রথম ব্যাচ যায় পূর্ব পাকিস্তানে আর তারপর আমাদের ১৯৬৪-র ব্যাচের পালা। তাই ঐ সময়ে অন্তত আমার বাংলা শেখা হয়নি। আমি বাংলা বুঝতে পারলেও বাংলায় তেমন কথা বলতে পারতাম না। তবু আমি সমবেত জনতাকে বললাম, ঠিক আছে, আমি আপনাদের সাথে যাব ও আপনাদের দেখাব যে কেউ আসলে মারা পড়েনি। আমি আপনাদের লোকজনকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব। এ কথা শুনে তারা খুবই আনন্দিত হলো। আর তারপর আমি তাদের সাথে রওনা হবার জন্য তৈরি হলাম। কিন্তু তার আগে ডিসি সাহেব আমার সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, আপনি ওদের সাথে যেতে পারেন না। কারণ ওরা তো পথে আপনাকে মেরে ফেলবে। আর যদি যেতেই হয় সাথে আপনার পুলিশ নেয়া উচিত। জবাবে আমি বললাম, আমি পুলিশ সঙ্গে নিতে পারব না এ জন্য যে, তাতে বরং আমার ঝুঁকি বাড়বে। পুলিশ নিলেই বরং ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমি পুলিশ ছাড়াই গেলাম ওদের সাথে। ঐ লোকজনের মাঝে আওয়ামী লীগের কিছু লোক ছিল যারা সিলেট পৌর কমিটিতে ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। আমি সরকারী পদাধিকার বলে ছিলাম ঐ পৌর কমিটির প্রশাসক। ঘটনাক্রমে আমাদের ডিসি সাহেব পৌর কমিটির এসব লোককে শায়েস্তা করতে চেয়েছিলেন আমাকে দিয়ে। কিন্তু সেটি কেন তা আমার জানা নেই। হতে পারে কোন রাজনৈতিক কারণ

এর নেপথ্যে ছিল। তবে আমি তার শিখণ্ডির ভূমিকায় কাজ করতে সম্মত হইনি। আর আমি না জানলেও এই লোকগুলোর সম্ভবত জানা ছিল আমি ডিসি সাহেবের সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করিনি। এ সব লোক এক্ষেত্রে আমার জন্য খুবই সহায়ক হয়েছিল। যা হোক আমি সেখানে লোকজনের সাথে পৌছানোর পর ইপিআর কর্তৃপক্ষের হাত থেকে ওদের লোকদের ছাড় করালাম। দেখা গেল ছাড়া পাওয়া লোকগুলোকে বেধড়ক পেটানো হয়েছে। আমি ওদেরকে নিয়ে ফিরতে চাইলাম। ওরা এ নির্দয় প্রহারের ঘটনার বিচার দাবি করল। তারা বলল, দায়ী ব্যক্তিদের তারা শাস্তি দিতে চায়। আমি বললাম, ঠিক আছে, ব্যাপারটি আমি নিজেই দেখব। এখন চলুন আমরা জনসভার ময়দানে যাই। ঐ ময়দানটি ছিল মূল শহর থেকে খানিকটা দূরে, স্টেডিয়ামে। জনতাকে আমি একটু দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিলাম এ কারণে যে, ওরা আবার ঘটনাস্থল শহরের দিকেই ফিরতে চাচ্ছিল। আমি তাই ওদেরকে দূরে নিয়ে ওদের সাথে কথা বললাম। সংক্ষেপেই বললাম। আমি বললাম, ঘটনা শেষ! যা কিছু করার ছিল করাতো হয়েছে। আর তারপর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যার যার পথে চলে গেল। একটু দূরে যাওয়ার পর দেখা গেল সেখানেও এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে এক সরকারী দলের এমপিএ (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) এক বেসামাল কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছেন। বিরোধী পক্ষের একদল লোক তাঁর বাড়িতে চড়াও হলে তিনি তাদের লক্ষ্য করে বন্দুক দিয়ে গুলি ছোড়েন। তাতে কেউ আহত হয়েছিল কি না সে খবর আমার জানা না থাকলেও এই মর্মে গুজব রটে যায় যে, লোক নাকি মারা গেছে। ফলে সেখানে এক বিরাট জনতার ভিড় জমে যায়। এ ঘটনা যখন ঘটে আমি তখন হবিগঞ্জ ট্যুরে রয়েছি। সেখানে এসডিও ছিলেন ফরিদ উদ্দিন। সে হলো আমার পরের ব্যাচের অফিসার। পাঞ্জাবী। একসময়কার সিডিএ চেয়ারম্যান। আমি সেখানে ঐ দিন কোন খেলাধুলার অনুষ্ঠান বা ঐ ধরনের কিছু পরিদর্শনে রয়েছি এমন সময় খবর এলো, ২০ হাজার লোকের এক বিরাট জনতা ঐ এমপিএ'র বাড়ি ঘেরাও করেছে। এমপিএ সাহেব, তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষ ও মহিলারা একটি বাড়িতে কার্যত এখন বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। আর তার বাইরের আঙিনার কাছারি বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকে সেখানে মাত্র ৫/৬ জন পুলিশ পাহারায় রয়েছে বটে, কিন্তু ভীতিকর পরিস্থিতিতে তাদের দশা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আতঙ্কিত হয়ে যে কোন মুহূর্তে তারা প্রাণ নিয়ে কেটে পড়তে পারে। আর সেটি যদি ঘটে তাহলে ওখানকার আটকে থাকা নারী-পুরুষ-শিশুকে কার্যত ভর্তা করা হবে, প্রাণে মারা পড়বে সবাই। কাজেই পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য ত্বরিত আমাকে সেখানে ছুটতে হলো। হবিগঞ্জে তখন পুলিশ ছিল মাত্র আট কি দশ জন। তাই আমি বললাম, চলো, আমরা ওখানে গিয়ে জমায়েত লোকজনের সাথে কথা বলে দেখি কী হয়। আমরা এরপর সেখানে পৌছে ঐ এমপিএ-র বাড়ির পাশে একটা খেলার মাঠে লোকজনের সাথে দেখা পেলাম। জানা গেল, উপস্থিত জনতার মধ্যে থেকে লোকজন আইয়ুব খান, মোনায়েম খান ইত্যাদির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে বললাম, এই যে শুনুন আপনারা, আমার কথা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? তারা জানাল, আমাকে এর একটা হেস্তনেস্ত কিছু করতে হবে। আমি আবার বললাম, ঠিক আছে, আমাকে অন্য কোন ভাষায় কথা বলতে হবে—হয় ইংরেজী নয় উর্দুতে। আমি বললাম, আমি ইংরেজীতে বলব? আমি লোকজনের কথাবার্তা ও

কণ্ঠস্বর থেকে ধরতে পারলাম ওদের অনেকেই উর্দু বোঝে তবু ওরা আমায় ইংরেজীতেই কথা বলতে বলল। বলাবাহুল্য, সেটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের, বিশেষত সেখানে উপস্থিত একজন পাঞ্জাবীর প্রতি বিরোধী অনুভূতিরই প্রতীকী বহিঃপ্রকাশ।

◆ আপনি কি ইংরেজী অনুবাদ করার জন্য সেখানে কাউকে পেয়েছিলেন?

Δ জ্বি, হাঁ, একজনকে আমরা যোগাড় করেছিলাম। আমি বললাম, কীসের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ আপনাদের? আপনারা তো আইয়ুব খান, মোনায়েম খান—এদের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ করছেন। তা করুন আপনারা। চালিয়ে যান। যা খুশি বলুন। কিন্তু আপনারা এই লোকটিকে কেন হত্যা করতে চান? আপনারা কেন এমপিএ ও তাঁর পরিবারের মেয়েদের জানে মারতে চান? ওরা তো আপনাদেরই লোক। ওরা ভুল করেছে। আপনাদের স্বার্থের সাথে বেঈমানী করেছে। তো ঠিক আছে, সে বিচার তো আপনারা পরেও করতে পারবেন। তাই ওদেরকে হত্যা করতেই হবে, কেন? কেনই বা ওদের ওপর চড়াও হতে হবে? তারা বলল, আমরা হত্যা নয়, বিচার করে আমরা ওকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চাই। আমি বললাম, আপনারা কী করে তা পারেন? আপনারা তো ছাত্রদের দল। আপনারা তার পাল্টা পক্ষ। আপনারা তো তা পারেন না। আমি দুঃখিত। আপনারা চলে যান এখান থেকে। আমি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব। তারা বলল, না তা হবে না, আপনারা সবাই শোষক! আমি জবাব দিলাম, আমি তো একজন বালুচ, আমাকে আপনারা কি করে শোষক বলতে পারেন? আপনারা যেমন শোষিত ঠিক সেভাবে আমাদেরও তো শোষণ করা হয়েছে! হয়নি কি? দেখা গেল ওদের মধ্যে এবার বিপুল সহানুভূতি জেগে উঠেছে। ওরা বলল, সত্যি! আপনাদেরকেও শোষণ করা হয়েছে। আমি এই অবকাশে বললাম, চলুন, বাড়িটার দিকে যাওয়া যাক। ফলে কাজ হলো কিছুটা। সমবেত জনতার নেতারা নমনীয় হলেন। আমি আরও বললাম, আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমি এই এমপিএ-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। তারপর আমরা ঐ বাড়িতে গেলাম। ইতোমধ্যে জনতার মধ্য থেকে কেউ কেউ অন্য কিছু লোককে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে, আমার কথা ওদের শোনা উচিত; আবার আরেক পক্ষ বলছিল, না, আমরা ব্যাটাকে গ্রেফতার করে তার বিচার এখানেই করতে চাই। আমি বললাম, আপনারা এখানে তার বিচার করতে পারেন না। আপনাদের সে কর্তৃত্ব নেই। আর আমিও কাউকে বিচার করে তাকে দণ্ড দেয়ার কোন কর্তৃপক্ষ নই। আমি দুঃখিত। আমি ওটা করব না। এরপর ওরা আমাদের ওপর ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করল। আমার গায়েও কিছু ইটপাটকেল এসে পড়ল, ফরিদকে ইটপাটকেলের ঘা খেতে হলো। কিন্তু যারা জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল তারা ওদের পাথর ছোড়া বন্ধ করতে বলল। আমার বিশ্বাস আমাদের নিরপেক্ষতায় এদের আস্থা ছিল। আরেকটি বিষয় হলো এই যে, ওরা জানত তাদের লোকজনের বিরুদ্ধে আমার উপর সিলেটের ডিসির অন্যায় দাবিতে আমি নতি স্বীকার করিনি। তাই সেখানে ওরা বা ওদের লোকজন ছিল, অন্য অনেকে ছিল যারা অঘটন ঘটাতে চায়নি। যা-ই হোক, ধীরে ধীরে ইটপাটকেল ছোড়া বন্ধ হলো। আর আমরা এমপিএ সাহেবের বাড়ির বাইরে অপেক্ষায় রইলাম। কেননা তখনও সেখান থেকে লোকজন যায়নি। ধীরে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার পর বেশ শীত পড়তে শুরু করল। বলাবাহুল্য তখন শীতকাল। শীতের কারণে লোকজন কমে আসতে লাগল—যদিও তারপরেও কিছু লোক

সেখানে থেকে গেল রাত এগারোটা পর্যন্ত। কেবল তখনই আমার মনে হলো এবার ওদের এখান থেকে কোথাও দূরে সরিয়ে নেয়া যেতে পারে। আমি পুলিশকে তাদের একটা জীপ দেয়ার জন্য বললাম। তাতে এমপিএ সাহেবের বাড়ির মেয়েদের তোলার ব্যবস্থা হলো। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে এমপিএকে গ্রেফতার করলাম। তাঁর আগ্নেয়াস্ত্রটি নিয়ে নেয়া হলো। তারপর তাদের সবাইকে পুলিশ এসকর্ট দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম সিলেটে। সাধারণ, সচরাচর রুটে না—আরেক পথে। ভাগ্যিস ওদের ঐ পথে পাঠিয়েছিলাম! কেননা, দুই ফেরিঘাটে দু'দুটো দল হামলা করার জন্য ওঁৎ পেতে ছিল। ওদের কপাল জোরে ওরা ওপথ দিয়ে যায়নি। এ ঘটনা থেকে আমার একটা শিক্ষা হলো। শিক্ষা হলো কেমন করে বেসামাল জনতাকে সামাল দিতে হয়। আর এ পাঠও আমি নিলাম যে, নিজে আন্তরিক ও সৎ হলে খুব কঠিন পরিস্থিতি, এমনকি পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাকর ও জনতা একাট্টা-মারমুখী হলেও তারা কথা শুনবে, যদি তাদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ও তাদের জয় করার মতো বুকের পাটা থাকে। এ ঘটনা অন্তত দেখিয়ে দিয়েছে যে, এমনকি সাধারণ, দেহাতী, প্রবল আবেগে অতি উত্তেজিত মানুষও যুক্তির কথায় কান দেয়, শোনে। তারা এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে যে, তাদের জন্য দরদ, সহানুভূতি রয়েছে, তাদের প্রতি করুণার ভাব নেই, অপছন্দের কিছু নেই। আমাদের চোখে তাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। কেননা, পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও দেশ গড়ার বছরগুলোতে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ। যা কিছু ঘটেছে ও যা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার পরেও আমার বিশ্বাস সেগুলো দুর্ভাগ্যজনক। কেননা, ন্যায়বিচার হলে, ন্যায়বিচার হচ্ছে, হবে এমন প্রত্যয় থাকলে ও স্বচ্ছতা থাকলে আমরা এখনও এক ও অভিন্ন দেশই থাকতে পারতাম। তবে আমার মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যাবার বেশ আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি বা ডায়নামিক্স সচল হয়ে উঠেছিল।

◆ উনসত্তরের আন্দোলনকে আপনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন? আপনি তো এই আন্দোলনের বিক্ষোভ আর জনতাকেই মোকাবিলা করেছেন। তখন দেশ জুড়ে আসলেও বিক্ষোভ চলছিল। আপনি সিলেটে তারই অংশবিশেষের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা বাংলাদেশে।

Δ না, তখন পশ্চিম পাকিস্তানেও বিক্ষোভ চলছিল।

◆ ঠিক, তখনকার পাকিস্তান জুড়ে।

Δ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে তখন...

◆ হ্যাঁ, এখানে লাহোরেও সে আন্দোলন হয়েছে। বিরাট বিক্ষোভ হয়েছে। আইয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য। কিন্তু ঠিক সেই সময়টায় আপনি কি বুঝেছিলেন দেশ জুড়ে এমন একটা তাৎপর্যময় ঘটনাই ঘটে চলেছে? যদি আপনি বুঝে থাকেন, তাহলে সে ব্যাপারে আপনার ধারণাটি কী?

Δ জ্বি, আমি সেসব খবর পেয়েছি, পড়েছি। দেশ জোড়া ঘটনা। বিক্ষোভের কতকগুলো মৌলিক কারণ ছিল। আপনাদের হয়ত জানাই... দেশে ছিল একনায়কসুলভ শাসন, সামরিক শাসন, কেন্দ্রের শাসন। আর আরও ছিল অনুমানভিত্তিক কিছু ধারণা যা সব কিছুকে তখনকার

ঐ পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। তখন আপনাদের ওখানে ছিল দারিদ্র্য, আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যা। আর যখন এই এতসব সমস্যার আগ্নেয়স্তূপে অনুমানসুলভ ধারণার সলতে যোগ দেয়...

◆ কীসে পরিস্থিতি এমন গুরুতর, ভয়ানক করে তুলল? কেন পরিস্থিতি ঘোরতর হলো, কী জন্য?

∆ দেখুন পরিস্থিতি ঘোরতর হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে ওঠা ধারণার কারণে। সে ধারণাটি ছিল এরকম যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সুবিচার পাচ্ছে না, পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষমতা কায়েমী সেই ক্ষমতার মালিকদের কাছ থেকে এর যথার্থ কোন ব্যাখ্যাও মিলছে না। আর...

◆ আপনার সেই ক্ষমতাধরদের কথাই তো বলছেন? আমি সেকথাই বলি, তখন ওরকম অনুভূতি ছিল, জনসাধারণ তখন বলাবলি করছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণী, সেনাবাহিনী আর আমলাতন্ত্রের মিলিত চক্র ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চাচ্ছে। আপনি দেখুন, এটি মূলত...

∆ আইয়ুব খানের দীর্ঘ শাসনামলে প্রধানত সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র ক্ষমতায় ছিল। রাজনীতিকরা...

◆ একজন আমলা হিসাবে আপনার কি একথা মনে হয় যে, রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হিসাবে আপনারা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন? আমি বলতে চাই, তখন এ রকম ভাবতেন আপনি?

∆ না, আমি আপনাকে বলি, আমরা খুবই নিচের স্তরের আমলা হওয়ায় আমাদের এ সব বিষয়ে এতখানি সচেতন হবার তখন অবকাশ ঘটেনি। তবে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু সিনিয়র আমলা কিংবা পাঞ্জাবী আমলার কথা আলোচনা করতাম—বাংলাদেশীদের প্রতি যাঁদের মনোভাব যথার্থ ছিল না। তাঁদের আচরণ ছিল অনেকটাই করুণাসুলভ, কিছুটা অবমাননাকর। তাঁদের আচরণ পূর্ব পাকিস্তানীদের বেলায় এমন ছিল তারা যেন অধিকারের প্রশ্নে পাকিস্তানের সমান নাগরিক নয়। আমার ধারণা, এই মনোভাবই বাঙালীদের মাঝে বিরূপ অনুভূতি সৃষ্টির সম্ভবত প্রধান কারণ। এ ছাড়াও পাশাপাশি পিআইডিই তথা পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট ইকোনমিকসের রেহমান সোবহান ও তাঁর অনুসারীদের অবদান রয়েছে—যাঁদের ধারণা ও বিশ্বাস এই যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকটায় পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় বৈষম্য করা হয়েছে। তবে তাঁদের এসব ধারণা, অনুমান ও দাবির সত্যাসত্যের তুল্য মূল্য কতখানি তা অত্যন্ত বিতর্কসাপেক্ষ। কিছু সত্য আছে। কিন্তু এসব দাবি হলো সেই একই সব ধারণা যার সৃষ্টি কল্পনামূলক অনুমানে।

◆ আপনার এই যে উপলব্ধির কথা বললেন, পূর্ব পাকিস্তানবাসীর প্রতি অযাচিত মনোভাব সম্পর্কে তা কি স্বীকৃতি পেয়েছে?

∆ পেয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের বহু নিরপেক্ষ মানুষই স্বীকার করেন যে, উন্নয়ন বা উন্নয়নের সুফল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে পৌঁছেনি। অথচ তা হওয়া উচিত ছিল। আরও

আপনাদের জানা দরকার, পূর্ব পাকিস্তানে আপনারা যখন সামরিক শাসনাধীনে ছিলেন তখন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করত সেনাবাহিনী। আর সেনা শাসনের উৎস পাঞ্জাব তথা পশ্চিম পাকিস্তান। তাই অনিবার্যভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য স্তরের নেতারা উপলব্ধি করতেন তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছেন। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশীদারী নগণ্য, প্রশাসনে, প্রশাসন প্রক্রিয়ায় তাঁদের অবদান নিহায়তই নগণ্য। আমরা খুবই নিচের স্তরের কর্মকর্তা হলেও আমরা জানতাম গলদটা কোথায়। আর ছয় দফা নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও তর্কাতর্কি করেছি আমরা। আমরা আলোচনা করেছি, দেখতে চেয়েছি গলদ আসলে কী, কোথায় সে গলদ, আর সে গলদ দূর করা সম্ভব কি না। এ সবকিছুই তখন বিবেচনায় ছিল।

◆ ছয় দফা সম্পর্কে আপনার নিজের ধারণা কী?

∆ আমি মনে করি, ছয় দফা বিচ্ছিন্নতারই ব্যবস্থাপত্র। আমি এর বিরোধী। আমার ধারণা ছিল, ছয় দফা ছাড়াই পরিস্থিতি বদলানো, গলদ দূর করা সম্ভব ছিল। তবে তখন যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা অবস্থাটি ছিল, তাতে অবস্থার উন্নতি ঘটবে এমন আশা অনেকেই করতে পারেনি। আমার বিশ্বাস, এ রকম অবস্থায় শোধন-পরিবর্তন আনতে হলে যে ধরনের বিশেষ জনগোষ্ঠী আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতার দরকার, যে নেতারা পরিস্থিতি-পরিবেশ অতিক্রান্ত হয়ে সব কিছুর উর্ধে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের পানে চোখ রেখে কী ভুল হলো না হলো আর তার প্রতিকার কীসে তা বলতে পারবেন। সে সময় চাপ ছিল নানা দিক থেকে। তাই সাধারণ নেতাদের—যাঁদের সেরকম উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি নেই—তাঁদের পক্ষে এ ধরনের প্রচণ্ড পরস্পরবিরোধী চাপের টানাপোড়েনে সবকিছুর ওপরে ওঠা অন্তত সম্ভব নয়। আপনারা ফ্রান্সের উপনিবেশ আলিজিরিয়ার স্বাধীনতার কথা শুনেছেন। আলজিরিয়ার স্বাধীনতা প্রশ্নটি যখন বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন জেনারেল দ্য গলের মতো একজন নেতার দরকার হয়েছিল। তিনি আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা দেবার সাহসী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত দিয়ে পরিস্থিতিকে সহজ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ তখন আলজিরিয়ায় মোতায়েন বিরাট ফরাসী সেনাবাহিনীর ধারণা ছিল দ্য গল আলজিরিয়ায় ফ্রান্সের ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করে তুলবেন। কিন্তু আমাদের তখনকার পাকিস্তানের রাজনৈতিক দিগ্বলয়ে দ্য গলের মতো কোন রাজনীতিককে আমরা পাইনি। আমাদের কোন দ্য গল ছিল না।

◆ আমাদের দু'জন রাজনৈতিক নেতা তো ছিলেন যাঁরা দুজনে পাকিস্তানের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির দুই নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন?

∆ জনাব ভুট্টো আর জনাব মুজিবুর রহমান?

◆ এই দুই নেতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

∆ আপনার এ প্রশ্নের সরাসরি, সহজ জবাবে বলি, আমি মনে করি না তাঁরা দ্য গলের মতো কেউ ছিলেন। ভুট্টো আমার নেতা হন আমি যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করি। আমি ভুট্টোর রাজনৈতিক জীবনের তিন মাস তাঁর মন্ত্রিসভার উৎপাদনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করি। এহেন তিনি ও শেখ মুজিবুর রহমান কেউই দ্য গলের আসনে উত্তীর্ণ হতে পারেননি বলেই আমি মনে করি। তাঁদের অবশ্য গুণ ছিল অনেক। একজন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অত্যন্ত জনপ্রিয়

নেতা, পশ্চিমেও অন্যজনের অনুরূপ প্রায় প্রতিষ্ঠা। তবু আমি মনে করি না, যে সঙ্কট তৈরি হয়েছিল তা কাটিয়ে নেবার সাধ্য তাঁদের ছিল।

◆ আপনি কি মনে করেন, ওঁরা যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যেতেন তাহলে যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে একেকটা কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচিত হওয়ার আলোকে ঐ অধিবেশন চলাকালে অধিবেশনের নেপথ্যে একটা রফায় যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল?

Δ না। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ভাঙন তখন সীমা ছাড়িয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে দুর্নিবার, পথ নেই আর ফেরার। আমি মনে করি না, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আর কখনও একটি ফেডারেশনের যুগল সদস্য হিসাবে থাকতে পারবে। কেননা, আমরা ইতোমধ্যে বহুদূরের পথ পেরিয়ে এসেছি। তাছাড়া... খুবই স্পষ্ট ব্যাপার পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর এ্যাকশন সবকিছুর চরম অবনতি ঘটিয়েছে, হয়েছে গৃহযুদ্ধ, হয়েছে ভারতের হস্তক্ষেপ... আর এভাবেই সম্ভাবনার হয়তবা খোলা খামে চিরস্থায়ী সিলমোহর পড়ে গেছে।

◆ আমি রাজনৈতিক দিক সম্পর্কেই বলছি। কেন এ জিনিসটা দ্রুততর হলো? আপনি কি মনে করেন নির্বাচনে জেতাই যথেষ্ট না আরও কিছুর দরকার ছিল?

Δ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর যদি দেশের উভয় অঞ্চলের মানুষ পরিস্থিতির গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত যে দেশের দু'টি শাখাকে এক রাখা দরকার, তাহলে সেখানে একটা জাতীয় সরকার গঠিত হতে পারত সমান অংশীদারী ও ফলদায়ক সিদ্ধান্তের শর্তে, হয়তবা পরিস্থিতি বদলাতেও পারত। কিন্তু তার বহু আগেই ধরেছিল অন্তিম ভাঙনদশায়, পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার অনুঘটক ও গতিদায়ক উপাদানগুলো অপরিবর্তনীয়ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়টাই আসে মহাদুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস পূর্ব পাকিস্তানে। তাতে ঘটে ভয়াবহ প্রাণহানির বিভীষিকা আর নজিরবিহীন ধ্বংসলীলা। এ ধারণাও গড়ে ওঠে, ফেডারেল সরকারও ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য কোন মমতার পরিচয় দেয়নি, তাদের দুর্দশা কমাতে তেমন কিছুই করেনি। আমি জানি না, এটিও হয়ত একটি কারণ, তবু সে যা-ই হোক এতে অবনতিশীল পরিস্থিতি চরমাবনতির দিকে গেছে নিশ্চয়ই। একটা খাঁটি কারণও...

◆ পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী যে এ্যাকশন নিয়েছে ও পরবর্তীকালেও তারা যে কার্যকলাপ চালিয়েছে... তার কোন যৌক্তিকতা কি আপনি দেখেন?

Δ না, আমি সেনাবাহিনীর কার্যব্যবস্থার কোন ওকালতি করছি না। তবে আমার এখানে বলার এই যে, সেনাবাহিনী এ্যাকশনে গেছে ঠিকই তবে অনেকটা ঐ পরিস্থিতির মাঝে টেনে নিয়ে যাওয়াও হয়েছে। কারণ, পরিস্থিতি যখন এমন সেখানে মুক্তিবাহিনীর আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে সেনাবাহিনীকে ডেকে না এনে উপায় কী থাকে?

◆ বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি তেমন হয়নি কেন?

Δ আমি তো বুঝি না সম্পর্কের অবনতিটাই বা কীভাবে এড়ানো যেত! এটি বলা শক্ত। বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে অত্যাচার-নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছে তা নিয়ে বহু কথাবার্তা হয়েছে। উভয় তরফে এত বিপুল প্রাণহানি কেন ঘটল তা অনুসন্ধান তদন্ত করে দেখার চেষ্টা

করেছি। জানার চেষ্টা করেছি, ওখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ কী আর দেশের নামে বা আদর্শের নামে তা দমন বা স্তব্ধ করে দেবার অভিপ্রায়ই বা কেন? বলা দরকার, তখন উত্তেজনা-আবেগ চরমে পৌঁছে যায়, পরিস্থিতি মোড় নেয় দুর্ভাগ্যজনক দিকে, অনিশ্চয়তার নিশানায়। অত্যাচার-নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয় আর তা মিথ্যা নয়। সে অত্যাচারের বিভীষিকার বিস্তার-পরিসর-ব্যাপ্তি—তা আজকের বাংলাদেশের যথাযথ রেকর্ডভুক্ত হয়ে থাকুক, বা না থাকুক, কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানে এর রেকর্ড যথার্থ নয়—এমন ধারণা থাক বা না থাক এটা অবশ্যই বিতর্কযোগ্য বিষয় আর এজন্য নিরাসক্ত সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তবে অত্যাচার-পাশবিকতা ঘটেছে উভয় তরফেই আর তাতে অনিবার্যভাবে একটা বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়েছে যার মাঝে সংযোগ সেতু গড়া কার্যত অসম্ভব।

◆ হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট দেখার কোন সুযোগ আপনার হয়েছে কি?

Δ হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট আমি পড়িনি। তবে এর বিষয়বস্তু কী তা আমার জানা।

◆ আমি বলতে চাই দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রুথ কমিশন বা এর মতো কিছুর সম্ভাবনা আছে কি না? এ বিষয়ে আপনার মত কী? আপনি কি মনে করেন এ রকম কিছু হলে কোন উপকার হবে?

Δ সত্য কী তা অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। দেশের ইতিহাস সঠিকভাবে লিখিত হওয়া একটি দেশের জন্য সব সময়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসবেত্তারা সব সময়েই প্রকৃত ইতিহাস নিরূপণ করতে ও প্রচার-প্রচারণার ফাঁদে খাঁটি সোনা যদি কিছু থাকে তা আলাদাও করতে পারেন। নিরাসক্ত ইতিহাসবেত্তারা কাজটি সব সময়ই করতে পারেন, সত্য প্রকাশ করতে পারেন। অন্তত আমার প্রত্যয়—সঠিক ইতিহাস আত্মপ্রকাশ করবে, আমি নিশ্চিত তা করবে, করা উচিত। তবে ঠিক, কালের এ সন্ধিক্ষণে পাকিস্তানে আমাদের জনসমাজ শাসনের, সমাজ সম্প্রীতির, হিংসাপ্রবণতার, উন্নয়নের, শিক্ষার, স্বাবলম্বী নারীর, নিজস্ব আরও গুরুতর সমস্যা নিয়েই বেশি করে উদ্বিগ্ন...

◆ জনাব ভুট্টোর সাথে ১৯৭১-এর বিষয়গুলো নিয়ে আপনার আলোচনার কোন সুযোগ হয়েছিল?

Δ তাঁর কার্যকালের শেষ তিন মাসে কেবিনেট মন্ত্রী থাকাকালেই তাঁর সাথে আমার যা দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে। ঐ সময়ে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিএনএ'র আন্দোলন চলছিল। তাই আমরা সাত-আট বছর আগে কী ঘটেছে তা নিয়ে সত্যিকার অর্থে ভাবিত ছিলাম না।

◆ আমি এখন দেশে আপনার রাজনীতি বা আপনার ব্যক্তিগত কর্মসূচী সম্পর্কে কিছু জানতে পারি?

Δ ভাল কথা। আমি কতকগুলো নীতির প্রশ্নে পদ থেকে ইস্তফা দিই যখন দেখি সরকার আইন ও শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করছে ও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ক্ষতি করছে।

◆ আপনি কি বেনজীর ভুট্টোর সরকারের কথা বলছেন?

Δ না, নওয়াজ শরীফের সরকার। বেনজীর ভুট্টোর সরকারকে আমি বরখাস্ত করি। আমি একমাত্র পিপলস পার্টিতেই শুধু যোগ দিয়েছিলাম। আমার রাজনৈতিক জীবনে এ পর্যন্ত সেটিই আমার দল ছিল।

◆ **আপনার সরকার বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।**

▲ আমি সরকার বাতিলের যে আদেশ দিয়েছিলাম যদি সেটি পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন, তাতে সরকার বাতিলের শেষ কারণ ছাড়া আর সব কারণই রয়েছে আর সেটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। একান্ত আশু বিপদ—সরকারের খেলাপী হওয়ার বিপদ—যার জন্য আমাকে ঐ চরম ব্যবস্থা না নিয়ে উপায় ছিল না। বেনজীরের সরকার আর ১০ দিন ক্ষমতায় থাকলেই সেই বিপদ ঘটিয়ে ছাড়ত। সেটি খুবই বড় কারণ। আরও অনেক কারণ ছিল যেমন, ছিল শাসনতান্ত্রিক কারণ, দুর্নীতির কারণ, শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের কারণ, বিচার বিভাগকে অগ্রাহ্য করার চিন্তাভাবনা ও প্রবণতা ইত্যাদি। আর নওয়াজ শরীফের সরকারের সাথে আমার বিরোধের কারণ মূলত হলো আমার এই মর্মে উপলব্ধি যে, আমি এমন লোকজনের সাথে একত্রে থাকতে পারি না যারা নিজেরাই সুপ্রীম কোর্ট হতে চেয়েছে। আমি তাদের গদি রক্ষার জন্যই ইস্তফা দিয়েছি, ইস্তফা দিয়েছি তাদের সবাইকে রক্ষার জন্য... আমি সুপ্রীম কোর্টের নাগাল থেকে নওয়াজ শরীফকে কোনভাবে বাঁচানোর যথাসাধ্য করেছি। সুপ্রীম কোর্ট ঐ সময় নওয়াজ শরীফের একটা মামলার বিচার পরিচালনা করছিল। আমি কোনক্রমে দুই সপ্তাহের জন্য ঐ মামলা মুলতবি রাখার জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে সম্মত করাতে পেরেছি। তাই এত কিছুর পর ওদের সাথে আমার আর একত্রে কাজ করা সম্ভব ছিল না। তাই ঠিক করলাম আমি আমার পদে ইস্তফা দেব। আর তারপর যদি ওদের বিরোধিতা করতেই হয় আমি সেটি করব বাইরে থেকে, পাকিস্তানের একজন নাগরিক হিসাবে। আমার এখনকার কর্মসূচী হলো পাকিস্তানের যেসব চিন্তাশীল মানুষ পাকিস্তানের বর্তমান সঙ্কট, আর্থ-সামাজিক সঙ্কট নিয়ে উদ্বিগ্ন তাদেরকে সংগঠিত করা।

◆ **তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন সেটি কি একটি রাজনৈতিক দল হবে?**

▲ ওহ! তাতো বটেই।

◆ **আপনি কি যেসব রাজনৈতিক সংগঠন বা ফোরাম রয়েছে সেগুলোর কোন একটির কথা ভাববেন?**

▲ আমার মনে হয় পাকিস্তানের দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলেরই একই ক্রটি রয়েছে, আমি বলতে চাই...

◆ **আপনার মত কি তাহলে...?**

▲ জ্বি, আমি অন্য লোকদের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাই না। আমি চাই তাঁরা সকলেই ভাল থাকুন। আমি কামনা করি, পিপলস পার্টি ও নওয়াজ শরীফের পার্টির সংস্কার যেন তাঁরা নিজেরাই করেন। কিন্তু আমি তো তেমন সম্ভাবনা দেখি না। এই দুই প্রধান রাজনৈতিক দল তাদের চরিত্র বদলাবে—এমন তো আমার মনে হয় না। একটা অভিন্ন ক্রটি রয়েছে এই দুই দলের, অবশ্য আপনারা যদি তাকে ক্রটি বলেন। সেটি হলো, এ দুটি দল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে তারা কস্মিনকালেও জনস্বার্থকে বেছে নেবে না। জনস্বার্থকে ব্যক্তি, বেসরকারী স্বার্থের উর্ধে স্থান দেবে না। ওটা সব সময়ই হবে আগে বেসরকারী, ব্যক্তিস্বার্থ, তারপরে জনস্বার্থ। তাই আমরা যদি দেখি দেশের পরিকল্পনা কমিশন

কোন কিছুর বেলায় অগ্রাধিকার ক, খ ও তারপরে গ—এভাবে নির্ধারণ করেছে, তাহলে সে সব খাতে সম্পদ বরাদ্দের বেলায়, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় দেখা যাবে, বিবেচনা চলছে কোন্‌টায় কী মধু আছে বা তাদের কী পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে—ঐ সব কার্যক্রম থেকে কী উৎকোচ, কী কমিশন মিলবে তবেই না সিদ্ধান্ত!

◆ দেশ যদি তাতে অপারগ হয় তাহলেও...?

∆ অবশ্যই। দেখুন, আজ সেইসব কাণ্ডই তো ঘটে চলেছে। দেখুন না, নওয়াজ শরীফ তাঁর অগ্রাধিকার কী কী তার প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছেন। সেগুলো হলো আরও আধুনিক মোটরওয়ে, লাহোর বিমানবন্দর, ইসলামাবাদ বিমানবন্দর, লাহোরে গণযানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা, করাচীর গণযানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা—এগুলো হলো তাঁর প্রকাশ্যে ঘোষিত অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কার্যসূচী; এমনকি তাঁর যাঁরা ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা তাঁরাও মনে করেন, এর প্রতিটি প্রকল্পই এ মুহূর্তে পাকিস্তানের জন্য, এমনকি খোদ নওয়াজ শরীফের জন্য বিষবৎ। পাকিস্তানের উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁরা সত্য প্রকাশের সাহস দেখিয়েছেন তাঁদের অনেককে চাকরি হারাতে হয়েছে। এসব প্রকল্প দেশের জন্য বিপর্যয়কর। বলার সাহস দেখানোর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক অতিরিক্ত সচিবকে তাঁর চাকরি হারাতে হয়েছে। নওয়াজ শরীফের স্পষ্ট কথা হলো কোন কথা শুনতে চাই না, বরং দেখুন, এগুলোই হলো আমার অগ্রাধিকার। তাহলে বুঝুন ব্যাপারটা! দেশের শীর্ষ নেতৃত্বকে তাঁর নিজের সহযোগী, সহকর্মীরা পরামর্শ দিলেও সেগুলো গ্রাহ্য হয় না। তারা জোর দিয়ে তবু বলতে ছাড়ে না যে এইসব কার্যক্রম দেশকে নিরুদ্দেশের বন্দরে নিয়ে তুলবে। পরিকল্পনা কমিশন তাঁকে বলে যে, এর প্রতিটি প্রকল্প হলো এক একটি দুর্যোগবিশেষ। দেশের জন্য এগুলো নেতিবাচক ফল নিয়ে আসবে। তাতেও তাঁর বোধোদয় ঘটে না। তাঁর সেই এক রা। তাঁর কথাই থাকতে হবে। এ অবস্থার জবাব কী? বেনজীর ভুট্টোর সরকারের বেলাতেও একই কথা। আমি বরাবরই তাঁকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে এসেছি। আমি বলেছি, উত্তরাধিকার হিসাবে উন্নয়ন কার্যক্রমের যেগুলো বাস্তবায়িত হবার কথা, আগামী পাঁচ বছরের জন্য যা গৃহীত হয়েছে নানা মেনিফেস্টোর ভিত্তিতে কিংবা একদিন জিয়াউল হকের শাসনামলে এ্যাড-হক ভিত্তিতে নেয়া হয়েছিল—তার বাস্তবায়ন করতে হবে, আপনাকে অবশ্যই আপনার অগ্রাধিকার বদলাতে হবে। জনগণের প্রয়োজন মেটাতে আপনাকে অবশ্যই সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে। এ সবের জবাবে তিনি বলেছেন, তাই হবে, হাঁ তাই হবে। বলাবাহুল্য আমার এসব জিজ্ঞাসা, আমার এসব জানতে চাওয়া একজন আমলা যেভাবে জিজ্ঞাসা করে সেভাবেই। আমি বললাম, এ কাজ কোন আমলার নয়। এজন্য দরকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এ নিয়ে কখনও তাঁকে আমি মাথা ঘামাতে দেখিনি। বরং এমন সব কার্যক্রম শুরু করলেন তিনি যার প্রতিফল হিসাবে সব নেতিবাচক ফল আসতে শুরু হলো। আর সেগুলো দেশের জন্য বিপর্যয় ছাড়া কিছু নয়। প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যন্ত করা হয়নি। অথচ শুরু করে দেয়া হয়েছে শত শত কোটি ডলার ব্যয়ের ঐ সব প্রকল্প। আর এ সবই হয়েছে কেবল উৎকোচ আর কমিশন মিলবে বলে। তাই এর ফল হিসাবে তাঁর সরকার যখন বরখাস্ত হলো তখন দেখা গেল পরের পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হচ্ছে ৮/৯ মাস

বিলম্বে, আর সেই মেয়াদের জন্য মোট সম্পদ তথা তহবিল রয়েছে ৫০ হাজার কোটি ডলার, যদিও তখনকার চলতি কার্যক্রমগুলোরই ব্যয় হলো ৬০ হাজার কোটি ডলার। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে আপনি নতুন উদ্যোগ নেবেন কী করে, কী করে আপনি আপনার দেশের অর্থনীতির গতি অশ্ববেগে ছুটিয়ে দেবেন, জনগণের জরুরী প্রয়োজন মেটাবে এমন কাজ আপনি কেমন করে করবেন? তিনি তাঁর ঐ সব অপ্রয়োজনীয় সাদা হাতি প্রকল্পগুলো ছেঁটে দিতে পারেননি, যেগুলো দেশের অর্থনীতির ঘাড়ে সিন্দাবাদের ঘাড়ের একচোখা কানা দৈত্যের মতো চেপে বসে বোঝা হয়ে উঠছিল দিন কে দিন। তাঁর সরকার বরখাস্ত হবার পরের কেয়ার-টেকার সরকারের অন্তর্বর্তী মেয়াদটুকুর মধ্যেই ঐ কাজটি আমি করেছিলাম মাত্র একটি মাসে নির্জলা বস্তুনিষ্ঠ যাচাইয়ের ভিত্তিতে। আমরা তখন দেশের ভবিষ্যতের স্বপ্নের তথা পরিকল্পিত উন্নয়নের একটা ছক দিয়েছিলাম। আমাদের শুধু দরকার কতকগুলো উদ্দেশ্য পূরণ করা যা আমাদের দেবে বেশি হারে জিডিপি (সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন), আমাদের দরকার এমন সব কার্যক্রম যেগুলোর মূল লক্ষ্য হবে ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন। আমাদের এমন সব কার্যক্রম দরকার যে সবের আওতায় মানুষ বা জনশক্তি নামের সম্পদ বিকাশ লাভ করবে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে। আমাদের দরকার এমন কার্যক্রমের যেগুলো আমাদের রফতানি বাড়াবে, আর তারই সুবাদে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের আত্মনির্ভর প্রবৃদ্ধির পথে।

◆ এগুলোও কি আপনার দলীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে, মানে আপনি যে দল গড়তে যাচ্ছেন?

Δ অবশ্যই। কেন তা নয়? যা কিছু জনগণের, যা কিছু সমাজের প্রয়োজন তার সবকিছুই তো থাকা দরকার। আরও থাকবে এমনসব কার্যক্রম যা আধুনিকায়ন নিয়ে আসবে, আমাদেরকে নিয়ে যাবে আগামীর অগ্রসর শতকে। তথ্য প্রযুক্তি, মাইক্রোবায়োলজি, অন্যান্য প্রাণবিজ্ঞান; যে যে খাতে অল্পবিনিয়োগেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব অনেকখানি সে সব নতুন খাত; পরিবেশমূলক নানা ইস্যু যেখানে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত ও বর্ধিত হতে পারে, সেগুলোও স্থান লাভ করবে। আমি এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথাই আলোচনা করেছি বেনজীরের সাথে।

◆ ভাল, তা মানবাধিকারের বিষয়টিও কি সে আলোচনায় ছিল?

Δ আমি প্রথমত অর্থনৈতিক ইস্যুগুলোর কথাই বলছি। এসব বিশেষ আলোচনায় কোনটাতেই বেনজীর অসম্মতি জানাননি, শরীফ সবুজ বাতির আভাস জানিয়েছেন ঠিকই কিন্তু যখন সম্পদ বাটোয়ারার ব্যাপারটা এসেছে তখনই গণেশ একেবারে পুরো উল্টে গেছে। ছিল সম্পদ, ৬০ হাজার কোটি ডলার ছেঁটে দিয়ে কমিয়ে আনলাম ৩০ হাজার কোটি ডলারে। নতুন সরকারের জন্য ২০ হাজার কোটি ডলারের নির্ধারিত পরিসর ও নমনীয়তা সত্ত্বেও শরীফকে দেখা গেল তিনি আরও মোটরওয়ের জিদ ধরেছেন—যা বলাবাহুল্য বালখিল্য, স্বপ্নবিশেষ; এসব কথিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া পাকিস্তানের জন্য বিপর্যয়ের প্রক্রিয়া। আমি যে কোন দেশ, বিশেষ করে আমাদের, আপনাদের দেশের মতো দেশের জন্য এ সব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি...

◆ **আপনি কতটুকু সমর্থন পাবেন বলে আশা করেন ও কী ভিত্তিতে...?**

∆ আমি মনে করি যারা এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবে তাদের কাছ থেকে সমর্থন প্রত্যাশা করা যায়। তারাই হবে আমাদের লক্ষ্য। আমি নিজে নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের এ হিসাবে ধরে রেখেছি।

◆ আপনি কি ওদের লোক? ওদের শ্রেণীতে পড়েন?

∆ না, তা পড়ি না। এসব লোক হবে প্রধানত শহুরে, পেশাদার, সমাজে যাদের সচলতা বা গতি উর্ধমুখী, যারা চর্চিত মন ও মননের অধিকারী।

◆ আপনি কি নিজেকে তাদের সাথে অভিন্ন করে ভাবেন?

∆ দেখুন, আমাকে তা ভাবতে বা হতেই হবে এমন নয়। আপনার জন্ম কোথায়, সমাজে আপনার অবস্থান কোথায় সেটিই বিবেচ্য বলে আমি মনে করি না। আমি জানি না আমি কেমন করে আমার শ্রেণী নির্দেশ করব, কেননা আমার তো ধারণা সেটি নির্ভর করে আয়ের স্তরের ওপর।

◆ তার মানে আপনি কি আপনাকে জমিদার শ্রেণীর বলতে চাচ্ছেন?

∆ হ্যাঁ, তা-ই আমি। আমার সম্পদ-সম্পত্তি যা-ই বলুন তা প্রধানত জমিতেই। আমার সম্পদ খুব একটা ব্যবসায় নেই। আছে খুবই অল্পস্বল্প, খুবই ছোট ছোট আকারের তবু আমি ভূস্বামী শ্রেণীরই লোক।

◆ আপনি র‍্যাপোতে ছিলেন?

∆ র‍্যাপো তো আমারই। র‍্যাপো হলো পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ দুনিয়ায় সকলের প্রতি আমন্ত্রণবিশেষ! এ কেবল সেমিনার-সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপার নয়। বরং সভা-সেমিনার, খবরের কাগজ, চিঠিপত্র, সাহিত্য, আরও নানা জিনিস, আমাদের নেতৃত্বে আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা যা করছি তা ভবিষ্যতের পাকিস্তান গড়ার জন্য। সে লক্ষ্যেই আমরা ঠিক এ মুহূর্তে কাজ করে চলেছি। আমি অনুভব করি পাকিস্তান আর্থ-সামাজিক পর্যায়ে অনেকটা মোহাবিষ্ট বিহ্বলতার মধ্যে অর্ধজাগরণ একটা অবস্থায় রয়েছে যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আর দেশের এই আচ্ছন্ন ঘোর অবস্থা ভাঙাতে না পারলে আমরা এগিয়ে যাব বিপর্যয়, ধ্বংসের দিকে। আমি মনে করি এই সব শ্রেণীর বহু লোক আছে পাকিস্তানে যারা এ সব নিয়ে আলোচনা করছে, উদ্বিগ্ন; অথচ তাদের ওসব চিন্তাভাবনা ঠিক শক্ত দানা বাঁধছে না। ওরা সবাই চিন্তিত। তারা একটা কিছু করতে চায়। পাকিস্তান বিশ্বের মধ্যে এক সম্ভাবনাময়, জীবনীশক্তিসম্পন্ন দেশ। আমাদের রয়েছে মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদ, যদিও মানব ও প্রাকৃতিক—উভয় ধরনের সম্পদের অবক্ষয় চলেছে। এসব সম্পদের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে না। আমাদের কাজটি করতে হবে। কেননা, ওখানেই আমাদের শক্তি, সামর্থ্যের প্রধান উৎস।

◆ আপনার দলীয় সংগঠনের কোন নাম দিয়েছেন কি?

∆ এখনও নয়। দলটির কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার আগে আমার ধারণা তিন-চার মাস লেগে যাবে। আমাকে সেই সময়টায় আরও বেশি সংখ্যক লোকজনের সাথে যোগাযোগ

করতে হবে। তবে এ সংগঠনের উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আমি দারুণভাবে উৎসাহিত হয়েছি।

◆ চমৎকার। তা এই দলটি নিশ্চয়ই জাতীয় পর্যায়ে হবে?

▲ নিশ্চয়। এটি হবে একটি জাতীয়ভিত্তিক দল। দলটির ঘোষণা ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে।

◆ আগামী নির্বাচন কি আপনার লক্ষ্য হতে যাচ্ছে?

▲ আমি সে রকমই আশা করি। নিশ্চয়ই আগামী নির্বাচন। তবে আমার আশঙ্কা আগামী এক বছর, ছয় মাস—এ এক বছরে যে আমাদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে!

◆ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ব্যাপারে আপনার কি কিছু বলার আছে? আমি বিশেষ করে, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের কথাই বলতে চাচ্ছি। ভারতের বিজেপি সরকার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিগত কোন পরিবর্তন আনতে পারে কি? আপনি কী মনে করেন?

▲ খোলাখুলি বলি, আমি হলাম তাদেরই একজন যারা মনে করে তাদের পাকিস্তানে কোন হেরফের হবে না। ক্ষমতার মসনদে বিজেপি না কংগ্রেস না কোন কোয়ালিশন বসবে সে ব্যাপারে আমাদের জাতীয় ব্যাপার খুবই পরিষ্কার। ওসবে আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না।

◆ সার্কের ভবিষ্যৎ কেমন বলে আপনি মনে করেন?

▲ আমি তো মনে করি সার্কের ভবিষ্যৎ রয়েছে। আমি নিজেও সার্ক সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। আমি সার্ক থেকে কিছু পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। আমি মনে করি পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারত—সকলের জন্যই এক সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ রয়েছে।

◆ আঞ্চলিক উন্নয়নের বেলায় এই সার্ক কি কোন কাজে আসবে বলে আপনি মনে করেন?

▲ সার্ক একটি সংস্থা। বেশ কয়েক বছর ধরেই এই সংস্থাটি গড়ে উঠেছে, উঠছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবেই এসেছে যদিও সে পথ মাড়ায়নি আদৌ। আমি মনে করি এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয়েছে ভালই। সবাই চায় এ সংস্থার আরও উন্নতি, প্রসার। আমাদের দেশগুলোর মধ্যে নৈকট্যের সুবিধা রয়েছে, সেই ভৌগোলিক নৈকট্যের সুযোগ ও সুবিধা আমাদের অবশ্যই নিতে হবে। ভৌগোলিকভাবে এই কাছাকাছি অবস্থান ছাড়াও এসব দেশের মাঝে অনেক অনেক বিষয় ও সমস্যা রয়ে গেছে। আমি মনে করি, সকল দেশের পারস্পরিক সুবিধার ইতিবাচক বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আলোচনায় বসা উচিত। তাছাড়া, আমাদের সমস্যাগুলোর নিষ্পত্তির চেষ্টা করাকেও আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। কিন্তু সমস্যা এই যে, সার্ক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। অথচ এসব সমস্যার আলোচনা হতেই হবে। আপনি এগিয়ে যাবেন কী করে যদি পথে সমস্যা আপনাকে আটকে দেয়? এখন পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, এমনকি শ্রীলঙ্কার মতো দেশ রয়েছে—এসব দেশের নেতাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে, এমনকি বাংলাদেশেরও সাথেও। তাঁরা আমায় বলেছেন, আমাদের অবশ্যই সমস্যা নিয়ে কথা বলা দরকার। কিন্তু ভারত অনড়, অনমনীয়ভাবে বলেছে এসব বিষয়ে কোন আলোচনা নয়। আর সে কথার উল্লেখ রয়েছে সার্ক সনদে, কাজেই আমি বলি, ঠিক আছে। তা-ই আছে। কিন্তু তাই বলে কি সে সনদ বদলানো যাবে না! খুব সেটি

করা যায় মানুষেরই প্রয়োজনে। সার্ক দেশগুলোর জনসাধারণের স্বার্থে ও প্রয়োজনে সংস্থার সনদে পরিবর্তন, সংশোধন আনা প্রয়োজন। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য অজস্র কথা বলা হচ্ছে, কথার খৈ ফুটছে শুল্কের বেলায় সুবিধা দেবার অগ্রাধিকার দেবার নানা বিষয়ে। পাকিস্তান এটি চায়, আমিও তাই চাই। আমি বলি, আমাদেরকে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যের পথে পা বাড়াতে হবে ঠিকই তবে তা হতে হবে প্রকৃত বাণিজ্যের ভিত্তিতেই। এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে একান্তই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে; ফলে দেশগুলোর মধ্যে একটা সমতার অবস্থা নিয়ে আসা সমস্যাই বটে। কেননা যে মাঠে আপনি খেলবেন সমানে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে, সেই মাঠই যদি অসমান হয় সমান খেলা জমবে কী করে? আমরা একথা ভারতকে বলেছি, আপনাদের বলছি, বলেছি অন্যদেরকেও যারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে চেষ্টা করছে। আমরা বলি ঠিক আছে! কিন্তু ওদের বাণিজ্য ব্যবস্থা ও অবস্থাগুলো দেখুন, দেখুন আমাদেরটাও, দেখুন ওদের শিল্পগুলোকে কি ভর্তুকি ওরা দেয়, আর আমাদের নাজুক, শ্বাস টেনে, ধুঁকে চলা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেখুন। দেখুন ওদের ঐসব ভর্তুকির নিচে আমাদের এসব শিল্প কীভাবে তলিয়ে যাবে। আরও এ রকম নানা বিষয় রয়েছে যা বিবেচনার দাবি রাখে। তাই বাণিজ্য হতে হলে তার ক্ষেত্র সমান, মসৃণ হতে হবে। আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আইটিও-র মূলনীতিও তো তাই। কাজেই আমরা এ ধরনের বাণিজ্যের পক্ষপাতী অবশ্যই কেননা ভৌগোলিক নৈকট্য ও প্রাকৃতিক সুবিধা রয়েছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য হলে দুটি দেশ ও তাদের জনসমষ্টি নিশ্চয় উপকৃত হবে। তাই আমরা দেখতে চাই যে সার্কে সেটা হচ্ছে। আমি মনে করি সার্ক এগিয়ে যাবে। সার্ক সংগঠনে কিছু চমৎকার লোক কাজ করছেন। আমি সেটিকে এক ইতিবাচক বিষয় বলেই মনে করি।

◆ এমন কোন জিনিস রয়েছে, যা আপনি মনে করেন পাকিস্তানের করা দরকার...?

∆ সবার আগে পাকিস্তানের দরকার তার অর্থনীতি ও সরকারকে একটা সুষ্ঠু ধারায় নিয়ে আসা। আমি মরেন করি, এ হলো মৌলিক শর্ত। এ হলো আশু করণীয়। দ্বিতীয়ত, আমি পাকিস্তানের জন্য যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তা হলো শিক্ষার খাতটিতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা, বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেতে হবে মেয়েদের শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট তৎপরতা।

◆ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে এই মর্মে সুপারিশ রয়েছে যে, প্রতিরক্ষার বিনিয়োগের চেয়েও শিক্ষায় আরও অনেক বেশি বিনিয়োগ হওয়া উচিত।

∆ তবে আমি মনে করি না যে এ দুটি জিনিস একান্ত পরস্পর-সম্পর্কিত বিষয়।

◆ আপনি এ কাজে প্রয়োজনীয় তহবিল পাবেন?

∆ আমাদের যে অর্থ বা সম্পদ আছে তা থেকে আমরা কীভাবে আমাদের অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রয়োজন নির্ধারণ করব তার ওপর সেটি নির্ভর করবে। আমরা আমাদের কর ব্যবস্থা থেকে অনেক রাজস্ব পেতে পারি। পাকিস্তানের জিডিপি : কর অনুপাত এই দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সবচেয়ে খারাপ। পাকিস্তানের কর ব্যবস্থায় নিদারুণ অব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার জরুরী। ঢেলে সাজানো দরকার। এ জন্য দরকার ত্বরিত জোর প্রয়াস, গোটা ব্যবস্থায়

সরকারের পক্ষ থেকে গতি সঞ্চার। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, কাজটি করার সাহস সরকারের নেই। আমরা কিছু লবিকে তোষামোদে ব্যস্ত। আর এসব মিলে ঘটছে পরিপূর্ণ বিপর্যয়। এ ধরনের নিম্ন জিডিপি, নিম্ন সঞ্চয় অনুপাত দিয়ে আর যা-ই হোক কোন অগ্রগতি, কোন উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে আমার ধারণা। আমাদেরকে সমষ্টি, ব্যষ্টি—উভয় পর্যায়ে মনোনিবেশ করতে হবে। আর মানব সম্পদের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক বিষয়। শিক্ষারও যথার্থ অগ্রাধিকার নির্ধারণ জরুরী। আমরা কী ধরনের মানুষ গড়ে তুলব? আমরা কি সেই সেকেলে গতানুগতিক ধারায় রাশি রাশি আর্টস গ্র্যাজুয়েট, ম্যাট্রিকুলেট, উদার মানবিকী বিদ্যার সাধারণ শিক্ষিতের লোক সৃষ্টি করব, অর্থনীতির পরিসরে যার প্রয়োজন নেই? অর্থনীতি বা সমাজের দরকার বিভিন্ন সামর্থ্য ও যোগ্যতার মানুষ অর্থাৎ আমাদেরকে এসব বিভিন্ন চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে, এ চাহিদারই যোগান দিতে হবে। ভবিষ্যৎ গড়তে এগুলোরই প্রয়োজন। আমার ধারণা এক্ষেত্রে সুবিপুল সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে।

◆ অর্থাৎ আপনি বলতে চান আরও বেশি হারে এ ধরনের উৎকর্ষ, উন্নতি... ধরুন দ্বিগুণ হারে?

▲ দেখুন, আমি ঠিক এমন ক্রমাঙ্ক করে বলছি না। তবে আপনাকে যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে কাজ করতে হয় আর প্রশাসন পরিচালনার হাতিয়ার যদি কার্যকর থাকে তাহলে চিন্তার কিছুই নেই। সবকিছুই ঠিকঠাক চলবে। আর এর অন্যথা হলে কাজের হাল হবে করুণ। শাসনের খোদ ব্যাপারটিই আমার কাছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ শাসন-প্রশাসন কারা চালাবেন, তাঁরা কত উৎকর্ষসম্পন্ন, তাঁদের সমাবেশ কতটা তাৎপর্যবহ ও যোগ্যতার অধিকারী তা বিবেচনা করতে হবে। আর সেই সাথে দরকার আইনের শাসন। তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া সেই আইনের শাসন সম্ভব নয়। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা সম্ভব হতে পারে যদি আইনের শাসনতান্ত্রিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। শাসনতন্ত্র ও সরকারের জন্য দরকার প্রদেশগুলোর কাছ থেকে বিপুল ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে সরিয়ে দেয়া, জনগণের ক্ষমতায়ন, কর্তৃত্ব ও প্রশাসনের বিকেন্দ্রায়ন—এ সবই মৌল বিষয়।

◆ আপনি কি বৃহত্তর প্রাদেশিক স্বশাসনের কথা বলছেন?

▲ না, তা বলিনি। ভারতের সংবিধানে যে পরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান সন্নিবেশিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে তার চেয়েও বেশি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কথা এই যে, এ বিধানটি শুধু বাস্তবায়িত হয়নি। শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের গ্যারান্টি থাকার সঙ্গে সঙ্গে তা সত্যিকারভাবে বাস্তবায়িতও হতে হবে। তবু তাও যথেষ্ট নয়। দরকার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপক স্থানান্তর, ওপর থেকে নিম্নতর স্তর অবধি ক্ষমতার নিম্নাভিমুখী প্রবাহ, ঐ প্রবাহ যাবে জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, এমনকি পঞ্চায়েত স্তর অবধি, আর তা হতে হবে সত্যিকার অর্থে। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণ বা জনপ্রতিনিধিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমরা স্থায়ী কমিটির কথা বলি। সেই স্থায়ী কমিটিগুলোকে আরও স্বশাসন দিতে হবে। আমাদের এখন যে ধরনের স্থায়ী কমিটি রয়েছে সে ধরনের কমিটির ফল শূন্যের কোঠায়। তবে যদি এই কমিটিগুলোকে

ভাল, উৎকর্ষসম্পন্ন স্টাফ সহায়তা দেয়া যায়, বিভিন্ন নথি ও রেকর্ডপত্রেরর নাগাল পাবার সুবিধা যদি তাদের থাকে, নিত্য-নতুন, সাম্প্রতিক জ্ঞান যদি তাদের হাতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়, ইন্টারনেট সুবিধা তারা পায় তাহলে কাজের কাজ হতেই পারে। সেক্ষেত্রে ঐ স্থায়ী কমিটির লোকজন আসবেন বেসরকারী খাত থেকে, তাঁরা হবেন অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক। তাঁরা আসবেন বাইরে থেকে সেকথা বলাই হয়েছে। তারপর তাঁদের কাজের স্বাধীনতা দিতে হবে, ন্যায়সম্মত মাত্রার স্বশাসনের সুযোগ দিতে হবে। এগুলো হলে তাঁরা খুবই ভাল কাজ করতে পারবেন, উদ্দেশ্যানুযায়ী ভাল ফল পাওয়া যাবে তাঁদের কাছ থেকে। আমরা জানি বেশ কিছু কারণেই মার্কিন কংগ্রেস সদস্যরা যে ধরনের স্টাফ সহায়তা পেয়ে থাকেন সে ধরনের সাহায্য একেকটি বিষয়ের স্থায়ী কমিটির পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে না। এ কাজটি কেবল জাতীয় পর্যায়েই নয়, প্রাদেশিক, জেলা পর্যায়ে করতে হবে। এসব স্তরে থাকতে হবে স্থায়ী কমিটি, থাকবে নজরদারি করার জন্য পরিবীক্ষণ কমিটিসমূহ। তাই অংশীদারিত্বমূলক শাসনের উৎকর্ষ, এসবের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা—এ সবই আইন বা ব্যবস্থাপক পরিষদীয় প্রতিষ্ঠানকে উন্নততর করে তুলবে। আর এ সব ব্যবস্থাই আমি কামনা করি একান্তভাবে।

◆ আমি আপনার ও এই সংগঠনের জন্য আপনার প্রয়াস ও উদ্যমের শুভ কামনা করি। আমরা আপনার সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

∆ আমিও আপনার দেশ ও জনগণের কল্যাণ কামনা করি।

কামরুল ইসলাম

[কামরুল ইসলাম ছিলেন পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। এখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। কথা জড়িয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তবে, কোন কোন জায়গায় খেই হারিয়ে ফেলেছেন। দীর্ঘক্ষণ কথা বলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই এ সাক্ষাৎকারটিকে অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে। করাচীর প্রতিরক্ষা আবাসিক এলাকায় তাঁর বাসভবনে এ সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়।]

◆ জনাব কামরুল ইসলাম, আমরা আপনাকে নির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন করতে চাই না। আপনি আপনার মতো করে চাকরি জীবনের প্রথম দিককার কথা বলুন।

Δ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাগুলোর সঙ্গে আমি একাত্ম ছিলাম, সেগুলোর পক্ষে আমি যুক্তিও দিয়েছি। সেগুলোর ইতিবাচক ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানের প্রবক্তাও ছিলাম আমি। পূর্ব পাকিস্তানী কয়েকজন অফিসারকেও আমি পেয়েছিলাম আমার সহযোগী ও সহকর্মী হিসাবে। তাঁরা ছিলেন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। আমরা সবাই মিলে একটি চমৎকার কাজের টিম ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন কেরামত আলী, ইপিআরডিসির চেয়ারম্যান শফিউল আজম প্রমুখ।

তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। আমার একজন সহকর্মী ও সুহৃদ বাঙালী বন্ধু ছিলেন, তাঁর নাম জনাব ওয়াহেদ। আমরা দুজনে পূর্ব পাকিস্তানের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম। তিনি আমাকে বলতেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাঝে সহানুভূতির অভাব রয়েছে। কথাটা ভুল নয়। তবে আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে উপলব্ধির অভাব রয়েছে, রয়েছে অজ্ঞতা, সমস্যা তলিয়ে দেখার অভাব। আর তাই তাদের পক্ষে ঠিক স্থির করে ওঠা সম্ভব হয়নি আসলে জিনিসটি সত্যিকার অর্থেই কী? ড. আখলাকুর রহমানের সঙ্গেও আমার ভাল বন্ধুত্ব ছিল। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। আমি ঢাকা

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

সেক্রেটারিয়েটে একজন ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলাম। পরে আমি খুলনার জেলা প্রশাসক, ডিএম নিযুক্ত হই। ঐ সময়ের দিকে ঢাকায় একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। আইয়ুব খান তখন ঢাকায়। পূর্ব পাকিস্তানে তিনি '৫০-এর দশকে জিওসি ছিলেন। তখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা, বন্ধুত্ব, ভাল সম্পর্ক। সম্ভবত ৩য় পাঁচসালা সম্পর্কিত এক বৈঠক ছিল সেটা। সেই বৈঠকে তিনি সমালোচনা করেছিলেন, সে সমালোচনা ছিল কেন্দ্রীয় সরকার তথা তাঁদেরই সরকারের বিরুদ্ধে। সে সভায় কেন্দ্রে যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানী আছেন যেমন, খান এ সবুর, শামসুদ্দোহা প্রমুখ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করছিলাম আমরা। পূর্ব পাকিস্তানের সকল সমালোচনার পক্ষে যুক্তি দিয়ে আমি কথা বলেছিলাম ঐ সভায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনাও করেছিলাম আমি। বলেছিলাম, দেখুন, পূর্ব পাকিস্তানের এই এই জায়গায় ভুল, অবিচার করা হয়েছে। মোট কথা, আমরা সবাই ছিলাম সমালোচনামুখর। আইয়ুব বলেছিলেন, এই যে দেখুন আপনারা, আমার একজন উত্তম বন্ধু কামরুল ইসলাম রয়েছেন এখানে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাগুলোর প্রতি অনেকখানি সহানুভূতিশীল, সরব, বোধ করি, খোদ পূর্ব পাকিস্তানের অনেকের চেয়েও।

আমি বাংলা শিখেছিলাম, টেকনিক্যাল কারণে। টেকনিক্যাল কারণটি হলো আইসিএস পরীক্ষা। আমি তখন হিন্দি ও মারাঠি শিখেছিলাম। তখন ঐ পরীক্ষার জন্য ভাষা দু'টি শেখা দরকার ছিল। এরপর সেক্রেটারিয়েটের একজন আমাকে লিখিতভাবে বললেন, আপনাকে বাংলা শিখতে হবে। তিনি শুধু লিখলেন না, বললেন, এটি নির্দেশ, আদেশ। তখন আমার বয়স বড়জোর ৩০। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। কারণ, আইসিএস হওয়ার জন্য আমাকে দু'টি বাড়তি ভাষা শেখার ধকল সামাল দিতে হয়েছে। যা হোক, অবশেষে বাংলাও শিখলাম। গেলাম খুলনায়। সেখানে মসজিদে খতীব, ইমাম সাহেবদের উর্দু-বাংলার ব্যবহারের কল্যাণে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবহারিক বাংলা রপ্ত করে ফেললাম আমি। এ দিকে নিখিল বঙ্গীয় যাঁরা, মানে আমি বলতে চাইছি, যে সব অফিসার এলেন দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে, তাঁদের মধ্যে এক-আধজন আইসিএসও ছিলেন, তাঁরা বাংলা জানতেন, বলতেনও খুব ভাল। তারপর থেকে আমি নিজের মতো করে বাংলা কথাবার্তা চালিয়ে যেতে থাকি।

আমি আমার বদলির আদেশের নয় দিন পর অর্থাৎ ১৯৪৬-এর ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঠিক এক বছর পর ঢাকায় পৌছাই। এ ক্ষেত্রে আমিই প্রথম ব্যক্তি। অবশ্য কলকাতা থেকে যাঁরা এখানে এসে গিয়েছিলেন তাঁদের কথা আলাদা। কোন আইসিএস অফিসার ছিল না। মাত্র একজন ছাড়া কোন বাঙালী আইসিএসও ছিল না। তাঁর নাম তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ নুরুন্নবী চৌধুরী। তাঁকে এমন শীর্ষ পদে নিয়োগ করা হয় যে তাঁর সঙ্গে আমার ক্বচিৎ দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন আইসিএস ছিলাম, আমরা ছিলাম বনেদী চক্র যাকে ইংরেজিতে বলা হয় রুলিং এলিট। প্রশাসনের চারধারে ছিল আমাদেরই সমাবেশ। তবে সে দিন আমরা কোন বাঙালী বা কাউকেই আমাদের ধারে কাছে পাইনি। এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার দায় অন্তত আমার নয়। আজও সে কারণগুলো হয়ত বা আমার কাছ থেকে আপনারা জানতে চাইছেন। জনগণ নয়, সরকার তাদের কাজ করেছেন। তাঁরা ইম্পিরিয়াল সার্ভিস থেকে পুলিশের আইসিএস অফিসারদের বেছে নেন।

কেননা, এই পুলিশেই তুলনামূলকভাবে বেশি মুসলমান অফিসার ছিলেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রিক্রুট করা যে সব অফিসার পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ছিলেন খাজা মোহাম্মদ কায়সার প্রমুখেরা। আনোয়ারুল হক পরে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন। কাজেই একটা বিরাট রকমের সমস্যা ছিল। তখন হাতের কাছে অনেক জরুরী জিনিসই মেলেনি। তখন অনেক রকমের বাধা বিপত্তি ছিল। ভারতের জন্য ইউপি, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে বহু ঝানু আইসিএস অফিসার ছিল। আর আমাদের তো দু'তিনজন পুলিশ অফিসার ছাড়া কোন বাঙালী অফিসারই ছিল না। আমি কারও সঙ্গে মেশার সুযোগ পাইনি। আলোচনা করারও অবকাশ ঘটেনি। কেন, আমি সেটি আগেই বলেছি। তাই যে সব আইসিএস অফিসার সে দিন অপশন দিয়ে পাকিস্তানে এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের জুড়ি পাননি। তাঁরা সে দিন কোন মুসলিম বাঙালী অফিসারের দেখা পাননি, যার সঙ্গে তাঁরা ভাব বিনিময় করতে ও সম অনুভূতি গড়ে তুলতে পারেন। পূর্ব পাকিস্তানে আমার যে সব অফিসারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে তাঁরা হয় কলকাতার তথা বাঙালী আইসিএস, না হয় ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলের আইসিএস। পাঞ্জাবী আইসিএস বলতে তেমন কেউই ছিল না। পাঞ্জাবী অফিসার ছিল না তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা আদৌ বেশি নয়। আমি কলকাতা থেকে আসিনি, সে অর্থে আমি হয়ত পাঞ্জাবী গণ্য হয়ে থাকতে পারি, তবে সে বিচারের মাপকাঠি সঙ্কীর্ণতার অলিগলিতে সীমিত। ফলে দেখলাম, সন্ধ্যা বেলায় হাতে যখন কাজ থাকে না তখন কথা বলার লোক পাওয়া রীতিমতো সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে সব সিনিয়র অফিসার তখন প্রশাসন চালাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একটা যোগাযোগ, ভাববিনিময়ের ব্যাপার ছিল। এঁরা ছিলেন চীফ সেক্রেটারি, স্বরাষ্ট্র সচিব, খাদ্য সচিব এ রকম সব লোক। এঁদের দু'একজন বাদে আর কারও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তেমন ওঠা-বসা ছিল না। আসগর আলী শাহ এঁদেরই প্রতিনিধি বলা যায়। একদিন আমি ও আরও কয়েকজন সিনিয়র অফিসার তাঁর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করতে গেলাম। আমি ওপর তলায় উঠে গেলাম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তার আগে লক্ষ্য করলাম, এক লোক তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। সে আমাকে দু'টি কাহিনী শোনাল। হয়ত লোকটি কোন বাসাবাড়ি, ফ্ল্যাট বা অন্য কোন আবাসিক সুবিধা প্রার্থী, আর সেটি বিব্রতকরও বটে। আসগর আলী শাহের মতো সরকারী আমলার মর্যাদাবোধের একটা দিকই আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরতে চাই। আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। আমার সে সুবিধাটুকু স্বাভাবিক কারণেই ছিল, আমি দেখাও করলাম ইতোমধ্যে। দেখাটা করা নিজের গরজে। সে সময় একটা ভৃত্য এসে জানাল যে, মুজিবুর সাহেব এসেছেন, আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। তাঁরা আপনার জন্য নিচে অপেক্ষা করছেন। আসগর আলী শাহ বললেন, ওদেরকে অপেক্ষা করতে দাও। তারা তো কোন না কোন সুবিধা আদায়ের জন্যই এসেছে। কাজেই এই যে সম্পর্ক, এই যে ব্যাপারটি আমরা লক্ষ্য করলাম তার দরকার ছিল না আদৌ। তাই আমাকেও ওখানকার লোকেরা এই অভিজাতদের সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে চেয়েছে, কারণ আমলাদের সিংহভাগই তো ওখানকার।

◆ এ রকম অবস্থা কত দিন বহাল ছিল? বহু লোকই নিশ্চয়ই এ রকম ছিল না, হলে তার একটা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারত?

∆ হয়ত। তবে, আমি এটাকে অন্যতম বিষয় হিসেবে গণ্য করি, প্রধান ঠিক নয়, তবে অন্যতম প্রধান বিষয় বটেই।

◆ কখন আপনার এই উপলব্ধি ঘটল যে, যোগাযোগ, ভাববিনিময় একটা হওয়া দরকার?

∆ না, আমি দু'টি কারণের কথা বলেছি। কোন রকম যোগাযোগ, ভাববিনিময় ছিল না। ১৯৬৫-র দিকেও আমি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম চাকরি উপলক্ষে। আসলে আমার ওখানে পোস্টিং হয়েছিল দু' দুবার। একবার ১৯৪৭-৫২তে। সে কাহিনী আপনাদের আমি বলেছি। আমি খুলনায় জেলা প্রশাসক ছিলাম। আর ১৯৬৩-৬৫-তে দ্বিতীয় দফায় আমি ছিলাম প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান।

◆ ১৯৭০-৭১-এ আপনার পোস্টিং কোথায় ছিল?

∆ আমি ঢাকায় পরিকল্পনা সচিব হিসাবে কাজ করছিলাম। তার আগে রেহমান সোবহান ছিলেন ডেপুটি চেয়ারম্যান। আমি ডেপুটি চেয়ারম্যান হই ১৯৭০-৭১-এ। আমি ছিলাম পরিকল্পনা সচিব, শিল্প সচিব। আর পরে আমি পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হই। আমি এ সময় যখন ঢাকায় ছিলাম তখন আমার সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক আখলাকুর রহমান, লতিফ কোরাইশী প্রমুখ। তাঁরা পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। সেখানেই আমরা মাহবুবুল হককে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজের চেয়ারম্যান হিসাবে পাই। আমরা তখন এই পিআইডিএসে সকল গবেষণা-সমীক্ষাকে অত্যন্ত নিখুঁত, নিটোল করে তুলেছিলাম। আমি আপনাদের দেখাতে পারি যে, আমরা তখন পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতির সমস্যাগুলোর কোন কথাই উল্লেখ করতে ভুল করিনি; বাদ দিইনি এ কথা বলতে যে, পাট খাতে যে বিদেশী টাকা আয় হচ্ছে তা কাজে লাগানো হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। আগে কখনও এগুলো বলা হয়নি।

◆ তাহলে বলুন পরিকল্পনা কমিশনে এসব কাজ-কারবার হয় কী করে? কেন আপনারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন? সেখানে কি তাহলে এজন্যে প্রেসার ছিল?

∆ প্রেসার? কীসের জন্য?

◆ পশ্চিম পাকিস্তানে আরও সম্পদ নিয়োজিত করার প্রেসার?

∆ না, এ হলো পরিকল্পনার ব্যাপার। পরিকল্পনা করেন পরিকল্পনা কমিশনের সকল সদস্য মিলে। আর যে যে প্রকল্প টিকতে পারবে বলে বিবেচিত হয় শুধু সেগুলোর জন্যই টাকার মঞ্জুরি দেয়া হয়ে থাকে। আর আমরা দেখতাম যে খুব একটা বেশি প্রকল্প টেকসই হওয়ার মতো যোগ্যতা নিয়ে আমাদের কাছে ফিরছে না। আমি আগে লক্ষ্য করতাম যেসব প্রকল্প স্পন্সর করা হচ্ছে সেগুলোকে যথাযথভাবে তৈরি করা হয় না। পূর্ব পাকিস্তান যথেষ্ট টেকসই হওয়ার মতো সব প্রকল্প পাঠাচ্ছে না। পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারী খাতে সেই সময়ের বড় প্রকল্পটি ছিল কর্ণফুলী কাগজ কল। আমি সেই সময়ে জুট কমিশনার নিযুক্ত হই। সে সময়ে সারাটা পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও কোন পাটকল ছিল না। আমাদের দু'টি জুট বেলিং প্রেস মাত্র ছিল। এর একটি ছিল কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, আরেকটি নারায়ণগঞ্জে।

◆ তখন কোথায় পাট রফতানি হতো। যুক্তরাজ্যে?

▲ না, ভারতে; বেশিরভাগই ভারতে। ১৯৪৯-এ ভারত আমাদের পাট নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ আমরা আমাদের মুদ্রার মূল্যমান কমাতে রাজি হইনি। আমি সে সময়ে জুট কমিশনার। গোটা ধাক্কা আমাকে সামাল দিতে হয়।

◆ আপনি আবার পরিকল্পনা খাতে ফিরে আসেন। তা আপনি বলছিলেন যে প্রকল্পের প্রস্তাব যথাযথভাবে রচিত বা চর্চিত না হওয়ার কারণে বাদ পড়ছিল, তাই না?

▲ আমি অবশ্যই এরকম দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানাব এই বলে যে, পরিকল্পনা কমিশনে এ ধরনের কিছুই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়নি। আর এ এমন এক প্রসঙ্গ যে ব্যাপারে আমি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথেই বলব ও তাতে স্থির থাকব যে এরকম কিছু হয়নি। প্রকল্পের গলদের অজুহাত দেখিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বঞ্চনা ঘটেনি। তবে এ বাস্তবতা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানেই একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছিল, আর পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে অর্জিত বিদেশী মুদ্রা কাজে লাগানো হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তবু আমি আবারও দৃঢ়তার সাথেই বলব যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন কিছু হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানকে ঠায় ওখানে দাঁড় করিয়ে রাখার কোন পরিকল্পিত প্রয়াস সেখানে চলেনি।

◆ কিন্তু এতে যে রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হয় সেটি টেকনোক্র্যাট ও আমলারা আমলে আনেননি?

▲ দেখুন, তখনও পর্যন্ত আমি রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠিনি, আমি বিষয়টিকে রাজনৈতিক আলোকে কখনও ভেবেই দেখিনি। আমি এযাবত অনেক কিছুই বলিনি যা এখন আমি বলছি। পরবর্তীকালে আমরা আখলাকুর রহমান ও খন্দকারের মতো লোক পরিকল্পনা কমিশনে পেয়েছি, পূর্ব পাকিস্তানে পেয়েছি মাহবুবুল হক ও তাঁর স্ত্রীর মতো প্রতিভাকেও। তাঁরা তাঁদের যথাযোগ্য স্থান করে নিয়েছিলেন আগেই, তাঁরা অত্যন্ত সুযোগ্য ব্যক্তি। যা-ই হোক, যা বলছিলাম, বেসরকারী খাত সচল হতে সুদীর্ঘকাল সময় নেয়। আদমজি পাটকলের এক নম্বর ইউনিট বসার পর অন্য ইউনিট বসতেও সময় লেগেছে।

◆ এভাবেই আপনি বলছেন সচেতন প্রয়াসের সুবাদেই...

▲ অবশ্যই, যথার্থ অর্থে। সচেতন প্রয়াসের সুফল হিসাবেই পূর্ব পাকিস্তানে পাট শিল্প গড়ে ওঠে, আর সেই সময় পরিস্থিতির একটা মণিকাঞ্চন সংযোগও ঘটে পণ্যের উৎকর্ষের পাশাপাশি। সে পরিস্থিতি হলো কোরীয় যুদ্ধ, আর সেই সুবাদে স্টকপাইলের হিড়িক। এই কোরীয় যুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যেও অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ হয়েছে। তবে আমাদের ভুললে চলবে না যে, শিল্প উদ্যোক্তা বলতে যা বোঝায় তার প্রায় সমস্তটাই আসে বোম্বে থেকে। তবে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে যাচ্ছিলেন না খুব একটা। এর কারণ, করাচী ছিল বোম্বাইয়ের খুব কাছে। আর সেখানকার ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সম্প্রদায় যেমন, কচ্ছী ও বোহরাদের মধ্যে এ নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। তাদের উদ্যমের ফেলে যাওয়া পথরেখা ধরে পরবর্তীকালে শিল্প প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে পিআইডিসি, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে ইপিআইডিসি। আমার যদ্দূর মনে পড়ে, কফিলউদ্দিন মাহমুদ ছিলেন ইপিআইডিসি'র চেয়ারম্যান। তিনি বহুকাল সেই পদটিতে বহাল ছিলেন। আমি আমার ক্যারিয়ারের একটা বড় সময় কাটিয়েছি পরিকল্পনার জগতে। আমি

অনেক ক্ষেত্রেই ছিলাম সভাপতির আসনে। পানি, বিদ্যুৎ, অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পর্কিত পরিকল্পনার তাবৎ বিষয় এসেছে আমার এখতিয়ারে। অনেক সভাতেই আমি জোর তাগিদ দিয়ে বলেছি, আল্লার ওয়াস্তে আপনারা বাস্তবোচিত সব প্রকল্প নিয়ে আসুন। হার্ভার্ডের ওরাও আমাদের এ পরামর্শই দিয়েছে।

◆ হার্ভার্ড গ্রুপ-এর কথা বলছেন?

▲ হাঁ, হার্ভার্ড গ্রুপ। ওদের প্রায় সকলেই তখন ছিল রীতিমতো সৎ ও সজ্জন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরও উন্নয়ন, আরও অর্থের দরকার ছিল।

◆ তাহলে বলতে চাচ্ছেন পরিকল্পনা পর্যায়ে পক্ষপাত ছিল না?

▲ আমি সে কথাই বলব। কেননা পরিকল্পনা কমিশন কখনও পূর্ব পাকিস্তানবিরোধী বা পশ্চিম পাকিস্তানপন্থী—এমন ছিল না। এম এম আহমদ পক্ষপাতদুষ্ট? হতেও পারে! তবে মাহবুবুল হক, আখলাকুর রহমান, পরিকল্পনা কমিশনের অন্যান্য সদস্য এমন হওয়ার প্রশ্নই আসে না। পরিকল্পনা কমিশনের কোন অফিসার বা অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান বিরোধিতা আমি দেখিনি।

◆ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, পূর্ব পাকিস্তান থেকে উত্থাপন করা হয়েছে এমন বহু প্রকল্পই টিকে থাকার ও টিকে যাবার মতো ছিল। কিন্তু সেগুলো টেকসই বিবেচিত হয়নি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব প্রকল্প দেয়া হয় সাধারণত তার সবই প্রায় টেকসই গণ্য হয়। এটা অবাক করার মতো ব্যাপার, তাই নয় কি? পরিকল্পনা বোর্ড ছিল, আরও প্রতিষ্ঠান ছিল। ঠিক আছে। কিন্তু অবস্থা যদি এই হয় তাহলে আপনারা আমলারা ছিলেন, আপনারা কিছু একটা করলেন না কেন?

▲ ইস্যুটি যে ছিল না তা কিন্তু ঠিক নয়। আমি বরাবর এসবের দেখাশোনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলাম। এজন্যে কাজও করছিলাম। মনে করুন আমাকে গোটা পরিকল্পনা কমিশন, এর আমলাবর্গের ওপর খবরদারি করতে হয়।

◆ ওকাজ তো আপনারই, আপনিই তো ছিলেন ওখানে।

▲ আমি যে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক সেখানে কোন রকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পক্ষপাত আমি দেখিনি। এরকম কিছু আভাসেও বলা হয়নি কখনও যে, ওটাতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছে, কাজেই ওটা নাকচ করাই উচিত হবে।

◆ প্রক্রিয়াটি কাজ করেনি...

▲ প্রক্রিয়াটি এমনই নিশ্ছিদ্র ছিল যে, এরকম কোন দায় পরিকল্পনা কমিশনের ওপর বর্তায় না। আমার এরকম মনে হওয়ার কারণ আমি এক সময় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলাম। ওখানে অনেক প্রকল্প আসতো। আমি অনতিবিলম্বে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও মনোনিবেশ করে বলতাম, দেখুন, আপনারা আপনাদের প্রকল্পের উপস্থাপনা ঠিকমতো করেননি। প্রকল্পটি আপনাদের জন্য দরকারী। যা হোক, আপনাদের চাহিদা নিরূপণের ব্যবস্থা করা হবে। তবে তার আগে আমি আপনাদের বলি, আপনারা আপনাদের প্রকল্প এমনভাবে দেখান যাতে তা অনুমোদন করা যায়।

◆ একাজ তো সচিবালয়ের।

∆ কিন্তু আপনি তো জানেন, এটিই তো যত ঝামেলার মূল। এমএম আহমদ তো বলতেন, উন্নয়নের জন্য যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয় তা খুবই পরিচ্ছন্ন বিলিবণ্টন।

◆ তিনি আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করেছিলেন... যেমন...

∆ আমি এমএম আহমদকে দোষ দিই না। পরিকল্পনার কাউকেই দোষারোপ করব না আমি। এমএম আহমদের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না, কেননা পরিকল্পনা কমিশনে অনেক বেশি সংখ্যক অফিসারই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। আর তাঁরা অত্যন্ত সুযোগ্যও ছিলেন।

◆ তাহলে কারা এসব করতেন? কারা করতেন না?

∆ প্রাদেশিক সরকার। আর সে কারণেই আমি উল্লেখ করেছি যে, লাহোরে আমার নিয়োগ নিশ্চিত হবার পরেও আমি ঢাকায় গিয়েছি যাকে মানুষে ভেবেছে খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমি তো জানি এর সার্থকতা কোথায়। প্রকল্প যাতে পাস হয় তা আমি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছি। আমি নিজে কর্মঅধিবেশনে হাজির থেকেছি, আর সেসব সভায় আইয়ুব খান সভাপতি হিসাবে উপস্থিত থাকতেন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করতেন। আর ইতোমধ্যে পিআইডি'র লোকজন যতটুকু সাধ্য করত। কিন্তু আমার মতে এভাবে সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি ন্যায়সম্মত ছিল। যদি কারও এমন ধারণা থেকে থাকে যে, প্রেসিডেন্টের এ ধরনের কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পক্ষপাত ছিল, আমি বলব, আমার জানামতে, তা ঠিক নয়। আমি তেমন কিছু করতে সিদ্ধান্তও নিতে পারতাম না। কেননা, সেখানে আখলাকুর রহমান ও মাহবুবুল হকের মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

◆ কথাটা ঠিক, লবি খুবই জোরদার ছিল।

∆ হ্যাঁ, লবি তো বটেই, লোকজনও ছিল...

◆ ছিল পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট ইকোনমিকস। তারাও প্রয়োজনীয় সমর্থন যোগাচ্ছিল। তবে আমরা আজকে সকালেই জেনেছি যে, এমএম আহমদ অন্যতম ব্যক্তি যিনি ভুট্টোর খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন আর ভুট্টোকে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও তিনি দিয়েছিলেন এই মর্মে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের টিকে থাকার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের আর দরকার নেই।

∆ এ অভিমত কেবল এমএম আহমদেরই নয়, এর শরিক আইয়ুব খান ও কালাবাগের আমিরেরও। তাঁদের কথা ছিল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তান তো উন্নয়নের একটা স্তরে পৌঁছে গেছে, পাট খাতে বিদেশী মুদ্রার বদৌলতে, কোরিয়ান বুম-এর সুবাদে। কাজেই অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সহযোগিতার আর প্রয়োজন নেই। এই হলো গিয়ে একটা বিষয়। আর দ্বিতীয়ত, ১৯৬২-র নির্বাচনে আইয়ুব নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে আইয়ুব খান ও মিস ফাতেমা জিন্নাহ পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেন। ঐ নির্বাচনও ছিল তাৎপর্যের দিক থেকে এক নির্দেশনামূলক মাইলফলক। ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান অত্যন্ত জোটবদ্ধভাবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার আইয়ুব খানের অনুকূলে ভোট দেয়। আমি সে সময়ে সান্ধ্য আসরের আলোচনায় বলতাম যে, আমরা খুবই ভাগ্যবান যে, মিস ফাতেমা জিন্নাহ ৫১ শতাংশ ভোট

পাননি কিংবা তাদের ভোট ভাগাভাগি হয়নি। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমার ধারণা, এই নির্বাচনে তিনি ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পেয়েছেন। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় তিনি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পান। আর সেটি খুব সম্ভবত আইয়ুব খান ও কালাবাগের আমিরের চিন্তাভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আর আপনারা এই মাত্র যা বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানেরও বহু লোকের ধারণা হয়ত ছিল, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের দরকার নেই। সম্ভবত এ ধারণা সঠিক। এ রকম একটা অনুভূতি দেখা দিয়েছিল যে, আমাদের আর পূর্ব পাকিস্তানের দরকার নেই।

◆ আর তাই ঐ ৬ দফা পাকিস্তান সরকারের জন্য হতবাক করার মতো কিছু অপ্রত্যাশিত ছিল না?

▲ লোকে তো বলে ৬ দফা লিখে দিয়েছিলেন আলতাফ গওহর। তবে এ ক্ষেত্রে আমার বলার হলো, তিনি তা লিখেছিলেন কি না আমার তা জানা নেই।

◆ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের পর পাকিস্তানের সিনিয়র কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? জেনারেল ওসমানীর প্রমোশন ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি সুযোগ পেলে এর প্রতিশোধ নেবেন এ রকম আশঙ্কায় ওরা জরুরী পরিকল্পনা আঁটে। তাদের কথা অনুযায়ী এ ধরনের অনুভূতি একটা ছিল, আমলারা...

▲ না, আমলাতন্ত্রের ব্যাপার নয়, পদোন্নতি পাওয়া না পাওয়া এর সাথে সম্পর্কিত নয়। এ ধরনের অনুভূতি থেকে থাকলে পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারদের মধ্যে থাকতে পারে। কারণ তাদের পদোন্নতি পাওয়ার ব্যাপারটি পর্যাপ্ত ছিল না। কে এম আহসান, শফিউল আজম ও এ রকম আরও অনেকের পদোন্নতি না পাওয়ার ক্ষোভজনিত অনুভূতি থাকতে পারে। আমি এখন সেনাবাহিনী প্রসঙ্গে আসছি। এটি সর্ববৃহৎ খাতও বটে। সেনাবাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন থাকে। বিষয়টি জটিল ও কঠিন। কাগজপত্রে ও বাজেটে আধুনিক সেনা বা সামরিক স্থাপনার জন্য বিপুল সংখ্যক চাকরি-বাকরির দরকার হয়। আর সেই কারণে মাত্র একটি সেনানিবাসের ওপর নির্ভরশীল থাকে বহু লোক। পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত সেনানিবাস ছিলই না বলা চলে। একটি কুমিল্লা, একটি যশোর আর একটি খুলনায়। আর সে তুলনায় সেনাবাহিনীর লোক ও সরঞ্জামবলের সিংগভাগই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ অবস্থায় পাকিস্তানের গোড়ার দিকে আইয়ুব খান যখন ঢাকায় গিয়ে নামলেন তখন তিনি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার, ১৪শ ডিভিশনের কার্যভারপ্রাপ্ত জেনারেল। কিন্তু ডিভিশন বলতে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, ছিল কেবল দু'টি ব্যাটালিয়ন। ব্যাটালিয়ন দুটি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। অফিসিয়ালি এ রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন সংখ্যা যদিও ছিল তিন। দুই ব্যাটালিয়নের একটি যশোরে, সম্ভবত পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন, আরেকটি কুমিল্লায়। এ কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আমি আগেই বলেছি, এর সাথে অর্থ ও অর্থনীতির সম্পর্কও গভীর। আর যে বিপুল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হয়, পূর্ব পাকিস্তান স্পষ্ট কারণেই তা থেকে বঞ্চিত থাকে। পাকিস্তানে এখনও আমরা সেই সমস্যার ভুক্তভোগী। তবে তা আমাদের আলোচ্য নয়। তাই বলছিলাম, এই যে সেনা স্থাপনাগুলো তার জন্য লোকলস্কর আসে একটি বিশেষ জনশ্রেণী থেকে, আর সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে

দাঁড়ায়। এই শ্রেণীটি থেকেই সেনাবাহিনীর অফিসার আসা শুরু হয়েছিল একদিন। দেখুন, দেশবিভাগের পর আমাদের মাত্র পাঁচজন জেনারেল ছিল। এঁদের একজন আবার ছিলেন পার্শ্ব কোরের লোক, মূল পদাতিক কোরের নয়। আর ছিল হাতেগোনা কিছু অফিসার। তবে কিছুকাল পরে অফিসারের সংখ্যা বাড়তে শুরু করলে তাদের প্রায় সবাই দেখা যায় আসছে এমন পরিবার থেকে যাদের ভূস্বামী শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক রয়েছে, আর গ্রাম জনপদের লোক। এই অফিসারদের মানসিকতা গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের এ সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে, যখন তারা পূর্ব পাকিস্তানীদের নিচু চোখেই দেখেছে। তাদের এ দৃষ্টিকোণের কথা এর আগে কখনও বলা হয়নি। সম্ভবত এ মানসিকতায় কোন কোন অসামরিক আমলাও আক্রান্ত। আমি গোড়াতেই বলেছি, ব্যাপারটা আত্মজাত, এমন এক মানসিকতা থেকে উদ্ভূত যাতে ভাবখানা দাঁড়ায়, আমরাই তো শ্রেষ্ঠ। অনেক লোক এখনও আছে, আমি আবারও বলি, এ ধরনের চিন্তাধারা তাদের মধ্যে কাজ করে চলেছে। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বেশি হলেও তাতে তেমন কোন রকমফের ঘটেনি। এটা আমি অহরহ প্রত্যক্ষ করি। এরা অনেকে অক্সফোর্ড, আমেরিকায় যাচ্ছে আধুনিক উচ্চশিক্ষা নেবার জন্য, তবু... সামাজিক ওঠাবসা, এমনকি পদোন্নতির বেলাতেও সেই সামন্তসুলভ ধ্রুপদী ধারণা এখনও অনড় হয়েই বহাল আছে। এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

◆ ওরা কি তাহলে একটা শ্রেণীই হয়ে উঠেছে? একটা বই আমার নজরে এসেছে যেটা লিখেছেন কয়েকজন সাংবাদিক। ওরা পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি অসম আচরণ করেছে। ওরা আরও পরে এখন মুহাজিরদের সাথেও পাকিস্তানে একই আচরণ করছে। এটি একাত্তর-পরবর্তীকালের প্রবণতা। আপনার কি তা নজরে পড়েছে? আপনি কি এ বিষয়ে মন্তব্য করবেন? বিষয়টি পরের না আগে থেকেই...?

∆ এ বিষয় মানে...?

◆ বিষয়টি আর কিছুই নয়, মুহাজিরদের প্রতি সেই একই শ্রেণীর অসম আচরণের।

∆ অনেক পরেই এসেছে এটি।

◆ এটি তাহলে এসেছে বলছেন আপনি?

∆ এসেছিল, আছে এখনও, তবে তার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের প্রসঙ্গের কোন যোগাযোগ নেই। আমাদের এখানে ওটা আছে, তবে ওটা ভিন্ন জিনিস।

◆ তা নিয়ে অবশ্য আমরা আলোচনা করছি না—একথা ঠিক।

∆ আমরা আলোচনা করছিলাম...

◆ আপনি তো তখন পূর্ব পাকিস্তানেই ছিলেন। পঁচিশে মার্চের ঘটনার কথা কি কিছু বলতে পারবেন?

∆ ওটা এক লম্বা কাহিনী। আমি ওখানে ছিলাম। ইয়াহিয়া খান একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছিলেন সেনাবাহিনীকে পরামর্শ দেয়ার জন্য... প্রতিরক্ষা সচিব গোলাম ইসহাক খান, আমার সহকর্মী রোয়েদাদ খানকে নিয়ে। কিন্তু আমাদের সব ভুল খবর দেয়া হচ্ছিল।

◆ আপনি কি এ ধরনের কোন পরামর্শ দিচ্ছিলেন? মানে আমি....

∆ না।

◆ কে তাহলে পরামর্শ দিচ্ছিল?

∆ তা আমার জানা নেই। আমরা খবর পাব কি হচ্ছে না হচ্ছে এমন একটা অবস্থানে ছিলাম, সেনাবাহিনীর কিছু খবরও পাওয়া যাবে.... এ পর্যন্ত। আমার কোন ভূমিকা ছিল না এতে। যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম শিল্পসচিব।

◆ আসলে এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি পাকিস্তানের একজন অন্যতম সিনিয়র কর্মকর্তা, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই বিদেশী তথ্যমাধ্যমগুলোর আপনার নাগালে থাকার কথা। আপনি জানবেন, দেশ-বিদেশে কী সব ঘটছে, সেখানকার খবরাখবর কী। কিন্তু সেখানে তা দূরে থাক, গোটা বিশ্ব জানলেও আপনি বা আপনারা জানলেন না আপনার দেশ পাকিস্তানের অন্য অংশে কী ঘটছে?

∆ আমি তথ্য পেতাম উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে। চীফ সেক্রেটারির সাথে আমার দেখা হতো, তিনি বা আমি একে অন্যের সাথে দেখা করতাম। তিনি আমায় বলতেন তুমি মিথ্যাবাদী নও, তোমাকে গ্রাস করেছে গভর্নর হাউস.... গভর্নর হাউসকে....

◆ ১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চে এটা ঘটে। আর এটা জারি থাকে ১৬ ডিসেম্বর অবধি। সুদীর্ঘ নয়টি মাস। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইয়াহিয়া খান ও তাঁর জেনারেলেরা যা বলছিল, যা বিশ্বাস করাতে চাইছিল ছেলে ভোলানোর মতো করে আপনারা তাই দিয়ে নিজের মনকে চোখ ঠাওরাচ্ছিলেন। কেন আপনাদের মনে এটা উদয় হলো না যে, আপনাদেরকে যা বলা হচ্ছে তা অলীক, বানোয়াটও তো হতে পারে। কারণ আমলারা তো আর নিরুপায় অন্ধ কেউ নয়, বিশেষ করে সারা দুনিয়া যখন তারস্বরে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, তারা ভিন্ন কথা বলছে, ভিন্ন ভাষ্য দিচ্ছে?

∆ আমার কপাল ভাল আমি পঁচিশে মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে ঢাকায় ছিলাম। আমি ওখানে তখন গিয়েছিলাম ওয়াপদা ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক এক বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য। বিপদের ব্যাপারটা আমার ড্রাইভার আইয়ুবের জানা ছিল। আমি সন্ধ্যায় বের হতে সে আমায় বলল, স্যার, চলুন তাড়াতাড়ি ফিরে যাই। কে জানে কাছেই হয়ত মুক্তিবাহিনী রয়েছে। তবে আমার ধারণা, পশ্চিম পাকিস্তানের বহু লোকই জানত না এখানে কী হচ্ছে।

◆ আপনি কি জানতেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যুদ্ধ চালাচ্ছে?

∆ না। যা কিছু বরং লোকে জানত তা হলো, মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাচ্ছে। ঢাকায় তখন সন্ধ্যা বেলা বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ড্রাইভাররা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের কাছাকাছি থাকছিল। হোটেল প্রহরায় ছিল ১১ জন পাকিস্তানী সৈনিক। এটা সরকারী ভাষ্য। আমি ওখানে গিয়ে মাত্র সাতজনকে দেখতে পাই। পরিস্থিতি আদৌ নিয়ন্ত্রণে ছিল না। আমি আপনাদের আগেই বলেছি আমার ড্রাইভার আমাকে বলছিল, সাহেব জলদি চলুন! বলুন আর কী জানতে চান?

◆ না, না। ঢের বাকি রয়েছে এখনও জানার। আমি মনে করি আপনি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অংশ ছিলেন।

A দেখুন আপনি যাকে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া বলেন, তার কখনও কোন বিভিন্ন অংশ ছিল না। আমার বন্ধু এমএম আহমদ আমার সিনিয়র, আমি তাঁর অধীনে কাজ করেছি কিছুদিনের জন্য। আর সেই কাজ করার সময় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে আমার মতপার্থক্য হয়েছে, পরেও হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনে তা থাকবে কেন? এটা পরে হয়েছিল, নির্বাচনে তাঁর জয়লাভের পরে। তাঁকে দানব হিসাবে দেখানো হয়েছিল। মুজিব বনেছিলেন দানব আর ভুট্টো হয়েছিলেন হিরো। আবেগের দিক থেকে এখনও এখানে তিনি হিরোই। আর দোষঘাট? সব পূর্ব পাকিস্তানের। মুক্তিবাহিনীর। আসলে নন্দ ঘোষতো পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে আপনাদের হিসাবে নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সেটা হলো পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ। এটি ঘটে ১৯৫০-এ। আমি তখন খুলনার জেলা প্রশাসক। কাহিনীটা দীর্ঘ। আমি সংক্ষেপেই বলব। তখন খুলনা জেলার অংশবিশেষ সমুদ্রের লোনা পানিতে তলিয়ে যায় উপকূল এলাকার বাঁধ ভেঙে। জমিদাররা এই বাঁধের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করত। ঐ বাঁধে কখনও কোন ফাটল দেখা দিলে জমিদারের লোকেরা তা মেরামত করত। কিন্তু ইতোমধ্যে জমিদারী উচ্ছেদ হওয়ায় বাঁধ ভাঙনের সময় কেউ আর এলো না, কেননা জমিদাররা তখন দেশান্তরী হয়েছেন। কথা হলো, এখানকার রাজনীতি যারা করত তারা জিন্নাহর কাছ থেকে পাকিস্তান আন্দোলন ছিনতাই করেছিল। অর্থাৎ জনগণ ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছিল কিন্তু সঠিক ও গঠনাত্মকভাবে তা প্রয়োগ করতে পারেনি। সময়ের ও তাদের নবলব্ধ গণতন্ত্রের একটা পরিচর্যাকালের প্রয়োজন ছিল।

মেজর জেনারেল গোলাম উমর

[১৯৭১ সালে জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী জেনারেলদের নীতি নির্ধারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় করাচীতে তাঁর বাসগৃহে।]

সোমবার, ১১ জানুয়ারি, ১৯৯৯, জেনারেল উমরের নিজের কথা

আমার জন্ম মদনগঞ্জে, বাবার কর্মস্থলে। ওটা আমাদের নিজেদের পৈতৃক গ্রাম নয়। আসলে আমাদের বাড়ি ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার এক গ্রামে। আজকের উত্তর প্রদেশ, সেকালের মধ্য প্রদেশ বা ইউনাইটেড প্রভিন্স বা ইউপি। আমার পড়াশোনা প্রধানত আলিগড়ে। আমি সেখান থেকেই অনার্সে উত্তীর্ণ হই। এরপর আমি তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ভাষায় মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করি। তারপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে আরও একটি মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করি। এই দু'টি ডিগ্রী আমি অর্জন করি সেনাবাহিনীর কমিশন পাবার পর। এই পড়াশোনায় আমার কয়েক বছর কেটে যায়। নিজ প্রয়াস ও যত্নে আমি এসব পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণও হই।

আলিগড়ে ছাত্রাবস্থায় কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে আমার সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে একটি ঘটনার কথা আমি আপনাদের বলি। তখন ১৯৪০ সাল। লাহোরে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশন নির্ধারিত হয়েছে। ঐ অধিবেশনেই পাকিস্তান প্রস্তাব (লাহোর প্রস্তাব) গৃহীত হয়। একটি বিশেষ ট্রেন যাবে দিল্লী থেকে লাহোরে, মুসলিম নেতাদের নিয়ে। আমি আগেই বলেছি আমি তখন ছাত্র। সেই ট্রেনে আমিও যাই, আলিগড়ের একজন ছাত্র হিসাবে। সেনাবাহিনীতে আমার যোগ দেয়ার বিষয়টিও কৌতূহলোদ্দীপক। আমি তখন ঠিক সোলজার বা সৈনিক কেমন তা দেখিনি। আমাদের পরিবারের কেউ সেনাবাহিনীতে ছিল না। একদিন আমরা দশ-বারো জনের মতো সহপাঠী মিলে গেলাম কায়েদ-ই-আজমের সাথে দেখা

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

করতে। সে সময় তাঁর সফরসঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন ঢাকার খাজা হাসান আসকারি। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের এখানে অনেক ছেলেই তো সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে, আমরাও কি যোগ দেব? আপনি আমাদের পরামর্শ দিতে পারেন? প্রবীণ নেতা আমাদের বললেন, 'দেখ, ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জানানো মুসলিম লীগের নীতি নয়। ভারতে ব্রিটিশ সম্রাটের যে রাজপ্রতিনিধি রয়েছেন সেই ভাইসরয়ের পরামর্শদাতা পরিষদে আমাদের যেসব মুসলিম প্রতিনিধি রয়েছে তাদেরকে ঐ পরিষদ থেকে ইস্তফা দেবার জন্য আমরা তাদের বলতে যাচ্ছি, তাদেরকে ঐ সাথে ব্রিটিশ সরকারের দেয়া সকল খেতাব-উপাধিও ছাড়তে হবে। তবে বলতে গেলে ভারতের সেনাবাহিনীতে তেমন মুসলিম নেই, অন্যান্য ভারতীয়রাও সংখ্যায় খুবই কম, হাতে গোনা কিছু জায়গীরদার জাতীয় ভূস্বামীর কিছু ছেলে সেখানে রয়েছে। বিষয়টি অন্যভাবে ভেবে দেখার অবকাশ আছে। সাধারণ মুসলমান ঘরের ছেলেরা কার্যত ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নেই।' এখানে বলে রাখি, এই ভদ্রলোকই ঐ সময় ভারতীয় আইনসভায় প্রস্তাব তোলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আরও বেশি সংখ্যায় ভারতীয়দের নিতে হবে। এ ঘটনা ১৯২০-এর। এ আলোকে আমরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেব কি না তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি ক্ষুব্ধস্বরেই বললেন, 'তোমাদেরকে ওরা নেবে বলে মনে হয় না। এরকম জিনিস তো ওদের কেতাবে নেই। ওরা মুসলমানদের নেবে না, সাধারণ কাউকে ওরা নেবে না, ওরা নিলে নেবে ভূস্বামী-জায়গীরদার-সুবিধাভোগীদের সন্তানকে।' তবে তিনি বলেন, পাকিস্তান কায়েম হলে তখন পাকিস্তানের জন্য একটি সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হবে, আর সেনাবাহিনী রাতারাতি একদিনে গড়ে ওঠে না। আর সেরা অভিজ্ঞতা হলো যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায় সায় পেয়ে আমরা ১২ বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে ফিরে গেলাম। সেখানে আমাদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষা করলেন ড. নুরুদ্দীন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। কড়াকড়িভাবে পুরোপুরি পরীক্ষা শেষে আমাদেরকে আরও একটি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হলো। সে-ও এক মজার অভিজ্ঞতা। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের এক সহপাঠী ছিল, নাম নূরে আলম হুসেন খান চৌধুরী। ভূগোলে মাস্টার্স ছিল সে। সে সময় এ বিষয়টিতে গোটা উপমহাদেশ জুড়ে শুধু হিন্দুদেরই একচ্ছত্র এখতিয়ার। যা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাবাহিনীর রিক্রুটিং টিম এসেছে। রীতিমতো হুলস্থুল ব্যাপার! ছেলেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের রীতিমতো আকাল। ইংরেজ ছাড়াও আরও অনেকে সেখানে আসন নিয়েছেন। তাঁদেরই একজন আচম্বিতে প্রশ্ন জুড়ে দিলেন আমাদের চৌধুরীর দিকে। তা মি. চৌধুরী, আপনি কি বলতে পারেন আফ্রিকার অবস্থানটা ভূগোলের ঠিক কোথায়? চৌধুরী কান লাল করে জবাব দিল, 'এমন একটা প্রশ্ন আমার শিক্ষার জন্য রীতিমতো অবমাননাকর মনে হচ্ছে, জনাব। পাকচক্রে আমি ভূগোলে মাস্টার্স, আর আমাকে এহেন প্রশ্ন!' আরে না না, কিছু মনে করবেন না মি. চৌধুরী। আলাপ তো একটা কিছু দিয়ে শুরু করতে হয়! তাই আর কি! যা হোক, আমাদের সেদিনকার কথাবার্তার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে চৌধুরী। সেদিন আমাদের গোটা আলোচনার বিষয় ছিল সেনাবাহিনীতে কমিশনের বুনিয়াদ। ঐ জমায়েতে সেদিন বহু লোক জড়ো হয়েছিল। ওরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ—নানা জায়গা থেকে এসেছে, বসে আছে চারধারে। আবার প্রশ্নবাণ শুরু হলো একই ধারায়। আচ্ছা, আপনার কি জানা আছে, আপনার মান্যবর পিতা ভাক্কারের নওয়াব বাহাদুর তাঁর তালুকের অধিকারী হয়েছিলেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে প্রাইভেট সোলজার হিসাবে কাজ করার বদৌলতে? আপনি কি প্রাইভেট সৈনিকের পদ, না ভাইসরয়ের কমিশন গ্রহণ করবেন? সে জবাব দিল, না। আমি এই কলেজের ছাত্র হিসাবেই আপনাদের সাথে কথা বলতে এসেছি। বলাবাহুল্য, আমার নিজের অভিজ্ঞতাও হয় এ রকমই। ১৯১৪ সালে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যে মনোভাব ছিল তা কার্যত অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। তখনও নিরাপত্তার (ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের) প্রশ্ন, এ ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন ছিল। যা হোক, এবার পালা এলো আমার। প্রশ্ন করা হলো, আপনি কেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান? আমি বললাম, এখন যুদ্ধ চলছে, এসব রণাঙ্গনে দায়িত্ব পড়েছে রাজার, প্রধানমন্ত্রীর, রাজপ্রতিনিধির। আমিও তাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই, আমার দায়িত্ব পালনের জন্য। আমি সেজন্য তৈরি হয়েই এসেছি, অর্থও চাই। আর যা-ই হোক আমি রুশ পক্ষে যোগ দিতে চাই না। বিশ্বাস করুন, সেদিন আমাদের সবাইকেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া হয়। কেউ বাদ পড়েনি। সেটা ১৯৩৯-৪০-এর কথা। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে আমাকে যেতেও হয়েছে। ইতোমধ্যে যুদ্ধ শেষের বছর ঘুরতেই জন্ম হলো পাকিস্তানের। আমরা সেনাবাহিনী ছেড়ে যেতে পারতাম, থাকতেও পারতাম। সে অপশন আমাদের দেয়া হয়েছিল। আমরা থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা লাহোরে রওনা হয়ে গেলাম। আমরা পাকিস্তানে পরবর্তীকালে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করি। তবে আমি মনে করি, ওতে কোন কাজই হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে এ রকম সংস্থা আছে। তার সাথে আমাদের এ কাউন্সিলের কোনই সম্পর্ক নেই। দরকার ছিল, এ রকম সংগঠন হবে শাসনতন্ত্রের অঙ্গ, যা আইন দিয়ে হবে। তা ছাড়া কোন উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। কোন সমন্বয় বা এ ধরনের কিছু ছিল না এ প্রতিষ্ঠানে। এক পর্যায়ে ভুট্টোকে আমরা দেশের নেতৃত্বে নিয়ে আসি। তিনি ক্ষমতায় এসে ঘর সাফ করলেন না। তিনি আমাকে আটক দশা থেকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন। তিনি আমার সহযোগিতা চাইতেন। আমার জিজ্ঞাসা ছিল কিসের সহযোগিতা? যাক! এরপর এলো আরেক সামরিক আইন। জেনারেল জিয়া বারংবার আমাকে বললেন তাঁর সাথে যোগ দিতে। আমি না করে দিই। তবে আমি পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড ডিফেন্স স্টাডিজের চেয়ারম্যান পদটি গ্রহণ করি। এক, পদটি ছিল অবৈতনিক। দুই, এটি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কেননা এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত স্বশাসিত হয়ে থাকে। এটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাই। গবেষণা হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে। এটি গবেষণা কাজ করবে পররাষ্ট্রনীতি ও উদ্ভাবনা ও বিবর্তন সম্পর্কে। ১৯৫০-এ একটি চিন্তানুশীলন ও পরিকল্পনা সেল গঠন করা হয় ব্যবহারিক দেশজ তত্ত্বের বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে, গবেষণা ও সমীক্ষামূলক বিশ্লেষণের জন্য। এর নেপথ্যে যে প্রেরণাটি কাজ করে তা হলো, আমরা সাবেক ব্রিটিশ মতবাদ ও সংগঠন পদ্ধতি অনুসরণ করছিলাম। আর তার পর আমরা মার্কিন মডেল অনুসরণ করতে শুরু করি। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা গেল, ব্রিটিশ-মার্কিন কোন পদ্ধতিই আমাদের পরিস্থিতির উপযোগী নয়। তাই একটা তাগিদ ছিল পাকিস্তানকে অবশ্যই তার স্বকীয় সামরিক তত্ত্ব গড়ে তুলতে হবে। ১৯৫৮-র ফেব্রুয়ারিতে আমাকে ঐ প্রতিষ্ঠানে নেয়া হয়। আমি তখন থেকে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে শুরু করি। উদ্দেশ্য—কী পরিবেশ, কী সম্পদ, কী অবস্থা রয়েছে তা দেখা। আমি আসলে আর যে কারও তুলনায়

বেশি করেই দেশের মানুষের প্রতিভা ও সম্ভাবনা যাচাই করি। আমি এ রকম কাজে পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি জায়গায় যাই। এর মধ্যে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের সাতটি জেলাও রয়েছে। আমি সেখানে কী পরিস্থিতি বিরাজ করছে সে বিষয়ে কিছুটা বিশদ সমীক্ষাও করি। আমার তাৎক্ষণিক ও তখনকার কাজ ছিল, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিরক্ষা ও অন্য আরও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু নীতি অনুসন্ধান।

সাক্ষাৎকার

◆ আপনি তখন কোথায় ছিলেন যখন বোঝা যাচ্ছিল দেশে সামরিক আইন আসছে? আপনি তো ১৯৫৮-র ফেব্রুয়ারিতে গিয়েছিলেন?

∆ সামরিক আইন জারি হয় ঐ ফেব্রুয়ারিতে।

◆ না, অক্টোবরে।

∆ সঠিক বলেছেন আপনি। তবে তার আগেই লাহোরে সামরিক আইন জারি হয়।

◆ ঠিক।

∆ এভাবেই সূচনা! কাজেই আপনারা বুঝতেই পারছেন, তখন দেশে সামরিক আইন নেই যেমন বলতে পারছেন না, আবার সেটা আসছে তাও বলতে পারছেন না—এমন একটা অবস্থা। তবে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হবার দিকেই মোড় নিচ্ছিল। ১৯৫২-তেও লাহোরে সামরিক আইন জারি করা হয়।

◆ অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছিল?

∆ অবস্থার অবনতি হোক না হোক, সেনাবাহিনীতে কিছু একটা ঘটছিল। আর সেটাই শুরু। তারপর থেকে আমরা একের পর এক সামরিক আইনের পথ ধরে চলতে থাকি। আমাকে স্বাভাবিক কারণে ভয়ানক ব্যস্ত থাকতে হয়। তবে কোন না কোন কারণে শোকর গোজার যে, আমি সামরিক সমস্যাগুলো বুঝতে পেরেছিলাম। আমি অঞ্চলওয়ারিভাবেই বুঝেছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার গতিক সুবিধার নয়। যদি তার উপকূলে দুশমন বাহিনী অবতরণ করে, করাচী থেকে তেমন কী আর করা যাবে? তাই আমি একটি দিকেই আমার মনোনিবেশ কেন্দ্রীভূত করি। আপনারা বোধ হয় জানেন না, দেশের তিনটি স্টাফ কলেজই আমার হাতে গড়া। আর এর ফলে ১৯৬২-তে গড়ে ওঠে অশ্বারোহী রেজিমেন্ট। আর তার মধ্যে আইয়ুব খানের সামরিক আইনের তিন-চার বছর কেটে যায়।

ইতোমধ্যে ওপরওয়ালার কাছ থেকে ডাক আসে। জেনারেল মূসা আমাকে ডেকে পাঠান। আমি হাজির হলে আমাকে চায়ে আপ্যায়িত করে জানালেন, তোমাকে পূর্ব পাকিস্তানে পোস্টিং দেয়া হলো। এভাবে আমি ঢাকায় বদলি হলাম। আমার ইউনিট হলো সামরিক আইন শাখা। গেলাম সেখানে। জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন ছিলেন আমাদের অফিসার কম্যান্ডিং। আমি সেখানে যোগ দিতে কর্নেল নগোদা বললেন, প্লিজ বসুন। আমি বললাম, স্যার আমাকে তো জিএসও (জেনারেল স্টাফ অফিসার) হিসাবে পাঠানো হয়েছে, সামরিক আইন ইউনিটে আমার তো তেমন বেশি কিছু করার নেই। আমাকে অন্য কোথাও...। তাঁর সদয় সম্মতি মিললো, আমার জায়গায় দেয়া হলো আরেক কর্নেলকে, কর্নেল লিয়াকতকে। আর আমি

আমার স্বকীয় কাজে মনোনিবেশ করলাম, যে কাজটা স্বভাবতই নতুন কিছু ছিল না। তবে আমার আরও গভীরে যাবার সুযোগ হলো। আমি আবিষ্কার করলাম গোটা পূর্ব পাকিস্তানে কোন গোলন্দাজ রেজিমেন্ট নেই। এমনকি, রেজিমেন্ট কাঠামোর বাইরেও এর কোন বিকল্প নেই। মাত্র একটা মর্টার ব্যাটালিয়ন ছিল। আর মর্টার ব্যাটারির ১০০০ গজ দূরে হতে হবে পদাতিক বাহিনীর অবস্থান। যা হোক, ট্যাঙ্ক ব্যবহারের প্রশ্নে আমার অভিমত ছিল, জামালপুর এলাকা ট্যাঙ্ক যুদ্ধের উপযোগী। পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে এ বিষয়টি আমার নজরে আসে। কিন্তু ওরা বলল, না, এলাকাটি তো নয়ই, গোটা পূর্ব পাকিস্তানই ট্যাঙ্ক লড়াইয়ের উপযুক্ত নয়। পূর্ব পাকিস্তানে কোন ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টও ছিল না।

◆ তাহলে আপনার মতে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষাযোগ্য ছিল না?

∆ না, তখন প্রতিরক্ষাযোগ্য ছিল না।

◆ ছিল না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার কোন প্রস্তুতি ছিল কি?

∆ বলছি। কোন জায়গাকে রক্ষা করতে হলে দু'টি জিনিসের দরকার। এক. আপনাকে বিবেচনায় নিতে হবে, এলাকাটি অবশিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কি না। তা না হলে এলাকাটি যদি দূরে হয়, তাহলেও দু'টি জিনিসের কথা ভাবতে হবে—কতকালের জন্য আপনি দেশের ঐ অংশটি রক্ষা করতে চান। আর সেই মেয়াদের জন্য জায়গাটি রক্ষা করতে হলে তার জন্য সম্পদ-উপকরণ থাকতে হবে। পরিতাপের বিষয়, আমরা সব সময়ই বলে এসেছি পূর্বের প্রতিরক্ষার চাবিকাঠি রয়েছে পশ্চিমে।

◆ ওটা তাদের কৃতিত্বই বটে।

∆ একটা ভিত্তিহীন তত্ত্ব! দৃশ্যত এটি কোন থিওরিই নয়। আমরা বাস্তব একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছি। যুদ্ধ আসে, এটা কোন আলাদা ধারণা নয়। কিন্তু আপনি যখন প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা করছেন তখন যুদ্ধের সম্ভাবনাটি আমলে না নিয়ে কোন পরিকল্পনা করবেন তা হয় না। পাকিস্তান কি দিল্লী-আগ্রা দখলের পরিকল্পনা করবে, না তার নিজ আঞ্চলিক ভূখণ্ডের সীমানা রক্ষা করবে?

◆ পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে—এই থিওরির উদ্গাতা কে বলতে পারেন? এর কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে?

∆ এ অতিকথার সূচনা ব্রিটিশ অফিসারদের কাছ থেকে। তখন পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সব পদের নেতৃত্বে ছিল ব্রিটিশ অফিসাররা। আপনারা জানেন, পাকিস্তান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল মেসারবি। সেকেন্ড ইন কমান্ডও ছিলেন ব্রিটিশ, তাঁর নাম মনে নেই। তৃতীয় জন ছিলেন আইয়ুব খান। তাই এ তত্ত্বের ঘোঁট পাকানো শুরু হয় সেই সময়ে। আপনারা দেখুন, দেশের দুই অংশের মধ্যে ছিল এক হাজার মাইলেরও বেশি ব্যবধান। এ বিষয়টিও সমানভাবে বিবেচিত হওয়া দরকার ছিল। এই এক হাজার মাইল এলাকা যদি আপনার জন্য বৈরী হয়ে ওঠে তাহলে কী হবে? দ্বিতীয়ত, এসব নিয়ে পরিকল্পনা হতে হলে তা কেবল উদ্দেশ্যভিত্তিক নয়, প্রকৃত অবস্থাও বাস্তবতার নিরিখে হওয়া উচিত।

◆ প্রয়োজনের কথা বলছেন?

Δ **এখন আপনারা যদি বলেন এক হাজার মাইলের ভারতীয় অঞ্চল আমাদের প্রতি বৈরী হবে না, তাহলে তত্ত্বের তর্কাতর্কিই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ভারতের কি সে সততা ও সাধুতার সামর্থ্য আছে? যদি না থাকে, কীভাবে তার সে সামর্থ্য গড়ে তোলা যায়? মাঝে দূতিয়ালি করে, রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে, সম্পর্ক রচনা করে, এমন আরও ব্যবস্থা নিয়ে। কিন্তু হয়েছে কি শেষাবধি?** আপনারা জানেন, এক সময় আমাদের বিমান ভারতের ওপর দিয়ে চলাচল করতে পারত না, আমাদের সুদূর শ্রীলঙ্কা ঘুরে যেতে হতো। তাই আমি জেনারেল মুফতি ওয়াসিউদ্দিনকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, দয়া করে একটা বৈঠক ডাকুন এ বিষয়ে। ওয়াসিউদ্দিন শুনে ভড়কেই গেলেন, বললেন, আমরা তো কিছু করতে পারব না। আমি বললাম, এটাই তো স্যার আপনার কাজ। তিনি বললেন, না কাজটা তো তোমার। তো ঠিক আছে, ওটা আমার দায়িত্ব। তবে আরও ভাল হয়, তুমি যদি আমাকে প্রশ্ন করো আমি জবাব দেব। তারপর তো প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এলেন। ঢাকায় কথা হলো। তিনি আমার প্রস্তাবে সবুজ সঙ্কেত দিলেন। চীফ অব স্টাফ জেনারেল মূসাও। গোটা ক্যারিয়ার আমার এভাবে কেটেছে।

আমি পূর্ব পাকিস্তানে আসার পর সিরিয়াস চিন্তা করেছি যদি যুদ্ধ বাধে, আর ভারত যদি আক্রমণ চালায় তাহলে সে কেমন করে আক্রমণ করবে তা বুঝবার চেষ্টা করি। ভারত প্রথমেই বড় আকারের বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করবে না, পরের দিনে বড় রকমের আক্রমণ চালাবে। কেননা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হয় বাস্তব পরিস্থিতি মূল্যায়নের আলোকে। আমি সে অনুরোধ বার বার জানিয়ে এসেছি। পরে আমি তত্ত্ব গড়তে শুরু করি। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা পশ্চিম দেবে না। এটি বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রাখে। কি সেই সামর্থ্য যা আপনি পূর্ব পাকিস্তানকে দিতে চান? পূর্ব পাকিস্তান কি ততক্ষণ টিকে থাকবে যতক্ষণ আপনি পরিকল্পনা করতে থাকবেন? আর ইতোমধ্যে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য একটা কিছু করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কী এ্যাকশন নেয়া হচ্ছে সেটিও বিবেচ্য। আমি দেখতে চাই ভুট্টোর প্রভাব এতখানি বেশি হোক যা পূর্ব পাকিস্তানকেও শেষ করবে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব থাকতে হবে। এটি একটি খুবই বড় মাপের জিজ্ঞাসা, যার জবাব নেই। এর জন্য বিশাল পরিসরে আলোচনার দরকার। তাই স্যার, আপনাদের এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। কিন্তু আমি যে ১৯৬২-তে কাজ করছিলাম তার যৌক্তিকতাটি কী? পূর্ব পাকিস্তানে কোন ট্যাঙ্ক ছিল না। এর কোন যুক্তি থাকতে পারে? কর্তাব্যক্তি বললেন, ট্যাঙ্ক চলবে কি পূর্ব পাকিস্তানে? আমি বলেছিলাম, আপনি হেলিকপ্টারে চলুন, আমি বোটে যাব, আমি আপনাকে বেশ কিছু এলাকা দেখাব যেখানে নানান ধরনের ট্যাঙ্ক—অন্তত ছোট আকারের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা যায়। এ রকম এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে, জামালপুর, রংপুর ও আরও এলাকা। কিন্তু হলে হবে কী, একটা গোটা রেজিমেন্ট কিন্তু একটি মাত্র ট্যাঙ্ক নেই! গোলন্দাজ বাহিনীর কথাই ধরুন, পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছে মাত্র একটি মাউন্টেড আর্টিলারি ব্যাটালিয়ন। আর এই মাউন্টেড আর্টিলারি কেবল ১০০০ মাইল দূর থেকে পদাতিক সেনাদের কাভার দিতে পারে। তাও শুধুমাত্র সম্মুখ রণাঙ্গনে, ভিতরের গভীর এলাকার **যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। তাই কর্তারা তখন ফিরে গিয়েই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের অর্ডার দেন। আর আমার যদি ঠিক ঠিক মনে থেকে থাকে, তার কম্যান্ডে ছিলেন ওয়াসিউদ্দিন। একটা মহাব্যাধির জন্য ব্যবস্থাটি ছিল যেন সিন্ধুতে বিন্দু।**

এ সময় আমাকে জানানো হলো, আমার সময় ফুরিয়েছে, এখানে, সময় হয়েছে ইংল্যান্ডের জয়েন্ট স্টাফ কলেজে যাবার। আমি বেশ উতলা হয়ে পড়লাম। আমি এখানে সপরিবারে ছিলাম ছয় মাস। তখনও কিছু সময় হাতে ছিল, মনে করেছিলাম অন্তত আমি দেখে যাই যে রেজিমেন্টটি এসে পৌছালো। যা হোক আমি আবার এখানে এসে সেসব অভিজ্ঞতার কথা বলার সুযোগও পেয়েছি। বলেছি, বাংলাদেশের মুসলমান মাগরেবি পাকিস্তানের মুসলমানের চেয়ে উত্তম, খুবই প্রিয়ভাজন তারা, আমার ধারণা এ রকমই। আর তারা আমার কাছে স্বাগত। ওরা আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আমি অনেক বন্ধু পেয়েছি তাদের মাঝে।

এর মধ্যে ট্যাঙ্ক যাচ্ছে। আমার কথায় কিছু কাজ হয়েছে। ইতোমধ্যে জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের পোস্টিং হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। তিনি গেলেন কম্যান্ড নিতে। ইয়াহিয়া এলেন, তাঁর বার্তা সেদিন এসেছিল, তুমি থেকে যাও, পরের কোর্সে যাচ্ছ তুমি। আমি আসি, কেননা পূর্ব পাকিস্তানের তেমন কিছুই আমি জানি না। তিনি এলেন, আমি তাঁকে এখানকার সশস্ত্র বাহিনীর একটা চিত্র দিয়ে বললাম, আমি রাজনীতি সম্পর্কে জানি না। তবে আপনি এখানকার সেনাধিনায়ক, সে হিসাবে আমি আপনাকে বলতে পারি এটুকুই, অনেক প্রশ্নের জবাব আপনার জানার রয়েছে, আপনার জন্য রয়েছে তাই অনেক মাথাব্যথারও কারণ। আমার এখানে তিন চার বছর থেকে যেতে আপত্তি নেই। সেখানে তো মাত্র আমার থাকতে হচ্ছে ছয় মাস! এভাবে পরে নানা ঘটনার মিছিল চলতে থাকে। আমি আপনাদের আগে বলেছি, আমার পারিবারিক কোন সামরিক পটভূমি ছিল না। আমার বাপ-দাদারা চাকুরে ছিলেন, আমার নানা লিখেছিলেন *রাবিতুল আলামিন* নামে একটি গ্রন্থ যা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। সেটি ছিল সেকালের অন্যতম বিখ্যাত রচনা। আমারও লেখার অভ্যাস বরাবরের। আমি কিছু নিবন্ধ লিখেছি, খুব একটা আপত্তিকর কিছু নয়, নির্দোষই। এক সময় লেখার প্রবল আগ্রহ ছিল আমার। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। আমাকে সরকারও সেভাবে গড়েনি, কেননা সেদেশটির সৃষ্টিই হয়নি তখনও! আল্লাহর নেহাত মেহেরবানি! আমি তো সেই ভক্তিতে ওযু করে নামাজ-মোনাজাত করতাম, আর সেটি লক্ষ্য করে ফিল্ড মার্শাল আমাকে দেখতে না পেলে, হাল্কা রসিকতা করেই বলতেন, মৌলবী যে কোথায় গেল এলাহি মালুম! এ রকম আরও অনেক কিছু। এরপরে এলো দেশে (পাকিস্তান) সামরিক আইন। এই সামরিক আইন বা শাসন জারি হবার পরে আমি পূর্ব পাকিস্তানে আসি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি হয়। আর এর ঝাড়া চার বছর পর যখন আমি পূর্ব পাকিস্তানে আসি—তখনও সে সামরিক আইন রয়েছে। ওটা তখনও তুলে নেয়া হয়নি। সামরিক আইনের পরিবেশে থেকে আমার মনে এমন একটা ধারণাই দানা বেঁধে ওঠে যে, পাকিস্তানের তো পত্তন হয়েছিল একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৪৬-এর অবিভক্ত ভারতজোড়া নির্বাচনে মানুষ রায় দিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে। নিখিল উপমহাদেশের সকল মানুষ, এমনকি যেসব অঞ্চল পাকিস্তানে পড়বে না, এমন সব অঞ্চলের মানুষ সবাই একজোটে ভোট দিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে। মাদ্রাজ প্রদেশের শতকরা শতজন মুসলমানই ভোট দেয় পাকিস্তানের পক্ষে। ভোট দেয় বোম্বাই, ইউপির মানুষ। আর বাংলার মানুষের সাড়ার কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনি এক প্রক্রিয়ায় একটি গোটা দেশ পাওয়া। দেশের মানুষ সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

থেকে সরে যায় কী করে? সত্যিই আমরা সরে গিয়েছিলাম। আর সেই থেকে শুরু অশুভ সবকিছুর। পাকিস্তান গণতন্ত্র থেকে সরে যেতে থাকে। অবশ্য এ প্রক্রিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বেশি করেই বিশ্বাস করতেন। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে যে দেশ কায়েম হয়েছে সে দেশ সামরিক আইনের বিধানে চলতে পারে না। আমার মতে, তাঁদের সে ধারণা অত্যন্ত সঠিক। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ তেমন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিপ্রবণ ছিল না। এর কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ভূস্বামী সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য। সামরিক আইন তাদের জন্য ছিল সুবিধাজনক। এর আরেকটি নেপথ্য কারণও হতে পারে, দেশের দুই অংশ পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যকার অতীত বিভেদ। আর ভারত সেটি ধরে ফেলতে সময় নেয়নি। সে চাতুর্য ও ধূর্ততা তার ছিল, আমি আপনাদের এ কথা বলছি। এ শুধু আমার বিশ্বাস মাত্র নয়, পূর্ব পাকিস্তানে অনেকেরই এ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা ছিল। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই ভারত নানা ফন্দি-ফিকির শুরু করে দেয় পাকিস্তানকে বরবাদ করতে। এটা করতে তারা তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে এক. প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা; দুই. আর ঐ বিচ্ছিন্নতা পর্বে চলবে পাকিস্তান জুড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, পূর্ব পাকিস্তানকে যেভাবে হোক ভেঙে দিতে হবে। তিন. দুই পরাশক্তির একটি শক্তিকে এ অঞ্চলে জড়িত করতে হবে। সেটি ষোলোকলায় পূর্ণ হয় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি করার পর। দ্বিতীয় পরাশক্তিকেও আনতে হবে নেপথ্য সমর্থনে; এ কাজে দ্বিতীয় পরাশক্তি হয়ত সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে না। কেবল কিছু বিবৃতি দেবে। আসলে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ছিল ঠিক এ রকম যা তাদের দেশের নানা লেখা, সূত্র ইত্যাদি থেকে এখন বেরিয়ে আসছে। ২৫ বছরের পরিক্রমায় তারা এসব অবস্থা তৈরি করেছে। ভারত ১৯৬৫-র যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করলে আপনারা ছয় ঘণ্টার বেশি সে আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন না। পেশাদার সৈনিক হিসাবে আমার তাই ধারণা। ছয় ঘণ্টাও নয়। আমার ধারণা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের তখন এ রকম একটা ধারণা হয় যে তাদের ভূখণ্ড রক্ষা, হেফাজত করার জন্য কেউ নেই। আর, জনাব, আমার মতে, সেটি এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি যদ্দূর এ বিষয়ে ভেবে দেখেছি তা হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তান ঐ যেদিন প্রতিরক্ষার দিক থেকে নিজেকে এতিম ভাবতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই আমরা শুধু একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করিনি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে আরও দূরে চলে গেছি। আর সামরিক আইন চলতেই থেকেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনও কোন পর্যায়েই সামাজিক বিষয়ে পরিপূর্ণ অংশীদার হবার উপলব্ধি পায়নি। আমার বক্তব্য হলো, একাত্তর একদিনে আসেনি, আসলে ওপরে যেসব বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করেছি সেগুলো একত্রে আবাহন করে নিয়ে এসেছে একাত্তরকে। আমি বাষট্টির আগে পূর্ব পাকিস্তানে যাইনি। ওখানে পোস্টিং হবার পর নানাভাবে অনেক কিছুই আমার কানে আসে। ওখানকার কিছু কিছু বেসামরিক আমলা আমাকে অনেক খবর দেয়। ওদের অনেকের মনোভাব অবশ্য সুবিধাজনক ছিল না। তবু তাদের মাধ্যমেই ছিটেফোঁটা অনেক কিছুই জানা যেত। ওদের মতে পূর্ব পাকিস্তান বরবাদ হয়ে যাবে। তবে আসল কথা ছিল এই যে, হয়ত আমরা দু'টি লোকে কিছু খারাপ কাজ করেছি, এখন দেখা গেল যে দশজন খারাপ লোক আসার পর তাদের আগে আমার নামটাই

ফলাও করে বসিয়ে দিয়ে তারা নেপথ্যে চলে গেছে। সামরিক আইন আমলে আরও একটি জিনিস ঘটে। সামরিক আইনের আওতায় যদি দু'চার জনে কিছু করেও থাকে তাতে দেখা গেল রীতিমতো দশজনে মিলে সেটাকে মহামারী করে তুলেছে। আমরা আলাদা হয়ে গেছি কিন্তু আমরা সে ব্যাধিতে ভুগছি আজও। পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র ভারত করেছিল—আর আমরা অঘোর, অচেতন হয়ে ছিলাম, আমাদের সে আচ্ছন্নতা থেকে আমরা আজও বেরিয়ে আসতে পারিনি। আমার এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। পাকিস্তান সৃষ্টির পরদিন থেকেই তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল এক ও একক। আর তারা সেজন্য তিনটি অবস্থা বা পর্যায় নির্ধারণ করেছিল। এ কাজ করবে তারা ৫০ বছরে—এ রকমই ঠিক ছিল। প্রস্তুতিও ছিল সে রকম। তাদের বাজি আগেই ফলেছে। আপনারা ১৯৭১-এর পরিস্থিতি খেয়াল করুন। পরিস্থিতি কী ছিল, তা আপনারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। আপনারা সে সময়ে ছিলেন লেলিহান বিভীষিকায়। আমি ঠিক বলিনি?

◆ ঠিকই বলেছেন আপনি।

▲ এখন আপনারা আমাকে যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন করুন, চ্যালেঞ্জ জানান, আমি তৈরি। আপনাদের হয়ত আবেগপ্রবণতার কারণে মনে নেই আমি আপনাদেরকে গোড়াতেই সব খুলে বলেছি। আমি জানি আপনারা এসেছেন আর সেজন্য আমি আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম। নানা রকম সংশয় ছিল আমার।

◆ আমরা বলেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের গোটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সীমিত ধরনের। আর আপনারা দাবি করেছিলেন যে, ব্যবস্থা একটা আছে। পূর্ব পাকিস্তান বলেছিল, সে ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করা চলে না। কাজেই এর পরিণামে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মনে তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। আর সেটি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। অথচ তাতে পশ্চিম পাকিস্তানে সেদিন কোন চিত্তবিকার ঘটেনি।

▲ সত্যিই উচিত ছিল।

◆ কিন্তু আপনি কি মনে করেন, আমরা বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পেরেছি? আমি বলি, এখানে প্রশ্ন হলো, আপনি বলেছেন, সেই পয়লা দিনটি থেকেই আপনি বা আপনারা জানতেন যে, আমাদের এখানকার প্রতিরক্ষার সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। আর ভারত নাকি পূর্ব পাকিস্তান ভাঙার তেভাগা ব্যবস্থাপত্র তৈরিই রেখেছে। তাহলে ভারতের এহেন চক্রান্তের চাক ভেঙে দেবার ব্যাপার নিশ্চিত করার জন্য পাকিস্তান সরকার কী প্রস্তুতি রেখেছিল?

▲ আপনি যা বলছেন তার সবকিছুর সাথেই আমি একমত। আমি শুধু বলি, আমাদের দরকার ছিল মাত্র একটি জিনিসের আর সেটাই সার জিনিস। সেটি থাকলে আমি সেদিনও ছিলাম, আর আজও আমি অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় বলতে পারি, আল্লাহ বাংলাদেশকে কায়েম রাখুন, যদি সেদিন জাতীয় পর্যায়ে সংহতি থাকত, যদি বিভেদ-বিরোধ না থাকত তাহলে ওদের পাকিস্তান ভাঙার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত শতক কে শতকের কালপরিক্রমায়। ওরা পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান কোথাও হামলা করার সাহস করত না। ওরা তো ওদের যা করার তা করবেই কিন্তু আমাদের তরফে বড় কথাটি তো জিইয়ে ছিল, হিমায়িত হয়েছিল সেই মৌলিক প্রশ্ন, একটি সুসংহত জাতি হিসাবে কি সত্যিই আমাদের অভ্যুদয় ঘটেছিল?

আমাকে পরিতাপের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, তা ঘটেনি।

◆ আপনি বলেছেন, তখনকার নেতৃত্ব দেশ শাসনের প্রক্রিয়াটি ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

▲ এক্ষেত্রে আমার জবাব একটু কড়া আর তা হলো, হয় তাঁরা ব্যাপারটা সত্যিই বোঝেননি, নইলে তাঁদের নিজ হীনস্বার্থেই তাঁরা তা করেননি।

◆ তা তাঁদের সেই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থটি কী ছিল?

▲ সেই কায়েমি স্বার্থের ধারক ও বাহক ছিল এ অঞ্চলের সামন্ত জমিদার শ্রেণী। আর সরকার গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মির্জা কিংবা সামরিক আইন যা-ই হোক, আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এই গোটা ভূস্বামী সামন্ত শ্রেণীটি বরাবরই এদের সমর্থন করেছে। আজকে এদেশের আইন পরিষদে কিছু সাধারণ লোক থাকলেও সেখানে এখনও সেই সামন্ত ভূস্বামীদেরই আধিপত্য। ফারুক লেঘারির কথাই ধরুন, তাঁর জমিদারিতেতো রীতিমতো প্রাইভেট জেল রয়েছে। আর সেই জেল বা বন্দীখানায় কত লোক যাচ্ছে, তারা আদৌ বেঁচে আছে কি না তার কোন পাত্তাই মেলে না। হয়ত কোনদিন তবু নির্বাচন হলে এরাই নির্বাচিত হবে। আর দেশের মানুষের শিক্ষার সচেতনতার কথা বলছেন? ওটা কোথাও নেই! আপনি প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন বলেই বলছি, আমরা এখন এসব প্রশ্নেই বিতর্ক করে চলেছি। দেখুন, মূল বিষয়টি হলো নিরাপত্তা বলতে এর সর্বাঙ্গীণ ধারণায় এ দিয়ে কী বোঝায় তা উপলব্ধি করতে, বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি। নিরাপত্তা কেবল ট্যাঙ্ক, কামান আর বিমানের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না।

◆ আপনি কাকে নিরাপত্তা বলতে চাচ্ছেন?

▲ দেশের অভ্যন্তরের এমন বহু বিষয় রয়েছে যা নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

◆ আপনি কি সেগুলোকে অসামরিক নিরাপত্তা বিষয় বলে উল্লেখ করবেন?

▲ আমি সে কথাই বলতে চাচ্ছি। আমরা অবশ্য আজও এ বিষয়গুলোকে এভাবে বুঝতে চাচ্ছি না। দেখুন, আজ এদেশে কী ঘটে চলেছে! হয়ত আমার কথা এ মুহূর্তে আপনাদের বিবেচ্য বিষয় ও এখতিয়ারের জন্য উপযোগী না-ও মনে হতে পারে, তবু আপনাদের কাছে বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক হবে বলেই আমি মনে করি। আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে বছরে ১৩০ বিলিয়ন ডলার খরচ করছি। আর দায় পরিশোধ খাতে ব্যয় হচ্ছে সে তুলনায় ১৮৬ বিলিয়ন ডলার। প্রতিরক্ষার ওপর এর রয়েছে সরাসরি প্রভাব। আর এ দুয়ে মিলে যে সম্পদ যায় তারপর আর এমনকি একটি রুপিও থাকে না দেশের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য, অর সে জন্য বাইরে থেকে ধার-কর্জ-ভিক্ষা করতেই হয়। আপনি কি বলবেন এতে নিরাপত্তা আসে? তা সে যা-ই হোক আমরা আবার আমাদের নির্ধারিত আলোচনায় ফিরে আসি। আপনাদের আরও কিছু কি জানার আছে?

◆ আমার গুটি কয়েক প্রশ্ন রয়েছে, তবু আপনিই বলুন।

▲ ঐ একই কথা, আপনারাই আমাকে জিজ্ঞাসা করুন আর আমি বলে যেতেই থাকি, সেটাই সবচেয়ে ভাল।

◆ দেখুন যা কিছু ঘটে গেছে সেই একাত্তরের ইতিহাসের বর্ণনায় এখানে-সেখানে নানা কিছু গলদ-ত্রুটি-ফাঁক-অভাব রয়ে গেছে। সেটা খালি চোখেই ধরা পড়ে।

▲ জানতে চান তো, আমি সামরিক এলাকার লোক তো, তাই আমাকে জিজ্ঞাসা যখন করছেনই তখন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করুন, আমার জবাব দিতে সুবিধা হবে। আমি জবাব দেবার মতো অবস্থায় থাকলে অবশ্যই জবাব দেব। আমার জবাব দেবার বা না দেবার ইচ্ছা, অভিরুচি ছাড়াই আমি আপনারা যা জানতে চান বলার চেষ্টা করব। তবে এমন কিছু বিষয় থাকতে পারে যার সাথে আমার নাম জড়িত—যদিও তেমন কোন ধারণা আমার নেই। আর তেমন কিছুর ওপর আমি কিছু বললে তা নিহায়তই গপ্পো ফাঁদাই হয়ে যাবে। আপনারা একটি সিরিয়াস ধরনের বই লিখছেন, বইটি প্রামাণ্য প্রকৃতির আর সেজন্য আমি কিছু কথা বলছি, মন্তব্য করছি। ঠিক আছে, আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করতেও পারেন, না-ও পারেন। কিন্তু আমি নিজে কোন বই লেখার কথা ভাবি না। কেননা, বই লেখা হচ্ছে, আর লেখকরা তাঁদের মতো করে রায় দেবার জন্য সত্যকে সেভাবেই বিকৃত করছেন। আমার কথা হলো, যা বাস্তব, যা সত্যি তাকে বিকৃত করা উচিত নয়। বাস্তবের ব্যাখ্যা আর আপনার ব্যাখ্যায় মিল না হতে পারে, আর আমার ব্যাখ্যাও আলাদা হতে পারে। আমার কাছে দু-তিনজন প্রকাশক এসেছিলেন, অনুরোধ করেছিলেন, বই লিখুন। আমি তাঁদেরকে বলেছি, আমি না হয় লিখলাম, কিন্তু আমাদের ঘরানায় তো এখানে এমন রীতি চল হয়েছে যে, একজন (লেখক) হয়ত বললেন যে, জেনারেল ওমরের রেল স্টেশনে যাওয়া উচিত ছিল, আরেক জন বললেন, না, তাঁর রেল স্টেশনে যাওয়া উচিত ছিল না। কেউ বলল, তিনি আদৌ রেল স্টেশনে যাননি। এখন আপনি এ নিয়ে কোমর বেঁধে তর্কে নামতে পারেন। তুমুল কাণ্ড হবে, পরিশেষে যা দাঁড়াবে তা হলো, আপনি বলবেন, আমি সেখানে তো আদৌ যাইনি কখনও। তার পাল্টা বলা হবে, দু'বছর আগে আপনার সাথে ঝগড়া হয়েছিল তখন আপনি একবার স্টেশনে গিয়েছিলেন। আর এতে কিছু লোক বলবে, গেছে তো ভাল কাজই করেছে, কেউ বলবে, কাজটা মোটেও ভাল হয়নি। শেষে উপসংহার হবে, আরে, কী সব বলাবলি হচ্ছে, এ সবের সারবস্তু তো আদৌ কিছুই নেই, ছাড় এসব তর্ক। আসলে ফালতু কিছু নয়, আমরা এ মুহূর্তে ইতিহাসের এক সিরিয়াস বিষয়—এক বিয়োগান্তক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছি...।

◆ আমরা ইয়াহিয়া খান প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে জিওসি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল আর আপনিও....

▲ আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করা হয়নি।

◆ না, না, ইয়াহিয়া খানকেই পোস্টিং দেয়া হয়েছিল... তবে আপনিও পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সময় একবার ছিলেন। ইয়াহিয়া খান আপনাকে এখানে ডেকে এনেছিলেন।

▲ না, আমাকে ডাকা হয়নি, আমাকে আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য বলা হয়েছিল।

◆ তারপর কী ঘটে?

▲ ছয় মাস থাকার পর আমি ইংল্যান্ডে যাই।

◆ আপনি চলে গেলেন?

∆ আমি ইংল্যান্ডে চলে যাই। আমি কেবল পূর্ব পাকিস্তানে আমার থাকার মেয়াদ দীর্ঘায়িত করেছিলাম। এর বেশি কিছু নয়। তবে ঐ সময়টার অবকাশে আমি ইয়াহিয়ার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ফাঁক-ফোকড়, অভাব নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হই। আমি কথাগুলো তাঁর কাছে পাড়ি অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক কৌশলে। তাঁকে বলি, জেনারেল আপনি তো রয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে। আমি এ আলোচনা করছি, আপনি পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি সেকথা মনে রেখেই। ধরুন, ভারত আক্রমণ করল। আসুন, এক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক যুদ্ধ পরিস্থিতির আলোকে বিচার-বিবেচনা করে দেখি। ধরে নিই আমাদের দুশমন পক্ষ আমাদের তুলনায় ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি শক্তিধর। আর এই রণদৃশ্যপটে পূর্ব পাকিস্তান নিঃসঙ্গ, একাকী। পশ্চিম পাকিস্তানেরও সেই একই অবস্থা। এভাবে গোটা দেশ যখন... এসব কথাবার্তায় তিনি কিছুটা প্রভাবিত হলেন বলেই মনে হলো। কথাগুলো তাঁর মনে ধরল। আমরা এসব নিয়ে কিছু অনুশীলনও করলাম। তিনিও তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা কিছুটা কাজে লাগালেন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য, আরও এক বা দুটি রেজিমেন্ট পাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তিনি জায়গামতো তেমন কিছুই বলেননি। এরপর তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বদলি করা হলো... আমার যদ্দূর মনে পড়ে তাঁকে... কম্যান্ড নিতে ডেকে পাঠান...

◆ তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসেন?

∆ আমার মনে পড়ে তিনি শিয়ালকোট ডিভিশনের কম্যান্ড গ্রহণ করার জন্য ফিরে আসেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তবে আপনি পূর্ব পাকিস্তানের যেসব জরুরী প্রতিরক্ষার বিষয় বলেছেন সেসব বিষয়ে তাঁর সাথে আমার যে আলোচনা হয় তার সারবত্তা তিনি অস্বীকার করেননি। আমার এখানে বলার হলো যেভাবে কথা হয়েছিল সে পরিসরে এখানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আদৌ মজবুত করা হয়নি। ঐ সময় তাৎক্ষণিকভাবে একটা কিছু করা হয়েছিল—কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

◆ আপনি এসব ব্যাখ্যা ইতোমধ্যে দিয়েছেন। আপনি এও ব্যাখ্যা করেছেন যে, কেন আপনার মতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরক্ষার ঐ পরিকল্পিত আয়োজন গড়ে ওঠেনি। কেননা সামন্ত স্বার্থ...

∆ না তা হয়নি। একটা রেজিমেন্ট পাঠানোর পরই সব শেষ। আর তারপর একাত্তর যখন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ল তখন শোর পড়ে গেল, টনক নড়ে উঠল, তড়িঘড়ি সামরিক মদদ পাঠানো শুরু হলো। আরে এক ডিভিশন, আওর ডিভিশন ভেজো, ইয়ে করো, উয়ো করো ইত্যাদি।

◆ কথাটা ঠিক নয়। পঁয়ষট্টিতেই তো ওদের মালুম হয়েছিল ঠিকই, ওরা আবিষ্কার করেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান রক্ষাযোগ্য নয়। এ হলো গিয়ে ১৯৬৫-র কথা। তারও পরে...

∆ কেউ বলেনি পূর্ব পাকিস্তান রক্ষাযোগ্য নয়, বরং ওরা সবাই বলেছে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার চাবিকাঠি রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। আর ঘটনাচক্রে '৬৫-তে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি, যদিও তার নেপথ্যে বহু কারণ ছিল। এ বিষয়ে আমার অভিমত

হলো, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হস্তক্ষেপের জন্য যেসব অবস্থা পূর্বশর্ত ছিল তার সব কিছু তখনও পূরণ হয়নি। আর সেগুলোর মধ্যে প্রধান শর্তটি ছিল এই যে, পঁয়ষট্টিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্কের বাঁধন একাত্তরের মতো অতটা শিথিল হয়নি। আর বলাবাহুল্য, সেটিই ছিল আমাদের প্রতিরক্ষায় সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। ভারতকে আরও ২০-২৫ বছর অপেক্ষায় থাকতে হলে সে তা করতে তৈরি ছিল, হুট করে হঠকারিতা করা তাদের পরিকল্পনায় ছিল না। আপনারা নিশ্চয়ই আমি যা বলতে চাই তা উপলব্ধি করেছেন। প্রতিরক্ষা সাজসরঞ্জামের প্রশ্নে আমার বক্তব্য হলো, ১৯৬৫-র যুদ্ধ ছিল আদর্শ পরিস্থিতি, ১৯৭১-এ আরও অনেক বেশি দিন ধরে যুদ্ধ চললেও প্রকৃতপক্ষে এ সংঘাতের মাত্র ছয় দিন পরেই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদেরকে যা বলতে চাই তা হলো যা হচ্ছিল তার মোড় উল্টা দিকে ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল, অবস্থা পর্যবেক্ষণের মতো সময় হাতে ছিল তখনও। দ্বিতীয় জিনিসটি ছিল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে অংশীদার হওয়ার উপলব্ধি ও প্রত্যয়ই যদি না থাকে, তাহলে তারাই বা কদ্দিন এভাবে চলবে, আর নেতৃত্বে যখন তারা নেই, তারাই বা সব বিষয় নিয়ে দেখবে, ভাববে কেন? আর ইত্যবসরে উস্কানি, মন্ত্রণা দেয়ার লোকেরও কি অভাব থাকে?

◆ আপনি কি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে?

▲ ছিল। বৈষম্য ছিল যা নিয়ে রীতিমতো কথা তোলা যায়। দাবি করা যায়। সে কথাই বলি। আপনারা জানেন, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বাঙালীদের উৎসাহিত করা হয়নি। বাঙালীদের ব্যাপারে একটা বৈরিতা ছিলই। তাই বেশি বাঙালী ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীতে ছিল না। এর কি অজুহাত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

◆ না, আমি সাধারণভাবে সেনাবাহিনীর জন্য সম্পদ বরাদ্দের কথা বলছি।

▲ আমি সে কথায় আসছি। সেজন্য আমাদেরকে ঐ সময়ে দেশের উভয় অঞ্চলের সত্যিকারের অবস্থা কী ছিল তা খতিয়ে দেখতে হবে। ঢাকা ঐ সময় একটা ছোট জনপদ ছিল, সেকথা আপনারাই জানেন। আর পূর্ব পাকিস্তানের অঞ্চলটি 'চাকর-বাকর' শ্রেণীর বাস বলেই পরিচিত ছিল। আর পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চল ছিল তুলনামূলকভাবে উন্নত, অন্য কথায় ব্রিটিশ আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা তেমন সুবিধাজনক ছিল না। সেদিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল ছিল। চাকরি-বাকরির বেলায় পশ্চিম পাকিস্তান ছিল অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থায়।

সেনাবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা সংখ্যায় ছিল অনেক, সিভিল সার্ভিসেও বাঙালীরা সংখ্যায় ছিল অনেক কম। এরকম অবস্থা নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু। তাই সর্বাগ্রে আমাদের সবাইকে পাকিস্তানী হতে হবে, আর বাংলায় মুসলিম লীগের ভূমিকা হতে হবে আরও বেশি। আপনি শের-এ-বাংলা মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিম উদ্দিন, হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথাই ধরুন... ধরুন ওদের গোটা গ্রুপটির কথা। এঁরা আমাদের সকলের বরণীয়, আমাদের খিদমতের দাবিদার, এঁরা সকলেই ছিলেন নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমি ঘটনাক্রমে আলীগড়ের ছাত্র। আপনাদের বাংলাদেশের একটি (প্রথম?) গোটা মন্ত্রিসভার সকলেই আলীগড়ের শিক্ষার ঐতিহ্যধারী, শুধু ঐ মন্ত্রিসভার হিন্দু সদস্য বাদে। যেমন ধরুন

ছিলেন, এটিএম মোস্তফা, কেএম কায়সার, আরও অনেকে। এঁরা সবাই অত্যন্ত দক্ষতা ও সম্মানের সাথে কাজ করেছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, কিছু পশ্চিমা স্বার্থবাদী মহলের ধ্বজাধারী দুষ্টচক্র শয়তানী শুরু করে দেয়। তারা চক্রান্ত করে বলতে শুরু করে ওরা পিছিয়ে পড়া লোক, ওরা বোঝা ছাড়া কিছু নয়। এটা ছিল ওদের ভুল। আসলে বাংলার কোন অপরাধ ছিল না। কেননা, এই বাংলাকেই ওরা একদিন সালাম দিয়েছে, বাংলা কোথায় সে খোঁজ পড়েছে। তবে আমি সে সব বিস্তারিত ইতিহাসে যেতে চাই না। সহজ, সরল, সোজা সত্যটি হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা সামাজিক দিক থেকে অনেক পিছনে পড়ে যায়। ওখানকার দশা করুণ হয়ে ওঠে। এ জন্য গোড়া থেকেই দরকার ছিল পরিকল্পনার, সেই সঙ্গে কাজের। দরকার ছিল ওখানকার মানুষের মোট আয়-উপার্জনের উন্নতির। আমাদেরই উচিত ছিল দেরিতে হলেও কাজটা শুরু করা। আর সেজন্য কিছু যুক্তি মেনে নেবার প্রস্তুতিরও প্রয়োজন ছিল। বোঝা উচিত ছিল, এসব পশ্চাৎপদ এলাকাকে টেনে তোলা দরকার, উন্নত এলাকাগুলোর সাথে সেগুলোকে সমান্তরালে আনতে হবে। বেলুচিস্তানের কথাই আপনি দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরুন, আপনারা তো সেখানে যেতে চেয়েছেন। আমি বরং আপনাদের কাছে এই আরজি পেশ করছি যে, পাকিস্তান যখন স্বাধীন হয় তখন দরকার ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য বাস্তব অবস্থা তৈরি করার। পূর্ব পাকিস্তানের একটি ভূমিকা ছিল, তারা তা পালন করেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আমরা তা করতে ব্যর্থ হয়েছি। পূর্ব পাকিস্তানে যেসব সিনিয়র সরকারী আমলা নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। এর একটি কারণও অবশ্য ছিল এই যে, সে আমলে সিনিয়র বাঙালী অফিসারও তেমন কেউ ছিল না। আর হাতে গোনা যাঁরা ছিলেন তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে বসে উন্নয়ন নামক 'পুলি পিঠার ফোঁড়' গুনছিলেন। এভাবে দূরত্ব বেড়ে যায় দ্বিগুণ। আবার সামগ্রিক পরিকল্পনা ব্যবস্থার পর্যায়ে যে কাজ করা হয় তাকে বলা হয় কৌশলগত পরিকল্পনা। আমি বলব এরকম উদ্যোগ নেয়া হয় ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের আমলে। কিন্তু আসলে হচ্ছিল ট্যাকটিকাল প্ল্যানিং বা আপাতত কাজ হাসিলের পরিকল্পনা। তবে সেখানেও ছিল শুভঙ্করের ফাঁক। আমার ধারণায়, নীতি নির্ধারণের বেলায় পূর্ব পাকিস্তানের এজমালি অংশ যা থাকা উচিত সে তা পায়নি। এর আরও পরের দিকে এ ব্যাপারে কিছু করার চেষ্টা হয়েছে তবে তা ছিল প্রসাধনীর বা অনুরূপ নামের প্রলেপ দেবার মতো, ভাসা ভাসা ব্যবস্থা। যেমন ধরুন, সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, বালুচ রেজিমেন্ট, ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ছিল—ছিল না পূর্ব পাকিস্তানী বা বাঙালীদের কোন রেজিমেন্ট। তাই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আর সেই কাজটি ছিল সবচেয়ে জঘন্য। কোন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেদিন প্রকৃত প্রয়োজন ছিল না, দরকার ছিল না পাঞ্জাব রেজিমেন্ট বা অনুরূপ নামের রেজিমেন্ট পোষার। বরং দরকার ছিল পাঞ্জাবী, পাঠান, বালুচ, বাঙালী নির্বিশেষে পাকিস্তান পদাতিক বাহিনীর। দরকার ছিল সবাইকে সেখানে একাত্ম করার। কাজেই আপনারা যদি ভেবে থাকেন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করে পাকিস্তানের জন্য খেদমতের ব্যবস্থা করেছেন, তাহলে সেটা নিহায়তই নির্বোধের বেহেশত বাস করার শামিল, অন্তত আমার তাই অভিমত।

◆ কিন্তু এই যে সেনাবাহিনী রেজিমেন্টের কথা আপনি বলছেন, সেগুলোর কি একটা জাতিগোষ্ঠী পরিচয় থাকার দরকার নেই? উচিত নয়?

Δ নামের কী দরকার? দরকার বলতে তো ছিল একটাই। দ্বিতীয় বিষয় ছিল, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা কত সেটা। শুধু পূর্ব পাকিস্তানী লোক নয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকও সেনাবাহিনীতে বাড়ানোর দরকার ছিল। এজন্য কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ছিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য দৈহিক উচ্চতার শর্তের কথা। কালক্ষেপণ না করেই উচিত ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য দৈহিক উচ্চতার শর্ত শিথিল করা। এ ব্যাপারটা বোধ করি অন্ধেরও মনোযোগ এড়াবার নয়। ইংরেজরা একটা কিছু বানিয়ে থাকতেই পারে, আমরা তো তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই চাচ্ছিলাম। ওরাই ঠিক করেছিল কারা যোদ্ধা জাতি, কারা নয়। অথচ সেসব মনগড়া ব্যাপার। কেউ যোদ্ধা, কেউ নয় বলে কোন কথা আছে নাকি? বরং সেক্ষেত্রে এমন একটা উন্নাসিক ধারণাই বরং কাজ করেছে।

◆ আপনি বাস্তবিক কথাই বলেছেন যে কারও পিঠ যদি দেয়ালেই ঠেকে যায় সে কি লড়বে না? আপনার কী মনে হয়?

Δ আমি তো বলি শুধু তাই নয়, প্রতিটি মানুষের মাঝেই যুদ্ধ করার সামর্থ্য রয়েছে। তবু প্রশ্ন কে লড়াকু, কে যোদ্ধা। এখানে, আমাদের বেলায় বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হয়েছে, ওখানে হয়নি... এই যা। ব্যাপারটি বলা যায় অনেকটাই এ রকম, হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকে শিল্প গড়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হয়নি তাদেরই বেনিয়া স্বার্থে। তখন রুমাল পর্যন্ত ম্যানচেস্টার থেকে তৈরি হয়ে আসত এদেশে। পরে কিছু কিছু শিল্প গড়ে তোলা হয় বোম্বাই, কলকাতা ইত্যাদি জায়গায়। পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই তেমন হয়নি, পাঞ্জাবে ঠিকই হয়েছিল। এখন কথা উঠতে পারে যুক্তির খাতিরে, পাঞ্জাবে যদি এত শিল্পই বসানো হয়, তাহলে সৈনিকের যোগান আসবে কোত্থেকে? তাহলে অন্য কোথাও থেকে কি সেটা আসবে না, আনতে হবে না? হয়ত অবস্থা এমন যে, তার পরেও সেখানে অনেক এলাকা রয়ে গেছে এখানে ওখানে, কিন্তু সেসব জায়গাতে তো মানুষের অন্য কাজও আছে। দেখা গেল, এমনি এক এলাকার এক লোক বলল, আমাদের অনেক লোকের দরকার কাজকর্মের জন্য। আমার চার ভাইকে সেজন্য বাড়িতে থেকে যেতে হবে। তাহলে? আজকাল আমাদের এখানে এক সমস্যা দেখা দিচ্ছে পাখতুনিস্তানের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। পাখতুনদের সব আলাদা হতে হবে। আমি এ নিয়ে বছর কয়েক আগে এক নিবন্ধে লিখেছি, এতই যখন জাতের ব্যাপার তো ঝামেলার দরকার কী। এসব ছেড়ে একটা ফেডারেশন ব্যবস্থা বহাল হোক। এ ফেডারেশনে কম-বেশি সবাই হবে সমান। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা এখন কেন্দ্রে খুব বেশি রকমে কেন্দ্রীভূত। সেটা থাকবে না। তৃতীয়ত, মুঘল জমানায় একেকটা অঞ্চলের যে সব নাম ছিল সেইভাবে মুলতান সুবা, লাহোর সুবা, পেশাওয়ার সুবা—এমন সব সুবা কায়েম হয়ে যাক বা এরকম কিছু হোক, ঝামেলা চুকে যাক। এখানকার যেসব বিভাগ/অঞ্চল রয়েছে সেগুলো ভেঙে সুবা বা স্টেস্ট বানিয়ে দিন। আর যত ক্ষমতা আছে দিয়ে দিন নির্বাচিত কাউন্সিলের হাতে, জাতিগোষ্ঠীর সমস্যা দূর হয়ে যাক। আজকে বেলুচিস্তানে ঝগড়া-ফ্যাসাদ চলছে সেখানকার

বালুচ-পাঠানদের মধ্যে। বেলুচিস্তানকে দুই বা তিন সুবায় ভাগ করতে হবে। এটা কোন কথা হলো? কিছু লোক আছে তারা শুধু সমস্যা দেখায়, পথ দেখায় না, গলদ ধরে, নিজেরা শোধরায় না। আর তাই আমি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রসঙ্গটি এমনি এক অলোকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

◆ আপনি কি আপনার এসব পর্যবেক্ষণ, অভিমত, অভিজ্ঞতার কথা নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসাবে আপনার দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত করে বলতে পারেন? মানে বলছি, যখন আপনি নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন?

∆ আমি তো জাতীয় নিরাপত্তা অফিসার ছিলাম না।

◆ ঠিক তা নয়, আমরা বলতে চাই তেমন একটা অবস্থানে তো ছিলেন আপনি!

∆ আমি আপনাদের সে বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে বলব। তিনটি ত্রুটির কথা আমি আগেই বলেছি। ওরা একটা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠন করে। এর নেতৃত্বে ছিলেন পাঁচ কেবিনেট মন্ত্রী। আর আমি সেই কাউন্সিলের সচিব মাত্র ছিলাম।

◆ ঐ পাঁচ মন্ত্রীর মধ্যে ড. জি ডব্লিউ চৌধুরী ছিলেন কি?

∆ বলছি। ইয়াহিয়া নিজে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আর ছিলেন অর্থমন্ত্রী, যোগাযোগমন্ত্রী, আরও ছিলেন দু'জন মন্ত্রী। তবে গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী ছিলেন না। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম, এ কাউন্সিলের কাজ কী? আমি এ প্রশ্ন করেছি পেশাদার এক সৈনিক হিসাবে। আমি আমার রেজিমেন্টের এ্যাডজুট্যান্ট ছিলাম। আমি ছিলাম একজন ক্যাপ্টেন, ব্রিগেড মেজর। লে. কর্নেল হিসাবে আমি রেজিমেন্ট কম্যান্ডে ছিলাম। লে. কর্নেল হিসাবে আমি ছিলাম জিআই। একই পদে আমার দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি ডকট্রিন বা তত্ত্ব গড়ে তোলা। কর্নেল হিসাবে আমি ছিলাম স্কুল অব ট্যাকটিক্সের প্রধান। সেখানে আমার কাজ ও দায়িত্ব ছিল সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট থেকে কর্নেল পর্যন্ত গোটা সেনাবাহিনীর সবাইকে ট্যাকটিক্স শিক্ষা দেয়া। আমি কাজ করেছি স্টাফ কলেজের একজন লে. কর্নেল হিসাবে। আমি ব্রিগেডিয়ার হিসাবে একটি ব্রিগেডের কম্যান্ডে ছিলাম। ব্রিগেডিয়ার পদেই আমি ছিলাম সেনাবাহিনীর কারাগারের মহাপরিচালক। মেজর জেনারেল হিসাবে আমি একটি ডিভিশনে জিওসি ছিলাম। আমাদের কাছে কিছু লোক আসা-যাওয়া করত। আমি তারপর একটি লেখা তৈরি করি। সেটি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। আমি তাতে নিরাপত্তা সম্পর্কে অনেক ভিতরের-বাইরের তথ্য সন্নিবেশ করি।

◆ আপনি কি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে উত্থাপন করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে লেখাটি তৈরি করেছিলেন? না, শুধু নিজের জন্য?

∆ কাউন্সিলের জন্য, সুনির্দিষ্টভাবে। আমি যখন কাউন্সিলে আমার পদের দায়িত্ব নিই তখন আমার প্রশ্নই ছিল : আমার কাজ কী?

◆ আপনি আমাদের জানিয়েছেন যে, ইয়াহিয়া যখন পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসেন তার আগে আপনি তাঁর সাথে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলেছিলেন। আইয়ুব খানের ১৯৬৯-এর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? ইয়াহিয়া খান

যখন ক্ষমতায় তখন আপনার ও ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? আসলে আমি আইয়ুব খানের শেষ ছয় মাস নিয়ে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

Δ আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল পরিকল্পনার। তবে হ্যাঁ, আপনি আইয়ুব শাসনের শেষ দিনগুলো সম্পর্কে জানতে চান তো সে কথা বলি। ঐ সময় দেশের ভিতরে কিছু ঘটনা ঘটে। সীমান্ত প্রদেশের লান্ডিকোটাল থেকে এসব ঘটনার সূত্রপাত। লান্ডিকোটাল পাকিস্তান সরকারের কার্যত নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত এলাকা, যেখানে রয়েছে দুনিয়ার সব সামগ্রীর এক বিরাট চোরাচালানী পণ্যের বাজার। এসব ঘটনা যখন ঘটছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন জেনারেল মূসা। তিনি বললেন, কাজের লোক উমর জিএইচকিউতে বসে আছে, আর সারা দেশ জ্বলছে। ওর গায়ে কি তাপ লাগছে না? করছে কী? মূসা এ নিয়ে ফিল্ড মার্শালের কাছে অভিযোগ করলেন। ফিল্ড মার্শাল আমাকে বললেন, কী করছো তুমি? আমি বললাম, স্যার, যা সব চলছে তাতে শুধু দেশের সেনাবাহিনী নয়, আগামীতে চীনা সেনাদেরও আপনি পাবেন। কিন্তু তাও বোধ হয় যথেষ্ট হবে না। ক'দিন পর খবর পাওয়া গেল, সোয়াত ও ঝিলামের মধ্যকার বেতার সংযোগ লাইনটি কেটে দেয়া হয়েছে। এখন সে জায়গাটি ঘিরে রেখেছে আর্মড পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লোকেরা। আর একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকেও ভয়াবহ সব সিচুয়েশন রিপোর্ট আসতে লাগল। এ অবস্থায় আমি তখন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি মুজাফফর হুসেনের কাছ থেকে খবর নেবার চেষ্টা করলাম। বললাম, মুজাফফর ভাই তুমি তো শরিফ লোক, এখন তুমি আমায় বল তো কী অবস্থা তোমার ওখানে? মুজাফফরের খবর অনুযায়ী, যত গর্জন আসলেই তত বর্ষণ নয়! মুজাফফর সম্পর্কে আর কী বলব, শুধু এটাই বলা যায় যে, লোকটা সহজে উত্তেজিত হয় না, বেশ আশাবাদীও বটে। তবে যাকে বলে বুদ্ধিদীপ্ত তেমন অবশ্য নয়। বাস্তব ও আশাবাদী হবে অথচ সেই সাথে মাথার অভাব যদি থাকে সেটা সেনাবাহিনীর জন্য বড় মুশকিলের কথাই বটে। তবে মুজাফফর সাদাসিধে সৈনিক, কোন মন্দ অভিপ্রায় তার নেই। এরপরে লাহোর থেকে, অন্য সব জায়গা থেকেও খবর এলো বাস্তবিকপক্ষেই ঐ ছয় মাসের দিনগুলো ছিল ভয়াবহ। ইতোমধ্যে ফিল্ড মার্শাল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যে লোকটি প্রায় সারাজীবন দোর্দণ্ডপ্রতাপে ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন তাঁর ভাগ্যরবি তখন পাটে নেমেছে। এলো গোলটেবিল বৈঠকের প্রশ্ন। আরটিসির আঞ্জাম করো। এলেন খাজা খয়েরুদ্দিন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসিব করুন। গুল হাসান বললেন, 'মুজিব সাবকো বোলাও।' জেনারেল গুল হাসানের ওখান থেকে টেলিফোনে শেখ মুজিবকে আসার জন্য বলতে হবে।

◆ শেখ মুজিব কেন? গোলটেবিল বৈঠকের কথা বলছেন তো? আমার কিছু প্রশ্ন আছে এখানে। যে আগরতলা মামলা হয়ে গেল সেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়টিকে কি সাধারণভাবে মিথ্যা বলে মেনে নেয়া হয়েছিল? যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবের বিচার চলছিল। আপনি তো জানেন, তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় এজন্য যে...

Δ বেগতিক পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে...

◆ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যে একটা বানোয়াট মামলা তা কি সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছিল?

▲ এখানকার প্রায় সব লোকেরই বিশ্বাস, মামলায় সত্যতা কিছু একটা ছিল। তবে তাদের যে আপত্তি একটা ছিল তা হলো মামলাটি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

◆ প্রকাশ্য বিচার?

▲ হ্যাঁ, বিচারের একটা যথার্থ রায় হতে হবে। হয় ঐ ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে, নয় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। তাঁর ওপর জাতক্রোধের কারণে তাঁকে উঠিয়ে এনে কোন মোকদ্দমাবাজি কাম্য নয়। একজন মানুষের ওপর এভাবে এত গুরুতর অভিযোগ অপবাদ চাপিয়ে দেয়া যায় না।

◆ তবে আমাদের এখানে প্রশ্ন হলো, এই মামলায় সুনির্দিষ্টভাবে জড়িত থাকার ব্যাপারে আপনাদের সরকারের একটা বিশ্বাসের কথা আপনিও জানেন, আর ঘটনা যদি তা-ই হয় তাহলে গোলটেবিল আলোচনায় মুজিবের উপস্থিতির ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেয়ার কারণ কী? তখন তো আপনাদের সে ধরনের গণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতাও ছিল না যে তাঁর বিচারপর্বটি অবাধ ও পক্ষপাতশূন্য হতেই হবে। তখন তো সামরিক আইনের জমানা।

▲ সামরিক আইন তখন ছিল না।

◆ আমরা ওটাকে সামরিক ডিক্টেটরশিপ বলত পারি।

▲ না, কোন একনায়কতন্ত্র ছিল না।

◆ ছিল ঠিকই, ওটা কী বলে, ছিল বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।

▲ ঠিক ধরেছেন আপনি! ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব তাঁর মানসিক স্থিতি হারিয়েছিলেন। সব ধরনের দলের লোক তখন তাঁকে ছেঁকে ধরেছে। আমরা তাঁকে বলতাম হুঁকা আওর টোপি— কী যেন নামটি তাঁর... নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান। একমাত্র শীর্ষ ব্যক্তিটি ছাড়া সবাই তখন কেবলই হুকুমদার : ইয়ে কারো, উয়ো কারো, রীতিমতো হুলস্থুল তুলকালাম ব্যাপার। সবাই তখন কেবল বলছে, ইয়ে কারে গে, মুজিবকো নেহি বোলাওগে। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি। এ ধরনের চাপ এলো, চাপ মাথা পেতে নেয়াও হলো। আর রাজনীতির এই খেলায় খাজা খয়েরুদ্দিন তাঁর চালগুলো চালছিলেন। তিনি এলেন, আর গোলটেবিলের দিন ঘনিয়ে আসতে জেনারেল গুল হাসান আমাকে বললেন, আরে, কোথায় তুমি। খাজা সাব তো শেখ মুজিবের সাথে কথা বলবেন। আমার ঘর থেকে যখন কথা হবে তখন আপনি নিজেই কথা বললে ভাল হয় না! তাঁর সাথে মুজিবের কথা বলিয়ে দাও। আমি বলি, আপনি নিজেই কথা বললে ভাল হয় না! সে যা হোক, খাজা সাহেব শেষ পর্যন্ত নিজেই রিসিভার তুলে শেখ সাহেবের সাথে কথা বললেন। এই কথা বলার সময় খাজা সাহেব একটা গ্যারান্টি কোথা থেকে পেয়েছিলেন জানি না, হতে পারে আইয়ুব বা তাঁর কেউ তাঁকে সে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে তাঁর নিরাপত্তায় কোন ব্যাঘাত হবে না। তাঁকে যদি কোন অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেই হয় তাহলে এসবের একটা দফারফা হওয়াই দরকার।

◆ তবে সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার জন্য মুজিব জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছেন, আমার তো মনে হয়, স্পষ্টত এ গ্যারান্টি দেন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক।

▲ নির্বাচনী ফলের কারণে ঐ ম্যান্ডেট ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।

◆ আমি ১৯৬৯-এর সময়কার কথা বলছি, সত্তরের আগে...

▲ তাই! আমি তো... এখানকার কর্তাব্যক্তিরা যা ভেবেছিল তা হলো, তাঁকে ছাড়া কাজ হবে না। কাজেই যেভাবে সম্ভব তাঁকে এখানে ডেকে আনুন। কেননা, একমাত্র তাঁর পক্ষেই এখানে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হোক তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে রাজি করানো সম্ভব।

◆ হয়ত আপনার মনে আছে যে, একটা রাজনৈতিক ঘটনা তখন চলছিল। শেখ মুজিব তাঁর ছয় দফার পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছিলেন আর সরকার ছয় দফাবিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছিল। ফলে শেখ মুজিব আরও বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

▲ ঠিক।

◆ এটাকে কী চোখে দেখা হয়?

▲ মনে হতে থাকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার রক্ষার চেষ্টা করছেন, আর সরকার তাতে বাগড়া দিচ্ছে।

◆ আমি তো কথাটাকে ঘুরিয়ে বলতে পারি, সরকার যদি তাঁর ৬-দফাকে আমলে না নিত, তাহলে মুজিব এত জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠতে পারতেন না।

▲ তাতো বটেই, তার ওপর সরকার যদি মামলা গোপনে না চালিয়ে প্রকাশ্যে পরিচালনা করত, তাহলে এতকিছু ঝামেলা হতো না।

◆ আপনি কি সরকারের ঐ সময়ের ঐ পদক্ষেপকে ভুল বলবেন?

▲ কোন সন্দেহ নেই। বিচারপতি আব্দুর রহমানও ঐ সময়ে একবার বলেছিলেন, তোমরা তো ওখানে বসে বসে জিনিসটা করালে, কিন্তু দরকার ছিল সবকিছু প্রকাশ্যে করার। তবে আপনারা কি একটা জিনিস খেয়াল করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে তখন অনেক কিছুই ঘটছিল যার ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার বেশ অবকাশ ছিল। আর স্বার্থান্ধ, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল সেদিন সে সব বিষয়কে নিজেদের জন্য হুমকি বলে গণ্য করেছে।

◆ আপনি শাসক চক্রের কথা বলছেন?

▲ শাসক মহলের শতকরা ৭৫ ভাগ তো বটেই। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের আমলাদের মধ্যকার বহু সিনিয়র অফিসার এতে ছিলেন, আর এঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এম এম আহমদ। এই সেই আদি ও অকৃত্রিম এম এম আহমদ যিনি ঢাকায় বসে দর কষাকষিতে ছিলেন। এ এক পরিতাপজনক বিষয় যে, তখন কিছু লোক প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতার ধারণায় মদদ যুগিয়েছে। এদেরই অন্যতম আহমদিয়া মিরযা সম্প্রদায়প্রধান মিরযা আবু তাহেরের এতে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ঐ সময় তিনি কোমর বেঁধে লেগেছিলেন পাকিস্তানের দু'টি অংশকে আলাদা করে ফেলতে। আর এম এম আহমদ তো এই আবু তাহেরেরই 'গোলাম' ছিলেন।

◆ ঐ সময় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রধান ছিলেন তো স্যার জাফরুল্লাহ খান।

▲ না, জাফরুল্লাহ খান কখনও তা ছিলেন না। বহু আগে মিরযা গোলাম আহমদ মারা যান। তাঁর ধর্মীয় উত্তরাধিকার লাভ করেন আরেক ব্যক্তি, সেই দ্বিতীয় জনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বশির উদ্দিন মাহমুদ তাঁর উত্তরাধিকার লাভ করেন। তাঁরই পুত্র ও উত্তরাধিকারী হলেন আবু

তাহের। আবু তাহের ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়প্রধান। জাফরুল্লাহ কখনও তা ছিলেন না। তিনি কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

◆ তাহলে আপনি বলছেন, আহমদিয়ারা...

∆ বলছি। ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় তারা একটা বৈঠকে মিলিত হয় লন্ডনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মিরযা তাহের, সরাফতুল্লাহ ও আরও একজন। ঐ বৈঠকে বিচার-বিবেচনা চলে, পাকিস্তানে যে নির্বাচন হচ্ছে তাতে তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন কাকে সর্মথন জানাবে। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়, পিপলস পার্টিকে সমর্থন জানানো হবে। পিপলস পার্টিকে ওরা কীভাবে সর্মথন জানায় সে খবর পিপলস পার্টি বা খোদ ভুট্টোও জানতেন না। ঐ নির্বাচনের সময় সারা পাঞ্জাব জুড়ে আহমদিয়ারা তাদের সোলা ও জানা সঙ্গে নিয়ে যেত আর সেসব কাজে লাগাত প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে প্রচারণায়। কাউকে তারা বুঝতে দিত না যে তারা পিপলস পার্টির কর্মী হিসাবে কাজ করে চলেছে। এভাবেই তখন ওরা কাজ করে।

◆ সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের কেউকেটা হিসাবেই কি এসব তথ্য আপনার হাতে আসে? আপনি মিরযাদের সম্পর্কে এখন যা বলছেন সেটা ঐ সময় কি আপনার জানা ছিল? জানা ছিল কি এম এম আহমদ সম্পর্কে, জানতেন যে ওরা এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

∆ জানতাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট, সি-ইন-সি কেউ একথা বিশ্বাস করেননি। এখন আপনিই ভেবে দেখুন এসব লোকের সত্যিই এসব...

◆ আপনি এম এম আহমদের কথা বলছেন?

∆ না, আমি কাজ করছি পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য।

◆ আপনি এসব কেমন করে জানতে পারেন, কার কাছ থেকে?

∆ ওদের মধ্যে খোলাখুলিই আলাপ চলত। আমি নিজে কিছু আহমদিয়াকে চিনি ও জানি...

◆ ওরাই আপনাকে বলেছে?

∆ ওরা বলেছে, আমাদের মিরযা সাহেবের ওপর খোয়াব এসেছে, হুজুরও দেখা দিয়ে বলেছেন, ব্যাপারটা তাঁদের জানা। কিন্তু ওরা বলে না, তারপর মঞ্জিল কী? কেননা, চোর ব্যাটা চুরি করতে বেরিয়ে কি শোর করে জানাবে যে, আমি অমুক জায়গায় চুরি করতে চলেছি?

◆ আপনি কী বলেন?

∆ বলাবাহুল্য এ সম্প্রদায়টি এরকমই। আর ভুট্টো বলেছিলেন তিনি কারও আনুকূল্য নেননি। এমন কথা কেউ যদি বলে তিনি তাদের চুরমার করে দেবেন। এর ফল হিসাবে দেখা গেল, ভুট্টো আহমদিয়াদের একটি পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায় ঘোষণা করেছেন। মদের ওপর নিষেধাজ্ঞাও ঘোষণা করেন ভুট্টো, যিনি নিজেই নাকি তাঁর সমসাময়িককালের সেরা শরাবী! জুম্মাবারের সরকারী ছুটির ঘোষণাও তিনিই দেন। আসলে তিনি তাঁর গদি সামাল দিচ্ছিলেন। তবে কোন কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি। তা সে যা-ই হোক আপনাদের কথায় আসা যাক। কী জানতে চাইছিলেন আপনারা? আমি কি আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছি?

◆ অবশ্যই! তবে আংশিক। এটি কি সম্ভব যে যেহেতু বিষয়টি তখন জানা ছিল, ইয়াহিয়া জানতেন, তিনি কি জানতেন এ পরিস্থিতির মোকাবিলা কেমন করে করা যায়?

Δ তথ্য তাঁকে পৌঁছে দেয়া হয়। এখন তিনি এ নিয়ে কিছু করেছিলেন কি না আমার তা জানা নেই। দৃষ্টত তখন এটি ঘটে...

◆ তবে আপনি কি এরকমটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান গোল্লায় যাক বলে যে তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল তিনি সেই স্রোতে গা ভাসিয়েছেন?

Δ না।

◆ অথচ বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ...

Δ না, না, সে কথা আপনাদের আমি বলছি। লারকানায় ভুট্টোর বাসভবনে ইয়াহিয়া-ভুট্টো সলাপরামর্শে বসার আগের কথাই বলছি আমি। তখনও পর্যন্ত আমি ইয়াহিয়াকে দেখেছি তিনি সর্বান্তঃকরণে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার পক্ষে। তিনি মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে ঐকান্তিক। কিন্তু লারকানা বৈঠকে তাঁরা যাবার পর সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়।

◆ জেনারেল গুল হাসান তাঁর লেখা বইতে এর উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এরকম ধারণার কথাও বলেছেন যে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে কী সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছিল বা ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ তিন জেনারেল মিলে কী স্থির করে সে বিষয়ে সেনা সদর দফতরকে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা হয়।

Δ এনএসসির কোন বৈঠকই হয়নি।

◆ আমি তিন জেনারেল যেমন, পীরজাদা...

Δ তাঁর অভিযোগ কেন তাঁকে সেই সিদ্ধান্তে রাখা হয়নি। এটা একটা ভাবার বিষয় বটে। জেনারেল হামিদ ছিলেন জিএইচকিউপ্রধান। তিনি সকল আলোচনা ও কথাবার্তায় ছিলেন। সবকিছুতে ছিলেন। আমাকে ওদের এত টানাটানি করার কারণ ঐ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল। ওরা ধরে নিয়েছিল যে, আমিই কাউন্সিলপ্রধান—যা আসলে সত্যি নয়।

◆ ঠিক?

Δ সিকিউরিটি সরাসরি প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করত। দুয়েকবার আমি সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করেছি, তবে তা পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের মতো কিছু বিষয়ে নয়। বরং তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান—দুই অঞ্চলেই অস্ত্র চোরাচালান হয়ে আসছিল। তাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ নিয়ে কোন পরিকল্পনা আছে কি না। মাত্র দুটি বিষয় ছাড়া আমি কখনও কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। তারাই প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলত। তবে জিএইচকিউপ্রধান ছিলেন জেনারেল হামিদ। তাঁর সাথে ইয়াহিয়া বৈঠকে বসতেন। যদি জিএইচকিউ-এর দায়িত্ব জেনারেল গুল হাসানের হাতে গিয়ে থাকে, হতেও পারে গুল হাসান সেখানে ছিলেন। দ্বিতীয়ত, একথাই সবচেয়ে সহজে বলা যায় যে, জিএইচকিউ তো আমার সাথে আলোচনা করেনি। কাজেই দেখ, আমি এতে নেই। তৃতীয়ত, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলেছি, তিনি আর পীরজাদা চাচ্ছিলেন ভুট্টো ক্ষমতায় আসুন। ওরাই ছিল পালের গোদা কিসিমের চরিত্র। পীরজাদা কলকাঠি, কৌশল ঠিক করছিলেন। গুল হাসান আর ঐ যে কর্তাব্যক্তি কী নাম যেন,

এয়ার চীফ আবদুর রহিম, রহিম। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই ওদের নানা টানাহ্যাঁচড়ার পর লাহোর দুর্গে নিয়ে আটকে রাখা হয়। কাজেই এখানে কথা হলো, জিএইচকিউ সবকিছুতে সত্যিই ছিল না। আমি এর একটা নমুনার কথা আপনাদের বলব, সেটি একটি অপারেশনের কথা। ওটার নাম ছিল অপারেশন জিব্রাল্টার বা এ ধরনের কিছু। ঐ অপারেশনের আওতায় ভারতীয় কাশ্মীরে কিছু লোক প্রবেশ করানো হয়। আমি ১৯৬৫-র আগের সময়কার কথা বলছি। এই অপারেশন পুরোপুরি পরিচালনা করা হয় রাওয়ালপিন্ডি থেকে। এতে জড়িত ছিলেন জেনারেল মূসা, জড়িত ছিল জিএইচকিউ। আর এরই পরিণাম হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় '৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ঐ সময় রাওয়ালপিণ্ডির জিএইচকিউ ছিল পুরোটাই আহমদিয়া জেনারেলদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জেনারেল ছিলেন আহমদিয়া, চীফ অব স্টাফ আহমদিয়া... এসব কি নিছক দৈবচক্রের ব্যাপার? তাই ওরা যা '৬৫-তে করতে পারেনি, একাত্তরে তা করতে সক্ষম হয়।

◆ তাহলে, কথা হলো ১৯৭১-এ চক্রান্তের ভিতর চক্রান্ত ছিল। একদিকে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে, অন্যদিকে পীরজাদা, গুল হাসান আর জেনারেল হামিদের মধ্যে। তারাও...

∆ না, জেনারেল হামিদ এসবে ছিলেন না। পীরজাদা ও গুল হাসানের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পীরজাদা ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের চীফ অব স্টাফ। আর আমার নজরে যেসব জিনিস ধরা পড়ে তা খুব সুবিধার মনে হয়নি। যেমন এ্যাডমিরাল একেএম আহসানের কথাই ধরি। তাঁর সম্পর্কে আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানেও তিনি সেখানকার মানুষের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবেই মনে করতেন, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া উচিত। এক সময় তিনি পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন। এহেন একজন ব্যক্তিকে পীরজাদার কক্ষে বসতে দেয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্টের কক্ষটি জাতীয় মর্যাদার প্রতীক বলে সেখানে তাঁকে বসতে দেয়া হয়নি। অফিসের কিছু চিঠিপত্র যথাস্থানে পৌঁছাচ্ছিল না। আমি তাই আহসানকে একটি চিঠি লিখি। আমি ঠায় বসে এখানে, আর সেখানে চলছে সিকিউরিটি। আমি আপনার জন্যে একটি কাজ তো করতে পারি। প্রেসিডেন্টের সাথে আপনার কিছু যোগাযোগ করার বা পৌঁছে দেবার থাকলে তা মেহেরবানী করে আমাকে জানান এবং কোন কিছু থাকলে তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি জীবিত থাকলে তা প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে যাবে। তিনি এজন্যে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি দেন। ঐ পর্যন্তই। আহসান ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছে আমার সাথে দেখা করেন। আমি আমার কাজ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বিধির অভিপ্রায় কী আমার জানা ছিল না, বুঝতে পারিনি। সবাই এটা করছিল, ওটা করছিল, তেল মর্দন করছিল। একজন তো সেনাবাহিনীপ্রধান হয়ে গেল, আর মাত্র তিন মাস না যেতেই দেখা গেল লোকটি প্রকৃতপক্ষেই মাজা ভেঙে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

◆ পরে টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করা হয়। এতে আপনার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

∆ তিনি একজন ভাল সৈনিক বটে, তবে ঐ স্তরের যোগ্য সৈনিক নন।

◆ আপনার কি সেকথা তখন জানা ছিল?

Δ তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন না যাঁর পক্ষে স্বকীয় ও স্বাধীন সিদ্ধান্তের আলোকে এবং বিরাজমান পরিস্থিতিতে কৌশলগত প্রয়োজন আর রাজনীতির চাহিদার মধ্যে মণিকাঞ্চন সমন্বয় সাধন করা সম্ভব ছিল। সৈনিক হিসাবে তিনি ভাল, সেই কাজটা দিন, তিনি চমৎকার আঘাত হেনে যাবেন দুরন্ত সৈনিকের মতোই। তবে ওখানে তার চেয়েও বেশি কিছুর দরকার ছিল। আরও বেশি করে দরকার ছিল স্বাধীনভাবে কম্যান্ড দেবার। আর আপনি যখন সেই স্বাধীন, আলাদা কম্যান্ডের আসনে আছেন তখন আপনাকে ঢের বেশি স্বাধীন সিদ্ধান্তও নিতে হবে। আপনাকে যারা রাওয়ালপিণ্ডি বা ইসলামাবাদে বসে আছে তাদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। সাধারণ মেধার সৈনিক হিসাবে আমাকে লাহোর বা রিসালপুরের অধিনায়কের দায়িত্বভার দেয়া যেতে পারে, পূর্ব পাকিস্তানের নয়। পূর্ব পাকিস্তানে আমি তা নেবও না। আর যদি তেমন দায়িত্ব নিতেই হয় তাহলে আমি সেখানকার পদাতিক ডিভিশনগুলোকে নিজে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দেব। আর সেটা পূর্ব পাকিস্তান বলেই। নির্দেশ দু'রকমের দেয়া হয়ে থাকে। এর একটি হলো অপারেশন অর্ডার। এর আওতায় বিভিন্ন কম্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর অপারেশন ইন্সট্রাকশন হলো, যাতে আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই। বড়জোর আপনি করণীয় কী তার একটা রূপরেখা দিতে পারেন ওতে। পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় প্রযোজ্য ছিল অপারেশন অর্ডার। সরাসরি অপারেশন অর্ডার—যা লিখতে হবে নিজেকে। এ নির্দেশের আওতায় বলা হবে, তোমরা এই এই অবস্থান বা জায়গাগুলো দখল করবে, এই এই অবস্থানগুলো রক্ষা করবে। তোমরা তোমাদের সেনাবিন্যাস ঠিক রাখবে। আর অন্য জিনিস যেটি হয় সচরাচর তা হলো, শত্রুপক্ষ যেসব জায়গা দখল করেছে তোমরা সেগুলোর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাবে। আর সেক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর সেটা তোমাদেরই ব্যাপার, সেভাবেই কাজ করতে হবে।

◆ আপনি কখন খবর পেয়েছিলেন, টিক্কা খান এ্যাকশন নিতে যাচ্ছেন?

Δ আমি তখন ঢাকাতেই ছিলাম। আমি ২৬ মার্চ ওখান থেকে রওনা হই।

◆ বেশ। ঢাকায় আলোচনা যখন ব্যর্থ হয়েছে ধরা হয়, সে রাতে ইয়াহিয়া চলে আসেন, ভুট্টোও তারপর তড়িঘড়ি ঢাকা ত্যাগ করেন। আর অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় ঢাকার বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানা শুরু হয়ে যায়। আপনি কি সেসবের কিছু জানতেন, জানেন? আপনি কি ইয়াহিয়ার সফরসঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন?

Δ আমার সেখানে যাওয়ার কারণ, বহুদিন ধরেই কথা চলছিল যে, প্রেসিডেন্ট ঢাকায় যাবেন, আমিও ঢাকায় গিয়েছিলাম। ঐ সময়ে যে পরিস্থিতি আমার নজরে পড়ে তাতে দেখা যায়, সেনাবাহিনী বেতার কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে, আরও সব পদক্ষেপ নেয়া চলেছে। আমি তাতে দেখলাম এসবের শেষ পর্যন্ত কী হবে, জাতীয় নিরাপত্তা বিধান আদৌ করা যাবে কি না। আর রোয়েদাদ খানের একটা তলব পাওয়া গেল। তিনি ছিলেন তথ্য ও বেতার সচিব। তাঁর কাছ থেকে খবর মিলল ওয়্যারলেস স্টেশনের কে কোথায় লাপাত্তা হয়েছে, কারও খোঁজখবর নেই।

◆ তা আপনি তো জেনারেল, সফরেই গিয়েছিলেন। আপনি কি প্রেসিডেন্টের সাথেই গিয়েছিলেন না কোন সুনির্দিষ্ট কাজে গিয়েছিলেন?

∆ না, আমার সুনির্দিষ্ট বা নির্ধারিত কোন কাজ ছিল না। তবে পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তা জেনে...

◆ যা ছিল জাতীয় গোপনীয়তামূলক কিছু বা জাতীয় নিরাপত্তা...

∆ বলতে পারেন, তবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে এমনি এমনি বাতচিৎ করে কাটাচ্ছি। কথা ওঠে, বসে বসে করছটা কি? তাই প্রথমে আমি লাহোর থেকে করাচী যাই। করাচীতে যখন এলাম তখন খবর পাওয়া গেল, ঠিক হয়েছে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে ঢাকায়, তার দিন-তারিখও ঠিক হবে। আমাকে বলা হলো, দ্যাখো সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে। আমি ঢাকায় গিয়ে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করি। আমি তাঁর সাথে ছিলামও কিছুক্ষণ, ফজরের নামাজের সময় থেকে...

◆ দিনটির তারিখ বলতে পারেন?

∆ তারিখটা আমার খেয়াল হচ্ছে না, মনে করতে পারছি না। একজন বিহারী লোক ছিল...। এ ঘটনা জাতীয় পরিষদের দিন-তারিখ ঘোষণার পর। আমাদের জানা ছিল, তখনও কিছু বিষয় নিয়ে বিরোধ থেকে গিয়েছিল। ইয়াহিয়ার কথায় দ্বিমত পোষণ করে মুজিব সাহেব বলেছিলেন, জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় হতে হবে। তাঁর আরও একটি শর্ত ছিল এই কারণে যে, প্রেসিডেন্ট তাঁকে বলেছিলেন তিনিই দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। আর সে কারণেই আরও ভাল হবে তিনি যদি ইতোমধ্যে একটিবার পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে আসেন। আমাকে এই দুটি কাজ দেয়া হয়েছিল। শেখ সাহেবের সাথে দেখা হলে আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনি তো কার্যত দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট তো যাবার পথেই সেকথা ঘোষণা করে দিয়ে গেছেন। তা আপনি একবার আসুন না পশ্চিম পাকিস্তানে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, আপনার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার। তাই! তা বেশ ভালই তো, তিনি বললেন। কিন্তু সম্মতি দিলেন না। এর ওপর খন্দকার মোশতাকও তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কী কারণে জানি না, তিনি না যাবার কথাই স্থির করলেন। আরও যে কথা তিনি বললেন তা হলো, আগে তো জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন এখানে হোক, তারপর না হয় আমি পশ্চিম পাকিস্তানে যাব। আপনার কথা আমি প্রেসিডেন্টকে বলব আর তিনি যা বলেন তা-ই করব। প্রেসিডেন্ট আমাকে বললেন, এখন ভুট্টোর সাথে গিয়ে কথা বলো। কাজেই আমি করাচী গেলাম ভুট্টোর সাথে কথা বলতে। ভুট্টোর সাথে দেখা হতেই তিনি আমাকে জানালেন, আমার বিশ্বাস মুজিবের সাথে দেখা হয়েছে তোমার। আমি বললাম, জ্বি স্যার। কী বলেছেন তিনি? তিনি বলেছেন, জাতীয় সংসদের পয়লা অধিবেশন ঢাকায় হতে হবে। তারপর মিনিটখানেক কী ভেবে বললেন, ওকে, এক কাপ চা তো খান। আমি ভাবসাবে খুব খুশি হলাম। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে গেলাম, স্যার, আমি জনাব ভুট্টোর সাথে দেখা করেছি। তিনি মুজিব সাহেবকে বলেছেন, আমার মতে ব্যাপারটা খুবই ন্যায়সম্মত হবে। বাদবাকি সেশন তো হতেই থাকবে নিয়মমাফিক, শুধু উদ্বোধনী অধিবেশনটাই...। প্রেসিডেন্ট তো খুবই খুশি। তিনি কাউকে

ডেকে একটা ডিক্টেশন দিলেন, শেখ সাহেবকে খবর দাও, জাতীয় পরিষদের পয়লা অধিবেশন ঢাকাতেই হবে। আর এরপর শুরু হয়ে গেল দৌড়ঝাঁপ, আর তারই এক ফাঁকে হলো লারকানা বৈঠক।

◆ সে বৈঠকে সবাই হাজির ছিল?

∆ আমার তো মনে হয় তার একটা কারণও ছিল। প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব ছিল ইরশাদ। তার কথাবার্তায় আমি আঁচ করলাম, পূর্ব পাকিস্তান ছুটে গেছে, ভুট্টো তাঁর এই থিওরি গছাতে চেষ্টা করছেন। তিনি বলতে চাচ্ছেন, ওটা তো ছুটেই গেছে নির্ঘাত, তো আসুন আমরাই ওটাকে বাতিল করে দিই। তবে সে যা-ই হোক আমি এসবের সাক্ষ্য নই। হলে বলতাম...। এসবের আগে পর্যন্ত আমার ধারণা অনুযায়ী অন্তত ইয়াহিয়ার সামনে এরকম কোন পরিস্থিতি আছে বলে মনে হয়নি। বাস্তবিকপক্ষে তিনি, এমনকি নুরুল আমিনের সাথেও তীব্র বিরোধ এড়ানোর জন্য শত উপায়ে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, নুরুল আমিন সাহেব আপনার বোধ হয় খেয়াল আছে, ভুট্টো শেষবারের মতো চীন সফরে যান তখন তাঁর সাথে আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটির একটা লোক ছিল, একই কাজ ছিল তার। এখন সেই সময়ে নুরুল আমিন, খাজা খয়েরুদ্দিন, জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব, মওলানা মওদুদী ও আরও একজন কর্নেল ছিলেন। আরও লোক ছিল, আমি তাদের নাম ভুলে গেছি। আমি তাঁদেরকে বলেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক নেতার সাথে কথা বলা দরকার। পরে আমাকে জানানো হলো যে, নুরুল আমিন সাহেব নাকি বলেছেন, এ জন্যে মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছে দৌড় পাড়তে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে তো হাওয়াই জাহাজে যাবার টিকিটের পয়সা নেই। আমি তাঁদের তিনজনের প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করি। ইয়াহিয়া সাহেব তো নুরুল আমিন সাহেবকে বলেই ফেললেন, আরে নুরুল আমিন সাহেব, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন, দৌড় পাড়ার জন্য আমাদের তিনজনকে সরকার পাঠাবে! এতে পাল্টা জবাব দিলেন নুরুল আমিন, না, খাজা সাহেব, আপনিই আমাদের বলুন দেখি দেশের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান কত খরচ করতে পারে? তবে এটা সামান্য ব্যাপার হলেও পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপার—তাতে কি কোন সন্দেহ আছে?

◆ কিন্তু ঐ সময় আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি তো ২৫ তারিখে রওনা হয়ে যান, তারপর কোথায় ছিলেন?

∆ ২৬ তারিখে। আমি বলেছিলাম নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্থগিত করায় খুবই খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

◆ আপনি তাও জানেন অথচ অপারেশন সার্চলাইট হচ্ছে এটা জানতেন না, বেশ ভালই তো!

∆ কিন্তু আমি জানতাম কর্নেল ফরমান আর ঐ জেনারেল কি নাম যেন... রাজা...

◆ খাদেম হোসেন রাজা। তখন সাহেবজাদা ইয়াকুবের অপারেশন চলছিল...

∆ না, ওটার নাম ছিল অপারেশন ব্লিৎসক্রিগ। প্রশ্ন হলো, কেন ঐ অপারেশন তৈরি করা হয়েছিল? এর জবাব হলো, এ রকম অভিযানের পরিকল্পনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ সম্পর্কিত নিবন্ধ আমি আপনাদের দেব। এ রকম দু'একটা নিবন্ধ লেখা রয়েছে। এর

একটিতে জেনারেল ইয়াকুব তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, হাঁ পরিকল্পনাটি আমিই তৈরি করি। কিন্তু সেটি ফরমান আপডেট করেছেন না হুবহু সেটিই বাস্তবায়িত করা হয়েছে সেটি আলাদা ব্যাপার। তবে ঐ পরিকল্পনার ব্যাপারে ইয়াকুবের যুক্তি ছিল সম্ভাব্য কোন পরিস্থিতির জন্য একটা পরিকল্পনা তো চাই। তবে তিনি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এ্যাকশন নেয়ার বিরোধী ছিলেন। তিনি বরং সর্বাত্মকভাবে রাজনৈতিক দরকষাকষির পক্ষে ছিলেন, আর সে কারণেই তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়।

◆ জেনারেল ইয়াকুবের প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, তা ঠিক।

∆ তিনি তাঁর নিজ অবস্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি মুজিবের বিষয়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেন।

◆ এখন আমার অন্য একটি প্রশ্ন লায়ালপুরে যে মামলার বিচার তখন চলছিল সে বিষয়ে আপনি কি অবহিত ছিলেন?

∆ এ বিচার চলার বেশিরভাগ সময়টাতেই কেবল আমি এটুকুই জানতাম যে, ঐ মামলায় আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন জনাব ব্রোহী ও আরেক জন। কোথায় এ বিচার চলছে আমি জানতাম না। এক লোক ছিলেন যাঁর নাম লে. কর্নেল কাইয়ুম। তিনি পরে পাকিস্তান সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য বেঁচে নেই। এই লে. কর্নেল কাইয়ুম ছিলেন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের লিয়াজোঁ অফিসার।

◆ জেনারেল কাইয়ুম ঐ ট্রাইব্যুনালের সভাপতি, চেয়ারম্যান বা এমন একটা কিছু।

∆ নাম আমার মনে নেই তবে কর্নেল কাইয়ুম ছিলেন ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স বা আইএসআই-এর জেনারেল জিলানীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। জিলানী ছিলেন আইএসআই-এর বড়কর্তা, আর কাইয়ুম ছিলেন তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন ও বন্ধু মানুষ। প্রেসিডেন্ট তাঁকে এ মামলার কোন কথা ফাঁস না করার জন্য বলেন। তাই শুধু এই লোকটি ও আইনজীবী ব্রোহীই মামলার আসামীর কাছে গিয়ে কথা বলতেন। আর কারও, এমনকি ব্রোহীর সহযোগী উকিলেরও সে অনুমতি ছিল না। তিনি কিছু জানতেন না। আমারও এ নিয়ে কিছু করার ছিল না।

◆ না, আমি কেবল জানতে চাইছি, কখনও এ বিষয়ে আপনি জেনেছিলেন কি না?

∆ আমি জানতাম এ ধরনের মামলা হয়ে থাকে। তবে আমাকে কখনও কেউ বলেনি এ রকমই একটা মামলা এখন চলছে। আমাকে বলা হয়...

◆ না, খবরের কাগজেই তো খবর ছিল যে শেখ মুজিবের বিচার চলছে। আর তাই নিয়ে দেশে বিরোধিতাও চলছে। এ সবের খবর ছিল খবরের কাগজেই।

∆ ঠিক। তবে মামলা হয়নি আমি তা বলিনি, আমি মামলার গোড়ার দিকের কথাই বলছি। ব্রোহী সাহেব শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা লড়ার প্রস্তাব দেন। এখানকার আরও কিছু শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীও তাঁর পক্ষে মামলা লড়ার প্রস্তাব দেন। আসলে ওর কী হলো, কে কার মামলায় তাঁর পক্ষে লড়লো বা লড়লো না, মামলা কী প্রকৃতির হবে, কোর্ট মার্শাল না

সামরিক বিচার, না অসামরিক আদালতের বিচার, সে বিচার কী ধরনের, কী প্রকৃতির হবে এসব নিয়ে অনেক গোমরই ছিল। কিন্তু মামলাই তো গেল ভেস্তে...

◆ আপনি কি ২৫ মার্চের এ্যাকশনের কথা জানতেন?

A আমি জানতাম কোন একটা পরিকল্পনার আওতায় সেনাবাহিনী পঁচিশে রাতে এ্যাকশনে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে এ্যাকশনটি কী ধরনের, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কোথায় আসলে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল না। শুধু আমার কাছে মনে হয়েছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমি সেখান থেকে ফেরার পরপরই বোঝা গেল, না, স্বাভাবিক ব্যাপার ওটা ছিল না। ওটা ছিল একটা বিরাট ধরনের অপারেশন। করাচীতে আমি বিমান থেকে পা মাটিতে রাখতেই খবর পেলাম, ভুট্টো মহোদয় এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতি দিয়েছেন পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য। আপনারা ভুট্টোর সেই বিবৃতি খবরের কাগজের পাতায় নিশ্চয়ই দেখেছেন, আমার কাছেও আছে। আমি সেদিন করাচীতে দেখলাম, সেখানকার লোকজন মিষ্টি বিলি করছে আনন্দে। এটা নজরে পড়েছে পেশাদার সৈনিকের চোখেও। এটির বিষয়ে আপনাদের একজন সাংবাদিক লিখেছেন। আছে নাকি আপনাদের কাছে বইটি? আপনারা তো লেখাপড়া করছেন, লেখক মানুষ। বইটি লেখা হাসান সাঈদের [জহিরের]। এসব নিয়ে আমরা তিনজনে কথা বলেছি : আমি নিজে, আলতাফ গওহর ও বেনজীর ভুট্টো। বেনজীর প্রধানমন্ত্রী থাকতে একদিন তিনি আলতাফ গওহরকে বলেন, জেনারেল উমরকে ডাকুন তো! গওহর আমার কাছে এলে আমি বললাম কবুল, আমার দিক থেকে আমি তো পরিষ্কার, আমি যাব, আপনি উনাকে জানিয়ে দিন। আমি অবশ্য পাকিস্তান কে বা কারা ভেঙেছে তাদের নাম করব না, তবে ঐ যুদ্ধ থেকে যে শিক্ষা মিলেছে তার কথাই বলব যে, তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। ভুট্টো ভেঙেছে, ইয়াহিয়া ভেঙেছে, মুজিব ভেঙেছে—এসব বলতে আমি আগ্রহী নই। কেননা তাতে লোকে বলবে আমরাই তো পাকিস্তান ভেঙেছি। কাজেই ওতে কাজ নেই। ওটা থেকে সরে আসাই বাঞ্ছনীয়। এ হলো একটি দিক। আর দ্বিতীয়টি হলো এই বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ককেই আমি খুব বেশিরকম গুরুত্ব দিই। আমি সেইসব লোকেরই একজন যারা পাকিস্তানের সাথে আজন্ম সম্পর্কিত। পাকিস্তানের জন্মের সাথে আমার একটি বড় সম্পর্কের বাঁধন রয়েছে। আমি মনে করি, পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশও হতো না। আপনারা হয়ত আমাকে যুক্তি দেখিয়ে বলবেন, সাহেব, আপনি তো এমন সব মোক্ষম যুক্তি দেখাচ্ছেন, তর্ক করছেন কিন্তু মনে করে দেখুন, '৪৬-এর লাহোর প্রস্তাবে বাংলার প্রতিনিধি দল না এলে কী হতো! আপনারা এরকম হরেক যুক্তি দিতে পারবেন তবু একথা আমি বলব যে, বাংলাদেশ ভাল করছে... এ খবর আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দেয়। আমার গৃহে একটি বাঙালী বালক রয়েছে, বিশ্বাস করুন সে আক্ষরিক অর্থেই আমাদের পরিবারেরই একজন। আমরা এক সময় যে দোষ করেছি সে সময়েরই দোষঘাট মাত্র। আমার তো মনে হয়, আমাদের আলাদা হওয়ার দরকার থাকলে সে তো হতোই, হয়েছেও কিন্তু যে মর্মান্তিকভাবে তা হয়েছে, সেটিই ট্রাজেডি! আর কিছু প্রশ্ন আছে আপনাদের? বলুন।

◆ একটি প্রশ্ন হলো, সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের কাছে নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছিল...

▲ গোড়ায় সামরিক বাহিনী কিছু জড়িত ছিল। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে অবস্থা বদলাতে শুরু করে। মনে হতে থাকে পরিস্থিতির উন্নতির আশা নেই তবে নির্বাচনের আগেই একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কিছু রাজনৈতিক দল যদি মোটামুটি আসন না পায়—না পাওয়ার আশঙ্কাই ছিল বেশি—তাতে কিন্তু হবে না। মনে করা হয়েছিল তিন মুসলিম লীগ—ফজলুল মুসলিম লীগ, খান আবদুল কাইয়ুমের মুসলিম লীগ আর মিয়া মমতাজ দৌলতানার মুসলিম লীগ ক্ষমতায় আসতে না পারলেও কয়েকটি আসন পাবে আর তাতে বড় রকমের বিভেদ দেখা দিতে পারবে না। মুজিব সাহেবের সঙ্গে দৌলতানার যোগাযোগই ছিল সবচেয়ে বেশি। ফজলুল কাদের চৌধুরী ইতোমধ্যে এ দুনিয়া ছেড়ে গেছেন। সে যা-ই হোক, এই তিন মুসলিম লীগের ওপরও জামায়াতে ইসলামী ছিল। সেই জামায়াত বলেছিল যে, মুসলিম লীগ যদি এক হয় তাহলে ঐ দল নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করবে না বরং মুসলিম লীগও ডানপন্থী দলগুলোকে সমর্থন জানাবে। তবে তার পর যা ঘটে তা হলো, মুজিব নাকি ইয়াহিয়াকে বলেছেন, কী হবে আমি বলতে পারি না, যে কোন কিছুই হতে পারে। তবে এর সত্যাসত্য আমি কিছু জানি না। মুজিব ও দৌলতানার মধ্যে কিছু আলাপ হয়। তবে গোড়া থেকে জনসাধারণের দিক থেকে যা ঘটে তাতে বোঝা যায়, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তারা পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের কোন অফিস খোলেনি, কাউকে নির্বাচন প্রার্থী করা হয়নি সেখান থেকে। আর এসবের মাঝে তাদের মনোভাব ফুটে ওঠে। ফলে আমরা এখন নিশ্চিত বলতে পারি, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে খসে যাক—শুধু তিনি (ভুট্টো) এটাই চাননি, তিনি আরও কিছু চেয়েছিলেন আর সেজন্য তিনি সবকিছুই করেছেন। যখনই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে, একটা না একটা চাতুরি খেলেছেন সব সময়। বলেছেন, এটা করুন, সেটা করুন। আমি এরকমই একটি ছলচাতুরির একজন সাক্ষী। পূর্ব পাকিস্তান তো নির্বাচনে এখানেও দু'একজন প্রার্থী দিয়েছিল, মুজিব সাহেবের রাজনৈতিক দলের দফতরও ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টির কিছুই ছিল না। তাই নির্বাচনের ফল যখন এলো তখন অনেকে মনে করলেন, দুটি দলের মধ্যে একটা কোনরকমের সমঝোতা হবে। যদি এ মর্মে সমঝোতা হতো যে, ঠিক আছে, আমরা বিরোধী দলের আসনে বসব, আপনারা সরকার গঠন করুন, সে-ই ভাল হবে। কিন্তু তা হবে কী, উল্টো এমন কথাবার্তা শুরু হলো যে, আরে, ওরা তো আমাদের ফতুর করে ছাড়বে, লুটে নিয়ে যাবে। ভুট্টো বললেন, আমি পশ্চিম পাকিস্তানকে বাঁচিয়েছি। এসব কথা রীতিমতো তাঁর প্রকাশ্য বিবৃতিতেই রয়েছে। আমি এর একটা দৃষ্টান্ত দেব। ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে ঢাকায় ছোটখাটো গোলযোগ হয়েছে—এ রকম বার্তা আসে জেনারেল ইয়াকুবের কাছ থেকে। আমি তখন করাচীতে আসি। আমি এসেছিলাম সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কারণে; এক বিয়ের অনুষ্ঠানে শরিক হবার জন্য। প্রেসিডেন্ট সাহেবও করাচীতে। আমার কাছে টেলিফোন এলো, প্রেসিডেন্ট আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। যা হোক আমি নির্দেশ পেয়ে গিয়ে দেখি ইয়াহিয়া ও ভুট্টো দু'জনে কথা বলছেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, দ্যাখো পূর্ব

পাকিস্তানে এই বার্তাটা পাঠাতে হবে। বলতে হবে, পরিস্থিতি বুঝে জোরালো অথচ ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নিতে হবে। কথা কানে যেতেই ভুট্টো সাহেব খৈ ফোটাতে শুরু করলেন, আরে কড়া ব্যবস্থা নিন, এটা করুন, সেটা করুন। আমি প্রেসিডেন্টের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললাম, দেখুন এত কথার কী দরকার, আপনার নির্দেশ কী সেটা বলুন মি. প্রেসিডেন্ট। 'আরে তুম যাও ভাই আপনা মেসেজ দে দো।' আমি ডিভিশন সদর দফতরে গিয়ে বার্তা দিলাম হাঁ, ইয়াকুব সাব, শক্ত হোন, তবে কোন অন্যায় নয়। আপনার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে। আরেকটি সভার কথা। আমার এক ভাই পাকিস্তানের আশঙ্কা বা ভয়ভীতির কারণ কিসে কিসে জানতে চেয়েছিল। সে আসলে তখন নানা বিষয়ে ড্রাফটিংয়ে হাত পাকানোর মহড়া দিচ্ছিল। বললাম, আর কী! পাকিস্তানের রয়েছে জাহেলিয়াতের ভয়, বেরোজদারির ভয়, ডিমের ভয়, এই যেমন আপোস করে থাকার মদদের ভয়, জনসাধারণের অংশীদারির চেতনা নেই—তার ভয়। আর আমি এসবের বিষয়ে মনোনিবেশ করে প্রেসিডেন্টের কাছে নোটের পর নোট পাঠাচ্ছি আর যেখানে সামরিক ভয়, আশঙ্কা আছে সেসব বিষয় পাঠাচ্ছি আমার প্রতিরক্ষা সহযোগীর কাছে, তার বিবেচনার জন্য। বিষয়টি ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক যোগাযোগের কারণে; সেটিও তো একটা হুমকি। আমেরিকানদের মনোভাবও হুমকি। যাক এসব, আমি ভুট্টোকে বললাম, তো জনাব ভুট্টো, আপনি পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপের পরিকল্পনার খরচটা যোগাতে যাচ্ছেন নাকি? হাসতে হাসতেই বললাম কথাগুলো। আর এর পরিণতি হিসাবে আমাকে হয় জেলে, নয় বাড়িতে অন্তরীণ কাটাতে হলো। আমি এরপরেও ভুট্টোর ঘর রক্ষার চেষ্টা করেছি। আমি নির্বাচনের ফলাফলের আলোকে বলতে চাইছিলাম, ক্ষমতার একটা ভাগাভাগি করে নেয়া তো যায়, একটি দল বিরোধী পক্ষে আসন নিতে পারে আইনসভায়। তাঁরা দৌলতানার মতো লোক বা রাজনৈতিক দলের পরামর্শও তো নিতে পারে। দৌলতানা তো বলেছেন, ধরো, এমন একটা সরকার তোমরা গঠন করো যাকে জাতীয় সরকার হয়ত বলা যাবে না তবে আমরা পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী সরকারের সকলের দলের প্রতিনিধিত্ব তো দিতে পারি। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়! তিনি সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের কাছে ঘেঁষবেন না। অথচ সেই তিনিই পোঁ ধরেছেন, জাতীয় নেতা হবেন। এদিকে, হুঁশ নেই তাঁর চেয়ে ঢের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পূর্ব পাকিস্তানে বসে আছে।

◆ আপনি জেনারেল নিয়াজীর বই পড়েছেন? তিনি তো লিখেছেনই, তার ওপর ইসলামাবাদের জেনারেলরাও তো পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভাবে না। এই অভিযোগ কি সত্যি?

∆ নিয়াজী ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছেন। ও ব্যাটা তো লুটপাটেই ব্যস্ত ছিল, ওর স্বকীয়তা কী করে থাকে?

◆ তিনি তো বলেছেন...

∆ বলেছেন! কেউ যদি সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই বকর বকর করতেই থাকে, বকলেই হলো! আমার অনেক বন্ধুই তার এসব বকোয়াজ রীতিমতো ঐ সময়টায় পর্যবেক্ষণ করেছে, সমীক্ষা চালিয়েছে।

◆ তিনি বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকে আলাদা করার একটা পরিকল্পনাই ছিল। ভুট্টোর সমর্থনক্রমে জেনারেলরা সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। তিনি বলেন যে, আপনার পদটি...

∆ যা খুশি তিনি বলতে পারেন, সেটা তাঁর অধিকার। তবে বস্তুতপক্ষে তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা হলো, গোটা সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি বয়স হয়ে যাওয়া ব্যক্তি যাকে ওরকম একটা পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁর সেই মেধা নেই। তিনি সুস্থ ও মানসিক ভারসাম্যের অধিকারী ব্যক্তি নন। তবে তিনি তাঁর ক্যারিয়ারে যা করে নিয়েছেন সেটাই তাঁর বাহাদুরি, সেটা অবশ্য অন্য জিনিস। আমরা এক জটিল রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করছিলাম। সোজা গিয়ে কমান্ড নেয়া, তাও স্বাধীনভাবে, এটা নিরেট কসাই হওয়ার কোন কাজ নয়।

◆ উনি তো ছিলেন শের বা টাইগার নিয়াজী!

∆ টাইগার! ওটাতো আমাদের এক কার্যক্রমেরও নাম...

◆ কোথাও গলদ ছিল। জেনারেল ইয়াকুব পরিকল্পনাটি করেছিলেন এ রকম কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য। আর জেনারেল নিয়াজী ছিলেন সিনিয়রিটি তালিকার অনেক নিচের দিকে। তাঁর অবস্থা এমন কিছু আহামরি ছিল না। আপনি কি মনে করেন, নিয়াজীর সিনিয়র জেনারেলরা পূর্ব পাকিস্তানে তখন যে পরিস্থিতি চলছে সেই বিবেচনায় সেখানে যেতে চাননি?

∆ ঠিক বলেছেন। তাঁদের অনেককেই বলা হয়েছিল, তাঁদের কেউ যেতে চাননি। আর সেখানে এই লোক বলেন, 'হাম জায়েঙ্গে। বাঙালীকো এক মিনিট মে ঠিক করে দেঙ্গে,' এ ধরনের দায়িত্বহীন উক্তি করেছিলেন নিয়াজী। করবেনই তিনি, কেননা সে মেধাই তাঁর ছিল না। আমি এ মন্তব্যের জন্য দুঃখিত। আমি নিজেও অতি সাধারণ একজন সৈনিক। সেই আমার মূল্যায়নেও নিয়াজী একজন ভাল যোদ্ধা, আঘাত হানা, সাহসিকতা দেখানো ইত্যাদির জন্য। তবে জটিল সমস্যার সঙ্গে পাল্লা দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আপনারা জানেন, একজন সামরিক অধিনায়কের জন্য এমন সামরিক কম্যান্ডের মুহূর্ত আসে যখন তাঁকে সামরিক অধিনায়কেরও উর্ধে উঠে কাজ করতে হয়। তিনি তখন আর সমরনায়ক থাকেন না। আইসেন হাওয়ারের কথাই ভাবুন। তিনি বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি তখন কেবলমাত্র সমর অধিনায়ক ছিলেন না। তাঁকে বহু দেশ ও জাতিকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল, বহু সমস্যাও দেখতে হচ্ছিল। তাঁর শতকরা ৯০ ভাগ কাজই ছিল অসামরিক।

সেনাসংগঠন হয়ত একটা পরিকল্পনা করে দিয়েছে এবং কার্যক্ষেত্রে অবস্থা অনুযায়ীই চলে সব। ঐ রকম পরিস্থিতিতে কেউ কম্যান্ড দেবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে গেলে, এমনকি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও তাঁকে ঐ মেধার হলে চলবে না। তাঁকে হতে হবে ঋজু চরিত্রের টাইগার, ঠাণ্ডা মাথার লোক। তাঁকে বলা হয় টাইগার, বাঘ, কিন্তু আমরা খোলা চোখে তেমন কিছুই আমি দেখি না, তাঁর মতো লোক ঐ জায়গায় একেবারেই বেমানান। আমি তাঁর সামরিক সামর্থ্যের সমালোচনা করছি না। রণক্ষেত্রে আমি আমার দুশমনের ব্যাপারে ধূর্ত, শয়তান হতে পারি, কিন্তু কেউ তাঁর নিজের লোকের বেলায় এমন হতে পারে না। অনেক

জিনিস সমাধান করতে হয় অত্যন্ত সতর্কভাবে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। আমি এ সম্পর্কে একটা লেখা দেব আপনাদেরকে। আমি আপনাদের বলতে চাই, সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল না। আমি এ জন্য সুনির্দিষ্ট করে কারও নাম নেব না। আমি মনে করি, কার্যত প্রায় প্রত্যেকেই এতে অবদান যুগিয়েছে, জেনে না জেনে, তা সবাই কমবেশি এ জন্য দায়ী। একাত্তরে যা ঘটেছে তা শুধু একাত্তরেরই ব্যাপার নয়। আমি একেবারে গোড়া থেকেই বলেছি, ভারতের মতলব ছিল, মতলব ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করে দিতে হবে; আর সে জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে...

◆ মাফ করবেন, আমার প্রশ্ন রয়েছে। আপনি বলছেন, ভারত সব সময় পাকিস্তানকে ভাঙতে চেয়েছে। আবার বলছেন, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ছিল বিরাট বৈষম্য। এ জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল আর তারই পরিণতি ১৯৬৯। তাহলে এ দুয়ের মধ্যে আপনি সম্পর্ক তৈরি করছেন কীভাবে? আসলে তো এ দু'টি পরস্পরবিরোধী বিষয়!

∆ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী মহলও ছিল...

◆ বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানীরা অসন্তুষ্ট ছিল।

∆ ঠিক।

◆ তাই তারা তাদের সঠিক অংশের অধিকার পেতে চেয়েছিল। সে কারণে ঐ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কেন, তাহলে কেন আপনি বলছেন, ভারতের স্বার্থ থাকতে পারে? তাদের বিষয় নয় এটি, এ ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বার্থের বিষয়।

∆ না, তারা এমন কিছু ছিল না যা করেনি।

◆ কেমন করে সেটা?

∆ পূর্ব পাকিস্তানে তখন প্রচারণা চলছিল।

◆ কী ধরনের?

∆ ভারতীয়রা সজাগ ছিল। তারা এও জানত পশ্চিম পাকিস্তান তথা কেন্দ্রীয় সরকার দেশের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার জন্য কাজ করছে। ঠিক এ অবস্থায় একটি লোকের নামে পরিস্থিতি কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে শত উপায়ে শোষণ করা হয়েছে তা নিয়ে লোকজন ছিল সোচ্চার। চাপও ছিল চারদিক থেকে। তখন তাই অনেক কিছুই ঘটছিল। কিছু কৌতূহলোদ্দীপক কথা আমি আপনাদের বলতে চাই। আমি পূর্ব পাকিস্তানকে তেমন নিবিড়ভাবে জানি না। তবু হিন্দুরা যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়, কত শিক্ষক ছিল পূর্ব পাকিস্তানে? খুব একটা সংখ্যা তাঁদের কমেনি, কেন? ব্যাপারটা শুধুই কি কাকতালীয়?

◆ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন হিন্দু শিক্ষকরা পশ্চিমবঙ্গে দেশত্যাগ করে যায়নি?

∆ গিয়েছিল। কিন্তু আমার কথা হলো, এত বিপুল সংখ্যায় তারা থেকেও গেল!

◆ মোটেও তা নয়। আমরা তো তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ, ও পরিসংখ্যান তো আমার জানা। কিন্তু আপনি বলছেন... সে যাক, জিজ্ঞাসা করি আপনি তো একজন একাডেমিক

ব্যক্তিত্ব। আপনার মননের বিচারেই এ ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া উচিত। আপনি বলতে চান, এখানে একটা প্রচারণা আছে বা এ রকম কিছু চলছে। আর পূর্ব পাকিস্তানের অভিযোগের কথা যারা তুলছে বা এসবের যারা প্রবক্তা তারা ভারতীয়দের দ্বারা প্রভাবিত।

Δ সবাই নয়। তবে তাদের মহলের ভিতরের কিছু লোক...

◆ তো তাহলে ঠিক আছে...

Δ আমি শুধু সাধারণ একটা

◆ আমাদের বলা শুধু আপনি প্রশ্ন তুলেছেন বলে। প্রফেসর রেহমান সোবহানের কথা আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই। তিনি বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর জামাতা। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তরুণ অর্থনীতিবিদ হিসাবে এক অর্থনৈতিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এই বৈষম্যের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। আর তাই সেই আলোকে বৈষম্যের বিষয়টি পরিকল্পনা কমিটির বৈঠকে উত্থাপিত হয়।

Δ আমি ওটা জানি।

◆ জ্বি হ্যাঁ, এসব দলিলপত্রেই রয়েছে। রয়েছে সাহিত্যেও, কাব্যে, রয়েছে তাতে বৈষম্যের একটি বিরাট ফিরিস্তি!

Δ তবে আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, এই বৈষম্য দূর করার প্রয়াস অনেকখানি এগিয়েছিল, কম অংশীদারির অনুভূতিও কমে আসছিল আর তেমন অবস্থায় যদি বলা হয় ভারত সুযোগ নেয়নি শতেক উপায়ে, আমার কী বলার আমার জানা নেই।

◆ আমাদের বঞ্চনা কী, তা কারও না বোঝার কথা নয়, আমরা যা নই, মানে আমি বলতে চাই...

Δ আমি সে কথা বলিওনি যে ভারতই শুধু করেছে। আমার প্রতিপাদ্য ছিল, ভারত অপেক্ষায় ছিল অনুকূল পরিস্থিতির। পাকিস্তানে এত বিশৃঙ্খলা, এত দুর্যোগ যখন এলো তখনই কেবল ওরা ভাবল, এটাই আঘাতের মাহেন্দ্রক্ষণ!

◆ ঠিক আছে। আপনি যা বলতে চাচ্ছেন তা সবই ঠিক। কিন্তু আমরা আসলে যা বলতে চেষ্টা করেছি তা হলো, আপনি যে সব যুক্তি খাড়া করছেন, রাও ফরমান আলীও কমবেশি সেসব যুক্তিই দিয়েছেন। তিনিও বলার চেষ্টা করেছেন যে, হিন্দু শিক্ষকরাই নাটের গুরু, এমনকি আপনি তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কেও বলেছেন...

Δ আমি এত কিছু জানি না। ওটা ইয়াহিয়ার ব্যাপার, আর আমার পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে, বাংলাদেশ সম্পর্কে, ওসমানী সম্পর্কে, গোটা নির্বাচন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো এই যে, আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ এসব সমস্যা সুরাহার চেষ্টা করেনি, আর কেউ করে থাকলেও তা দায়সারা ধরনের। একবার ইয়াহিয়া সাতজন বাঙালী অফিসারকে এক সাথে পদোন্নতি দেন। সেটা একদিনেই ঘটে। তাতে প্রতিক্রিয়া হয় একান্ত বিপরীত। কেউ সারাটা সময় কাজ করে না, হুঁকা টানে, তাদের গাত্রদাহ ঘটে। আমি প্রতিবাদ জানাই। বলি, ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেছে! সাতজন লোককে তুলে নিয়ে প্রমোশন একেবারে ফুল

সেক্রেটারি হিসাবে? এ রকম একটা ভাবসাব। আসলে এর ব্যাখ্যা শুধু এই হতে পারে যে, নিজের ভাল এমন কিছু হলেও অনেকের তা পছন্দ হয় না।

◆ আমরা তো দেখছি, আপনি এসব ভালই জানেন, তাহলে কেন আপনি ভারতীয় জুজু চোখে দেখেন? আপনি এর কারণ কী কী তা বলবেন?

▲ অবশ্যই, আমার হিসাবে ইতোমধ্যে ২৫টা বছর পার হয়েছে। সাহিত্যের একটা প্রভাব পড়েছে। ওটার প্রভাব তখন থেকেই পড়তে শুরু করেছিল। রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে বলার কিছুই নেই। তবে তাঁকে তুলে ধরা হচ্ছিল পরম শুভ হিসাবে। এই ঠাকুরকে সাগরপারে, বিদেশেও ওঠানো হচ্ছিল। আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাজটা হীন, নোংরা। গোড়ায় নমঃ নমঃ সূচনা, সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো—যে সাফল্য এর আগে আর কখনও আসেনি। এমন ঘটনা নিত্য আমার সামনে ঘটেছে, আমার সামনে মারমুখী হয়ে বলেছেন, সাহেব আমরা বাঙালী। আর আমি জানি আমি মুসলিম। আমার নাম দেয়া হয়েছে দূরদেশী আরবী বীরদের নামে। এসব ব্যাপার বহুদিন ঘটতে পারেনি। অবস্থা ছিল টাইট, নিশ্ছিদ্র। সাহিত্যের লেনদেন হবে—তাতে আপত্তির কী আছে! তবে কোন চক্রান্ত, কোন পরিকল্পনা একদিনে ফলে না, ওরাও তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি রাতারাতি। ওরা কেবল আমাদের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসেছে। আমার মূল বক্তব্য এটিই। ওরা আমাদের দুর্বলতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে, আমরা যখন ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছি তখনই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে—লোহা গরম হয়েছে ঠিকমতো, এখনই আঘাত হানার সময়।

◆ আপনি কি মনে করেন, সাধারণভাবে পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা পাকিস্তানের প্রতি কখনও অনুগত নয়?

▲ এটা ঢালাওভাবে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে কিছু লোক তো খেলায় থাকে, সবাই নয়। দেখুন, আজকাল দালাল বানাতে পয়সা হলেই হয়, তবে যাদের তা বানানো হবে তাদের মনন বা মানসিকতা যদি অনুকূল থাকে কাজটা শতেক উপায়ে করা সহজ হয়ে পড়ে। আমি একটা নজির দেব। এক গুরুত্বহীন লোক ফতুয়া, পাঞ্জাবি পরত, সে লিখল, আমি একজন কমিউনিস্ট, পুরনো কথাই পাড়ছি আপনাদের কাছে। সে কোন চর ছিল না তখন। যা হোক, তার কথার যাদুকরী মাদক প্রভাবে লোকজন তাকে প্রচুর চাঁদা দিল। লোকটার ছিল একটি মোটর সাইকেল, হাঁকালো মোটরকার আর তারপর—হয়ে গেল মহা কমিউনিস্ট! আর এভাবেই তো সব ঘটে। এমন অনেক বিভ্রান্ত, বিচ্যুত ব্যক্তি আছে, তাই বলে সে যে পাকিস্তান ভেঙে খান খান করতে চায় এমন নয়। তাকে উস্কে তোলা হয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে। ভাষা বিরোধকেও এরকম মিহি চালে কাজে লাগানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল দ্বিভাষিক রাষ্ট্র হবে, তাতেও কাজ হলো না, সর্বাধিক সমালোচনা এলো ভারতের দিক থেকে। ভারত সুযোগ নিতে থাকল। আমরা সমালোচনায় মুখর হলাম, একে অন্যের বিরুদ্ধে, বাঙালীরা উর্দু নিচ্ছে না কেন,... তবে এ সিদ্ধান্ত এক পর্যায়ে হলো দ্বিভাষিক রাষ্ট্র হবে। যা হোক আমরা তখন একাধিক জিনিস নিয়ে একের পর এক ভুল করছিলামও আর ভারত তার ফায়দা তুলছিল। আজকে তাদের লক্ষ্য হলো পাকিস্তানকে ভাঙা নয়, বাংলাদেশকেও নয়। তারা এটুকু নিশ্চিত করতে চায় আপনি তাদের লাইনে থাকুন, আর তারা হবে এই অঞ্চলে সিদ্ধান্ত নেবার মালিক। আমি অবশ্য নিজে ভারতের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের পক্ষে।

তাহেরা মাযহার আলী

[তাহেরা মাযহার আলী ডেমোক্র্যাটিক উইমেন্স এ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী ও উইমেন্স এ্যাকশন ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া তিনি ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল ও উইমেন্স ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনেরও সদস্য। তাঁর অন্য পরিচয় পাকিস্তানের একসময় অন্যতম সাংবাদিক, 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক মাযহার আলীর স্ত্রী ও বিশ শতকের ষাট দশকের অন্যতম ছাত্রনেতা তারেক আলীর মা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে যে ক'জন প্রকাশ্যে বাংলাদেশ আন্দোলন সমর্থন করেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পাকিস্তানের অন্যতম প্রগতিশীল মহিলা সক্রিয় কর্মী তাহেরা মাযহার আলীর এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় লাহোরে তাঁর বাসভবনে।]

◆ যেসব কারণে ১৯৭১-এর বিভীষিকার সৃষ্টি আর তাতে আপনাদের নারী সমাজ ও সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া কী তা আপনার জবানিতে জানতে চাচ্ছি।

Δ আপনি যদি মহিলা সমাজের কথা বলেন, তাহলে আমি খোলাখুলিই বলব, লাহোরে আমাদের মতো চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী হাতেগোনা হিসাবে মাত্র ১২/১৩ জন মহিলার মতে যা ঘটেছে তা অন্যায়; জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, কাণ্ডকারখানা চালানো হয়েছে তা অন্যায়। এ বিষয় নিয়ে জনসাধারণের ভেবে দেখতে শুরু করা উচিত। ইয়াহিয়া যখন এ কাজগুলো করেন তখন আমরা লাহোরের মল-এ সমবেত হতে যাই। লোকজন আমাদেরকে ওখানে না যাবার পরামর্শ দেয়। তবু আমরা মাত্র ৯ জন সেখানে যাই। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, ৭ মহিলা ছিলেন আমাদের সংগঠনের, যাঁদের বসবাস শ্রমিক শ্রেণীর বস্তি এলাকায়। তাঁদের কেউ কেউ ঐ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এই ভাষায় "আবার জব কিসি বাঙালী আরাত কা... খুলতা হায় আওর ফুল গিরতা হায় তো হামারি দিল...।' এ হলো এক তথাকথিত নিরক্ষর মজুরী নারীর ভাষণ, যার বাস ছিল আমাদের মহল্লায়। অথচ পরিতাপের বিষয়, যেসব মহিলার কুইন মেরি

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

কলেজের শিক্ষা রয়েছে, যারা সমাজের উঁচু তলার কুলীন শ্রেণীর মহিলা তাদের এ বিষয়ে বক্তব্য ছিল একেবারেই ভিন্ন। তাদের আলোচনার, বক্তব্যের বিষয়বস্তু প্রায় অবিশ্বাস্য! তাদের প্রথম কথাই ছিল, "কেয়া হুয়া?" তাদের গুঞ্জন-আলাপ চলেছে কফি পার্টিতে হেন-তেন নানা বিষয়ে আর সেসব আলোচনা, বলাবাহুল্য, রীতিমতো অসহ্য। আর সেখানে আমাদের কেউ হাজির হলে ওদেরকে বলতে শোনা যেত, "ও তরফের লোকজন এসে পড়েছে।" ওরা বলেছে, "আমরা নাকি বিজাতীয়, দেশকে ভালবাসি না।" দেখুন ওদের পাকিস্তান নিয়ে কথাবার্তার বস্তু হলো একটাই, যা আপনাদের অবশ্যই জানা দরকার। সে জিনিসটি হলো, কেউ সত্য কথা বললেই, বিশ্বস্ততা রক্ষা করে কথা বললেই তাকে দেশবৈরী বলে নিন্দা করা হয়। কারণ এ দেশে শুধু সরকারই ঠিক করে কে দেশপ্রেমিক, কে দেশপ্রেমিক নয়। এখানে জনগণের কোন এখতিয়ার নেই। কেননা ওদের সকলের কথা হলো, আপনি যদি সরকারের বিরুদ্ধে বলেন আপনি দেশপ্রেমিক নন। সে সময় সবকিছুর বিচার-বিবেচনার মানদণ্ড ছিল এ রকম। ঐ সময়টায় লোকজন বাংলাদেশ তথা পূর্ব বাংলাকে নিয়ে নানা আলোচনা করত। আমার মনে আছে ভুট্টোর প্রথম বক্তৃতার কথা। আমি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভাটি বেশ বড় আকারের। তিনি বলেছিলেন, জাতীয় পরিষদের বৈঠকের জন্য যে-ই পূর্ব পাকিস্তানে যাবে তার ঠ্যাং ভেঙে দেয়া হবে। এ কথাগুলো মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী-কে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছিল। কেননা সম্ভবত তিনি বলেছিলেন, ওখানে আমাদের যাওয়া উচিত কেননা ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট রাজনৈতিক দলগুলো ঢাকায় যাচ্ছিল। তাই কথাগুলোর লক্ষ্য ছিলেন মাহমুদ আলী কাসুরী, যিনি ঠিক ভুট্টোর পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার কাছে ঐ কথাগুলো একান্তই বেখাপ্পা, অদ্ভুত মনে হয়েছিল। লোকটা এমন সব কথা কীভাবে বলতে পারে! তবে আমি এ-ও বেশ বুঝতে পারি, মাহমুদ কাসুরীই মূল কারণ নয় বরং ভুট্টো এসব বোলচালের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গেই সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সময়ে সেনাবাহিনীর মনের কথাই বলেছিলেন, আমি মনে করি না, তিনি এমন বোকা, বিশ্বাস করতেন না ঐ খেলায়। খেলাটা কিছুকাল ধরেই চলছিল। এ খেলার নাম সমতা বা প্যারিটির খেলা। পূর্ব পাকিস্তানের লোকজন ক্ষমতার ভাগ নেবে—এটা এখানকার লোকজনের সহ্য হচ্ছিল না। অথচ ভাববার বিষয়, পূর্ব পাকিস্তান ক্ষমতার ভাগ কেন নেবে না? তারা তো পাকিস্তানেরই অংশ। তাদের এ সবে সব রকমের অধিকার তো আছে। আমার মনে পড়ে, প্রথমবার যখন আমাদেরকে জেলে পাঠানো হয় তখন আমাদের ক্ষমা চাইতে বলা হয় এ কারণে যে আমরা দাবি করেছি, সেনাবাহিনীর অভিযান বা কার্যব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, অবিলম্বে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। এ সব কথা বলা তখনকার সময়ের জন্য ছিল খুবই ভয়ানক ব্যাপার। আর তাই আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। আমাদের প্রায় সকলেই ছিল মহিলা। আমাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হয়। আমরা তাতে অস্বীকৃতি জানাই। আমরা বলি, আমরা কেবল প্রশ্নের জবাব দেব। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'কিছুই নয় শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমরা চাই, এখানেই সব কিছুর সমাপ্তি ঘটুক।' আমি বললাম, আমরা আজ যদি এখানে ক্ষমা-ই চাই আমাদের বংশধররা কী বলবে? ওরা আমাদের ক্ষমা করবে? ওরা জানবে আমরা অসত্যের সঙ্গে আপোস করে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি। আমরা ক্ষমা চাইব না। আপনার যা করার করুন।' এ

জন্য আমাদেরকে কয়েকদিনের জন্য আটক রাখা হয়। ঐ সময় মাযহার ছিল *ডন* পত্রিকায়। আমার ধারণা *ডন*-এর সম্পাদকও তখন এ পত্রিকায় যোগ দেয়ার তোড়জোড় করছিলেন বলেই মাযহার ঐ পত্রিকায় যোগ দেয়। কিন্তু আমি জানি, আমার ছেলে তারেক বাংলাদেশে যায় ও সেখানে কয়েকটি মাত্র সভায় কয়েক দফা বক্তৃতাও দেয়। এ নিয়ে কাগজে নানা ব্যঙ্গচিত্রও ছাপা হয়। সে জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশের পক্ষে কলমও ধরেছিল। এভাবে সে বাংলাদেশের, বাংলাদেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও রাখত। কিন্তু তখনকার সময়ে বাংলাদেশের লোকজন মনে করত যে, সে পাকিস্তানের লোক। তাই তারা বলত, 'আমরা তোমাকে আমাদের দেশে আসতে দেব না।' ১০ বছর এভাবে তাকে বাংলাদেশে যেতে দেয়া হয়নি। প্রায় সাত বছর আগে আমার বাংলাদেশে যাবার সুযোগ হয় একটা সভা উপলক্ষে আর সেটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে আমার প্রথম সফর। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আমায় বলল, 'আরে আপনি তারেকের মা! আপনি আমাদের কাছে স্বাগত!' আমি আমার ছেলে তারেকের জন্য খুবই গৌরবান্বিত ও আনন্দিত বোধ করলাম এই ভেবে যে, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ এখন জানে কারা তাদের সঙ্গে রয়েছে, কারা নেই। এরপর আমরা শহীদ স্মৃতিসৌধে যাই। সেখানে আমরা পরম লজ্জাবোধ করতে থাকি। বাংলাদেশে আমি তখন এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করি যে, তখন বাংলাদেশে কী সব ঘটে যাচ্ছিল, আমাদের বোনদের ভাগ্যে কী ঘটছিল পাকিস্তানের মানুষ তার আসল কোন খবরই পায়নি। এরপর বাংলাদেশের অনেক ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু প্রায় সবাই দেখা গেল অতীতের আলোচনায় আড়ষ্টবোধ করছে এই ভেবে যে, আলোচনা হয়ত বা ঠিক হবে না, কেননা সে এক কদর্য ইতিহাস। ওরা তাই মুখ খুলল না। তবে এক মহিলা আমায় বললেন, 'তাহেরা, তখন আমি সন্তান সম্ভবা। সেই আমাকে লম্বা ১৫০ মাইল পাড়ি দিতে হয়েছে সীমান্তে পৌঁছতে। আমি সীমান্তের ওপারে পৌঁছে পড়ে যাই ও আমার পেটের সন্তানটি মারা যায়।' এসব ঘটনা ঘটেছে। এগুলো উপলব্ধি করতে হবে। আর আমি আপনাদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করতে চাই যে, পাকিস্তানের কিছু লোক অবশ্যই মর্মান্তিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করেছে। পাকিস্তানের যারা দেশের দুই অংশের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে না তাদের কথা আলাদা, তবে আর সবাই বুঝত পাকিস্তানকে এক রাখতে হলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা দরকার ছিল। ঠিক এমনি এক সময়ে আমার ছেলে ন্যায়ের সপক্ষে কথা বলেছে, এ এক বড় গৌরবের কথা। আমার স্বামী মাযহার ঐ সময়ে *ডন* পত্রিকায় ১২টি নিবন্ধ লেখে বাংলাদেশে কী কী অন্যায় চলছে সে সম্পর্কে। আমি অবশ্য ঐসব নিবন্ধের একটাও পাইনি। নিবন্ধগুলো সত্যি চমৎকার হয়েছিল। আমার ধারণা *ডন* অফিসে খুঁজলে নিবন্ধগুলো পাওয়া যাবে। নিবন্ধগুলো ১৯৭০-এর বাংলাদেশের অনুকূলে লেখা হয়। এ সময় ভুট্টো মাহমুদ হারুনকে বলেন মাযহারকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে। তিনি বলেছিলেন, বেতন ২০০-২০০০ যা-ই হোক ও নিয়ে কিছু ভেব না। লোকটা আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। ওরা তা ভাবেওনি, একথা আমাকে অবশ্য বলতে হচ্ছে। তাই মাযহার যখন এ সব নিবন্ধ লেখে তখন *ডন* কর্তৃপক্ষ তাকে বলেনি যে, 'তুমি লিখো না।' নিবন্ধগুলো লেখা ও প্রকাশের পর ভুট্টো বলেছিলেন, 'সেনাবাহিনী এ নিয়ে অসন্তুষ্ট। কাজেই আমি যা বলেছিলাম সেটা জলদি করুন।'

◆ **১৯৭১-এ সংবাদপত্রেরর ভূমিকা কী ছিল?**

∆ বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকা যা করার তাই করেছে। এদের প্রায় সবাই সেনাবাহিনীকে সমর্থন জানায়। তবে সংবাদপত্রের একটি ভূমিকা ছিল। সংবাদপত্র বলছিল গণতন্ত্রের কথা। যদিও সবাই বলছিল, গণতন্ত্র তো রয়েছেই। এই সংবাদপত্র বা সংবাদক্ষেত্র হলো সেই সংবাদক্ষেত্র যার প্রতিনিধিত্বশীল *পাকিস্তান টাইমস*-এর নিয়ন্ত্রণ সরকারী হাতে তুলে নিয়েছিলেন আইয়ুব খান। তখন প্রতিটি সংবাদপত্র *পাকিস্তান টাইমস*-এর প্রকাশনা বন্ধ করার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল—একে মহাপদক্ষেপ বলে। আমি সুযোগ পেলেই বিষয়টির উল্লেখ করি। আমি বলি, আমাদের সংবাদপত্র পাকিস্তানে খুবই নোংরা ভূমিকা পালন করেছে। তারা পাঞ্জাবকে এমন ধারণা দিয়েছে যে, আমরা পাঞ্জাবীরা পাকিস্তানের ঠিকাদারী নিয়েছি। আমরা সেইসব লোক যারা কে দেশপ্রেমিক আর কে দেশপ্রেমিক নয় তা ঠিক করব। তাই যখন পাকিস্তানের জন্ম হয় তখন যে প্রদেশকে তাদের ভাষায় কথা বলার জন্য নিন্দা জানানো হয় তা হলো পাঞ্জাব। বলা হয়, এ লোকগুলো পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে। ওরা ভারতের। আমাদের কথা বলা উচিত উর্দুতে। পাঞ্জাবের লোক বলেছিল তাদের মাতৃভাষা উর্দু। যা সত্য নয়। খোদ পাঞ্জাবে পাঞ্জাবীরাই এ ধরনের জটিলতার ভুক্তভোগী। যেহেতু কিছু লোক আলিগড়ে এ রকম শিক্ষাকেন্দ্রে লেখাপড়া করেছে সে জন্য উর্দু আমাদের ভাষা। পাঞ্জাবী এখন আবার চালু হতে শুরু করছে। মানুষ এখন পাঞ্জাবীতে কথাবার্তা ও লেখা শুরু করেছে।

◆ **আপনি তো জানেন এখন পাকিস্তানে বিতর্ক চলছে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া হবে কি হবে না তা নিয়ে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?**

∆ ১৯৭১-এ পাকিস্তান যা করেছে তার জন্য অবশ্যই তার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত বাংলাদেশের কাছে।

এ ম বি ন ক ভী

[এমবি নকভী দীর্ঘকাল ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। নীতিনিষ্ঠ ও সৎ সাংবাদিক হিসাবে পাকিস্তানে তিনি শ্রদ্ধেয়। এক সময় ঢাকার 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন, বর্তমানে পাকিস্তানে কলামনিস্ট হিসাবে বিখ্যাত। তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় করাচীর নাজিমাবাদে তাঁর বাসগৃহে।]

এমবি নকভী : কী দিয়ে শুরু করি?

◆ পূর্ব পাকিস্তানী আর পশ্চিম পাকিস্তানী মানসিকতার পার্থক্য দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়?

∆ পাকিস্তানের সূচনায় পশ্চিম পাকিস্তানে যে নেতৃগোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে তাদেরকে পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী বলাই বোধ করি ঠিক হবে। প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়, পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৫০-এর জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাসের দিনটি থেকেই এ নেতৃগোষ্ঠীর আঁতে ঘা লাগার বিষয়টি স্পষ্ট হতে থাকে। বলা বাহুল্য, পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের প্রভাব ও নেতৃত্ব ছিল সেখানকার মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী জমিদার শ্রেণীর করায়ত্ত। পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদ ও গণপরিষদের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ আইনের অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তারা মনে করতে থাকে যে, বাঙালীরা তাদের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক; কাজেই তাদের ক্ষমতায় আসতে দেয়া যাবে না।

◆ এ মানসিকতার পটভূমি কী?

∆ পাকিস্তানী রাজনীতিতে এ ছিল এক রূঢ় বাস্তবতা। এ সময়টায় পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী ছিল একটি ক্ষুদ্র অভিজাত কোটারি, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই হলো সবচেয়ে বড় ভূস্বামী। এরা তাদের জমিদারী পেয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আনুগত্য ও খিদমতগারীর ইনাম হিসাবে। তারা ইংরেজ আমলা ও জেনারেলদের পছন্দের লোক। স্বভাবতই প্রভুপ্রিয় এ ভূস্বামীরা তাদের স্বার্থ রক্ষায় ব্রিটিশ মডেলের আমলাদের

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

ঘাড়ে সওয়ার হয়। তাদেরকে মন্ত্রণাদাতা হিসাবে গ্রহণ করে। এদের প্রায় সবাই ছিল নিজ জমিদারীর অত্যন্ত নির্দয় পরজীবী। এরাই মুসলিম লীগকে কুক্ষিগত করে, আর তারপর সরকার ও খোদ মুসলিম লীগকে তাদেরই বিশ্বস্ত আমলাদের হাতে তুলে দেয়। পাকিস্তানী আমলাতন্ত্র পাকিস্তানী ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক ভূস্বামীদের মতলব বাস্তবায়ন তথা স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে কাজ করেছে। এদিক থেকে সম্পর্কটি অত্যন্ত অদ্ভুত, যদিও ব্যাখ্যাতীত নয়। আমলাতন্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে বরাবরই একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে ভূমিকা প্ল্যাটোনিক পরিভাষায়—রাজনীতিকদের বন্ধু, তাত্ত্বিক ও পথ প্রদর্শকের। পাকিস্তানে সত্যিকার ক্ষমতা এভাবেই মুসলিম লীগের সাইনবোর্ডের আড়ালে আমলাতন্ত্রের সহায়তায় পশ্চিম পাকিস্তানী ভূস্বামী সামন্ত প্রভুদের কুক্ষিগত ছিল। মুসলিম লীগ আইন পরিষদগুলো নিয়ন্ত্রণ করত। এই মুসলিম লীগের পশ্চিম পাকিস্তানী অংশ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানীরা যাতে তাদের ন্যায্য ভূমিকায় না যেতে পারে সে জন্য তারা আমলাদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হয়।

◆ **তাহলে বলতে হয় শুরু থেকেই ভাঙনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল?**

Δ অনেকটা তাই। পাকিস্তানের গোড়ার দিকের ১১ বছরের কথিত 'গণতন্ত্রে' সমস্ত ক্ষমতা প্রধানত একটা আমলা কোটারির হাতের মুঠোয় ছিল। রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন একজন আমলা, যিনি আইন পরিষদগুলোকে ও খোদ সরকারকে ক্রীড়নক হিসাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলিম লীগ নেতাদের মাধ্যমে কিংবা আরও সঠিকভাবে বলা যায়, তাঁরা নিজেরাই কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন ক্ষমতার নেপথ্য প্রভুদের পক্ষে। পাকিস্তানের তৎকালীন জাতীয় রাজনীতিতে পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধি কোন কোন বাঙালী সদস্যকে বরাবরই মতলব সিদ্ধির কাজে লাগানো সম্ভব ছিল, কেননা এই সব বাঙালী নেতার মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক ভেদ-বিভেদ ছিল বিস্তর। এদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক, এইচ এস সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমউদ্দিন প্রমুখ। বাঙালী রাজনীতিকদের এই অংশের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল অত্যন্ত ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত। তবু এদের মাঝে বিরল ঐক্য কখনও সম্ভব হলে দেখা গেছে পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিকরা বাহ্যত হলেও জয়ী হয়েছেন।

◆ **বাঙালীরা কখন পশ্চিম পাকিস্তানের এই মানসিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে?**

Δ ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান নিবাসী হিসাবে আমার যদ্দূর মনে পড়ে '৬০-এর দশকে জেনারেল আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের পর বাঙালীদের এ রকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাদের আর কখনও রাষ্ট্রক্ষমতায় ন্যায্য অধিকার পাবার বা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অংশীদার হবার সত্যিকার কোন সম্ভাবনা নেই। দেশে স্বাভাবিক অবাধ গণতন্ত্রের আর কোন সুযোগ তাদের রইল না। পশ্চিম পাকিস্তানীরা দেশ শাসনে তাদেরকে অংশ নিতে দেবে না। তাদের এ বিশ্বাসের কারণ, '৫০-এর দশকের মাঝামাঝি 'ওয়ান ইউনিট' তথা প্যারিটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পশ্চিমাঞ্চলে চার প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় একটি প্রদেশ। আর তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। আইয়ুব শাসনতন্ত্র পাস হয়। পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রেও দেশের পূর্বাঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্তান বলেই অভিহিত করা হয়।

ঠিক এ পর্যায়ে পাকিস্তানী ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে শিখণ্ডীয় পালাবদল ঘটে। সিভিলিয়ান আমলাদের ক্ষমতার শ্রেষ্ঠাংশে ভূমিকাভিনয়ের অবসান ঘটে। ওদের জায়গায় রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের দিকে এগিয়ে আসে সামরিক চক্র। পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের তাৎপর্য নানা জনের চোখে নানা তাৎপর্যে প্রতিভাত। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে এ ছিল পাকিস্তানের কথিত ক্ষমতা কোটারিতে আরও বিবর্তন। এতদিন পাকিস্তানে ক্ষমতার অনুশীলনে আমলাদের সহায়ক ছিল সামরিক বাহিনী। আমলারা সত্যিকার ক্ষমতা পরিচালনায় সর্বেসর্বা থেকে যাবে—এটি জেনারেলদের আর তেমন মনঃপূত হচ্ছিল না। কারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন করতে তাঁদের ব্যবহার করা হবে, তাঁদের কব্জির জোরে ভর করে আমলারা দেশ চালাবেন তা হয় না। তাঁরাই এখন থেকে দেশ চালাবেন। বাঙালী মন-মানসে এর প্রতিক্রিয়া ছিল এক একক ও অনিবার্য এবং বৈশিষ্ট্যময়।

◆ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিষয়ে বিরোধিতা কখন সোচ্চার হতে থাকে বলে আপনার মনে হয়?

▲ পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ সুনির্দিষ্ট অর্থে পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটের সূচনা ঘটায়। ১৯৬৫ অবধি এ সঙ্কট ক্রমেই ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে। ঐ বছরই নভেম্বরে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশনে নুরুল আমিন যে ভাষণ দেন তা থেকে যে কারও চোখে দেশের দুই অংশের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকা এক ধরনের অচলায়তন মোটেও চোখে না পড়ার কথা নয়। নুরুল আমিনের সে ভাষণে প্রতিরক্ষাহীন ও ভারতের করুণানির্ভর পূর্ব পাকিস্তানের করুণ অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছিল। তখন ভারতকে কেউ ঠেকানোর ছিল না, চাইলেই সে ছোঁ মেরে গিলে ফেলতে পারত পূর্ব পাকিস্তানকে। অথচ তেমন এক সঙ্কট সন্ধিক্ষণে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ছিল নির্বিকার। তাদের কোনরকম চিত্তচাঞ্চল্যই চোখে পড়েনি। তখন বোধকরি বাগাড়ম্বরেই বলা হয়েছিল, চীনের সুবাদে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।

অর্থনৈতিক ভাবনার বেলাতেও এ সময়ে বড় রকমের ব্যবধান দেখা দেয়। দেশের ৩য় পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক ও সংঘাত দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানী প্যানেলের এক দল অর্থনীতিবিদ ঐ সময় অভিযোগ তোলেন যে, পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা হচ্ছে। পাট খাতে পূর্ব পাকিস্তানের উপার্জিত অর্থে ফেডারেল রাজধানী করাচীকে গড়ে তোলা হয়েছে। তাঁদের হিসাব মতে, পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে পূর্ব পাকিস্তান ৩০০০ কোটি টাকা পাওয়ার হকদার। সাংবাদিক হিসাবে আমি যদ্দূর জানি, কামরুল ইসলাম, এমএম আহমদ, মাহবুবুল হক প্রমুখ পরিকল্পনা কর্মকর্তা, যাঁরা ঐ সময় তুলনামূলকভাবে জুনিয়র ও দ্বিতীয় সারির লোক, তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে, ৩য় পরিকল্পনা আমল থেকে পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নীট ১০০ কোটি টাকার (পাকিস্তানী রুপী) সম্পদ স্থানান্তর করা হবে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবার কথা থাকলেও তা কখনও হয়নি।

এর নেপথ্যে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। এখানে সে বিশদ ইতিহাস অবতারণার অবকাশ না থাকলেও আমার বলার উদ্দেশ্যও এটুকুই যে, পূর্ব পাকিস্তানকে ছেঁটে দেবার একটা নিজস্ব

পরিকল্পনা পশ্চিম পাকিস্তানীরা তৈরি করেছিল। আর সেটির পক্ষে খোলাখুলি ওকালতিও শুরু করেছিল তারা। 'ওকালতি' শব্দটিই আমি ব্যবহার করছি, কেননা পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের কিছু সদস্য ও আমলাতন্ত্রের নেতা বলা শুরু করেন, 'পূর্ব পাকিস্তান তো আমাদের কাঁধে বোঝা হতে চলেছে।' কাজেই তাঁদের ওকালতি তথা যুক্তি হলো, 'আমাদেরকে এখন পূর্ববঙ্গ থেকে রেহাই পেতে হবে।'

◆ **অর্থাৎ আমরা আরও অনেকের কাছে যে লায়াবিলিটি তত্ত্ব শুনেছি তা সত্য। তাহলে নিশ্চিত ধরে নেয়া যায় যে ১৯৭১-এর পটভূমিকা তখনই নির্মিত হচ্ছিল?**

Δ বস্তুত এ সবই একাত্তরের বিভীষিকাকে ডেকে আনে। ওটা আসমান থেকে নাজেল হয়নি। আমলাতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের গদিনসীন সেনাবাহিনীর শীর্ষ নেতারা স্থির করেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা খুবই বেড়ে যাচ্ছে, ওরা বোঝা হয়ে উঠবে। তাই পরিস্থিতি অনুকূলে পেলে 'পূর্ববঙ্গকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।' হুবহু এ রকম ধারণা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ সাংবাদিক ও সরকারী মহলে। ওদের ধারণা জন্মায়, 'পূর্ব পাকিস্তানের উপচে পড়া লোকজন এসে পাকিস্তানকে ভাসিয়ে দেবে, আর কেন্দ্রে সরকারের ক্ষমতাও দখল করবে। আর আমরা উদ্বৃত্ত যা-ই তৈরি করি না কেন তার সবই ওরা সাবাড় করে দেবে।'

তখন এ রকম যে একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা তৈরি করা হয়েছিল তার সপক্ষে এখানে আমি দু' তিনটি দৃষ্টান্ত দেব। '৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্যের কোন কোন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন, কৃষিতে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অত্যন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার এক অর্থনীতিবিদ পূর্ব পাকিস্তানে সকল আধুনিক উৎপাদন শিল্প কেন্দ্রীভূত করার ও পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষির উন্নয়নে সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগের পরামর্শ দেন। এর আগে '৫০-এর দশকের গোড়ায় ব্রিটেনের এক লর্ড পাকিস্তানে উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়ে এসে বলেন, প্রথম তিন বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করা যায়। এর পর দীর্ঘমেয়াদে আরও বেশি গুণ উৎপাদন করা যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (ব্রিটিশ আমলের সাবেক জাঁদরেল আমলা ও অর্থবিশারদ) চৌধুরী মোহাম্মদ আলী আমার সহকর্মী ও বন্ধু নাজিউল্লাকে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প কারখানা কী জন্য? ওটা তো একদিন সটকে পড়বেই। শিল্পকারখানা থাকবে এখানে—পশ্চিম পাকিস্তানে। বলা বাহুল্য, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কথাগুলো বলেছিলেন সেই সুদূর ১৯৫৫-তে। আর আমলাদের কথা বলছেন? বহুদিন গত হয়েছে তো—সব নাম মনে না থাকারই কথা। তবে দু'টি নাম আমার এখনও মনে আছে—কামরুল ইসলাম এবং তখনকার পরিকল্পনা সচিব এমএম আহমদ, পরবর্তীকালে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান। তাঁদের মতো আরও লোক ছিল। আইয়ুব খানের 'নওরতন'দের সকলেই ছিল এ চক্রান্তে শামিল। আর আসলেও এ সত্যি অনস্বীকার্য, ধ্রুপদী ধারায় আমলাতন্ত্র বরাবরই একাট্টা হয়েই কাজ করে। এ ছাড়া পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকসেও কয়েক জন ছিলেন যাঁদের দু'একজন আমার বন্ধু বটে।

◆ **শুধু তো অর্থনীতি নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তো পার্থক্য সূচিত হয়েছিল।**

∆ পূর্ব পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরে কথা ওঠার পর থেকে সেখানকার বাঙালীরা পশ্চিম পাকিস্তানী কোটারি স্বার্থের চোখে হয়ে ওঠে বদখত, বৈরী, পয়মালকারী বদলোক, আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা গুণান্বিত, সজ্জন। মুসলিম বাঙালী চরিত্রে কালি মাখানোর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বলা হয়, ওরা হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবদুষ্ট, হিন্দু দূষণাক্রান্ত। তাই ওরা সত্যিকারের মুসলমান নয়। ওদের শিক্ষক হিন্দু। ওরা ওদের ভাষা সংস্কৃতির খুব কাছাকাছি। তাই পাকে-প্রকারে হলেও ওরা নিখুঁত মুসলমান নয়, বড়জোর মন্দ মুসলমান।

বাঙালী মুসলমানের এই যে ভাবমূর্তি, এই যে আদল এর নিখুঁত, নিটোল বয়ান ঠিক কেমন করে করা যায় তা আমার জানা নেই। তবু যে করেই হোক এভাবেই বড়জোর বলার একটা চেষ্টা আমি নিতে পারি, পূর্ব বাংলার বাঙালীরা নিকৃষ্ট মুসলমান, উত্তম মুসলমান নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কোটারি স্বার্থ ওদেরকে এভাবেই ছাঁচে ফেলে বৈরী, কার্যত দুশমন (যদিও সত্যি নয়, আমি তা বলছিও না) জ্ঞান করেছে। অথচ আমি জানি, বাঙালী মুসলমানের এ দানবীকরণের পিছনে কোন সত্যিকারের হেতু নেই। হিন্দুদের সাথে আমাদের বসবাস ছয়-সাত শ' বছরের। মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা হিন্দুদের সঙ্গে থাকবে না। স্বাধীনতায় রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাবার মতো গুণগত পরিবর্তন আসার পর দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দুদের বা হিন্দু এজেন্টদের দ্বারা প্রভাবিত হবার জুজু অর্থহীন, বোগাস! শাসকশ্রেণী এ রকমটা রটিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ রটনায় বাস্তবতা নেই। '৯৬-এ আমার বাংলাদেশে যাবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বিএনপি দলীয় এক সাবেক মন্ত্রীকে তাঁদের দলীয় প্রতিপক্ষকে যে ভাষায় আদ্যশ্রাদ্ধ করতে শুনেছি, হুবহু সে ভাষাই আমি শুনেছিলাম একাত্তরে।

◆ বলা হয়ে থাকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কী ঘটেছিল তা পশ্চিম পাকিস্তানীরা জানত না, কথাটা কি সত্যি?

∆ '৭১-এ পূর্ব বাংলায় আসলে কী ঘটছিল তা পশ্চিম পাকিস্তানীরা জানত না, আর সে কারণে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সেখানে আত্মসমর্পণের খবর শুনে তারা মর্মাহত হয় বলে যে দাবি করা হয় তা সত্যের অপলাপ। পাক সরকারের প্রচারণা যে অলীক কথামালায় ভরা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু এও সত্যি, ট্রানজিস্টর বিপ্লবের ঐ যুগ আর যাই হোক কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগ ছিল না। বিবিসি, অল ইন্ডিয়া রেডিও, রেডিও কাবুল, ইরান তো ছিলই। আসলে সবাই কিছু না কিছু খবর রাখত। পাঞ্জাবী বহু পরিবারের কাছেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে মানি অর্ডার আসত। মানি অর্ডারের প্রেরক সৈনিক-সিপাইটির বেতন সে আমলে বড় জোর ছিল সাকল্যে ৩০০ টাকা। অথচ তারা মাসে দু'বার মানি অর্ডার পাঠাত, প্রতিবার গড়ে ৫/৬শ' টাকা করে। এ টাকা আসত কোত্থেকে? সেনাবাহিনী বা এ ধরনের অন্য বাহিনীর লোকদের ঘুষের টাকা পাওয়ার সুযোগ ছিল না। তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা কিছুই বুঝত না, জানত না—এ কথা কি কেউ নিজ বুকে হাত রেখে দাবি করতে পারবে?

◆ আপনি জানতেন কতটুকু?

∆ '৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে আমার জানা অতি সামান্য। শুধু আমি বহু ছাত্রকে নিখুঁত বর্বরতায় হত্যার বর্ণনাটি আমার জন্যই একান্ত করে রেখে দিতে চাই। এ নিয়ে আমি সবিস্তারে লিখব। এ বর্বরতার ঘটনার মিছিল যেন আমার গোটা বিবেককে তোলপাড়,

তছনছ করে দিয়ে এখনও আমার মনের পর্দায় জীবন্ত হয়ে চলছে। আর বাকি ঘটনা সবার জানা। তারা জানে বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যার জন্য তুলে নেয়ার ঘটনা। এঁদের মাঝে আমার একান্ত বন্ধু শহীদুল্লাহ কায়সার ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাও ছিলেন। আমি শুধু এ কথাই বলি, মানবতার জন্য জঘন্যতম নরক নাজেল হয়েছিল সেদিন বাঙালীদের ওপর। একটা ঘটনা দিয়েই বলি। আমাদের একটি শরণার্থী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে বিহারীদের রাখা হয়েছিল। ওটি একটি সামরিক ইউনিটের আস্তানাও বটে। ঐ ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন এক পাঠান কর্নেল। তিনি বিহারীদের দেখিয়ে আমাদের জানালেন যে, ওরা শরণার্থী। বাঙালী পড়শীরা ওদের কী করেছে সে কাহিনী ওরা জানিয়েছে। তিনি এও জানালেন, তাদের কাহিনীতে মর্মপীড়া তাঁর এতখানি চরমে পৌঁছে যে, তাঁর প্রায় চোখ ফেটে পানি এসে পড়ে। ও কোন একটা গ্রামে গিয়ে নিজেই শোধ তোলার মতো অবস্থায় চলে যান। কী ধরনের ভয়ঙ্কর পাগলামি! একেবারেই বেকসুর, নির্দোষ তাদের ওপর শোধ তোলার দায় তুলে নিচ্ছেন কর্নেল নিজে, গুলি-বৃষ্টি চালিয়ে দিচ্ছেন নিজের বন্দুক নিজ হাতে তুলে নিয়ে!

এ হলো পাক সামরিক বাহিনীর কর্নেলের স্বীকারোক্তি। আরও অনেক কাহিনীই আছে '৭১-কে নিয়ে। তবে সেগুলোতে নতুন যোগ করার মতো কিছু নেই। একটি বিষয়ই তাতে বারংবার পুনরাবৃত্তি হয়। তা হলো বাঙালীদের ওপর খোলাখুলি হামলা। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লোকেরা যাচ্ছেতাই, ন্যক্কারজনক কাজ করেছে। এ বাহিনী ছিল সবচেয়ে বিশৃঙ্খল, কু নেতৃত্বাধীন। তারা যা করেছে তাতে আর যা-ই হোক যুদ্ধ বা লড়াই বলতে যা বোঝায় তার লেশমাত্র ছিল না। যে কোন বিবেচনায় এ বাহিনী ছিল পঙ্কিল, দুর্নীতিগ্রস্ত। লুটেরা এ বাহিনী লুটপাট করে তাবৎ অপরাধে লিপ্ত হয়, নারীধর্ষণও বাদ থাকেনি। এ বিষয়ে তো আমাদের অননুকরণীয় জেনারেলের (টিক্কা খান) ভাষ্য অনুযায়ী 'মাত্র' ৩০০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে পূর্ব পাকিস্তানে!

◆ ১৯৭১-এর জন্য কে দায়ী বলে আপনার মনে হয়?

∆ '৭১-এ কে কী করেছিল, কী হয়েছিল, কে আত্মসমর্পণ করেছিল তা নিয়ে এখন পাকিস্তানে, বিশেষ করে লাহোরে কিছু কিছু বিতর্ক চলছে। তবে এসবে দেখা যায়, শুধু হয় ইয়াহিয়া খান বা জেনারেল নিয়াজী, টিক্কা খান বা ভুট্টো বা আরও কাউকে দোষারোপ করার চেষ্টা চলেছে। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো এই যে, পাকিস্তান হলো আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার এক নিদারুণ জগাখিচুড়ি, যা দেশের লোক-জীবনাচরণ ও নিয়তি নির্ধারণ করেছে। আর এতে নির্ধারক ছিল মূলত নিছক স্বার্থচালিত রাজনীতি। অর্থনৈতিক প্রেষণা মানবীয় বিষয়াবলীকে কতখানি নির্ধারণ করতে পারে এমন বিতর্ক দুনিয়ায় যদি কখনও কোথাও দেখা দেয় তাহলে পাকিস্তানের এসব ঘটনাকে এক মহা নজির হিসাবে দেখানো যাবে। দেশে একটা অনুমান-কল্পনাসর্বস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থই নির্ধারণ করেছে তামাম জিনিস, আর আমাদের কপালে নেমে এসেছে অবর্ণনীয় দুর্গতি।

◆ **পাকিস্তানে বামপন্থীদের ভূমিকা আপনি কীভাবে বিচার করবেন?**

Λ অখণ্ড ব্রিটিশ-ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলের ক্ষুদ্র একাংশ এসেছিল পাকিস্তানে। বামপন্থী কিংবা যাঁরা নিজেদেরকে বামপন্থী ভাবতেন বা মার্কসবাদে প্রভাবিত ছিলেন তাঁদের সংখ্যা নিহায়ত কম ছিল না। অন্ততপক্ষে উর্দু সাহিত্যে বামপন্থীদেরই ছিল একাধিপত্য। ডানপন্থীরা পিছু হটছিল। এ ছিল খোদ পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা। আমি যদ্দূর জানি, দেশের পূর্বাঞ্চলের বামপন্থীরাও অথর্ব, ক্ষমতাহীন কিংবা অনুচ্চার ছিলেন না। বাংলা সাহিত্য তথা পত্র-পত্রিকায় প্রগতিশীল লেখা অত্যন্ত প্রসার লাভ করে, প্রভাবেরও অধিকারী হয়। পূর্ব বাংলায় বামগোষ্ঠীর অস্তিত্ব একেবারে গোড়া থেকেই জনজীবনের এক উল্লেখযোগ্য বাস্তবতা। তবে গূঢ় রহস্যময় কোন না কোন কারণে পাকিস্তানে বামপন্থীদের আচরণ ছিল অত্যন্ত গলদপূর্ণ, ক্লৈব্য। এক ধরনের নপুংসক পৌরুষহীনতায় অংশত এরা আক্রান্ত হয়। পাকিস্তান হয়েছে ইসলামের নামে। আর তাই পাকিস্তানের উত্তরাধিকার মোল্লাদের ওপর বর্তায়, তারাই পাকিস্তান শাসন করবে—তারা এ রকম ভাবতে থাকে জামায়াতী দাবির আলোকে। অবিকল অভিন্ন কারণে পাকিস্তানের বামপন্থীরা নিজেদেরকে অসহায়, বেআব্রু ভাবতে থাকে, কেননা তারা এমন এক দর্শনের ধারক-বাহক যাদের বিরুদ্ধে নাস্তিকতার গুরুতর অভিযোগ খাড়া করা যায়। কাজেই পাকিস্তানে তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারাও রুদ্ধ হয়। এ ছাড়াও পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল ব্রিটিশ-ভারতের গোয়েন্দা পুলিশের এক বিশাল অংশ। পুলিশের এসব গোয়েন্দা, টিকটিকিরা বামপন্থীদের হাড়-মাংস খুবলে নেবার যোগাড় করে, আর '৫০ দশক ও '৬০ দশকের গোড়ার দিকে তারা প্রতিটি বামপন্থী গোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশ করে ও টাকা ছড়ায়। সুপরিকল্পিতভাবে টাকা ও পৃষ্ঠপোষকতা ঢেলে বামপন্থীদের আরও বিভক্ত করে দেয়া হয়। বিভক্তির এই মাদারীর খেলে '৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে কমিনটার্নেও বিভক্তি আসে। ১৯৬৪-৬৫'র দিকে মানুষ এ বিষয়ে স্পষ্টত সচেতন হয়ে ওঠে। আসলেও ১৯৬১-তে তৃতীয় আন্তর্জাতিক (ITU)-এর পর থেকেই এ ভাঙনের শুরু। পরে এ বাস্তবতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষয়টি গোটা বাম আন্দোলনের জন্য ছিল বিপর্যয়কর। পরিস্থিতি হয়ে ওঠে বামপন্থীদের রাজনৈতিক আত্মহত্যার চেয়েও বেশি কিছু।

গ ফু র আ হ ম দ

[গফুর আহমদ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন সদস্য। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের তিনি একজন নীতি নির্ধারক। ১৯৯৮ সালে যখন তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি তখন তিনি ছিলেন ঐ সংগঠনের সহ-সভাপতি। ১৯৭০ সালেও তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। করাচীর লালুক্ষেতে তাঁর বাসগৃহে এই সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।]

◆ আপনিতো ১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তখন আপনার নির্বাচনী এলাকা ছিল কোন্‌টি?

Δ করাচী।

◆ আইয়ুব খানের পতনের পর সেই '৬৯ থেকে শুরু করা যাক। পূর্ব পাকিস্তানের অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকার কথা বলুন।

Δ আমি তো মনে করি তখনকার পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ভিন্ন ছিল না। আইয়ুবের সামরিক আইন জারির পর জামায়াতে ইসলামী ঐ সামরিক আইনের বিরোধিতা করে। আমরা বলেছিলাম, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে চলতে দেয়া উচিত। সামরিক আইন আরোপের বিষয়টি দেশের জন্য আত্মহত্যার শামিল হবে। আইয়ুব খান তাঁর নিজ শাসনতন্ত্র ১৯৬২-তে চাপিয়ে দেন। তারপর তিনি দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। মুহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহ ঐ নির্বাচনে আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু আইয়ুব খানকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। তিনি বুনিয়াদি বা মৌলিক গণতন্ত্রে পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ৮০ হাজার সদস্য এই ব্যবস্থার আওতায় নির্বাচিত হয় আর এদের নিয়ে গঠিত হয় ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্বাচকমণ্ডলী নামে একটি সংস্থা—যার ভোটে নির্বাচিত হবে পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদ ও প্রেসিডেন্ট। এ ব্যবস্থার আওতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও মুহতারিমা ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হন। আইয়ুব খানকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় যদিও জনসাধারণ অভিযোগ করে যে, নির্বাচনে কারচুপি করা হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

এরপর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ গঠিত হয় কিন্তু জনসাধারণ তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা নানাভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ শুরু করে। পাকিস্তানের তৎকালীন উভয় অংশেই অসন্তোষ, ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। গোটা দেশ আইয়ুব খানের বিপক্ষে চলে যায়। আইয়ুবের ধারণা ছিল সেনাবাহিনীর ক্ষমতার বদৌলতে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে সাধারণ নির্বাচনের কোন তারিখ ঘোষণা না করেও নিজের দেয়া শাসনতন্ত্র বাতিল করে, তিনি সেই সময় ক্ষমতা সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে হস্তান্তর করে ক্ষমতা থেকে সরে যান। ইয়াহিয়া খানও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটান। তিনি শাসনতন্ত্র বাতিল করে দেন। সামরিক শাসন আবার জারি করা হয় ও দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। জামায়াতে ইসলামীও এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে। ১৯৭০-এ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এসব নির্বাচনে জন-অসন্তোষ আরও ধূমায়িত হয়ে ওঠে।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে এই সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তিনি পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ঠিক একইভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কার্যত কোন নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেনি, নামমাত্র ২/৩টি আসনে প্রার্থী দেয়া ছাড়া। এভাবে আওয়ামী লীগও মূলত কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। উভয় রাজনৈতিক দলই হয় পূর্ব পাকিস্তান কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের ভিত্তিতে তাদের বক্তব্য দিতে থাকে। আর নির্বাচনে এই দু' দল দেশের এককেটি অংশে জয়ী হয়। এ অবস্থায় আবার সামরিক আইন জারি করা হয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হলো না।

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে পরাজিত হয়। তারা জাতীয় পরিষদের মাত্র ৪টি আসন পেতে সক্ষম হয়। তবু জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল দাবি জানায় যে, অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে হবে যাতে করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু ও শাসনতন্ত্র রচিত হতে পারে। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান এ ধরনের জনমতের তোয়াক্কা না করায় পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ দেখা দেয়। আর ইয়াহিয়া খান আবারও সেনাবাহিনীর দমনমূলক অভিযানের আশ্রয় নেন। ফলে আবার পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ১৯৭১-এ ঢাকার পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্র ক্ষমতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান। তিনি ও তাঁর মিত্ররা পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের শতকরা ৯১টি আসনে জয়ী হন। ভুট্টো নিজেও পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠান স্থগিত রাখেন।

◆ ২৫ মার্চে সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যে দমন অভিযান চালায় সে ব্যাপারে আপনার দলের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

▲ আমরা সবসময়ই মনে করতাম যে, সেনাবাহিনী দেশের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে না। সেনাবাহিনীকে দমনের কাজে লাগানো হলে তা হবে বিপর্যয়কর। আমরা তাই সেনা অভিযানের বিরোধী ছিলাম।

◆ পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হলে এর প্রতিক্রিয়ার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বলা হয়েছিল, "শোকর খোদার কাছে, পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে"—এ সম্পর্কে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী?

▲ উক্তিটি করেছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

◆ তাহলে ওটা ছিল অন্যতম প্রতিক্রিয়া। মানুষের সাধারণ প্রতিক্রিয়া কী ছিল তাহলে?

▲ সাধারণ প্রতিক্রিয়া ছিল এটাই যে, আমরা সেনাবাহিনীর হাতে অনেক দুর্ভোগ ভোগ করেছি, কেননা পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক আইন বলবৎ ছিল প্রায় ২৫ বছর। আমাদের সুদীর্ঘকালের সামরিক আইনের শাসনে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে যা ছিল নিষ্ফল, কিছুই করা হয়নি সে সময়। তাই সবাই জানত সামরিক আইন অকেজো কিংবা সেনাবাহিনীর ব্যবহার নিষ্ফল হয়েছে। আমরাও কিছু করতে পারিনি।

◆ ২৫ মার্চে কী ঘটেছিল তা কি আপনি জানতেন, জানেন?

▲ আমি তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম না। খবরের কাগজ থেকেই যা কিছু জেনেছি। জেনেছি যে সেখানে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে...।

◆ অন্যান্য সূত্রে কি কোন খবর আপনারা পাননি? যেমন ধরুন, আপনাদের পার্টির সূত্রে?

▲ আমরা কিছু কিছু খবর পাচ্ছিলাম, তবে সেগুলো বিশ্বাস করা বেশ কঠিন ছিল। তবে আমার ধারণা, ঐ সময় কিছু চরমপন্থী তৎপর হয়ে ওঠে। আর তাতে ভারতেরও মদদ ছিল।

◆ এ চরমপন্থীরা আপনার মতে কারা?

▲ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের লোকজনের মধ্যেই তারা ছিল। আমার বিশ্বাস ওরা অমুসলিম সম্প্রদায়েরই লোক। ভারতের হাতও ছিল। কেননা আজ অবধি ভারত পাকিস্তানকে মেনে নিতে পারেনি। আর তাই তারা বরাবর পাকিস্তানকে বরবাদ করার চেষ্টা করে এসেছে। আর পূর্ব পাকিস্তানের ঐ পরিস্থিতি তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়।

◆ সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে মানুষ মারতে নেমেছিল সে খবর কি আপনারা জানতেন? আপনারা কি জানতেন ওরা নারী ও শিশুদের হত্যা করেছে?

▲ জানতাম। আর বিষয়টি আমাদের কাছে নতুন কিছু ছিল না।

◆ সাধারণ মানুষকে হত্যা করার জন্য সামরিক বাহিনীর এই পরিকল্পনা ২৫ বছরের ইতিহাসে এর আগে আর কখনও ছিল না, আপনি কী বলেন এ ব্যাপারে?

▲ দেখুন, আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবার আগে সেনাবাহিনী ২৫ বছর পাকিস্তান শাসন করেছে। তারা অবশ্যই কঠোর হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে।

◆ আর আসলেও দুনিয়ার সব সেনাবাহিনী সেভাবেই সবকিছু করে!

▲ ঠিকই বলেছেন আপনি, তারা শক্তি দিয়ে অনুভূতি দমন করতে চেয়েছিল।

◆ তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অনুভূতির কথা জানতেন?

∆ দেখুন, আমি আপনাকে তো বলেছি, পাকিস্তানী সূত্র ছাড়া অন্য কোন উৎস বা সূত্র থেকে কোন তথ্য পেলে সে তথ্য যে সঠিক এ রকম আস্থা আনা আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। যেমন ভারত যদি বলে যে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে সেটিকে সঠিক তথ্য বলে গ্রহণ করা আমাদের জন্য ছিল খুবই কঠিন। তবে পূর্ব পাকিস্তানে যা করা হয়েছে আমরা তার সমর্থন করিনি। আমরা বলেছিলাম, সমস্যা থাকলে তার সমাধান হতে হবে রাজনৈতিকভাবে।

◆ সেনাবাহিনী যা করেছে সে ব্যাপারে আপনারা কি কোন ঘরোয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন?

∆ সেই সময় জামায়াতে ইসলামী পার্টি ছিল একটি অভিন্ন দল—তখন কোন আলাদা পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী পার্টি ছিল না। আমি বলতে চাই তখন ছিল সম্ভবত জামায়াতে ইসলামী পূর্বাঞ্চল কিন্তু দলটি মূলত ছিল একটি পার্টি।

◆ পূর্বাঞ্চলের জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা আপনি জানেন?

∆ এ প্রশ্নের জবাব সম্ভবত আপনি পেতে পারেন যারা ঘটনাস্থলে ছিল তাদের কাছ থেকে।

◆ কিন্তু আমরা ঠিক এ মুহূর্তে আপনাদের প্রতিক্রিয়াই জানতে চাই।

∆ এ ব্যাপারে আমার খোলাখুলি জবাব হলো এই যে, আমরা এ সবের একান্ত বিরোধী ছিলাম। আমি অবশ্য আপনাকে বলেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে অনেক চরমপন্থী ছিল। আমি নিজে পূর্ব পাকিস্তান সফরে গিয়েছি, আর যেসব লোক পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের আমি চিনতাম। আমরা আরও জানতাম যে, ভারত পাকিস্তানকে ভাঙতে চায়। তাই কোন খবর আমরা পেলেও সেটিকে সঠিক তথ্য বলে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল।

◆ আপনি বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী সব সময় সামরিক সরকারের সমালোচনা করেছে, সব সময়... তাই ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা হলো, আমি বলতে চাই, সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে। তাই আমি বলতে চাই, জামায়াতে ইসলামীর নেতা হিসাবে সে ক্ষেত্রে আপনার প্রতিক্রিয়া কী ছিল? কেননা আপনাদের কথামতো আপনারা তো সব সময়ই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ছিলেন?

∆ আমাকে বলতে দিন, আমি আপনাকে বলেছি যে, আওয়ামী লীগ যদি গোটা পাকিস্তানভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দলই হয়ে থাকে তাহলে এ দলটির উচিত ছিল, বাধ্যবাধকতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

◆ তাহলে পিপলস পার্টির ব্যাপারে কী বলবেন আপনি?

∆ আমি সেই একই কথা বলি এ দলের ব্যাপারেও। ওরা ছিল চরমপন্থী। পিপলস পার্টিও পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেনি। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনে অংশ নেয়নি, পশ্চিম পাকিস্তানও তা করেনি পূর্ব পাকিস্তানে। মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি নিয়ে আসেন ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, তিনি পাকিস্তানের দ্বিধাবিভক্তি চান। তিনি বিপ্লবী ইসলামী ধারণার পক্ষপাতী ছিলেন।

◆ সে সময় কি ওটা জানা ছিল?

∆ জানা ছিল ও তার মূল্যও তিনি দিয়েছেন। আমরা পাকিস্তানে ১৯৭৩-এর শাসনতন্ত্রে প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়েছি। এটা বলবৎ না হওয়া বা না করা সেটা অন্য কথা। কিন্তু শেখ মুজিব রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়ছিলেন না। তাঁর কথা ছিল, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছে। এ কথা শুধু তখনই ওঠেনি, ওটা বলা চলছিল বিগত ২৫ বছর ধরে। বলা হচ্ছিল, আমাদের পাট পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গেছে, আমরা ভিখারী হয়ে গেছি। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর একান্তই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি যদিও আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি মনে করি, এসব বক্তব্য অতিরঞ্জিত।

◆ তাহলে ৬ দফাকে কি...?

∆ আমি তাহলে বলি, ওটাতে অতিরঞ্জন ছিল ও কথাটি সঠিক। কেননা যা দাবি করা হয়েছে এ সবের নেপথ্যে যেমন বলা হয়েছে আমরা নাকি পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেছি! আমরা তাই যদি করে থাকি তাহলে তো আমাদের সম্পদ-সম্পত্তি গড়ে ওঠার কথা। কিন্তু তাতো হয়নি। আমরা ছিলাম উন্নয়নশীল, আপনারাও ছিলেন তাই। তাই আমি বলব ভুট্টো ও মুজিব চরমপন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ জনসমষ্টির ওপর ভর করতে একাট্টা ছিলেন।

◆ তাহলে সেই শোষণের কথায়ই আসা যাক। আমরা আপনাদের পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্যদের সাথে কথা বলেছি। তাঁরা আমাদের বলেছেন, তাঁদের তখন জানা ছিল দেশের সিংহভাগ আয় করে পূর্ব পাকিস্তান আর সিংহভাগ ব্যয় হয়ে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। এই বাস্তবতা, বৈষম্য শোধরানোর একটা প্রয়াস তাঁরা শুরু করেছিলেন ১৯৭০-এর দিকে।

∆ আজকে সেই একই যুক্তি দেয়া হচ্ছে এখন পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে—যদিও পাকিস্তানের অবশিষ্ট তিন প্রদেশের মোট জনসংখ্যা পাঞ্জাবের চেয়ে কম। এ কারণে কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় পাঞ্জাব বাকি তিন প্রদেশকে শোষণ করছে।

◆ না আমরা নয়, আপনাদের পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্যরাই আমাদেরকে ঐসব কথা বলেছেন।

∆ কিন্তু আমি তা বলি না। রেকর্ডে অনেক কিছুই আছে, কিন্তু আমি মনে করি না সেগুলোর সবকিছুই গ্রহণযোগ্য। দেখুন আমি এখানে রয়েছি ৫০ বছর ধরে। আমি বলতে পারি না ওসবে অতিরঞ্জন নেই। হতে পারে ওসবে সত্যতাও আছে। তবে আমার ধারণা হলো, ঐ দুই নেতা মানুষের ভাবাবেগকে পুঁজি করেছেন। মানুষের সত্যিকারের ভালমন্দ নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল না। দেশটাকে ভাগ করতে হবে, ক্ষমতা পেতে হবে সেটাই ছিল তাঁদের সত্যিকারের মাথাব্যথা। যদি কোন কিছু অন্যায় হয়ে থাকে আমার প্রতি আমি বলব যে, সেটা অন্যায়। এ অন্যায় শোধরাতে হবে। আমার এ অবস্থান এক। আর কেউ যদি সে অবস্থায় বলে এটা অন্যায় আর তাই সম্পর্কই ছেদ করব, আলাদা হয়ে যাব—সেটি অন্য জিনিস। সে কারণেই আমি এর পক্ষপাতীও নই।

আমি বলতে চাই, এ ধরনের আবেগানুভূতিকে নিজেদের মতলবে কাজে লাগিয়েছেন এই দুই নেতা। আর আমি এও মনে করি জনগণও তাঁদেরকে ক্ষমা করেনি। আপনারা দেখুন,

শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভাগ্যে কী ঘটেছে, তাঁরা অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসার পর কিন্তু সেই জনগণের জন্য কিছুই করেননি। তাঁরা নিপীড়িত মানুষের কথা ভাবেননি। তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা কী করে কব্জা করবেন সেটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

◆ ১৯৪৭-এ আপনি বলছেন স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন?

Δ শুধু আমি কেন আমার ধারণা ভারতের পুরো জনসমষ্টিই ঐ আন্দোলনে শরিক হয়েছিল।

◆ শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের অনেক বলিষ্ঠ নেতাও তো পাকিস্তানের জন্য লড়েছিলেন আর তাঁরা মুসলিমও বটে। তাহলে? তাহলে সেই তাঁদের কেন আলাদা হতে হলো?

Δ তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল। পাকিস্তানে গণতন্ত্র ছিল না, ছিল সামরিক আইন, একনায়কত্ব ছিল বলে। গণতন্ত্র থাকলে তাঁরা আলাদা হতেন না। তাঁদেরকে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। আর সেই কারণে এই দুই ব্যক্তির পক্ষে জনগণের আবেগকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছিল।

◆ আমলাতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? আপনি কি মনে করেন আমলাতন্ত্রও পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য কাজ করেনি?

Δ করেনি বলেই আমি মনে করি। আমার ধারণা, পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র এ দেশে অত্যন্ত লজ্জাকর ভূমিকা পালন করেছে।

◆ ১৯৭১-এ? না তারও আগে?

Δ আমি মনে করি আগে থেকেই তাদের ভূমিকা ছিল দেশের জন্য ক্ষতিকর।

◆ এ কথা আপনি কেন বলছেন?

Δ কারণ আমলারা গোড়াতেই পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল করেছিল। গোলাম মোহাম্মদ, যিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন, তিনিও আমলাতন্ত্রেরই লোক ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ বাতিল করেছিলেন। তাঁরা দেশ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। তাঁরাই দেশের ক্ষতি করেছেন অনেক বেশি। এ কাজে শরিক হয়েছে সামরিক ও সিভিল উভয় আমলাতন্ত্র। তারা তাদের কর্তব্য কর্ম করেনি। আর সে কারণেই আমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

◆ নয় মাস ধরে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানে আপনাদের পার্টির সাথে আপনার যোগাযোগ ছিল?

Δ আমি সেখানে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাকে যেতে দেয়া হয়নি।

◆ কে যেতে দেয়নি, সেনাবাহিনী?

Δ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার পর আমি ঐ অধিবেশনের সুযোগে ঢাকায় যাওয়া ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সেই অধিবেশন স্থগিত হয়ে যাওয়ায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে যেতে পারিনি।

◆ জামায়াতে ইসলামী কখন ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস গঠনের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়?

Δ আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানি না।

◆ আপনি এর কিছুই জানতেন না? রাজাকার বাহিনী সম্পর্কেও না? জামায়াতে ইসলামী পার্টি ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

Δ শুধুই জামায়াতে ইসলামী পার্টি এ কথা ঠিক নয় বরং আরও অনেক দলই তা করেছে।

◆ কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক দল বলতে তো ছিল আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি। তবে জামায়াতে ইসলামী পার্টির প্রার্থী পাকিস্তানের উভয় অংশেই নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেছে।

Δ জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও জমিয়তুল উলেমা-ই-ইসলাম ও আরও অনেক দলই দেশের উভয় অংশ থেকে নির্বাচনে শরিক হয়েছে।

◆ দেখুন, আমার কথা হলো, জামায়াতে ইসলামী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে কি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী পার্টির শাখার কোন যোগাযোগ ছিল না? যদি থেকেই থাকে তারা তো সশস্ত্র বাহিনীর সাথে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সহযোগিতা করেছে। এই বিষয়টি স্ববিরোধী নয়?

Δ আমি আপনাদের বলেছি, আমাদের এ অভিমতও ঐ সময় ছিল যে, পাকিস্তানে ঐ সময় যা হয়েছে তা প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানকার জনগণের অভ্যুত্থান নয় বরং যারা এগুলো করেছে তারা ঐসব শক্তি যারা পাকিস্তানকে বরবাদ করে দিতে চায়। পরিস্থিতি ছিল এ রকমই। রাজাকাররা কী করছিল সে বিষয়ে আমি অবগত নই।

◆ তা হয়ত আপনাদের নীতির ব্যাপার। কিন্তু আপনার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে গোলাম আযম বা মতিউর রহমান নিজামীর কি কোন যোগাযোগ ছিল না?

Δ স্বভাবতই ছিল। নিশ্চয়ই তা থেকে থাকবে।

◆ তারা কি আপনাকে এ বিষয়ে কোন কিছু জানিয়েছে? আমি বলতে চাইছি, পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছিল সে ব্যাপারে?

Δ আমি যা কিছুই বলছি তা হলো, আমাদের দলের সমষ্টিগত মনোভাব যা গড়ে উঠেছে, আমাকে যেসব তথ্য দেয়া হয়ছে তার ভিত্তিতে। আমাদের ধারণা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যারা অন্যায়ের, অবিচারের বিরুদ্ধে লড়ছিল এরা তারা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ওখানে সুনিশ্চিতভাবেই কিছু কিছু লোক ছিল যারা পাকিস্তানকে খতম করতে চাচ্ছিল। আমার ধারণা আপনারা সঠিক জবাব পেয়েছেন।

◆ আপনারা বলেছেন যে, আপনাদের মনে হয়েছিল যে, ঐ সময়ে পাকিস্তানে চরমপন্থীরা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। তাহলে এই চরমপন্থীরা কি অন্যান্য পার্টিতেও ছিল, না কেবল আওয়ামী লীগেই ছিল?

▲ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের আলোকে তো বলতে হয় আওয়ামী লীগই তো আইনসভায় আসনগুলো পেয়েছিল।

◆ আপনি কি দৃষ্টান্ত হিসাবে বলবেন যে, ওরা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সমাজের অন্তর্গত? আপনার মতে ওরা কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে?

▲ আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে যাই তখন আমাকে বলা হয় যে, ওখানকার গোটা জনসমষ্টির একটা বড় অংশ পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতে চলে গেছে। তবে স্কুলের শিক্ষকরা যায়নি। ওরা এখনও রয়ে গেছে। আমাকে ঐ সময় আরও জানানো হয় যে, ঐসব হিন্দু শিক্ষক দেশের অখণ্ডতার ধারণার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী ছেলেমেয়েদের মন বিষিয়ে তুলছে।

◆ কিন্তু কারা আপনাকে এসব কথা বলেছে?

▲ পূর্ব পাকিস্তানের লোকজনই আমাকে জানিয়েছে। আমি নিজেও সেখানে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতাম। আমাদের ঐ প্রতিষ্ঠানটির ঢাকা ও চট্টগ্রামে অফিস ছিল। সেখানকার প্রায় সকল কর্মচারী আমাকে জানায় যে, হিন্দু শিক্ষকরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছে না বরং তারা ছেলেমেয়েদের মনে বিচ্ছিন্নতার বীজ রোপণ করে চলেছে।... আমি জানি ওরা বলার চেষ্টা করেছে এখানকার লোকজনের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। এ কথাও সত্যি যে, পশ্চিম পাকিস্তানেরও অনেক লোকজনের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়নি।

◆ তার মানে আপনারা বলতে চাচ্ছেন হিন্দু শিক্ষকরা ছেলেমেয়েদের মন বিষিয়ে...

▲ তারা এক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে কাজ করেছে একেবারে গোড়া থেকেই। তাদের বিশ্বাস ছিল পাকিস্তান টিকবে না। এটা অল্পদিনের মধ্যেই খতম হয়ে যাবে আর দেশটি আবার ভারতের অঙ্গ হবে। কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই এ ধারণা ছিল না, পশ্চিম পাকিস্তানেও ছিল। এমনকি আজও যারা সিন্ধু ছেড়ে চলে গেছে তারা বলে, তারা কখন পাকিস্তান ভাঙবে তার অপেক্ষায় রয়েছে। তখন তারা আবার তাদের দেশে ফিরে যাবে।

◆ এমন ধারণা তাহলে সিন্ধুতেও রয়েছে?

▲ রয়েছে।

◆ কিন্তু দেখুন, এই বিষয়টি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আপনারা প্রথমে সেনাবাহিনীর কাজের সমালোচনা করলেও পাকিস্তান রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর দোসর হিসাবে কাজ করলেন। আর তারপর আবার ১৯৭১-এর পরেও জিয়াউল হকের সামরিক শাসকগোষ্ঠীর ও সামরিক বাহিনীর সাথে সেই আপনারাই সহযোগিতা করেছেন।

▲ আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলছি, এ বিষয়ে আমি অবহিত নই। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সাথে জামায়াতের যোগসাজশের বিষয় আমি জানি না। তবে আমি একথা আপনাকে বলেছি যে, সেখানকার পরিস্থিতি ও সে ব্যাপারে গড়ে ওঠা অনুভূতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ দায়ী নয় বরং এজন্য দায়ী কোন কোন বিশেষ মহল যারা পাকিস্তানকে ভাঙার ব্যাপারে ছিল একাট্টা। তাই যদি কিছু সেখানে ঘটে থাকে, হতে পারে তা হয়ত হয়েছে পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য। আর জেনারেল জিয়াউল হকের সাথে যোগসাজশ-সহযোগিতার অভিযোগের ব্যাপারে আমার জবাব হলো, আমি আবার জাতীয়

পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। আমি একটি দরকষাকষি আলোচনামূলক দলের একজন সদস্য ছিলাম। ১৯৭৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন জুলফিকার আলী ভুট্টো, যদিও ঐ নির্বাচনে কারচুপি করা হয়। এ সময়ে কতক রাজনৈতিক দলের এক ধরনের মোর্চা বা জোট গঠিত হয়। এর নাম ছিল সাতদলীয় পাকিস্তান জাতীয় মোর্চা। এতে জামায়াতও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে ঐ সময় সারা দেশে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু হয় ও নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানানো হয়। পাকিস্তানের লাহোর, করাচী, ফয়সালাবাদের মতো বড় বড় নগর-শহরে এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ভুট্টো সেনাবাহিনী দিয়ে বিক্ষোভ দমনের চেষ্ট করেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। তিনি বাধ্য হন পিএনএ-র সাথে দরকষাকষির আলোচনায় বসতে। এ জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় তিন সদস্যের। আমি ঐ কমিটির একজন ছিলাম। ছিলেন মুফতি মাহমুদ ও নসরুল্লাহ খান। ভুট্টোর সাথে আমাদের আলোচনায় আমরা একটা নিষ্পত্তিতে উপনীত হই। তবে পিএনএভুক্ত কয়েকটি দল অভিমত প্রকাশ করে যে, ভুট্টো এমনকি সব দাবি মেনে নিয়ে আবার নির্বাচন করলেও তাতেও তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আবার কারচুপি করবেন। এই দল দু'টি ছিল ন্যাপ ও এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খানের নেতৃত্বাধীন তেহরিক ইস্তিকলাল পার্টি। তাদের অভিমত ছিল এই যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে ভুট্টো নির্বাচন করবেন না বরং সামরিক আইন জারি করা হবে। কিন্তু পিএনএ তাদের এই অভিমত গ্রহণ না করে সংলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। আমরা এই সংলাপে একটা সমঝোতায় উপনীত হই, কিন্তু ভুট্টো শেষ পর্যন্ত সে চুক্তিতে সই করেননি। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৭-এ আবার সামরিক আইন জারি করা হয়। আমরা একান্তভাবেই সামরিক আইনের বিরোধী ছিলাম।

আর জিয়াউল হকের সাথে জামায়াতে ইসলামীর যোগসাজশ ও সহযোগিতা প্রসঙ্গে আমার জবাব হলো : জিয়াউল হক প্রথমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি তারিখ ঘোষণা করেন, পরে স্থগিত করেন। আবার একটি তারিখ ঘোষণার পর আবারও তিনি তা স্থগিত ঘোষণা করেন। তারপর তিনি পিএনএ-র দ্বারস্থ হন। তিনি জানান, তিনি দু'বার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেও তিনি তার আয়োজন করতে পারেননি। তাই রাজনৈতিক দলগুলো তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা না করলে তিনি নির্বাচনের তারিখ আবার ঘোষণা করতে পারছেন না, আর সে কারণেই সামরিক আইন চলতে থাকবে।

◆ জিয়াউল হক আপনাদের কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা চেয়েছিলেন?

▲ আমাদের সাথে এসে মন্ত্রিসভায় যোগ দিন। আর তা হলেই আমার পক্ষে নির্বাচনের একটি তারিখ ঘোষণা করা সম্ভব হবে। আর তেমন একটি তারিখ ঘোষিত হলেই আপনারা মন্ত্রিসভা ছেড়ে যেতে পারবেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আট মাস ধরে আলাপ-আলোচনার পর পিএনএ জিয়াউল হকের মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ জোটের কেবল সর্দার শেরবাজ মাযারীর নেতৃত্বাধীন দলটি জানিয়ে দেয় যে, তারা সমঝোতার সাথে একমত কিন্তু তারা সরকারে যোগ দেবে না। পিএনএ সিদ্ধান্ত নেয় যে, আবার যাতে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মন্ত্রিসভায় এই জোট যোগ দেবে, সহযোগিতা করবে। তবে শুধুই জামায়াত নয়, জোটের বাকি সব রাজনৈতিক দলই সরকারে যোগ দেয়।

আর তারপর নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলে আমরা মন্ত্রিসভা ছেড়ে আসি। আপনি যে সহযোগিতার কথা জানতে চেয়েছেন এ হলো সেই সহযোগিতা।

◆ দেখুন আমি একজন বহিরাগত ব্যক্তি হিসাবে আপনার কাছে জানতে চাই তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০-এর নির্বাচন বাতিল করার পর সেখানকার প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে উপনির্বাচন করা হয়। সেখানকার জামায়াত নেতারা ঐ নির্বাচনে শরিক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আপনি কি উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন? এই উপনির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের নতুন সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। আপনি কি বলবেন, তাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল ছিলেন? আর সেই সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ কি ছিল?

∆ আমি এ বিষয়ে অবহিত নই—আমি একথা আপনাকে আগেও বলেছি।

◆ ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর যখন আপনি খবর শোনেন যে, পাক সেনাবাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করেছে তখন আপনাদের দলের ও আপনার নিজের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বলবেন? খবরটা কি সময়মতো পেয়েছিলেন আপনি?

∆ আমি বিচলিত হয়েছিলাম। হয়েছিলাম এ কারণে নয় যে, সেনাবাহিনী সেখানে আত্মসমর্পণ করেছে, বিচলিত বোধ করেছিলাম পাকিস্তান খণ্ডিত হয়ে গেল বলে। কেননা এই পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল অনেক কোরবানীর বিনিময়ে। আমার আত্মীয়স্বজন, আমার বোন সেখানে ছিল—আমাদের তো নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য ছিল। তাই আমরা যখন এ খবর পাই তখন আমরা সত্যিই দুঃখ পেয়েছি, বিষাদাক্রান্ত হয়েছি।

◆ এই যা কিছু ঘটে গেল তাতে আপনাদের কাদেরকে বড় দুশমন বা কাকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়েছে?

∆ ঐ সময়ে ছিল তিনটি পক্ষ—তিনটি দল—পিপলস পার্টি, আওয়ামী লীগ ও সেনাবাহিনী।

◆ ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিয়ে যাওয়া বা হত্যা করার কোন খবর কি আপনি জানেন?

∆ জামায়াত এ রকম কিছু করতে পারে না। আমি এসব বিশ্বাস করতে পারি না। আপনারা যদি বলেন যে, জামায়াত সহযোগিতা করেছে, সে ক্ষেত্রে আমার যা বলার তা হলো...।

◆ এভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব কি গোলাম আযমের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল?

∆ রোজ কে রোজ সেখানে কী কী হয়েছে তা আমার জানা নেই। যখনই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তারা দু'তরফে আলোচনা করেছেন, যখন সম্ভব হয়নি, হয়নি। এর কারণ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এমনকি আমাদের সকলের মধ্যেও যোগাযোগ ছিল না।

◆ আপনারা কি অনতিবিলম্বে এই বাস্তবতা মেনে নিয়েছিলেন যে, একটি ভিন্ন জামায়াত পার্টি হবে?

∆ দেশ এক না থাকলে এক জামায়াত আর থাকে কীভাবে? ভারতে আমরা এককালে কাজ করেছি। অন্যান্য দেশেও ওরা কাজ করেছে। কিন্তু জামায়াত পাকিস্তানে কাজ করতে পারছে না। দেশ যখন এক নেই তখন জামায়াতও এক থাকতে পারে না।

◆ বাংলাদেশে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হয়। তারপর সে নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান নেতারা কি কখনও এখানে আসেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা করেন?

∆ তাঁরা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন ও নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনাও করেন। এখন তো অনেক লোকই পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যাওয়া-আসা করছে। কেননা এখন অবাধে যাওয়া-আসা করা যায়। এর ওপর কোন বিধিনিষেধ নেই। আমি অবশ্য যাইনি। ওখান থেকে ওরা আসছে। এখান থেকেও লোক ওখানে যাচ্ছে।

◆ তবে এ রকম আশা কি আছে যে, আগামীতে নেতারা নানা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করবেন আর সেই প্রক্রিয়ায় একটা পরিবর্তন আসবে?

∆ আমার ধারণা যেভাবে রয়েছে তা থাকবে না, বদলে যাবে। ঘৃণা এক সময় আমরা পরিহার করব। তখন আমরা আমাদের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করতে পারব। পাকিস্তানের সম্পর্ক যদিও সে রকম হবে না তবু যেহেতু আমরা একই দেশের নাগরিক ছিলাম সেহেতু সে সম্পর্ক পুরোপুরি মুছে ফেলা খুবই কঠিন। আপনার আমার ভাবনার মাঝে কোনই তফাত নেই। আপনি আমার ভাইও। আপনি বাংলাদেশী হতে পারেন। তবু আমার কাছে ভিন্ন কেউ নন। অবশ্যই আপনি আমার ভাই। বাংলাদেশ আমার ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ।

◆ এ দু'দেশের মাঝে ঘনিষ্ঠতর কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে কি?

∆ শিল্প-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি দু'দেশের উন্নততর সম্পর্ক কামনা করি।

◆ কিন্তু আপনারা তো আবার এক দেশ কামনা করেন, নয় কী?

∆ না সেটি খুবই কঠিন ব্যাপার। যা আর সম্ভব নয় তা আমি চাইব কেন?

◆ তাহলে আপনার ধারণা সেটি আর সম্ভব নয়?

∆ আমার ধারণা, দু'টি দেশের আবার এক হওয়া সম্ভব নয়।

◆ না, আমি এক দেশের কথা বলছি না, তুলনামূলকভাবে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের কথা বলছি।

∆ আমি চাই এক দেশ হিসাবে যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল তেমন নিবিড় সম্পর্ক আবার আমাদের মধ্যে গড়ে উঠুক। আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

◆ আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কনফেডারেশনের কথা বলা হয়ে থাকে।

∆ সেটি সম্ভব। কেননা, সেটি তো আর এক ও অভিন্ন দেশ নয়।

◆ আপনার দল কি সেজন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করবে?

∆ আমরা এমন কিছুই করতে চাই না যার ফলে পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আমরা সুসম্পর্ক চাই। ওরা যদি বলে আমরা কনফেডারেশন চাই আমরা আপনাদের খোশ আমদেদ জানাব।

◆ আপনাদের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ কিছুদিন আগে ঢাকায় বলেছেন যে, ১৯৭০-এর নির্বাচনের রায় মেনে নেওয়া হলে, বাস্তবায়িত করা হলে আমাদের বিচ্ছিন্ন হবার মতো পরিস্থিতি থাকতো না। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

∆ আমিও সেই একই কথা বলি। বলি, যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতো আর শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন... দেশটি দুই দেশ না হয়ে একটি দেশই থেকে যেতে পারতো। কেননা দেশকে দু'ভাগ করা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব হতো না। কিন্তু জাতীয় পরিষদের সেই অধিবেশন আর ডাকা হয়নি। অধিবেশন হতে পারেনি কেননা জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেছিলেন, আমি ঢাকায় সেটি হতে দেব না।

◆ তাহলে কে এ জন্য দায়ী?

∆ তাঁরা দু'জনেই।

◆ আপনি বলেছেন যে, তাঁদের দু'জনই চরমপন্থী। আপনারা মুসলমানদের সাথে বাংলাদেশের মুসলমানদের বৈষম্য করেছেন। এমনভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যেন পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানেরাই সত্যিকারের মুসলমান। আপনারা জানেন এরকমই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আর সে কারণেই আপনারা পূর্ব পাকিস্তানে চরমপন্থী আবিষ্কার করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে চরমপন্থীরা ছিল—আপনার কথার প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য এটিই হওয়া সম্ভব যে, আওয়ামী লীগের লোকজন চরমপন্থী। আর তারা সুনিশ্চিতভাবেই পাকিস্তান ভাঙতে চায়—এই হলো যুক্তি। আবার আপনি ভুট্টোকেও বলছেন চরমপন্থী। এই যুক্তি তাহলে এ কথাও বলে যে, এমনকি ভুট্টোর দলেও ভারতের চর ছিল। তাই ওরাও পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিল। ভাঙতে চায়নি শুধু জামায়াতে ইসলামী, অন্যসব রাজনৈতিক দল আর সেনাবাহিনী। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বসতে চেয়েছিল, এ কথা ভুলবেন না। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসাতে একটা তারিখ নির্ধারণের জন্য বহু হৈ চৈ করেছে। বলেছে, আসুন আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকি। ডাকা হোক যে কোন সময়ে।

∆ এ ক্ষেত্রে যে পার্থক্য সেটিই আমি আপনাকে বলতে চাই। জনাব ভুট্টো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন পাঞ্জাবে, তাঁর নিজ প্রদেশ সিন্ধুতে নয়। কাজেই পাঞ্জাব গোটা দেশের বিরুদ্ধে সে কথা ঠিক নয়। তাই আমি বলেছি যে ওঁরা দু'জনেই চরমপন্থী। আমি কখনও বলিনি যে, শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভারতের চর। আমি শুধু এ কথাই বলেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ছিল। ওরা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক, ওরা কিন্তু পাকিস্তানকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেনি।

◆ সে না হয় হলো, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দুদের খবর কী?

∆ ওরা তেমন প্রভাবশালী বা শক্তিশালী নয়। ওরা মোট জনসমষ্টির তুলনায় সংখ্যায় একেবারেই কম। আবার বাসও করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সেহেতু ওরা কোন ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়।

তবে আমি আশা করি, আমি আপনাদেরও এ কথা বলিনি যে, মুসলমানেরা (পূর্ব পাকিস্তানের) ভারতীয় সেনাবাহিনীর চর ছিল। আমি শুধু আপনাদেরকে এ কথাই বলেছি যে, তখনকার পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ, সেনাবাহিনী ও আমলাদের ভুলের কারণেই দেশ আজ দ্বিধাবিভক্ত। যদি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুবিচার করা হতো, যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চলতে দেয়া হতো, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা যেত তাহলে এ ধরনের বিপর্যয় এড়ানো অসম্ভব হতো না।

◆ আর এখানেই রয়েছে আপনাদের মাঝে স্ববিরোধিতা। কেননা, আপনি বলছেন যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হতো, যদি ভুট্টো ও মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আসতেন তাহলে পাকিস্তান এক থাকত। কিন্তু জাতীয় পরিষদের ডাকা অধিবেশন কেন বসতে পারল না তার একমাত্র হেতু যদি বলেন তা হলে তা ছিলেন খোদ ভুট্টো নিজেই। আর কেউ নয়। তিনিই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাবেন না। কাজেই তাঁরা ছিলেন উস্কানিদাতা চর।

∆ কিন্তু আপনারা তো জানেন, (আগরতলা মামলায় Sec) শেখ মুজিবুর রহমান তখন ছিলেন জেলে আর পশ্চিম পাকিস্তানের তাবৎ নেতা বলেছিলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি না দেয়া হলে তাঁরা সরকারের সাথে আলোচনায় বসবেন না। কাজেই আমরা বলিনি যে, শেখ মুজিব ছিলেন বিশ্বাসঘাতক।

◆ আগরতলা মামলার ব্যাপারে আপনাদের ধারণা কী? আপনারা কি একে বানোয়াট মামলা মনে করেন না?

∆ আমি এর বিস্তারিত জানি না। কিন্তু তিনি (শেখ মুজিব) মামলায় জড়িত ছিলেন যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নেতা বলেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি না দিলে তাঁরা সরকারের সাথে আলোচনায় বসবেন না।

◆ আসল কারণ তো এমনও হতে পারে যে, যদি মুজিব না আসেন তাহলে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব আলোচনার বাইরে থেকে যায়। ফলে শেখ মুজিবকে আলোচনার টেবিলে আনার সেটিই ছিল বাধ্যবাধকতা। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলোচনায় শরিক না হয় আর কেবল সংখ্যালঘিষ্ঠই সে আলোচনায় হাজির থেকে থাকে তাহলে তো গোলটেবিল আলোচনা থেকে কোন ফল পাবার কথা নয় আপনাদের। আমি মনে করি না, শেখ মুজিবকে আলোচনায় আনার কথা বলে তাঁরা কোন আনুকূল্য দেখিয়েছেন, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতার কাছে তাঁদের অনুনয় করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল কি?

∆ কোন বাধ্যবাধকতা নয় বরং পাকিস্তানকে এক রাখার বৃহত্তর প্রেরণাই এতে কাজ করেছে।

◆ গত দু'তিন দিনে এ বিষয়ে আমরা কিছু শিখেছি, জেনেছি। বেশ কিছু বইও আমরা পড়েছি যাতে তথ্য রয়েছে যে, ভুট্টো একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন যাতে এমন ধারণা রয়েছে

যে, এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে যার ফলে পাকিস্তানের দুই অংশকে এক রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে। আর তাতে পশ্চিম পাকিস্তানেরই লাভ হবে। বিষয়টি তাঁরা কিছু অর্থনীতিবিদকে বলেন এবং ঐ অর্থনীতিবিদরা এ ব্যাপারে একটি দলিলও প্রণয়ন করেছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে নিয়াজীর বইতেও উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন আলোচনা থেকেও এসব বিষয় কিছু কিছু বেরিয়ে আসছে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানের বহু লোক ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানকে বাদ দিয়েই বরং ওরা ভাল থাকবে।

∆ এ প্রশ্নে আমি আপনাদের সাথে আংশিকভাবে একমত। পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু লোক ছিল যাদের অভিমত হলো, পূর্ব পাকিস্তান আমাদের জন্য সমস্যা হয়েই থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান দায়বোঝা এ কারণে যে, ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ওরা বেশি রকমে গণতন্ত্রী। যে লোকগুলো ভারতে থাকলে নির্বাচনে জেতার আশা করতে পারত না তারাই এক সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হতে পেরেছে। লিয়াকত আলী খান, ইস্কান্দার মীর্জা—পশ্চিম পাকিস্তানের এসব বড় বড় নেতা পূর্ব পাকিস্তান থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা ছিলেন উন্নততর পাকিস্তানী। তাঁরা মনে করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে তাঁদের নিজেদের মতলবে কাজে লাগানো বেশ কঠিন হবে। এভাবেই তাঁরা তাঁদের ভূমিকাভিনয় করেছেন, কেননা পরিস্থিতি ছিল তাঁদের অনুকূলে। সেভাবেই তাঁরা পরিস্থিতিকে তাঁদের কাজে লাগিয়েছেন।

◆ জেনারেল নিয়াজী বলেছেন, তাঁকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে কেননা যখন তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়েছে তখন যা কিছু হবার হয়েই গেছে। তাঁর শুধু একটা জিনিসই করার বাকি ছিল...।

∆ কী সেটি?

◆ সেটি হলো তাঁর আত্মসমর্পণ। ভারত তাঁকে সব কিছু থেকে রেহাই দিয়েছে। পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের এককালের জাঁদরেল কর্মকর্তা ছিলেন মীর্জা এম এম আহমদ। তিনি ছিলেন একজন আহমদিয়া। এদের ভূমিকা কী ছিল?

∆ আমার কথা হলো, পাকিস্তানের উভয় অংশেই কিছু লোক ছিল যারা পাকিস্তানকে বরবাদ করার চেষ্টায় ছিল। আর আহমদিয়া সম্প্রদায়ের কথা বলছেন? ওরা খুবই অল্প কিছু লোক। আমাদের ওপর ওরা প্রভাবশালী কী করে হয়ে উঠবে? আমরা তা হতে দেব না। আমি ওদেরকে নয়, নিজেকে বিশ্বাস করতে চাই।

◆ আপনি কি মনে করেন, এমন কিছু সত্যি ছিল যেমন আপনি বলেছেন, পাকিস্তান পিপলস পার্টির কর্মী হিসাবে ওদের কিছু লোক গ্রামে যাচ্ছিল। আর পিপিপিও সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে আহমদিয়াদের হাতের পুতুল হয়ে উঠেছিল।

∆ ভুট্টোর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন একজন আহমদিয়া।

◆ আপনি কি মনে করেন, ভুট্টো আহমদিয়াদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?

∆ তা আমি বলতে পারি না। তবে ভুট্টো ছিলেন খুবই ধূর্ত ব্যক্তি। এই লোকটি পরবর্তীকালে আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করেছিলেন। তিনি শুধু এই মর্মে শাসনতন্ত্র সংশোধন করেছিলেন যে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হবে।

◆ কেন তিনি তা করেছিলেন বলে আপনি মনে করেন? আপনাদের মতো একটি শক্তিশালী দলকে খুশি করার জন্য?

∆ আহমদিয়াদের আমি দোষ দিই না। আমি দোষারোপ করি মূল অপরাধীদের। আমি আপনাদেরকে বলেছি যে, এ জন্য দোষী ভুট্টো, এ জন্য দোষী মুজিবুর রহমান, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা, আর ইয়াহিয়া খান তো বটেই। ইয়াহিয়া প্রধান অপরাধীদের একজন।

◆ সেনাবাহিনীর সাথে আপনাদের যে সম্পর্ক ছিল তা কি এই কয়েক বছরে বদলে গেছে কিংবা ঐ সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে? কখনও কি আপনারা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, সেনাবাহিনীর কোন ভিন্ন ভূমিকা পালনের ছিল কি না?

∆ আমরা সবসময় বলছি, সেনাবাহিনীর একমাত্র কাজ হলো দেশ রক্ষা। কিন্তু তারা রাজনীতিতে জড়িত হচ্ছে। আজও তারা রাজনীতিতে জড়িত।

◆ আপনি কি মনে করেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাঠামোতে একটা কিছু গলদ রয়েছে যার ফলে রাজনীতিতে এতখানি জড়িত হবার অবকাশ সেনাবাহিনীর হচ্ছে? পৃথিবীর কম দেশেই সেনাবাহিনী রাজনীতিতে জড়িত।

∆ ঠিক নয়। আরও অনেক দেশেই সেনাবাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতায় রয়েছে। পাকিস্তানই এ ব্যাপারে একমাত্র দেশ নয়। আরও অনেক মুসলিম দেশও রয়েছে।

◆ এটা কেন? আপনি কি মনে করেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাঠামোতে একটা কিছু আছে বলেই এটা হচ্ছে?

∆ এর কারণ, রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। আর সেটিই হলো প্রধান সমস্যা। আমি পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা জানতাম না। তবে আমি আজকের পাকিস্তানের কথা বলতে পারি যে, ভোটারদের ভোট দানের হার অত্যন্ত দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে। কারণ, এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের হতাশা বাড়ছে। গত ১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সবচেয়ে কম লোক ঐ নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। এর কারণ, মানুষ নির্বাচন সম্পর্কে আশাবাদী নয়। তারা বলছে, নির্বাচনের ফলাফল গতানুগতিকভাবে একই থেকে যাচ্ছে, একই লোকেরা বারংবার নির্বাচিত হচ্ছে আর এভাবে নির্বাচন হলে তাতে কেবল ধনীরাই নির্বাচনে নির্বাচিত হতে পারবে।

◆ আমরা ইসলামকে একটা জীবনধারা বলে থাকি। রাজনীতি আর ধর্ম কি ইসলামে অভিন্ন?

∆ ঠিক তাই, আপনি যা বলছেন। আপনি যদি বলে থাকেন, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলাম আমাদের পথনির্দেশনা দেয়, আর তাই রাজনীতিও জীবনেরই এক শাখা; কেননা, সুনিশ্চিতভাবেই রাজনীতিতে আমাদের পথনির্দেশনা যোগায় ইসলাম। একজন মুসলমান বলতে পারে না সে কেবল মসজিদের ভেতরেই মুসলিম, বাইরে নয়।

◆ অমুসলিম হওয়ার প্রশ্ন নয় বরং রাজনীতির জন্য ধর্মকে ব্যবহারের কথাই আমি বলছি।

∆ ব্যবহার করা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মকে মেনে চলা। কেননা কোরআন আমাদের সবকিছুতেই পথ নির্দেশ দেয়।

◆ রাজনীতি তো এক ধরনের খেলা, মানুষ ঐ খেলা খেলে।

∆ জনসাধারণ মুসলিম হলে তারা কোরআনের বিধান ও অনুশাসন অনুযায়ী সে খেলা লেখবে।

◆ জনসাধারণ কোন কোন নীতির মোকাবিলায় এমন কিছু আপোস করতে পারে না যা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আপনি এ ব্যাপারে কী বলবেন?

∆ তাহলে সেটি হবে ইসলামী বিধানের লঙ্ঘন। এ ব্যাপারে আমার অভিমত হলো, ইসলাম আমাদের জীবনের সর্বস্তরে নির্দেশনা দেয়। তাই রাজনীতি চলবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী। আমি বলতে পারি না, আমার রাজনীতি ইসলাম থেকে আলাদা।

◆ আপনি রাজনীতি উপভোগ করেন?

∆ ধর্মের মতোই।

◆ লোকজন আমাদের বলেছে নানাভাবে—পাকিস্তান ছিল আল্লাহর রহমত, তাঁর দান। একটি দেশ কীভাবে পরিচালিত বা শাসিত হবে পাকিস্তান তার আদর্শবিশেষ। কিন্তু দেখা গেছে, একেবারে গোড়া থেকেই দেশটি নানা সমস্যায় আক্রান্ত। তাহলে দেশটির এই যে এত সমস্যা, এত সঙ্কট, তার আলোকে পাকিস্তানের মূল গলদটি কোথায়? যদিও বাস্তবতা এ দেশের প্রায় সবাই মুসলমান, অনেকে জবরদস্ত মুসলমানও বটে! এর নির্মাণে ত্রুটি কোথায়?

∆ আমি আপনাদের বলেছি, গোড়া থেকেই মুসলিম লীগ কোন জাতীয়তাবাদী সংগঠন ছিল না। ভারতের জনসাধারণ যখন দেখতে পায়, পাকিস্তান আসছে, ওটি হবে এক স্বাধীন দেশ তখন ঐ সব লোক যাদের অনেকেই ব্রিটিশের অনুগত তারা এসে মুসলিম লীগে যোগ দেয়। পাকিস্তানের জন্মের কয়েক মাস পরেই কায়েদে আযম ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজনীতিতে অরাজকতা দেখা দেয়। লোকজনের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী দেশের সবকিছু চলছিল না।

◆ দেখুন, প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই বলতে গেলে পাকিস্তানকে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, চক্রান্ত চলেছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, লোকজন অন্তত সেসব কথাই আলোচনায় তুলেছে। আপনি কি মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবেই এ কথা সত্যি যে কিছু লোক চক্রান্তে লিপ্ত ছিল?

∆ তারা জনসাধারণ নয়—কিছু ক্ষমতাধর পরিবারই এসব কাজ-কারবারে শামিল ছিল।

◆ আপনি কি সামন্ত ভূস্বামী ও সেনাবাহিনীর কথা বলছেন?

∆ ঠিক তাই। ভূস্বামী, সর্দার, উপজাতীয় বা গোষ্ঠীপ্রধানদের প্রবল প্রভাব ছিল সাধারণ মানুষের ওপর।

◆ পাকিস্তানে জাতি বা বর্ণপ্রথা কতদূর প্রবল?

∆ তেমন জোরদার বলা যাবে না, তবে নিহায়ত কমজোরও নয়। পাঞ্জাবে এই প্রথা বেশ জোরদার। কেননা, পাঞ্জাবের লোকজন তাদের উপজাতীয় প্রধানদের কথা মেনে চলে।

◆ আপনার সাথে আলোচনা থেকে মনে হচ্ছে, ইসলামের অনেক বিষয়ই আছে পাকিস্তানী জনসমাজে যেগুলির নিষ্পত্তি আজও হয়নি। বর্ণ বা জাতিপ্রথা এ রকমেরই একটি সমস্যা।

▲ জাতি বা বর্ণ এক ধরনের পরিচয়। এটি আর যা-ই হোক ইসলামবিরোধী নয়। যদি আমি বলি আমি একজন শেখ বা সৈয়দ সেটি ইসলামবিরোধী নয়। ইসলাম পরিচয়ের স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু সে পরিচয়ের অপব্যবহার নিশ্চয়ই ভাল নয়।

◆ পাকিস্তানের ৫০ বছরেও কেন আপনারা এ সবের সুরাহার চেষ্টা করেননি?

▲ আমরা এখন সেটাই করছি। ২৫ বছর ধরে আমরা ছিলাম সামরিক শাসকদের অধীনে। আর দেশও ভাগ হয়ে গেছে। এখন আমি মনে করি, আমরা উন্নততর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস, আমরা সমস্যা কাটিয়ে উঠব।

◆ সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের দলের অবস্থান হবে কোথায়?

▲ আমরা জাতীয় পরিষদে না থাকলেও আমার মনে হয় সাধারণ মানুষের প্রত্যেকেই আপনাদের একথা জানাবে যে, আমাদের পরবর্তী ভরসা হলো জামায়াতে ইসলামী। আমরা হয়ত কোন আসনে জয়ী হতে পারিনি তবু যে কোন মানুষ আমাদের কথা ভাবে—আপনারা জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

◆ এখন আমি একটি ভিন্ন প্রশ্ন করব। গত নির্বাচনে আপনাদের এমন ভরাডুবি ঘটল কেন?

▲ আমরা ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিনি।

◆ আমি এর আগের নির্বাচনের কথা বলছি।

▲ ১৯৯৩-এর নির্বাচনে আমাদের বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছে, ভোটাররা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একভাগে ভুট্টোর পিপলস পার্টির সমর্থক, আরেক ভাগে পিপলস পার্টির বিরোধী। পিপিপিবিরোধীদের ভোট পড়ে নওয়াজ শরীফের ব্যালট বাক্সে, তারা জামায়াতের পক্ষে ভোট দেয়নি।

◆ তাহলে কি প্রচ্ছন্নভাবে আপনারা ভোটারদের সেভাবে ইঙ্গিত-ইশারা দিয়েছিলেন?

▲ না, আদৌ তা নয়। কেননা, আমাদের অনুকূলে বড় বড় র‍্যালি, সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। সবাই জামায়াতে ইসলামীর সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী ছিল কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে অবস্থা বদলে যায়, আর ভুট্টোবিরোধীরা তাদের ভোট নওয়াজ শরীফকেই দেয়।

◆ জামায়াত সব সময় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। তাহলে আপনাদের ভোট কেন ভাগাভাগি হয়ে যাবে?

▲ এর কারণ, যারা পিপলস পার্টিবিরোধী তারা মনে করেছিল, ভোট যদি ভাগ হয়ে যায় তাহলে তার ফায়দা লুটবে পিপলস পার্টি। সে কারণেও আমাদের সমর্থকরা নওয়াজ শরীফকে ভোট দেয়।

◆ বাংলাদেশে বেগম খালেদা জিয়া যখন সরকার গঠন করেন তখন বাংলাদেশের সংসদে জামায়াত ১৮টি আসন পায়। কিন্তু এবার তারা পেয়েছে মাত্র ৩টি। এর কারণ কী?

▲ আমি বলতে পারি না।

◆ **তবু একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক হিসাবেই বলুন।**

∆ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলব!

◆ **বাংলাদেশের জামায়াত নেতাদের সাথে সবশেষ কবে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে?**

∆ কেউ কেউ এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সাথে বৈঠকে বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। তবে কেউ কেউ যে এসেছিলেন সে কথা ঠিক।

◆ **অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে আপনার আলোচনা হয়েছে?**

∆ তিনি এখানে আসেননি।

◆ **আপনি তাঁকে টেলিফোনও তো করতে পারেন, তাই না? আজ রাতেও তেমন আলাপ হয়েছে। নাকি?**

∆ আরে না।

ড. মুবাশ্বির হাসান

[ড. মুবাশ্বির হাসান ছিলেন পাকিস্তানের পিপলস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঘনিষ্ঠজন। পিপলস পার্টির প্রভাবশালী নীতিনির্ধারক ছিলেন তিনি। ভুট্টোর সময় কিছুদিন ছিলেন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী, বেনজীর ভুট্টো ক্ষমতায় এলে মতবিরোধের কারণে মূল পার্টি ত্যাগ করেন। বর্তমানে (১৯৯৮) পিপলস পার্টির এক ভগ্নাংশের নেতা। লাহোরের গুলবাগে তাঁর বাসভবনে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।]

◆ প্রসঙ্গের অবতারণা করছি '৭১-এর ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে। প্রশ্ন হলো, সেই সময়ে জনাব ভুট্টো আওয়ামী লীগ নেতার কাছ থেকে কী চাচ্ছিলেন?

∆ আমরা একটা সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে কাজ করছিলাম। এই সাধারণ ধারণায় পিপলস পার্টির অনুমোদন ছিল যে, পাকিস্তানে অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি ঔপনিবেশিক চরিত্রের। পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের পুঁজির বাজারে পরিণত করেছিল। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্বের উপকার ভোগ করছিলাম। এ কথা আমরা ১৯৭০-এ আমাদের দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে উল্লেখ করেছি। এরপর নির্বাচন হলো। নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হলো। আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের মিত্রদের সাথে আমাদের বিভিন্ন আলোচনায় আমরা একান্তভাবে চেষ্টা করেছি যাতে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। ছয় দফার সকল দাবি মেনে নেয়া পিপলস পার্টির পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সম্ভব ছিল না। আমরা আওয়ামী লীগের প্রায় সাড়ে পাঁচ দফাই মেনে নিতে রাজি ছিলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের দলীয় নির্বাচনী মেনিফেস্টো থেকে ছয় দফার উল্লেখ বাদ দেবার মতো অবস্থায় ছিল না। নির্বাচনের ফলে দেখা গেল আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে পিপলস পার্টি। তখন আমরা একটা সাধারণ প্রস্তাবনা বা ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে থাকি। সে সময়টা ছিল ১৯৭১-এর জানুয়ারির আগে। ধারণাটি ছিল

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

এই যে, ইয়াহিয়া খানের কূটপরিকল্পনা হলো, দুই রাজনৈতিক দলকেই চেপে ধরা। প্রথমে হয় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টিকে নয় পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগকে দমন করবেন।

◆ ইয়াহিয়া কেন এ রকম দমন করার চেষ্টা করবেন বলে আপনারা ধরে নিয়েছিলেন?

∆ তাঁর শাসকচক্রের প্রকৃতির কারণে। এ শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া অবশেষ যার সত্যিকার বুনিয়াদ ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন। এই আইনে ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে আসার কোন সুযোগই নেই। বস্তুত এ রকম কোন উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ভারত শাসন আইনের প্রস্তাব করা হয়নি। এই আইনে বরং এমন কিছু সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে যেগুলোর আওতায় এমনকি খোদ গভর্নর জেনারেলও পুরো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। তাঁর ক্ষমতা প্রথমেই খর্ব হয়েছে উপমহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলোর সাথে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কারণে। তাঁর ক্ষমতা আরও খর্ব হয়েছে লন্ডনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রসচিবকে সরাসরি লেখার ব্যাপারে প্রেসিডেন্সির গভর্নরদের অনুমোদন থাকার কারণে। তৃতীয়ত, এ ক্ষমতা সংকুচিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সার্ভিসকে গভর্নর জেনারেলের আওতায় না রেখে লন্ডনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রসচিবের আওতায় রেখে। চতুর্থত, উপমহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলোর নৌবাহিনী সরাসরি ব্রিটিশ রাজকীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে ছিল। সেনাবাহিনী এ কারণে কখনও গভর্নর জেনারেলের আওতায় ছিল না। আর শাসন সংক্রান্ত আইন-কানুন যেগুলো দিয়ে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ শাসিত হয়ে থাকে, বিশেষ করে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, কারাগার ও কর আদায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসনমূলক কাজগুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে বেতনধারী কর্মচারীদের হাতে। ফলে এসব দেশের গোটা শাসন কাঠামোর আবর্তে সিভিল সার্ভিস বা আমলাশ্রেণী, তার নেপথ্যে, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে বোঝায়। এ ধরনের ব্যবস্থার এ দিকটি নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, জিন্নাহ, স্বয়ং গান্ধী, এমনকি পরের শাসকদের কেউ বুঝতে পারেননি। এসব কারণে ইয়াহিয়া কী করতে পারেন তা দুর্বোধ্য ছিল না।

◆ জনাব ভুট্টো তো সামরিক শাসকগোষ্ঠীর অবদান, তাই নয় কি?

∆ সে ধারণায় অবশ্য হ্যাঁ, সুনিশ্চিতভাবেই তিনি তাই। তবে পাকিস্তানী সামরিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থার ধারণা তাঁর ছিল না। আর এ শাসন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি তাঁর এজেন্টদেরকে ক্ষমতা দেয়। সে সময় কম্পিউটারে 'ওয়ার গেম' চলত। আমি সেটি পুরোপুরি ছকে নিই এভাবে—আমরা যদি এটি না করি, ইয়াহিয়া সেক্ষেত্রে তা করবে। সে না করলে, অমুক করবে। এতে হ্যাঁ বা না প্রয়োগ করে এক পর্যায়ে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছি, ইয়াহিয়া দু'টি রাজনৈতিক দলকেই খতম করবে। এ গেমের ফল ভুট্টোকে জানানো হয়।

◆ সেটা কখন?

∆ '৭১-এর জানুয়ারি আলোচনার পরপরই।

◆ আপনি অধিবেশনে যোগ দেবেন না বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার আগে?

∆ ঠিক তার আগে। ইয়াহিয়া খান এ রকম কাজই করবেন বলে আমি যে ধারণা করেছিলাম সেটি এই অনুমানের ভিত্তিতে, আর ভুট্টো সব সময়ই সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন না, তবে

আমরা যা বলতে পারিনি তা হলো ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগের একটি রফায় পৌঁছানোর কিংবা ইয়াহিয়া খানের সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছাচ্ছে, অন্ততপক্ষে এ রকম একটা ভাব দেখানোর ব্যাপারটি।

◆ ওরা আওয়ামী লীগের সাথে রফায় আসবে—এ রকম সঙ্কেত আপনি পেয়েছিলেন?

∆ কোন সঙ্কেত নয়। ওরকম ঘটনা ঘটেছিল। তবে সত্যিই আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সমঝোতায় আসছিল না। অনিবার্য কোন একটা কিছু ছিল কি না তা জানা যায়নি। ব্যাপারটা এ রকম। আমার ধারণা, জানুয়ারি এমনকি আরও আগে—বহু আগেই ওটা ঘটে। যখন বিশেষ ফ্লাইটে করে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পৌঁছানো শুরু হয়। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর অর্থ সেখানে একটা কিছু নিশ্চয়ই করা হচ্ছে। অর্থাৎ সামরিক বাহিনী সেখানে পরে কিছু করার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

◆ তাহলে ওরা জানত, ওদেরকে পরবর্তীকালে কোন অভিযানে নামতে হবে?

∆ দেখুন, আমরা জানতাম বলছি এই ধারণায় যে, ওরা ওখানে আকাশপথে সেনা পাঠাচ্ছিল, আবার যুগপৎ ওদের সাথে দরকষাকষির আলোচনার দ্বৈরথও চালিয়ে চাচ্ছিল। ওরা আমাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি আঁধারে রাখে। পরে ২৪ মার্চ আমরা খবর পেলাম আওয়ামী লীগ নেতারা ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কোন একটা চুক্তিতে সই করার জন্য অপেক্ষা করছে। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমরা আলোচনার জন্য সকল চেষ্টার পরও তিনি আমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এমনি অবস্থায় আমরা তাঁর সাথে মিলিত হতে পারিনি। আমার মনে পড়ে, শেখ সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য মুস্তাফা খারকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ভুট্টো ও শেখের মধ্যে কোন বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। ভুট্টো প্রেসিডেন্ট হাউসে শেখ সাহেবের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁকে লনের এক পাশে নিয়েও গিয়েছিলেন, কিন্তু কী হয়েছিল তা আমার জানা নেই।

◆ ঠিক কী সমঝোতা ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে চাচ্ছিলেন? শেখ মুজিবের দল হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষ। এ দল পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। পার্লামেন্টের আসনগুলোতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে দলটি তৎকালে প্রেসিডেন্টের সাথে কোন এক সমঝোতার ভিত্তিতে পার্লামেন্টে যোগ দিতে তৈরি ছিল। তাহলে ভুট্টো কী ধরনের সমঝোতা চাচ্ছিলেন?

∆ আমার ধারণা, ভুট্টোর একটা ভয় ছিল। ভয়টি হলো এই যে, একবার যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে, সে অধিবেশন ঘেরাও করা হবে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় বসার কথা ছিল। এ অধিবেশন হলে অধিবেশনের প্রথম দিনটিতেই শাসনতন্ত্র পাস করা হবে। আর এ শাসনতন্ত্র কী হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা অবহিত ছিলাম না। সেনাবাহিনীও সে শাসনতন্ত্র মেনে নিত না। আমরা চাচ্ছিলাম পূর্বাহ্নে এ নিয়ে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা হোক। নইলে বিশৃঙ্খলা-নৈরাজ্য দেখা দেবে।

◆ আসলে প্রধান অন্তরায়টি ছিল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে অংশীদার করতে চায়নি কিংবা কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তানের কেউ আসুক—এ

ধারণা নিয়ে আলোচনায় বসতে চায়নি। এর কারণ এখন পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর দু'টি রাজনৈতিক দলই গণতন্ত্র চাচ্ছে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে বলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করবে। আর ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে যাওয়াটাই উচিত ছিল। কিন্তু আমরা কী দেখেছি? দেখেছি আপনারাই এক পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন না। এ কথা বলতেই হচ্ছে এ কারণে যে, নির্বাচনে পরাজিত হবার পরেও ক্ষমতার ভাগীদার হতে চেয়েছেন আপনারা। এ কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্ববিরোধী জিনিস নয়? ভারত ও পাকিস্তানে আজ আমরা কী দেখছি? সেখানে নির্বাচন হচ্ছে। আপনি নির্বাচনে পরাজিত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সরকার গঠন করছে। তাহলে সেদিনের পাকিস্তানে কেন তা হয়নি? এর কারণ আমি বলব, পিপিপি অখণ্ড পাকিস্তানের ধারণায় বিশ্বাসী ছিল না। বিশ্বাসী ছিল এক পশ্চিম পাকিস্তানের ধারণায়—যেখানে তাদের শাসনই চলবে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে কী বলবেন আপনি?

∆ আপনি যা বলছেন, '৭১-এও তা নতুন কিছু ছিল না। এই-ই হলো পাকিস্তানের ইতিহাস, বরাবরই পূর্ব পাকিস্তানীদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর গোড়াপত্তন সেই সাতচল্লিশে। আমি ইতিহাসের সাত্যিকার ছাত্র না হলেও বলি—যুক্তফ্রন্ট যে নির্বাচনে জয়ী হয় সে নির্বাচনকে নিষ্ফলা করে দেয়া হয়। তমিজুদ্দিন খানের দেশ কাঁপানো মামলার রায় কোন কাজে আসেনি, হাজির হয় সামরিক আইন। আসলে প্রফেসর সাহেব যা বলতে চাচ্ছেন সে জন্য কেবল ভুট্টোই একমাত্র নন্দঘোষ নন, বরং বলা যায় পাকিস্তানের সকল শাসক একই রকম আচরণ করেছেন। কোন্ সময় আমরা একটা গণতান্ত্রিক স্থাপনার অধিকারী ছিলাম? পাকিস্তানে কখনও কোন সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়নি। এর পার্লামেন্ট ছিল। সে সব পার্লামেন্টে আধিপত্য ছিল পাকিস্তানের সামন্তপ্রভু, ভূস্বামী অথবা আমলাদের। তাদের মাঝে তাই গণতন্ত্র ছিল না। এই পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। একই কারণে পূর্ব পাকিস্তানীরা গণতন্ত্র বলতে যা বুঝে থাকেন সে ধরনের গণতন্ত্র আমরা পাকিস্তানে কখনও পাইনি। জনসাধারণ, রাস্তার মানুষ কিংবা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার—এদের প্রতিনিধি কোথাও ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানীরা বারংবার তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে, তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছে আর এরই পাশাপাশি বারবারই তাদেরকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এ কারণেই ১৯৭১-এর গোড়ার দিকের মাসগুলোতে ভুট্টো বলতে পারেননি, সামরিক আইন বহাল তবিয়তে চলতে থাকুক আর আমরা পাকিস্তান শাসন চালিয়ে যেতে থাকি। শেখ মুজিবুর রহমানের ভোট জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবেই তিনি সচেতন ছিলেন, তবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কিছু একটা করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

◆ এই কিছু একটা করে ওঠা বা ব্যবস্থা বলতে পিপিপি বা ভুট্টো আসলে কী চাচ্ছিলেন? আমি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই, মুস্তাফা খার যদি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে পারতেন, বৈঠক হতো ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে—কী হতো? ভুট্টো কী বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন?

∆ সত্যিকারের তেমন কোন সমস্যা ছিল বলে আমি মনে করি না। তবে একটা কথা, ভুট্টোর আশঙ্কা ছিল—এমন একটা শাসনতন্ত্র পাস হবে যা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করবে। আর সেটা পশ্চিম পাকিস্তানে তার ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

◆ আমি যদ্দূর জানি, ভুট্টোর পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৮টি আসন পেয়েছিল। তাহলে অন্য দলগুলোর মতামতের ব্যাপারে কি... ?

Δ ওটা ছিল ভুট্টোর ধারণা। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের ধারণা।

◆ তিনি কি আওয়ামী লীগের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনার পরিকল্পনা করছিলেন?

Δ ক্ষমতার ভাগাভাগি করতে হতো, তবে সে ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী হতেন শেখ মুজিব।

◆ সেটি কেমন করে হতো? তিনি কি শাসনতন্ত্রে কোন বিধানের ব্যবস্থা চাচ্ছিলেন?

Δ না।

◆ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করে, সে জন্য ভুট্টোকে বিরোধী দলের আসনে বসতে হতো। সেখানে থেকেই তো তিনি পার্লামেন্টে যে কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারতেন। আর সেটিই ঘটছে এখনকার পাকিস্তানে।

Δ তিনি এমন এক শাসনতন্ত্র চাচ্ছিলেন বলে আমার ধারণা, যে শাসনতন্ত্রে থাকবে একটি সত্যিকারের ফেডারেল ব্যবস্থা। এর আওতায় ভুট্টো পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে ক্ষমতায় থাকবেন। আর কেন্দ্রে তিনি বিরোধী দলের আবস্থান নেবেন।

◆ এ ব্যবস্থাই কি তিনি চাচ্ছিলেন?

Δ আমার ধারণা, তাই।

◆ বলা হয়েছে, ভুট্টো বলেছিলেন—"আমি বিরোধী দলের আসনে বসতে প্রস্তুত নই"—এ কথা সত্যি?

Δ না, তা নয়। প্রদেশগুলোর জন্য ক্ষমতার বিধি ব্যবস্থা ও কেন্দ্রে ক্ষমতাই বা কী হবে সেই বিষয়ে।

◆ তাহলে আমরা এখন রয়েছি '৭১-এর মার্চে যখন ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ স্থগিত করার ঘোষণা দেন। তখন আপনার কী মনে হয়েছিল? ইয়াহিয়া খান ও পিপিপি'র মধ্যে এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর মধ্যে কোন রকমের একটা আঁতাত ছিল কি?

Δ এখানে সমস্যা এই যে, ঐ চক্রে মুষ্টিমেয় যে ক'জন ছিল, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম না।

◆ তাহলে কারা ছিল?

Δ মুস্তাফা খার, রহিম ও রফি রেজা।

◆ কিন্তু আপনি যে চক্রের কথা বলছেন, রফি রেজা তাতে থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, আমি এ বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি। তবে হতেও পারে, ২৬ বছর—ঢের সময় কেটেছে তো...।

Δ না, ২৬ বছর বলে কথা নয়। রফি ছিল ভুট্টোর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ।

◆ ঠিক, আরও অনেকে এ রকমই লিখেছেন।

Δ সে ছিল ভুট্টোর সবচেয়ে কাছের লোক। মুস্তাফা খারও তাই।

◆ গতকাল আমি জনাব খারের সাথে কথা বলেছি। তিনি ইসলামাবাদ রওনা হচ্ছিলেন। যা হোক, তিনি আমাকে তাঁর ইসলামাবাদের টেলিফোন নম্বর দিয়েছেন, মনে হলো এ বিষয়ে কথা বলতে পারলে খুশিই হবেন।

Δ তিনিই আসল লোক।

◆ আপনিও ঐ সময় নীতিনির্ধারণে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন।

Δ বলেছেন, কিন্তু আমি তা ছিলাম না। আমি ১ জানুয়ারির আলোচনা বৈঠকে ছিলাম না, পিপিপি'র যে দলটি শেখ মুজিবের দলের সাথে আলোচনায় বসে আমি তার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। এমনকি যে নৌযানে এই দুই দল যমুনা-বুড়িগঙ্গায় নৌবিহারে যায় তাতেও আমি ছিলাম না। তবে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক অভিযান যখন শুরু, আমি সেখানে ছিলাম।

◆ লারকানা পরিকল্পনাটি কী? কোন সময় কি আপনার মনে হয় যে, এর নেপথ্যে সত্যতা আছে? অন্য সব রাজনৈতিক দল মনে করে, এমনকি জেনারেল নিয়াজীর অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থেও মতপ্রকাশ করা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তার জন্য ভুট্টো কোন না কোনভাবে দায়ী। তাই আপনি কি মনে করেন লারকানা পরিকল্পনার অস্তিত্ব ছিল কিংবা থাকা সম্ভব? আপনি খোলাখুলি বলতে পারেন। আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমরা আর আপনার কাছে আসব না।

Δ আমার মাথায় একেবারেই আসে না যে, ভুট্টো ভাবতে পেরেছিলেন দেশ খণ্ডিত হওয়া উচিত।

◆ না, দেশ ভাগ হবার কথা নয়। কী জন্য দেশ ভেঙেছে—সেটি ভিন্ন কথা। তবে কথা হলো ঐ সময় এই মর্মে জোর বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, বাঙালীদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে তাদের দমন করা যাবে। আর বাস্তবিকপক্ষেও রফি রেজা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, ১৯৬৯-এর আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান যখন ক্ষমতা ছাড়েন তখন সবকিছু চুপচাপ হয়ে যায়। এর ইশারা বা সঙ্কেত ছিল এই যে, সামরিক শাসন আসুক, কিছু এ্যাকশন নিক, সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একটা অনুমিত ধারণার বশে পাকিস্তানের শাসকেরা ব্যাপক আকারে অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। ওরা ভেবেছিল, বাঙালীরা ভয় পেয়ে শামুকের মতো খোলের মধ্যে গুটিয়ে যাবে। আর তখন ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে নিজের দরদস্তুর অনুযায়ী দরকষাকষিতে বসতে পারবেন।

Δ '৭১-এর জুলাইয়ে, হ্যাঁ, আমার ধারণা তখন জুলাই মাসই হবে—ইয়াহিয়া খান করাচীতে ছিলেন। ঐ সময় ভুট্টো আমাকে গাড়ি চালিয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্ট হাউসে নিয়ে যাবার জন্য বলেন। আমি কথামতো গাড়িতে ভুট্টোকে প্রেসিডেন্ট হাউসে পৌঁছে দিয়ে বাইরে অপেক্ষায় থাকি। এক সময় ভুট্টো সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, "ডক্টর, দেশকে বাঁচানো যাবে বলে কি আপনি মনে করেন?" আমি বলেছিলাম, "মনে হয় না।" তিনি বললেন, "আমার তো মনে হয়, এখনও দেশকে রক্ষা করা যায়। সেনাবাহিনী উন্মত্ত, বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। তবে রাজনীতি যথাযথ হলে দেশকে বাঁচানো সম্ভব।"

◆ মার্চে কী ঘটে তা কি আপনি জানেন? আপনি তো তখন ঢাকাতেই ছিলেন। আপনি কি জানতেন কিংবা বলতে পারেন, 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর পরিকল্পনা কী ছিল?

∆ আমরা খুব আশঙ্কা করছিলাম, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। বেলা অনুমান ৪টার দিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দশতলার জানালা থেকে দেখলাম, পাশেই রেডিও স্টেশন ভবনে সৈন্য আসতে শুরু করেছে। আমি ভুট্টোর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, আলামত আদৌ ভাল নয়। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তিনি এরপর আমার সাথে এসে জানালা থেকে সৈন্যদের আনাগোনা নিজ চোখে দেখলেন। একমাত্র জে এ রহিম ছাড়া পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের কেউ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে ছিলেন না। এর এক বা দু'দিন আগে ভুট্টোর সাথে আমি যখন বসে আছি তখন রহিম এসে ভুট্টোকে বললেন, "আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আপনার উচিত হবে ইয়াহিয়াকে বলা।" ভুট্টো চিৎকার করে বললেন, "রহিম, ও কাজটা আমায় দিয়ে হবে না, তবে তোমার যখন এতই খায়েশ তুমি নিজেই গিয়ে ইয়াহিয়ার সাথে কথা বলো।" রহিম বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে আমিই যাব।" জানা গেল যে, রহিম সাবেক ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোক। সে এমন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। রহিম জবাবে আরও বলেছিলেন, "ঠিক আছে, আমি যাব, ইয়াহিয়ার সাথে কথা বলব। এখন তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।" ভুট্টো মুস্তাফা খারকে ইয়াহিয়া খানের সাথে এ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে বললেন টেলিফোনে। ব্যবস্থা হলো। রহিম গিয়ে ইয়াহিয়ার সাথে কথা বললেন। তবে কী কথা হলো সেটি রহিম আমার উপস্থিতিতে ভুট্টোকে জানালেন না। কিন্তু এরপর ভুট্টো রহিমকে নিয়ে তুমুল ঠাট্টা-মশকরা করে বললেন, "রহিম একটা আস্ত বোকা। ইয়াহিয়া তাঁকে চমৎকার সৌজন্য দেখিয়ে গ্রহণ করেন। আর তাতে রহিমের মনে হয়, ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে মতামত বদলানো যায়।" তাই এসবের আলোকে ও আমি যা জানি তাতে আমি অত্যন্ত জোর গলাতেই বলব যে, ভুট্টোর এ ধরনের পরিকল্পনা ছিল কিংবা তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য আলাদা পরিকল্পনা চেয়েছিলেন।

◆ ড. মুবাশ্বির, আপনি বলেছেন, পিপিপি ৬ দফার সাড়ে পাঁচ দফাই মেনে নিয়েছিল। এই আধা দফা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন যা ছিল আপনাদের বিষয়? ব্যাখ্যা করে বলবেন?

∆ প্রাদেশিক ও নিখিল ভারতীয় স্বার্থের সংঘাতের কারণে পাঞ্জাবীরা উপমহাদেশের অন্যত্র বসবাসকারী তাদের স্বধর্মাবলম্বী অন্যান্য মুসলিমের কাছ থেকে সরে গিয়ে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ও তাদের নিজেদের জন্য একটা দাবি খাড়া করার সিদ্ধান্ত নেয়, যার সাথে সামগ্রিকভাবে উপমহাদেশের যোগসূত্র তুলনামূলকভাবে অতি সামান্য; বরং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ঢের বেশি। স্যার ম্যালকম হিলি পাঞ্জাবী মুসলমানদের মানসে এ পরিবর্তন সম্পর্কে তৎকালে ব্রিটেনের ইন্ডিয়া অফিসে স্থায়ী রাষ্ট্রসচিব আর্মার হিজেলকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেছিলেন। এই পত্রের বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, পাঞ্জাবীদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনাস্রোত কতখানি এগিয়ে গেছে। আমি এখন সেই চিঠির বরাত দেব। তাদের ধারণা ভারতের বিভিন্ন বিপুল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে অন্যান্য মুসলিমের সঙ্গে তাদের স্বার্থ একান্তই এক ও অভিন্ন নয়। আর তাই তারা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ থেকে আলাদা হয়ে তাদের নিজস্ব ফেডারেশন পত্তনের বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব

সহকারে ভাবে। তাদের এই ভাবনা অনুযায়ী তাদের সেই নিজস্ব ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে পাঞ্জাব, ইউপির বিভিন্ন অংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু। পাঞ্জাবে সিন্ধুকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পাঞ্জাব প্রদেশের উত্তর-পূর্বের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলোসহ দিল্লী পর্যন্ত ছেড়ে দেয়ার বিষয় এ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা প্রকাশ্যে এ কথা বলে যে, পরিকল্পনাটি আসলে আরও বৃহত্তর ফেডারেশনের প্রস্তুতিমাত্র, যার আওতায় আসবে গোটা আফগানিস্তান ও সম্ভবত ইরান। এখন বলা হচ্ছে, পরিকল্পনাটি যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী সন্দেহ নেই। হিলি এ পরিকল্পনার একটি সামগ্রিক ছবি তুলে ধরেছেন, আরও তুলে ধরতে ভোলেননি বঙ্গদেশে মুসলিম বাইদের প্রতি পাঞ্জাবীদের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিও। হিলি বলেছেন, "আপনি লক্ষ্য করবেন, ভবিষ্যতের যে স্বপ্নের ইঙ্গিত আমি দিয়েছি তাতে বাংলা অন্তর্ভুক্ত নেই। আপাতত উত্তর ভারতের মুসলমানরা বাংলায় তাদের স্বধর্মীদের এই বিবেচনায় বিসর্জন দিয়েছে যে, ওরা কোন কর্মেরই নয় আর দৃশ্যত ইসলামের স্বার্থে পাঞ্জাবীরা বাংলা থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে না। পাকিস্তান সৃষ্টির ২০ বছর ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছর আগে অবস্থা ছিল...।

◆ মোটামুটি এই হলো সংক্ষেপ?

Δ এ হলো একটি বরাত ডেভিড পেজ রচিত ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস দিল্লী প্রকাশিত *Prelude of Partition* গ্রন্থ থেকে।

◆ ২৫ মার্চের কথায় ফিরে আসি। ২৬ মার্চ আপনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসেন। তারপরে বাংলাদেশে কী ঘটনা ঘটেছে তা কি সত্যই জানতেন? পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতার কথা জানতেন?

Δ কিছুই না, অন্তত ঐ সময়ে।

◆ আমি বলতে চাই মার্চ থেকে ডিসেম্বর মেয়াদের ঘটনার কিছুই জানতেন না আপনি?

Δ আমরা কিছু জানতাম না, সেটাই কথা নয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ অধ্যাপক রেহমান সোবহান-এর দেশ শাসন সম্পর্কিত যে পুস্তক প্রকাশ করেছে তাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। আমরা এ সবের কিছুই জানতাম না। পূর্ব পাকিস্তানে যা হচ্ছিল সে বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কিছুই জানা ছিল না।

◆ পূর্ব পাকিস্তানে অবিচার বলতে কী বোঝাতে চান? '৭১-এর নয় মাসের কি?

Δ না, না, আমি বলছি গত ২৪ বছরের কথা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ অবধি। পাকিস্তানে কথিত সামরিক এ্যাকশন সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজনও জানত না। পাকিস্তানের ফেডারেল সরকার সুদীর্ঘ দুই যুগ ধরে প্রদেশটির সাথে কী আচরণ করেছে তা কখনও জানতে পারেনি।

◆ আপনি কি আম জনসাধারণের কথা বলছেন, না কি নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেই বলছেন?

Δ বলতে পারছি না।

◆ ডক্টর মুবাশ্বির, আপনি একজন বড় দরের প্রগতিবাদী নেতা, সবকিছুই আপনার নাগালে ছিল...।

∆ তবু আমি জানতাম না। কখনও এসব আমার গোচরে আসেনি।

◆ এ সবের মহড়া অনুশীলন চলেছিল পরিকল্পনা কমিশনে। আমি মনে করি, আইয়ুব খান পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সমতার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তিনি স্বীকার করেছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ছিল। আর কেবল সে সময়েই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা তাদের পাওনার ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা বলতে থাকে, তোমরা আমাদের পাটের টাকায় তোমাদের অবকাঠামোগুলো গড়েছো। এভাবে স্বীকৃত হয় যে, আদতেই পাটের টাকা এমন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল। আর এ আলোচনা হচ্ছিল খোলাখুলি। আর আপনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি ছিলেন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী। তাতে আমি আশ্চর্যই হচ্ছি আপনি এ সবের কিছুই জানতেন না?

∆ আমি অর্থমন্ত্রী হয়েছিলাম ঠিকই, তবে গোটা ব্যাপারটাই ছিল হেঁয়ালিময়। আমি আর্থিক বিষয়ের কিছুই জানতাম না। একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে আটকে ছিলাম। আর মন্ত্রিত্বের কথা বলছেন? সামরিক আইন আদেশে সে মন্ত্রিত্ব খতম হয়ে যায়। আমি সাধারণ অজ্ঞতার কথাই বলছি।

◆ আমি নিশ্চিত যে রাজনৈতিক শীর্ষমহলের এসব জানা থাকার কথা।

∆ না, না, মোটেও তা নয়।

◆ ২৫ মার্চের ঘটনার পর সংবাদ মাধ্যম তো আপনার নাগালে ছিল। আপনি খবরের কাগজ পড়তেন, বিবিসি শুনতেন।

∆ এখানে এসবের কোন কিছুরই নাগাল মেলেনি।

◆ পাকিস্তান সরকারের জবানিতে বিবিসি ভারত ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের বৈ কিছুই ছিল না। আপনি কি সরকারের এ ধারণার অংশীদার?

∆ মোটেও নয়।

◆ তাহলে আপনি বিবিসি বা ভিওএ'র খবর শুনতেন কিংবা নিউজউইক, টাইম ম্যাগাজিন পড়তেন? সবকিছুই তো আপনার নাগালে ছিল। কারণ, আপনি তো ড. মুবাশ্বির হাসান, আপনি পাকিস্তানের কোন সাধারণ নাগরিক নন। সামরিক সরকার আপনাকে বরখাস্ত করে আপনার বামপন্থী মতবাদের জন্য।

∆ দেখুন, এখানে এসবের কিছু পৌছায়নি। আর জানেনই তো সামরিক আইনের প্রচারণা নামক বস্তুটি কী?

◆ আমি তো বলব আপনি সামরিক আইনের প্রচারণাই বিশ্বাস করতেন।

∆ আমি এসবে বিশ্বাস করতাম না। বরং সামরিক আইনের আওতায় যা করা হচ্ছিল আমরা তার বিরোধী ছিলাম।

◆ দেখুন, এসব যখন ঘটে চলেছে তখন বেগম তাহেরা মাযহার আলী এক দল লোক নিয়ে এসবের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ করেন। আর সেটি যে লাহোরে ঘটে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অথচ আপনি কিছুই জানেন না? অদ্ভুত তাই না? কেননা, ট্রানজিস্টর আপনার

হাতের নাগালে না থাকার কথা নয়, খবরের কাগজও পেতেন। অথচ লোকজন, আমি বলতে চাইছি, পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা বলছে, আমরা কিছুই জানতাম না।

▲ কথাটা সত্য।

◆ বহু লোক আমাদের বলেছে তারা ঘটনা জানত। তবে মার্শাল ল থাকায় কোন্ বিপদ আসে সেই ভয়ে সামরিক বাহিনীর ভয়ে তারা কিছু বলেনি। তারা রাস্তায় বেরিয়ে আসতে ভয় পেত। তাদের এ পরিস্থিতি অবশ্য বেশ বোধগম্য। তবে ঘটনা সকলেরই জানা।

▲ রাস্তায় বেরিয়ে আসা, সামরিক আইনের আমলে! আপনি জানেন ভুট্টোর ফাঁসি হবার পর... কেউ রাস্তায় বেরিয়ে আসেনি?

◆ কথা ঠিক। এটি খুবই বোধগম্য। কোন কিছু না জানা, আর জেনে না করা এক নয়। তারা জানত, কিছু করেনি।

▲ গোটা এ্যাকশনই ছিল অন্যায়। অত্যাচার, নৃশংসতার ব্যাপ্তি জানা যায়নি।

◆ কোন সময় কি আপনার মনে জাগেনি যে, এতে আপনার দলের অবদান ছিল? আপনার পার্টি এই সামরিক ব্যবস্থা ও সুদীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ তো এড়াতেও পারত?

▲ এখন অবশ্য নেপথ্য বিষয় আলোয় আসার পর আমি বলব যে, বাংলাদেশের সৃষ্টি ছিল অনিবার্য। কিন্তু আমরা পাকিস্তানের জনসাধারণ, বিশেষ করে, বাংলাদেশের মানুষ সে জন্য যে মূল্য দিয়েছে তার কোন দরকার ছিল না। যেমনটি একদা আমি বিশ্বাস করেছি পাকিস্তানের আবির্ভাব অনিবার্য। একে ঠেকানো যাবে না। ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের জন্ম না হলে এটা '৫৭ বা '৬৭ যে কোন এক সময় হতে পারত। কেননা, সাম্রাজ্যবাদী জাতের জাতীয়তাবাদের পোকা এমনই চীজ, এমনই অন্যায় পদ্ধতির উদগাতা যার আওতায় অন্য বিরোধী জাতিগোষ্ঠীর জনসমষ্টির অভাব-অভিযোগের সুরাহা এক বিশেষ ভাষাভাষী গোষ্ঠীর শাসকশ্রেণীর শাসনে করা যায় না, করা যায় না কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর সক্রিয়তাকে একান্ত উপেক্ষা করে...।

◆ তো বলুন, '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের প্রতিক্রিয়া কী?

▲ প্রতিক্রিয়া আর কী! সার্বিক বিপর্যয়।

◆ না বলব যে, পিপিপি'র জন্য ওটা খুশির ব্যাপার, কেননা...।

▲ না, না, কারও কাছে বিষয়টি আনন্দের ছিল না। এটি বড় রকমের আঘাত হিসাবেই আসে। আঘাত এ কারণে যে, এসব ঘটনা এত বিপুল প্রাণ হরণ করেছে। ওরা সকলেই ভেবেছিল, এ ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি যে বই লিখছি তাতে আমি দেখাব যে, আমরা তখন আমাদের দলের জন্য খুবই খারাপ কিছুই আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু এখন দেখা গেল, নরক নেমে আসবে মাটিতে আর তা আমাদের ধ্বংস করে দেবে যেমনটি আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু এসবের পরেও আমরা জানতাম না সেনাবাহিনীর ভিতরে কী ঘটেছে। সেনাবাহিনীই ক্ষমতা সমর্পণ করে। কোন শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা আমাদের হাতে আসেনি। সেনাবাহিনী শুধু তখনকার মতো ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। ১৯৭৭-এ আবার ফিরে আসে।

◆ ইতিহাসের যা জানা উচিত অথচ কিছু একটা প্রকাশ করা হয়নি, গোপন রাখা হয়েছে বলে মনে করেন সে ব্যাপারে আপনি কি আমাদের কাছে বলতে পারেন? ইতিহাসের শুদ্ধতার স্বার্থেই সেটা কী তা বেরিয়ে আসা দরকার।

∆ আমি মনে করি, সত্যিকারের কী ধারণায় সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়েছে তা কোনদিনই জানা যাবে না। এর কারণ, পরাজয়ের, বিশেষ করে, চারদিকে শুধু নিরেট পরাজয়ের গ্লানির পটভূমিকায় কেউ দায়িত্ব নিতে চাইবে না। বিজয়ের পিতৃত্বের দাবিদার অনেকেই, পরাজয়—সে তো মাতৃ পিতৃহারা এতিম। ও কথা কোনকালেই জানা যাবে না। তবে এ ঘটনা মানবেতিহাসের অন্যতম ট্রাজেডি, ইতিহাস ট্রাজেডিতে সমাকীর্ণ, নয় কি! তবে এ থেকে বড় যে দিকটি আজও রয়েছে তা থেকে পাঠ নেয়া হয়নি। এটি শুধু যে পাকিস্তানে হয়নি তা নয়, ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাতেও হয়নি। শিক্ষাটি হলো এই যে, আর্থ সামাজিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকেন্দ্রায়ন এবং ব্রিটিশের রেখে যাওয়া শাসকশ্রেণীর এই অবশেষ থেকে ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত উপমহাদেশের কোন একটি দেশের ভিতরেও বা দেশগুলোর মধ্যে শান্তি আসবে না। এ আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিটি মূল দাগী আসামী আর অন্য আসামী হলো সত্যিকারের স্বার্থ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতার, আমাদের শিক্ষার অভাব ইত্যাদি।

◆ সব কিছু শুধরে নেবার একটি আন্দোলন বা দাবি ছিল। আপনি কি সে ধরনের আন্দোলনকে সমর্থন জানাবেন?

∆ ব্যক্তিগতভাবে আমি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার সকল বিধিনিষেধ তুলে নেয়ার পক্ষপাতী। আমার মতে বাণিজ্য, ভ্রমণ ও সাংস্কৃতিক লেনদেন অবাধ হওয়া উচিত।

◆ এর সূচনা হতে পারে কেমন করে? কিছুটা পরিমাণে বিধিনিষেধমুক্ত অবস্থা তো রয়েছেই। সমস্যা তেমন হবার কথা নয়।

∆ আছে, ভিসা রয়েছে, ভিসা, ফ্রি ভিসা হতে হবে।

◆ আমরা নিউজলাইনে এআই রহমানের একটি নিবন্ধ লক্ষ্য করেছি। নিবন্ধে এ যুক্তি সমর্থন করা হয়েছে যে, ১৯৭১-এ যা ঘটেছে সে জন্য পাকিস্তানের উচিত বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আপনার কী মত?

∆ আমি মনে করি, পাকিস্তানের তা করা উচিত একশ'বার। তবে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে কেবলই ক্ষমা প্রার্থনা অর্থহীন। ঠিক এ কথাই আমি বোঝাতে চাই। আমরা অত্যন্ত কপটাচারীর মতো ইসলামের কথা বলি। বলি, ইসলাম হলো ঐক্য নির্ধারক উপাদান। তা হলে সে ঐক্য কোথায়?

আ ই এ র হ মা ন

[জনাব আই এ রহমান পাকিস্তানের একজন প্রখ্যাত প্রগতিশীল সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত। এ কারণে চাকরি জীবনে তাঁকে নানা রকম নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। বর্তমানে পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক। এ ছাড়া নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কলাম লিখে থাকেন। লাহোরে পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশনের দফতরে তাঁর এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।]

◆ ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের পর শেখ মুজিবুর রহমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর থেকেই ভুট্টো তাঁর সাথে দরকষাকষির আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার কী মনে আছে?

∆ ১৯৭০-এর পর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কয়েকজন সাংবাদিক পত্র-পত্রিকায় নির্বাচনী রায় মেনে নেয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টির কথা বলেছিলাম। আমাদের তখন চাকরিচ্যুত করা হয়। আমাদের চাকরি যায় এজন্যে যে, আমরা এক সাংবাদিক ধর্মঘটের আয়োজন করেছিলাম। সে ধর্মঘট করেছিল পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস। ইয়াহিয়ার গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের খবরের কাগজ বের করে আমরা সেদিন আমাদেরকে চাকরিচ্যুত করার জবাব দিয়েছিলাম। আর এমনি করেই আমরা সেদিন সেই পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ি। ১৯৭০-এর জানুয়ারিতে ঢাকায় পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস-এর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমরা সে সময় একটা সনাতন প্রচলিত ধারণা বদলে ফেলার চেষ্টা করি। ধারণাটি এই যে, পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একটা বেশ ভাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, আর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় একই অবস্থায় থাকবে পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ। আসলে বিষয়টি হবে উভয় দলের জন্যই ভিন্নতর। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা সমঝোতা গড়ে উঠবে। পিপলস পার্টি দৃশ্যপটে আসার আগে এ রকমটাই অন্তত আমাদের কাছে মনে হয়। আমরা আমাদের ঢাকার বন্ধুদের এ কথা জানানো দরকার বলে মনে করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

আমরা তাদের সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করি আর যা-ই হোক, কাউন্সিল মুসলিম লীগের ঝুড়িতে সব আশা-ভরসার ডিম রেখে তা দেয়া চলবে না, ঐ ঝুড়িতে সব ডিম রাখবেন না। আর পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতরেই নতুন বাস্তবতার সৃষ্টি হবে, তার মোকাবিলায় আপনাদের তৈরি থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কয়েকজন বন্ধু ও সাংবাদিকতা পেশার সিনিয়র সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনায় আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে শতকরা ৯৫টি আসন পাবে। আর তাই আমার কাছে মনে হলো, পশ্চিম পাকিস্তানীদের জানিয়ে দেয়া উচিত হবে যে, তাদের আকাশ-কুসুম স্বপ্নবিলাসের কোনই অবকাশ নেই। পূর্ব বাংলার মানুষ বিপুলভাবে আওয়ামী লীগকেই ভোট দিতে চলেছে। আর তাই তাদের উচিত হবে আগামীতে যারা ক্ষমতায় আসবে সেই শক্তিগুলোর সাথে গণতান্ত্রিক পন্থায় আলাপ-আলোচনায় বসে একটি নিষ্পত্তিতে আসা ও সেভাবে তাদেরকে মোকাবিলা করা। বস্তুত এক সাপ্তাহিক পত্রিকার এক সম্পাদক আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি নিজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে কাজটি করব কি না। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আগে আমরা বলেছিলাম, দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ওপর। আমরা এ বিষয়ে লিখেছি। সেটিই ছিল আমাদের অবস্থান। ১৯৭০-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর আমরা, বিশেষ করে সাংবাদিকতায় আমাদের অন্যতম সিনিয়র সহযোগী আব্দুল্লাহ মালিক ইতিবাচকভাবে চেষ্টা করেছিলেন যাতে করে শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী এক সংলাপে মিলিত হয়ে ইস্যুগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। আর সে আলোচনায় সমস্যার একটা গণতান্ত্রিক নিষ্পত্তিতে পৌছান। আমাদের হয়ত ভুল হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়েছিল, যদি বিবদমান ইস্যুগুলো নিয়ে অন্তত সাময়িকভাবে হলেও তাঁরা রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে পৌছুতে পারতেন তাহলে তা সবার জন্য কল্যাণকর হতো এবং তেমন নিষ্পত্তি আইনের দৃষ্টিতেও বৈধ হতো । শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে সহজ ও মসৃণ করে তোলার জন্যও আমরা প্রস্তাব করেছিলাম। রাজনৈতিক নেতারা একে অন্যকে জানেন কেবল প্রকাশ্য বিবৃতি কিংবা সংবাদপত্রের বদৌলতে, সংবাদপত্রে তাঁদের গড়ে ওঠা ভাবমূর্তির কারণে। আমরা এ রকমই মনে করেছিলাম। ঘটনা আসলে যা ছিল না পরে সেটাকে তেমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর একটা কারণ হলো, ভুট্টো ঢাকা থেকে ফেরার পর তিনি তাঁর দলীয় এমপিদের সাথে লাহোরে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের সাথে তাঁর নানা বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। এ আলোচনায় দুই তরফের মতামতই প্রকাশ পায়। কারও কারও মতে, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পিপলস পার্টির অবশ্যই সহযোগিতা করা উচিত। কেননা, সেটিই সঙ্কট এড়ানোর একমাত্র উপায়। পশ্চিম পাকিস্তানে থাকা বা আসার অবকাশ ঘটলে শেখ মুজিবের অবস্থানে নমনীয়তা আসতেও পারত। এ রকম একটা প্রস্তাবে সাড়া পাওয়া যায়। ভুট্টো নিজেও উল্লেখ করেছেন যে, শেখ মুজিব তাঁর মন্ত্রিসভায় পশ্চিম পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে কয়েকটি পদ দেবার প্রস্তাব করেছেন। ঐ বৈঠকে এসব আলোচনা হয়। তবে ফলাফল শেষাবধি শূন্যে পর্যবসিত হয়। আর তারপর থেকেই অবস্থার অবনতি শুরু হয়। সে সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ। ঐ সময় দুটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। এক. পূর্ব পাকিস্তানে তথা পূর্ব বাংলায় ক্রমবর্ধমান হারে এমন এক ধারণা গড়ে উঠতে থাকে যে, সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে আন্তরিক নয়। দুই. আমরাও সেনাবাহিনীর জেনারেলদের সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠি। কেননা, তাঁরা নেতাদের সাথে আলাদা আলাদা কথা বলছিলেন। ভুট্টোর সাথে কথা বলছিলেন স্বতন্ত্রভাবে, কথা বলছিলেন অন্যদের সাথেও, পৃথক ও একান্তে। আমরা তাই আমাদের অনুভূতির কথা জানিয়ে বলেছিলাম, একটা কিছু গলদ কোথাও হয়ত আছে। আর তারপরেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায়। সুনিশ্চিতভাবেই একটি মারণাঘাত আসে এভাবে। সম্ভাব্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ঠেকাতে আমরা চেষ্টা করেছি। আর সেই সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর আমরা আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগে দেশের এই পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জনমতকে ঐ ঘটনার নিন্দার পক্ষে নেবার চেষ্টা করেছি।

◆ জনাব রহমান, ঐ সময়কার সংবাদপত্রের ভূমিকা কী ছিল সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। কেননা, আমার ধারণা ঐ সময় খবরের কাগজগুলোর ভূমিকা ছিল একান্তই নেতিবাচক।

∆ হ্যাঁ, নেতিবাচক ছিল একেবারে গোড়া থেকেই। যে কয়টি বছর আমরা একত্রে ছিলাম পাকিস্তানী আদর্শের ও স্বার্থের রক্ষাবরদাররা পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে সব সময় পূর্ব বাংলার নেতিবাচক ছবিই তুলে ধরেছে। ওরা পূর্ব পাকিস্তানীদের গাত্রবর্ণের কথা তুলত। তারা বলত, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাঞ্জাবীদের মতো সামরিক নরগোষ্ঠী (জাতি) নয়। আমাদেরকে একনাগাড়ে বলা হতো, পূর্ব বাংলার লোকেরা হিন্দু শিক্ষকদের প্রভাবে প্রভাবিত। তাদের চিন্তার মৌলিকতা বা স্বকীয়তা নেই। তাদের মধ্যে দেশপ্রেমবোধও নেই। তাদের বলার ভাবখানি এমনই যে, দেশপ্রেম যা কিছু তা কেবল লাহোর নগরীতেই অন্তরীণ। আমি একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। আগে বলেছি, আমরা আমাদের নিজস্ব একটি পত্রিকা বের করেছিলাম। আমরা সেই কাগজের পক্ষ থেকে দেশের পূর্বাঞ্চলে যে সামরিক অভিযান চলেছে তার নিন্দা জানানোর জন্য এক গণস্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করি। কিন্তু সে অভিযানে আমরা লাহোর নগরীর সাহসী ৪৮ ব্যক্তির সই নিতে সক্ষম হই। তাঁরা যে বিবৃতিতে সই দেন তাতে বলা হয় আমরা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের নিন্দা জানাই। আমরা জনগণের অধিকারের ভিত্তিতে একটা রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য আহ্বান জানাই। আর ঐ বিবৃতিটি আমরা আমাদের কাগজে প্রকাশ করি। আর কোন পত্রিকারই মনোযোগ আকর্ষণ করেনি ঐ বিবৃতিটি। এমনকি ঐ বিবৃতির একটি লাইনও ছাপার যোগ্য বিবেচিত হয়নি তাদের কাছে। অথচ, যাঁরা ঐ বিবৃতিটিতে সই দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। আমার মনে পড়ে তাঁদের অন্যতম ছিলেন এয়ার মার্শাল (অবঃ) নূর খান। দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট আইনবিদ, সক্রিয় নারী কর্মীও সই করেছিলেন বিবৃতিটিতে। কিন্তু এর জন্য সেদিন আমাদেরকে ইন্দো-সোভিয়েট-বাংলা চক্রের এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। আমাদের অন্যতম সহযোগী জনাব আব্দুল্লাহ মালিক 'বাংলাদেশ'—এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। একটি সামরিক আদালত তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় ও এক লাখ রুপী জরিমানা করে।

জনাব আব্দুল্লাহ মালিক ছিলেন আমাদের পত্রিকার সম্পাদকীয় পরিষদের অন্যতম সদস্য। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সেখানে এক ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সে ভাষণে বলেছিলেন যে, তিনি সকল মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সমর্থন করেন। বাংলাদেশের মানুষেরও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রয়েছে। সামরিক আদালতে তাঁর এই অপরাধেরও বিচার হয়। আদালতের প্রিসাইডিং অফিসার তাঁকে বলেছিলেন, আপনার বৃদ্ধ বয়সের বিবেচনায় আমি আপনাকে বেত্রাঘাত করার দণ্ড দিচ্ছি না। যা হোক, বিচারানুষ্ঠানটি প্রহসনে পর্যবসিত হয়।

এ নিয়ে খবরের কাগজগুলোতে কোন রকম প্রতিক্রিয়া যে হয়নি তা নয়। তবে সেটি ছিল এক ধরনের লোক দেখানো, ছলনাময়, আকাশ থেকে পড়ার মতোই ঘটনা। আমি ওটাকে ওভাবেই বলতে চাই। কেননা, এর বহু আগে থেকে যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল তা যদি তাদের বিবেককে আদৌ নাড়া না দিয়ে থাকে তাহলে ঢাকার পতনে আসমান থেকে জমিনে পড়ার মতো ঘটনাই বা ঘটবে কেন? তার অনেক আগে থেকেই তো সবকিছুই ঘটে যাচ্ছিল। আমরা জানি সেদিন লাহোর ও করাচী থেকে হাওয়াই সফরে অনেকে হুড়োহুড়ি করে ঢাকায় যাচ্ছিল সম্পত্তি, লাইসেন্স-পারমিট, পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাগানোর জন্য—জাতীয় পরিষদের শূন্য আসনগুলোর বেলাতেও সে রকমটিই চলছিল; দালানবাড়ি, সম্পত্তির ক্ষেত্রেও একই কথা। কাজেই এ কথা ধরে নেয়া যায় যে, তখনকার চলতি ভয়ানক ঘটনাতেও তারা বিবেকের দংশন অনুভব করেনি। জনাব মহিউদ্দিন, আপনি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগীদের* জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, ১৯৭১-এর সংঘাতের সময় ভারতের ভূমিকা কী ছিল তার ওপর একটা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য তাঁরা এখানে এসেছিলেন। ঐ সমীক্ষার প্রতিবেদন তো পাওয়া যাওয়ারই কথা।

◆ কিন্তু এখানে সবাই বলছেন, তখন বাংলাদেশে কী হচ্ছিল তা তারা জানতেন না।

∆ আমি বলতে চাই, পূর্ব পাকিস্তানে তখন কী হচ্ছিল তা তাদের জানা ছিল। আর তাই আকাশ থেকে পড়ার মতো বিস্ময়ের ব্যাপারটা তাদের অভিনয় বৈ নয়। রাস্তায় বিক্ষোভ হয়েছে, পত্রিকাগুলো বলেছে ইয়াহিয়া খান নিজেই শাসনতন্ত্র ইস্যু করেছেন, আর সকল সংবাদপত্রকে ঐ শাসনতন্ত্র প্রকাশ করার নির্দেশও জারি করেছেন। আর তখন কে যেন এ কথা বলে—আমার মনে হয় কেউ যেন নির্দেশটা পড়ে বলেও ছিল যে, তথ্য সচিব বলেছেন যে, খবরের কাগজগুলো ওটা ছাপাতে অস্বীকার করছে কিংবা ওটা ছাপাতে সম্মত হবে না—এরকম একটা কিছু। জানা যায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান প্রতিটি খবরের কাগজের অফিসে সেনা কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছিলেন সংবাদপত্রের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে বসতে। সংবাদপত্রের সম্পাদকরা বলেছিলেন, তাঁরা ও-কাজটি করতে চান না। তাঁরা বরং রাস্তায় জনতার সাথে তাঁদের বিবেচনায় সামরিক পরাজয় ও অপমানের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভে যোগ দেন। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এখনও এ কারণে খুবই দুঃখিত যে, আসলে তাঁদের আরও বহু আগেই অপমানিত বোধ করার মতো অতীব গুরুতর কারণ ঘটে গিয়েছিল; তখন কিন্তু সে কাজটি করা হয়নি। আমি সব সময় মনে করেছি যে, সংখ্যা কী তা নিয়ে

---

* এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগীদের বলতে পাঞ্জাব বিশ্বদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহিউদ্দিন আহমেদ ১৯৬৯-৭০ সালে স্বল্পপরিসরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করায় এই উক্তি করা হয়েছে।

মতভেদ থাকতে পারে—সেটি ধর্তব্যে না এনেও অনায়াসে আমরা স্বীকার করতে পারি যে, মুসলমানের হাতেই মুসলমান মারা গেছে অনেক বেশি। গোটা উপমহাদেশে আমাদের পরিস্থিতিতে যত মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে ইংরেজ ও হিন্দুর হাতেও তত মুসলমান প্রাণ হারায়নি।

◆ কিন্তু কেন এমন হলো বা হচ্ছে?

Δ এর নেপথ্যে সামগ্রিক একটা মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে হয়ত বা। অনেকে এটিকে বলেছেন, এক ধরনের জাতিগোষ্ঠিক মনস্তত্ত্ব; অনেকে আবার একে বলেছেন, গণ বা দেহাতি মানসিকতা। তবে অত্যন্ত নির্মম বাস্তবতা হলো এই যে, আপনি যদি একবার রক্তপাত শুরু করেন তাহলে আরও বেশি রক্তপাত ঘটাবেন আপনি। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, তার কথা অন্যকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং এ জন্য সে যদি বলপ্রয়োগ করে, তাহলে সে কাজটি হবে স্বীয় মত গ্রহণ করার জন্য অন্য কারও ওপর বলপ্রয়োগ করা। আপনি তলোয়ার ব্যবহার করবেন, আপনি কামান, রকেট যা ইচ্ছা অস্ত্র ব্যবহার করবেন, কিছু একটা করতে পারেন মতবিরোধ হলেই। তা হলে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা ঐ সব অস্ত্র ব্যবহার করবে সুন্নীদের বিরুদ্ধে—সুন্নীরা একই পথ ধরবে, পাঠান যাবে মোহাজিরের বিরুদ্ধে, মোহাজির যাবে সিন্ধীদের বিরুদ্ধে, আর এভাবে ঐ ভয়ানক সংস্কৃতির মহামারী চলতেই থাকবে। রক্তের স্বাদ আমরা পেয়েছি, তাই এ হানাহানির কখনও শেষ হবে না।

◆ তা হলে এই সমস্যা সমাধানের পথ কী?

Δ সমস্যা ছিল, থাকতেই পারে তবে তার সমাধান হওয়া উচিত ছিল নমনীয় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়। কেন তাহলে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, কেন সেটি থাকবে বা থাকবে না— এ নিয়ে কারও অনড় অবস্থান নেয়া উচিত হবে না। ওটা আমাদের মাথাব্যথা নয়। ইতিহাসের কোন বিশেষ মুহূর্তে আমরা কী করেছিলাম, কী করতে পারতাম, কী করা উচিত তাও বিচার্য নয়।

◆ উপমহাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

Δ আজকের বাংলাদেশ যা ১৯৭১-এ তা ছিল না। ১৯৪৭-এ আমরা যা ছিলাম আজ আর তা নেই। বাংলাদেশেও মৌলবাদী আছে, পাকিস্তানেও আছে। এ আমাদের গন্তব্য ছিল না। আর সে কারণেই বাংলাদেশে এক ধরনের উন্মাদ শ্রেণীর লোক রয়েছে, পাকিস্তানেও আছে। তাদের উদ্ভট চিন্তার ফসল—আমরা উভয় তরফে বন্ধু হয়ে যাব! তারপর কি আবারও ফিরে যাব সেই জমানায়! কোন একটা রকমের মৌলবাদী আঁতাত হয়ে যাবে! এসব নিতান্ত মূঢ়তা, নিরেট নির্বোধের স্বপ্নবিলাস! আর তাই আমরা এখন কী চাই, কী আমাদের উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে পরিষ্কার হওয়া যাক। আমাদের এ কথা জানা উচিত—আমাদের ইতিহাস, আমাদের ভূগোল, আমাদের মাটি, আমাদের জলবায়ুকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। বাংলাদেশ বা ভারতই কেবল আসল ব্যাপার নয়। আমরা এ উপমহাদেশের সকলেই হিমালয়ের সন্তান। আর তাই আমাদের জীবনের উৎস অভিন্ন। প্রকৃতির সন্তান হিসাবে আমাদের একত্রে বসবাস করতে শেখা উচিত। আমাদের কে কালো কিংবা কে কালো নয়, কে লম্বা, কে খাটো, কে

মুসলিম, কে অমুসলিম—এসব চিন্তা অর্থহীন। আমার মোল্লা বন্ধুদের মনে হয় বলি, কীভাবে তোমরা আমার থেকে আলাদা! আমার তোমার মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। কেবল মুসলিম হিসাবে তোমরা দেখানোর জন্য জুম্মার নামাজ পড়তে যাও, আমি যাই না। আর সর্বোপরি, আমি আপনাদেরকে এ কথাই বলতে চাই, এই যে এত কিছু—এসবই তো শুধু ক্ষমতা—সবকিছু ক্ষমতারই জন্য।

কুররাতুল আইন বখতিয়ারি

লাহোরে আমরা যখন মানবাধিকার কমিশনের দফতরে কমিশনের পরিচালক আই এ রহমানের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন করাচীর উন্নয়নকর্মী কুররাতুল আইন বখতিয়ারি এসেছিলেন জনাব রহমানের সঙ্গে দেখা করতে। তার আগের সপ্তাহে সাপ্তাহিক 'নিউজ লাইন'-এ জনাব রহমানের একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, যাতে তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে লিখেছিলেন, পাকিস্তানের উচিত বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া। কুররাতুল তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে সাগ্রহে তিনি আমাদের আলোচনায় অংশ নেন।

কুররাতুল আইন বখতিয়ারি : আমার নাম কুররাতুল আইন বখতিয়ারি। ১৯৭৮ থেকে আমি গ্রাসরুট কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ-এ কাজ করছি। আর এ ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে আমার শেখার, অভিজ্ঞতার ও এ পথে সত্যিকারের যাত্রার সূচনা হয়েছে সেই ১৯৭১ থেকেই। ১৯৬৬-তে আমি ম্যাট্রিক পাস করি। পরের বছর আমার বিয়ে হয়ে যায়। আমার ছোটবেলা কেটেছে অত্যন্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আমার শিশুকাল কেটেছে বস্তিতে। জীবনের প্রথম ১৫টি বছরই কেটে গেছে বস্তি জীবনে। আমার বাবা-মা এসেছিলেন ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে মোহাজির হিসাবে। আমার জীবনের শুরুটা এ রকম। আমার বাবা-মাকেও করতে হয়েছে সংগ্রাম, স্বাভাবিক কারণেই। আমি ছিলাম তাঁদের বড় সন্তান। কন্যা সন্তান হিসাবে আমিও তাঁদের জন্য উদ্বেগের অন্যতম নিশ্চিত কারণ। তবে সে যা হোক, তখনকার বস্তির সে খোলামেলা জীবনের কারণে আমি প্রচুর সুযোগও পেয়েছিলাম নিজের মতো করে, নিজস্ব ধারায় বড় হয়ে ওঠার। বড় কন্যা সন্তান হিসাবে আমি আগেই বলেছি আমি ছিলাম আমার বাবা-মায়ের মাথা ব্যথার কারণ। কেননা, আমি কখনও ঘরের চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ হয়ে থাকিনি। এভাবে আমার মতো ডাগর হয়ে ওঠা একটা মেয়ের সব সময় ভবঘুরের মতো বাইরে থাকার স্বভাবের জন্যই অনিবার্য সমাধান হিসাবে আমার বেশ আগেই বিয়ে হয়ে যায়। তখন আমার বয়স ১৬

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

বছর। আর তারপর থেকে ২১ বছরে পা দেবার মাঝের সময়ে আমি তিনটি সন্তানের মা হই। আমার বিয়ে হয়েছিল খুবই চমৎকার, শিক্ষিত, বিবেকবান, মার্জিত একটি পরিবারে। তবে আমার শ্বশুর পরিবারের বিত্ত বা বাড়িঘর, সম্পত্তি ছিল না, ছিল কেবল শিক্ষা। আমার স্বামী ছিলেন একজন ডাক্তার। তাঁর পেশার শুরুতে খুবই ভাল করেন তিনি। আমার কাহিনী এ রকমই। সে যাক হোক, আমার স্বামী আমাদের জন্য একটি বাড়ি করতে পেরেছিলেন। সে বাড়িটি পাওয়া সম্ভব হয় আমার দাদিশাশুড়ির সুবাদে। আর সে জন্য তাঁদের পরিবারের সান্নিধ্যেও বাস করতে হয় আমাদেরকে। তাঁরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও চরিত্রের। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও মধ্যবিত্ত পর্যায়ের উদার। আসলে আমার আশপাশের, বৃহত্তর একাকার জীবন সংগ্রাম কী সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেবার অবকাশ ঘটেনি। কেননা, আমি যে চৌহদ্দির মধ্যে মানুষ ছোটবেলায় তার গণ্ডির মধ্যে এসবের কিছু জানার তেমন কোন অবকাশ ছিল না। আমার মা সবকিছুর মাঝ থেকে সুখকর কিছু না কিছু খুঁজে বের করতে পারতেন। আমার বাবা-মা বাস্তবিক পক্ষে কষ্টে থাকলেও তাঁরা কখনও তা গায়ে মাখেননি, মনে আনেননি। তাঁরা কষ্ট ভুলেই থাকতেন। আর আমি সে রকম আনন্দ-বেদনার অম্লমধুর এক পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেছি। আমার মাকে দিনে ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হতো। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষয়িত্রী। তিনি ছাত্রীও পড়াতেন। আরও টুকিটাকি কিছু করে কিছু বাড়তি আয়ের চেষ্টা করতেন। আর সেই সঙ্গে আমাদের পাঁচ ভাই-বোনকেও আগলাতে হতো তাঁকে। তবু এ গোটা জীবন সংগ্রামের ব্যাপারটি কখনও আমাকে কোন নেতিবাচক বা বঞ্চনার অনুভূতি দেয়নি। মনে করিয়ে দেয়নি আমাকে যে আমরা গরিব, আমরা দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে চলেছি। আমি আমার মনের এ সম্পদ, চিত্তের এ বিত্ত নিয়েই আমার নতুন ঠিকানা স্বামীর বাড়িতে নতুন পরিবারে আসি। নতুন এ পরিবারে আমি খুবই সুখী, সুরক্ষিত ও নিরাপদ বোধ করি। এর কিছুকাল আগে '৬৫-এর যুদ্ধ বাধে। তখন আমি তরুণী। তখন আমার মনে ছিল বিপুল কর্মউদ্দীপনা, মনে হতো বড় একটা কিছু করে ফেলব বা করছি। ঐ সময় আমরা প্রায় শিশুবয়সীরা মিলে ট্রেঞ্চ ইত্যাদি খননের কাজ করি। আমাদের তখনকার অনুভূতি ছিল, চারদিকে তখন যা ঘটছিল তার সবকিছুই ঠিকঠাক।

◆ তা ১৯৭১ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি বলবেন?

∆ আমি ঠিক সে কথাতেই আসছি। '৭১-এর যুদ্ধ শুরু হতে আমি আমার তিন সন্তানকে নিরাপদ রাখার জন্য বাড়িতে ছুটে যাই, সবকিছু ঠিকঠাক করে গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। '৭১-এর যুদ্ধের সময় আমার গর্ভে ছিল তৃতীয় সন্তান। আমরা ঘরে শুয়ে শুয়ে আমাদের স্বপ্নের জাল বুনতে থাকি এই বলে যে, আমরা চমৎকার একটা বাড়ি তৈরি করব বসবাসের; এ করব, সে করব, আরও কত কী! আমি, আমার সংসার—শুধু এসব নিয়েই ছিল আমার ঠিক তখনকার চিন্তাভাবনা। আর কিছুই না। তবে রাতে যখন ব্ল্যাক-আউট চলত তখন লোকজনকে বলাবলি করতে শুনতাম যে, গতকাল লাহোরে নাকি একটা উড়োজাহাজ ফেলে দেয়া হয়েছে, রাতে এতগুলো বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে, ওদের হ্যানো-ত্যানো করা হয়েছে—এসব। আমি তো খবরের কাগজ, রেডিও সবকিছুই তখন বিশ্বাস করেছি। যে রাতে ঢাকার পতন হয়, আমি সে সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানতাম না। আমি বলব একান্ত

একজন সাধারণ গৃহবধূর মতো, নিজ ঘরের অবোধ শিশুর মতো, যে কিছুই দেখেনি তার মতো আমি খবরের কাগজ, দেশের গোটা ব্যবস্থা, আমার পরিবারের লোকজনকে, দেশকে, দেশের সরকারকে বিশ্বাস করেছিলাম। যে রাতে ঢাকায় পাকিস্তানের পতাকা নামানো হয় সে রাতে আমি সে বাস্তবতা বিশ্বাসই করতে পারিনি। আমি আদৌ বিশ্বাস করিনি। অর ঠিক তখন থেকেই শুরু হয় আমার অন্তর হাতড়ানো, আমার নিজ মানস অভিমুখে যাত্রা।

◆ তারপর?

∆ কোন খবর, কোন কিছুতেই আমার আর আস্থা রইল না। আমি আমার পারিবারিক খবরাখবরের সূত্র থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম না এসব রিফিউজি কোথা থেকে আসছে। যারা বাংলাদেশ থেকে এভাবে আসছিল তাদের সাথে দেখা করে কী ঘটনা সেখানে ঘটেছে তার প্রাথমিক বিবরণ আমি সংগ্রহের চেষ্টা করি। আর তাদের যে কাহিনী আমি শুনলাম তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষক। আর তাদের সে কাহিনীর অংশবিশেষ হলো এই যে, আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী যে আচরণ করেছে তা বলার নয়। যারা চলে আসছিল তারা ছিল বিহারী। তাদের কাহিনী যা শুনলাম তাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হলো যে, আমাদের যা কিছু আমি চোখের সামনে দেখেছি তার সবকিছু বরবাদ হয়ে গেছে—সবকিছুই আমার কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ঘরবাড়ি, জীবন—সবকিছুই বিপদাপন্ন হয়ে উঠেছে। যা ঘটে গেছে তার প্রতিকারের লড়াইয়ে আমাদের তাদের সাথে শামিল হওয়ার কোন অবকাশ সম্ভবত আর নেই। তাদের জীবনে যে দুঃখ-দুর্দশা ঘটে গেছে তার সাথে আমি নিজেকে কী করে সম্পর্কিত করব তাও ভেবে পেলাম না। আমি মনে মনে নিজেকেই বললাম, বাংলাদেশ থেকে এই এত মানুষ চলে এসেছে, ওদের জন্যে আমরা কী করতে পারি।

নিজেকে মনে হলো না আমি আমার মধ্যে, আমার স্বগৃহে আছি। আর তখন আমি ঠিক যা করেছিলাম তা হলো গোটা দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক প্রক্রিয়ায় নিজেকে শরিক করা। আমার মনে ঠিক তখনকার অনুভূতি হলো, ওরা আমরা মিলে একই পরিবার। আমার হৃদয় তো চাচ্ছিল, এক নতুন ঘরে প্রবেশ করার জন্য। তা-ও এ জন্য যে, আগের গোটা ঘরই তো খুব খারাপ হয়ে গেছে। তবে এই যে নয়া ঘরে এখন প্রবেশের অনুভূতি তার পক্ষেও খুব একটা যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওদের কেউ যেন বলে চলেছে, সে ঘরের পিছনে একটা আনাজ বাগান তৈরির জন্যও জায়গা বানিয়েছিলাম। কিন্তু হলে কী হবে, তা-ও খতম হয়ে গেছে। আমি এ পর্যায়ে নিজেই স্বগতোক্তি করলাম ওদেরই গলায় : তা হলে কী করে পারব আমি? আমার তো কারিগরি, টেকনিক্যাল যোগ্যতা নেই। লেখাপড়া করিনি, আমি কেবল বড় হয়ে উঠেছিলাম।

আমি এসবের আগে মনে মনে ঠিক করেছিলাম, আমাকে ওদের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর তাই আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষস্থানীয়রা আমার কাছে জানতে চাইলেন, তুমি কী পড়তে চাও? আমি বললাম, আমি এমন একটা কিছু বিষয়ে পড়তে চাই যাতে সাধারণ গরিব মানুষের সুখ-দুঃখে আমি অংশীদার হতে পারি। এ রকম কোন বিষয় কি কিছু আছে? হতে পারে সেটিই হয়ত আমার জন্য হবে প্রথমবারের মতো শেখা। তাঁরা বললেন, সমাজকর্ম নামে একটা বিভাগ আছে। আর আমি

সেই বিষয়ে ভর্তি হয়ে যাই। আমার আশা ছিল ৬/৭ বছরে নিশ্চয়ই আমি আমার সেই পরিবারগুলোর সাথে একাত্ম হতে পারব, এক ও অভিন্ন পরিবার হিসাবে। আমার অভিপ্রায়, আমি যা-ই করি তার একটা গণভিত্তি থাকবে, সেটা হবে গণমুখী। তাই আমি ওরাঙ্গি টাউনকে আমার কর্মক্ষেত্র করে নিলাম, যার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের সাথে একটা যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারব ও সেখানকার পরিস্থিতির সাথেও আমার একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। বস্তুত আমি কখনও ঐ সময়ে করাচীর বাইরেই যাইনি। আর এই হলো আমার গোটা কাহিনী। তবে হ্যাঁ, একটি জিনিস আমাকে বরাবরই পীড়া দিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে, সে নিয়ে আপনি লিখেছেনও আপনার বইতে নিজেদের ঘরের সুপরিসর জায়গার চারদিকে কোথাও কারও সাথে যে কথা বলব, সত্য প্রকাশ করব সে অবকাশটুকুও যেন নেই, এমনকি কোন প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত নেই, ছিল না!

আ ফ তা ব আ হ ম দ

[আফতাব আহমদ পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন সচিব। অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত আছেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করেন। ড. আহমদ বাংলাদেশ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে অনেক লিখেছেন। তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় ইসলামাবাদে, তাঁর বাসভবনে।]

◆ ড. আহমদ, ১৯৭১-এর পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কী?

Δ আমি ঢাকায় ছিলাম ১৯৬৮ থেকে শুরু করে ১৯৭০-এর শেষাবধি। কাজেই '৭১-এর ঘটনা আমি দেখিনি। এ ব্যাপারে আমার যে ধারণা তার ভিত্তি হলো খবরের কাগজ, আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও লোকজনের সাথে আমার ভাব বিনিময়ের ফল। আর তাই যদি আপনারা সুনির্দিষ্ট আকারে প্রশ্ন করেন তাহলেই বরং আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করব বেশি।

◆ আপনি তো ১৯৬৮-৬৯-এ ঢাকায় ছিলেন। আপনি '৬৯-এর গণজোয়ার বা গণঅভ্যুত্থান তো চোখের সামনেই দেখেছেন। কাজেই আমরা মনে করি, আপনি এসবের আলোকে কিছু বলবেন। আপনার নিজের অভিজ্ঞতার কথাও বলুন।

Δ ১৯৬৮-এর নভেম্বরে এর সূচনা। সে সময় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন মওলানা ভাসানী। জনসভাটি হয়েছিল সেকালের গভর্নর হাউসের ঠিক সামনে। ঠিক তখন থেকেই আন্দোলনের সূচনা, যদি আমার স্মৃতি আমাকে প্রতারণা না করে থাকে। মওলানা ভাসানী তাঁর সে ভাষণে মোনেম খানের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁর ঐ সমালোচনা ছিল আসলে গোটা সরকারের বিরুদ্ধে। মনে পড়ে সেদিন সন্ধ্যার দিকে আমি একটা ডিনারে যাচ্ছিলাম। ঐ সময় আইয়ুব খান ঢাকায় ছিলেন। তাঁর সাথে আমি ঐ সন্ধ্যাতেই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দেখা করি। আন্দোলন যে চলছিল তার কিছু কিছু রিপোর্ট আমি তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে আমার অফিসারদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। যা হোক, ডিনারে যখন রওনা দিয়েছি তখন আচমকা একটা ঘটনা ঘটে। না, আমি এটাকে ঠিক কোন হামলা বলে অভিহিত করব না। তবে যা ঘটে তা হলো, একটা পাথর বা ইটের

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

টুকরা আমার গাড়ির মাডগার্ডের ওপর পড়ে, কাচের ওপর নয়। তাই কীসব ঘটনা তৈরি হচ্ছে, হতে চলেছে তা আমি টের পেয়েছিলাম। পরে নানা ঘটনা মিলে এক গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দেয়। বিক্ষোভ, সমাবেশ, মিছিল হতে থাকে ঘন ঘন। আমি তখন ঢাকায় যে এলাকায় থাকতাম সেটি শেরে বাংলা নগর নামে পরিচিত হয়ে ওঠে, যা ছিল পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী। বাড়িটি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সচিব সৈয়দ মুজাফফর হুসেনের নামে বরাদ্দ ছিল। তবে সেই উত্তপ্ত দিনগুলোতে ঐ বাড়ির দখল নেয়ার কোন চিন্তা-ভাবনা তাঁর মাথায় ছিল না। তাছাড়া তিনি করাচী থেকে ঢাকাতে আসতেও চাচ্ছিলেন না। তাই বাড়িটি খালি পড়ে ছিল। আমি ঐ সময় প্রাদেশিক তথ্য সচিব এজেডএম ওবায়দুল্লাহ্ খানের বাবা ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার বিচারপতি আব্দুল জব্বার খানকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমি তাঁর সাথে আগেও দেখা করেছি। তাঁকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করে বলি যে, বাড়িটি খালি পড়ে রয়েছে। আর জাতীয় পরিষদের সচিবের তো ঢাকায় আসার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই বাড়িটি তাঁর সদয় অনুমতি সাপেক্ষে আমাকে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। তিনি আমাকে সে অনুমতি দিলে আমি ঢাকায় প্রায় দু'মাস বাইরে থাকার পর ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠি। আমার স্ত্রীও ঐ সময় ঢাকায় আসেন। এ কারণে ঐ শেরে বাংলা নগর থেকে আমাকে ঐ সময় সেগুনবাগিচায় আমার দফতরে আসতে হতো। বলা দরকার ঐ সময়ে ময়মনসিংহ রোডেই প্রধানত মিছিল, বিক্ষোভ, সমাবেশ ইত্যাদি হতো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করত। এ রকম বিক্ষোভ, মিছিল বেশ কয়েকদিনই প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। শেষের দিকে রাতে আমি ও আমার স্ত্রী বাসায় নানা রকমের ভয়ভীতি দেখানো টেলিফোন কল পেতে থাকি। এ সব ঘটনা অবশ্য পরিস্থিতির কারণে ঘটে...।

◆ কেন আপনাকে হুমকি দেয়া হতো?

∆ কেননা আমি ছিলাম তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। হয়ত সংবাদপত্রে কিছু একটা ঘটে থাকবে! তবে আমি মোটামুটি এ নিয়ে কাউকে দোষারোপ করতে চাই না। কেননা এ ধরনের আন্দোলন ও পরিস্থিতি, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যা কিছু ঘটছিল তার আলোকে ও-ধরনের কোন কিছুর লক্ষ্য হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য তাই আমি কাউকেই দায়ী করি না।

◆ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে আপনার ভূমিকা কী ছিল—সে বিষয়ে আমি আপনার কাছে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাই।

∆ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আমার প্রত্যক্ষভাবে কিছু করণীয় ছিল না। আমার কাজ বলতে গেলে ছিল ঐ মামলা সংক্রান্ত রিপোর্ট বা খবরগুলোর দেখাশোনা করা। অবশ্য আমি এ মামলা চলার সময় আদালতেও গিয়েছি। তবে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক যে ঘটনা মামলার পয়লা দিকেই ঘটে তা হলো ঐ মামলার ১নং সাক্ষী বৈরী হয়ে যায়। অনেকেই ভাবতে থাকেন, বিকালেই তো আকাশবাণী সব জায়গায় খবরটা প্রচার করে দেবে যে মামলার পয়লা সাক্ষীই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কী হবে তখন! তাই আমি সরকার পক্ষের কৌসুলি মঞ্জুর কাদেরকে একথা বলতে তিনি জবাব দিলেন, আমি এখন ওকে জেরা করতে যাচ্ছি। এটা করছি, ওটা

করছি... এইসব। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সংবাদপত্রে কভারেজের ব্যাপারটা নিয়েই শুধু আমার মাথাব্যথা।

◆ কেননা তখন সকলের মুখে আলোচনা চলছিল, মানে আপনি...।

Δ আলোচনা? তা চলছিল বটে তবে সত্যিকার অর্থে কেউই এটি বিশ্বাস করতে পারেনি। আমার বাঙালী বন্ধুরা কেউ এ মামলার সারবত্তায় বিশ্বাস করতে পারেনি। এমনকি কেউ এ মামলায় একটা কিছুতে বিশ্বাস করলেও আমি মনে করি না... এ মামলা আসলে...।

◆ কিন্তু আমলারা, মানে আপনার পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীরা যাঁরা তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন, তাঁরা কী বলতেন? কী প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁদের?

Δ পশ্চিম পাকিস্তানী সহযোগীদের খুব বেশি কারও কথা আমার মনে নেই। ঐ সময়ে আমার পূর্ব পাকিস্তানী বন্ধুর সংখ্যাও যে অনেক ছিল এমনও নয়। পশ্চিম পাকিস্তানী কেউকেটা কারও সাথে আমার দেখা হয়েছে... এমনও আমার মনে পড়ে না। তবে হ্যাঁ কেউ একেবারে ছিল না বললেও ভুল হবে। পোস্ট মাস্টার জেনারেল ছিলেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানী। তিনি আমার মতোই বাঙালীদের দাবিদাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর কথা বলা যায়।

◆ কিন্তু কেন? কেন তিনি বাঙালীদের দাবিদাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন?

Δ কেননা, আমরা দেখেছি, বাঙালীদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

◆ আর তাতেই বলছেন বড় রকমের অবিচার!

Δ অবশ্যই! কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার-স্যাপার তো আমার জানার কথা নয়!

◆ বলতে চাই, আপনি কী ধরনের অবিচারের কথা বলছেন?

Δ অর্থনৈতিক দিক থেকে বাঙালীরা নিজেদেরকে বঞ্চিত ভেবেছে।

◆ বঞ্চিত বোধ করা আর হওয়া এক জিনিস নয়। আমি বলি, আপনার ধারণায় আপনি তাকে সেরা জিনিসটি দিলেও তার বঞ্চনাবোধ থেকেই যেতে পারে। তবে আপনার ধারণা...।

Δ পশ্চিম পাকিস্তানীরা, আইয়ুব খান... এঁরা মনে করেছিলেন, তাঁরা ওদেরকে সর্বোত্তম প্রাপ্যই দিচ্ছেন।

◆ ঠিক, বাঙালীরা তেমনটি মনে করেনি।

Δ সে কারণেই কল্পিত ধারণা বাস্তবতার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা কি পেয়েছে বা পায়নি সেটি ধর্তব্য নয়।

◆ আপনি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। আপনি কি মনে করেন, বাঙালীদের অভাব-অভিযোগ যথার্থ?

Δ আমি মনে করি, অর্থনৈতিক বঞ্চনাই মূল কারণ যদিও আমি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করিনি। রাজনীতিতে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের অংশীদারিত্ব ছিল না। সিভিল সার্ভিস ও ক্ষমতাধর রাজনীতিকদের ওপর থেকে নিচু অবধি প্রায় সকলেই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। আইয়ুব খানের সরকার ও সামরিক বাহিনীর বেলাতেও ঐ একই কথা।

আইয়ুব খানের সরকার এমন এক ধরনের সরকার—যা প্রতিনিধিত্বশীল ছিল না। এমনকি আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় যে সব পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন তাঁরাও আইয়ুব খানের ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র পছন্দ করতেন না... এমন প্রামাণ্য রেকর্ড আছে। এই মন্ত্রিসভায় আইয়ুব খানের মনোনীত ব্যক্তিরা পর্যন্ত ১৯৬২-র শাসনতন্ত্র পছন্দ করতেন না। তাঁরা আইয়ুব খানের সঙ্গে ছিলেন তবু...। তাই আমার মতে, রাজনৈতিক অংশীদারিত্বই ছিল মূল বিষয়।

◆ তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র ছিল এরই অন্যতম অভিব্যক্তি?

∆ স্পষ্টতই তাই...।

◆ আর তাই এই ষড়যন্ত্র? আপনি কি মনে করেন যে এ ষড়যন্ত্র হয়েছিল? সে সময় আপনি যা জানতে পেরেছিলেন তার ভিত্তিতেই কি আপনি এতে বিশ্বাস করেন?

∆ দেখুন, সরকারের মামলা অনুযায়ী একটা ষড়যন্ত্র ছিল। ষড়যন্ত্র কিছুটা থাকতেও পারে। তবে এ বিষয়ের গভীরে আমি যাইনি।

◆ আর সে ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিব জড়িত ছিলেন?

∆ আমি জানি না শেখ মুজিব এতে কদ্দূর জড়িত ছিলেন। তবে তিনি জনগণের একটা শ্রেণীর অংশের—শুধু ঠিক অংশের বললেও ভুল হবে—একটা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি ছিলেন, যাদের ধারণা ছিল, তাদেরকে রাজনৈতিক পর্যায়ে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের উপলব্ধি, তাদের অনুভূতি ছিল রাজনৈতিক পর্যায়ে তাদের অংশীদারিত্ব নেই। মুজিব ছিলেন ঘটনার অনুঘটক।

◆ কোনভাবে হলেও আপনি তাহলে স্বীকার করছেন যে, পাকিস্তান সরকার কাঁচা হাতের ও অপরিপক্বতার পরিচয় দিয়েছে?

∆ সে কথা আমি বলতে পারি না। ও মামলা সম্পর্কে সামান্য যা আমি জানি তাতে ঐ মামলার যাথার্থ্যের ব্যাপারটি আমার কাছেও তেমন বোধগম্য নয়। আর মামলা যেভাবে চালানো হয়েছে সে সম্পর্কে আমার বলার এই যে, ঐ সময়টায় চারদিকে ছিল প্রবল, সংবেদনশীল, টানটান অনুভূতি... এত চরম কড়াকড়ির মধ্যেও ঐ মামলা তুলে নিতে হয়, এ কথা আপনারা জানেন। ঐ পরিস্থিতিতে মামলাটির টিকে যাওয়ার কোন অবকাশই কার্যত ছিল না।

◆ সেটি কি রাজপথে জনতার বিক্ষোভ?

∆ নিশ্চয়ই, ওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

◆ মামলায় একটা কিছু ছিল, ছিল না কি?

∆ সরকারের দিক থেকে বাহ্যত মামলা একটা ছিল। কিন্তু বাস্তবতা ও আদালত কীভাবে সেটিকে সম্ভব করে তুলতে পারত তা আমরা জানি না।

◆ ১৯৭০-এর নির্বাচন সম্পর্কে কিছু বলুন। অবশ্য তখন আপনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন।

∆ পশ্চিম পাকিস্তানেই ছিলাম। তবে আমি সুনিশ্চিত ছিলাম আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হতে চলেছে। বস্তুত আমার ধারণা ছিল, ২, ৩, ৪, ৫টি আসন বড়জোর অন্যরা পাবে। কিন্তু

বাস্তবে দেখা যায়, অন্যরা পেয়েছে মাত্র ২টি বা একটি। নূরুল আমিন নির্বাচিত হয়েছিলেন, একথা আমার মনে আছে। ইয়াহিয়া খানের সামরিক আইন জারি, এমনকি, তার আগেই '৬৯-এর শেষ নাগাদ এটি আমি টের পাই। লোকজনের শেখ মুজিবের পক্ষে না যাবার কোন কারণ ছিল না তখন। মুজিব হয়ে উঠেছিলেন তাদের কাছে বীরনায়ক। তাঁর প্রথম সভার পরেই আপনারা নিশ্চয়ই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন...।

◆ তাহলে বলছেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়?

∆ হতে পারে, হয়ত এটি তাতে প্রবল শক্তি যুগিয়েছে। নিঃসংশয়ে প্রায় তা বলাও যায়, কেননা তখন যে অনুভূতি ছিল শেখ মুজিবকে যেন ধাওয়া করে বেড়ানো হচ্ছে।

◆ নির্বাচনে তো ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে জিতেছেন। কথাটি আরও সুনির্দিষ্টভাবে এই যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হলো, সেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের বা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

∆ গোড়াতেই তাহলে বলি, ভুট্টো মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানালেও খোদ ইয়াহিয়া খান ও কি শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে তৈরি ছিলেন, এ ব্যাপারে আমার ঘোর সন্দেহ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আপনাদের হয়ত ভিন্ন ধারণা থাকতে পারে, আমি বলতে চাই, শেখ মুজিব কি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য তৈরি ছিলেন? সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেননা ঢাকার ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনে এক ডিনার পার্টিতে আমি গিয়েছিলাম। ঐ সময় জামিনে মুক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সময়টা আগরতলা মামলার আগে। শেখ মুজিবও ঐ ডিনারে উপস্থিত ছিলেন। *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদক এসজিএম বদরুদ্দিনও ঐ পার্টিতে ছিলেন। শেখ মুজিব বলেছিলেন...।

◆ সেটা কখন?

∆ অবশ্যই ১৯৬৮। এসজিএম বদরুদ্দিন শেখ মুজিবের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'শেখ সাব, দেখিয়ে সুহরাওয়ার্দী সাব তো ইয়ে থে, উও থে, আপ উনকি লিডার হা!' শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'বদরুদ্দিন ভাই, সুহরাওয়ার্দী সাব বহুত বড়ে আদমি থে, হাম এত্তা বড়া আদমি নেহি হায়, হাম তো বাংলাদেশ কা আদমি হায়। হাম পাকিস্তান কো লিডার নেহি হোত সাকতা হায়। সুহরাওয়ার্দী সাব তো বহুত বড়া আদমি, হাম তো ছোটা আদমি।' এ রকম অনেক বিবৃতি তাঁর রয়েছে, এ ধরনের কথা তিনি বলেছেন। নির্বাচনের পর তিনি আরেকটি বিবৃতিতে বলেছিলেন, "পাকিস্তান, পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র, সরকারের শিল্পপতি ও সামন্ত ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণের মাঝে আমি কি শুধু পার্লামেন্টে আমার সংখ্যাতাত্ত্বিক শক্তি দিয়ে ঐ সরকার চালাতে পারব?" আর এ কারণেই তিনি একবার মাত্র সফরের খাতিরে হলেও ইসলামাবাদে আসেননি। এমনকি ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের মিত্র বলে পরিচিত ও তাঁর কাছে বন্ধু বিবেচিত একজনের অনুরোধ সত্ত্বেও সে অনুরোধ রক্ষা করেননি শেখ মুজিব। তাই আমি মনে করি না, তিনি পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি যে শান্তি চেয়েছিলেন সে শান্তি তিনি পেয়েছেন। আমিও সর্বতোভাবে এর পক্ষে। যদি কেউ এটা চায় তার তা পাওয়া উচিত। তাতে ল্যাঠা চুকে যায়।

◆ পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে জনাব ভুট্টোর কিছু সহযোগীর ধারণা ছিল, ইয়াহিয়া খানের সাথে ইতোমধ্যেই শেখ মুজিবের একটা সমঝোতা হয়েছে। আর সে সমঝোতা এই যে, ইয়াহিয়া খানকেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট করা হবে। সে কারণে তাঁরা মনে করতে থাকেন যে, ভুট্টোর স্বার্থকে ঠেলে ফেলা হয়েছে। আপনারা হয়ত জানেন, ভুট্টো তাঁর পক্ষে জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলার জন্য তৎপরতা ও ঘোরাফেরা শুরু করে দেন।

∆ এ ধরনের পরিস্থিতিতে সবকিছুই ঘটতে পারে। আমি তো বলেইছি, ভুট্টো তাঁর দিক থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলায় ঝুঁকিপূর্ণ চাল দিয়ে যাচ্ছিলেন, মুজিবও সেই একই পথ ধরেছিলেন। যদি মুজিব ভেবে থাকেন তিনি তা করতে পারেন, করেছেন। কিন্তু সবকিছুর ওপর রূঢ় বাস্তবতা ছিল এই যে, এই নিয়ন্ত্রণ ছিল সেনাবাহিনীর হাতে। তাদেরকে সেনাবাহিনীর মোকাবিলা যা কিছু করার করতে হচ্ছিল। তাই এসবে মুজিবের কৌশল কী ছিল তা আমরা জানি না। আর ভুট্টোর সহযোগীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগও ছিল না। বস্তুতপক্ষে আমি কখনও ভুট্টোর সঙ্গে মিলিত হইনি। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর যখন তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তখন তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে। আমি তাঁর সাথে মিলিত হয়েছি যখন তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমি প্রেসিডেন্টের পরিদর্শন টিমের অন্যতম সদস্য ছিলাম। আমি সরকারীভাবে তাঁর সাথে দেখা করেছি, মিলিত হয়েছি। কিন্তু সামাজিক পর্যায়ে কখনও তাঁর সাথে আমার আলাপ-পরিচয় হয়নি। আর তাঁর কোন সহযোগীকেও আমি চিনতাম না। মুস্তফা খার, রফি রেজা—এঁদের কারও সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। আমি সাধারণত সেই ধারণায় চুপচাপ থাকা মানুষ। আমি সেই আমলাদেরই একজন, রাজনৈতিক পর্যায়ে যাঁদের কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল না। তাই তাঁরা কী বলেছেন, করেছেন আমার জানা নেই।

◆ আপনি কি আসলে জানেন, ২৪ মার্চ বা ২৫ মার্চের পর তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে কী সব ঘটেছিল? তার অর্থ আমি বলতে চাই সেনাবাহিনীর অভিযানের পর কী হয়েছিল?

∆ আমি শুধু খবরের কাগজে পড়েছি। আমি তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম না।

◆ না-না ঠিক আছে। তবে খবরের কাগজ, অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে, শাসক শ্রেণী বা আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকেও কিছু জানতে পারেননি?

∆ দেখুন, আমার ধারণা হয়েছিল, সেনাবাহিনী প্রচুর অত্যাচার, নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটিয়েছে। শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনীর চৌধুরী ও আমার অনেক বন্ধুকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে সব বিবরণ শুনে খুবই কষ্ট ও দুঃখ পেয়েছি।

◆ কখন এসব জানতে পেরেছিলেন আপনি? পরে, না নয় মাস ধরে ক্র্যাকডাউন যখন চলছিল তখন?

∆ ঠিক কখন এসব খবর আমি পেয়েছি সঠিক আমার মনে পড়ছে না। ১৯৮১-তে আমি বাংলাদেশ সফরে যাই ইউনিডো সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে। আমি এ সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করি। ঐ সময় আমি এসব খবর পাই। ঐ সময়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন ড. হুমায়ুন খান। তিনি আমার

অন্যতম বন্ধু, পুরনো সহকর্মীও। আমরা একসাথে যুক্তরাষ্ট্রে ডক্টরেট করেছি। আমি তাঁকে আগে থেকে খবর দিই যে, এ রকম একটা প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে যাচ্ছে। তিনি আমাকে টেলিফোন করে বললেন, তুমি এখানে এসে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে উঠবে না, আমার বাড়িতে উঠবে। তাই ঢাকায় আমি তাঁর বাড়িতেই ছিলাম। তা আপনি যেন আমার কাছে কী জানতে চাচ্ছিলেন?

◆ ঢাকায় আপনার যেসব বাঙালী বন্ধু ছিল তাদের ব্যাপারে কিছু জানলেন কি না!

∆ আমি ঢাকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের ওখানে থাকলেও আমি সতর্কতা রেখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে কবীর চৌধুরীকে টেলিফোন করি। আমি তাকে বলি, আমি তোমার বাসায় আসতে চাই। এই টেলিফোন আমি করি মুনীর চৌধুরীর হত্যাকাণ্ডের খবর জানার পর। খবরটা আমি অবশ্য আগেই পেয়েছিলাম। সে কারণে আমি আঁচ করতে পারছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনায় একটা স্পর্শকাতর পরিবেশ রয়েছে। কবীর জানত আমি কেন তার বাসায় আসতে চাই। যে কারণে সে আমাকে এড়াতে চাইল না। সে আমায় বলল, ঠিক আছে, সকালের দিকে এসো। আমি এক কাজ করলাম। পাকিস্তানী দূতাবাসের কার আমি ব্যবহার করছিলাম। কারটিকে আমি প্রধান রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে রেখে পায়ে হেঁটে পৌঁছলাম কবীরের ফ্ল্যাটে। বললাম, আমার অতি পরিচিত পুরনো প্রিয় এক বন্ধুর নিষ্ঠুর মৃত্যুতে আমি শোক জানাতে এসেছি। এরপর কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে বলার আর কিছুই রইল না। এক পর্যায়ে ফিরে আসার সময় পিছনে আসা কবীর আমার কাছে জানতে চাইল, তা তোমার কার কোথায়? আমি বললাম, ও নিয়ে ভেবো না। আমি গাড়ি পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই যাব।

◆ ১৯৭১-এর পরের ঘটনা?

∆ ১৯৮১-র।

◆ '৭১-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর কি আপনি ইসলামাবাদেই ছিলেন?

∆ ইসলামাবাদে।

◆ '৭১-এর বাংলাদেশে অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার কথা কি কিছু আপনি শুনেছিলেন বা জানতেন?

∆ জানতাম, জানতাম আমি নিশ্চয়ই। তবে তারও বেশি কিছু শুনেছি। মুক্তিবাহিনী, বিহারী ও অন্যান্যের ওপর অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার কথা শুনেছি। এমনকি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অফিসারদের ওপরও অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার খবর আমি শুনেছি। সামরিক শাসনের ঐ দিনগুলোতে কিছু সেনা অফিসার, আমার কাছে যাদের যাওয়া-আসা ছিল, তারা সেসব কাহিনী আমাকে জানায়। জানায় তাদের কয়েকজন অফিসারকে কেমন করে জবাই করা হয়। আমি এসব কাহিনী শুনেছি লাহোরে। তবে আমার সহানুভূতি ছিল বাঙালীদের দিকে। কেননা আমি জানতাম এ সব ঘটনা ছিল দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অভাব-অভিযোগের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এ ধরনের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এ রকম মোড়ই নেয়। আর সেনাবাহিনীর নিজ ভাষায় ওখানে তখন বিদ্রোহ চলছিল। তাদেরকে সেটা দমন করতে হয়েছে। আর সে মতোই কাজ করেছে তারা। তবু অনেকের জন্য তা ছিল ভয়ঙ্কর এক বিভীষিকা। অভিশপ্ত কিছু। আমি

আপনাদের একটি ব্যক্তিগত কাহিনী বলি। রাজিয়া নামে আমাদের এক আয়া ছিল। তাকে আমরা পাকিস্তানে নিয়ে এসেছিলাম। সে আমাদের সাথেই থাকত। বাংলাদেশে অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার খবর এখানে এসে পৌঁছতে শুরু করলে কথাটা তার কানেও পৌঁছায়। আমি তখন করাচীতে। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে ইয়াহিয়া খান তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাটি দেন। আমি মনে মনে বললাম, অবস্থা এখন ক্রমেই খারাপের দিকে যাবে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, রাজিয়াকে প্লেনে তুলে দাও। রাজিয়াও ইতোমধ্যে খবর পেয়েছিল কারও কাছে থেকে সে কথা আমি বলেছি। আমার অফিসে এক বাঙালী কাজ করত। তার কাজ ছিল চিঠিপত্র তৈরি করা। সে-ই জানায় যে রাজিয়ার জামাইকে নাকি ওরা তুলে নিয়ে গেছে বা এরকম কিছু। কাজেই তারপর রাজিয়া করাচী চলে আসে। তার যা কিছু টাকাকড়ি আমাদের ব্যাংকে জমা করে। এরপর আমি তাকে তার সব টাকাপয়সা দিয়ে দিই। আমি তখন আমার বোনের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। রাজিয়াও সেখানে আসে ও বাংলাদেশে যাবার অপেক্ষায় থাকে। আমি তাকে বললাম, রাজিয়া তোমাকে যেতে হবে। আমি দুঃখিত। তাছাড়া আমি জানি তুমি দুশ্চিন্তায় আছ তোমার জামাইকে নিয়ে, আত্মীয়-স্বজনের কী হয়েছে সে সব ভেবে কি তুমি উদ্বিগ্ন নও? এখন ঘটনা এমন দাঁড়িয়েছে। এ কথা বলেও আমি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম : 'মায় তুমনে ফির লে আয়েঙ্গে। আভি তুম যাও।' আমি তাকে ঢাকার বিমানে তুলে দিলাম। তখন পিআইএ'র বিমান যেত কলম্বো ঘুরে। আমি ওর বাড়ি নিরাপদে পৌঁছানোর ব্যাপারে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিই। আমি ঢাকায় টেলিফোন করি রাও ফরমানকে। আমি তাকে চিনতাম। তাকে বললাম, দ্যাখো ফরমান, আমার আয়া এই ফ্লাইটে ঢাকায় যাচ্ছে। তুমি তোমার কোন মুলকি জওয়ান না পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী কাউকে পাঠাবে বিমানবন্দরে, যাতে করে রাজিয়া নিরাপদে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরতে পারে। তার কাছে কিছু টাকাও রয়েছে। তুমি তার বাড়ি ফেরার খবরটা আমাকে জানিও। ফরমান আমাকে অবশ্য এ খবরটা আর দেয়নি। তবে রাজিয়া ফেরার অল্পদিনের মধ্যেই একটা চকচকে পোস্টকার্ড আমরা পাই। ও ঠিকমতো পৌঁছেছে। আর সেটাই ওর তখনকার মতো শেষ খবর। ১৯৮১-তে আমি ঢাকায় গেলে আমার ওখানকার কেরামত নামে এক পুরনো চাপরাশির হদিস খুঁজে বার করি। তাকে আমি ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আসার জন্য বলি। সে কথামতো কন্টিনেন্টালে পৌঁছলে আমি তাকে চিনতে পারি। আমি তাকে বললাম, কেরামত, আমার আয়া রাজিয়ার কোন খোঁজ জান! এই কেরামত এক সময় আমার ঢাকার বাড়িতেই কাটিয়েছে কিছুকাল। তখন পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তপ্ত। আর কেরামত থাকত মোহাম্মদপুরে। একদিন সে আমাকে বলল, 'স্যার, উহাঁতো বিহারী হ্যায়।' আমি বললাম, 'তুম হামারা পাস আ যাও।' আর তারপর সে আমাদের কোয়ার্টারে এসে ওঠে।

◆ আগে যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে—হয় খবরের কাগজে, নয় বিভিন্ন বইয়ে, তাতে লেখকরা বলেছেন, সেনাবাহিনীতে সমন্বয় বলতে কিছু ছিল না, সেনাবাহিনীর ভিতরে...।

∆ আমি তেমন কিছু শুনিনি।

◆ আপনি কি এসব বিবরণ পড়েছেন? মানে আমি বলতে চাই, আপনি কি রাও ফরমান, নিয়াজী, গুল হাসান, ফজল মুকিম খান প্রমুখের লেখা বই পড়েছেন? তাঁদের লেখা থেকে

তো দেখা যায়, তাঁরা সবাই সেনাবাহিনীতে সর্বেসর্বা ৩ বা ৪ কুচক্রীর কথাই বলতে চেয়েছেন।

▲ তাঁরা বিশেষ করে নিয়াজীর কথা বলেছেন।

◆ নিয়াজী অনেক পরে মুখ খুলেছেন। তার আগে অনেকের লেখা বেরিয়েছে।

▲ দেখুন, কী আর বলব, এ রকম পরিস্থিতিতে এসব হয়েই থাকে।

◆ জনগণের কপালে কী ঘটেছে তা কখনও তারা জানতে পারবে না, যদি এর ইতিহাস লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর আমরা সেই ইতিহাস লেখার কাজটিই করতে চাচ্ছি। চেষ্টা করছি। মানে আমি বলতে চাই, এগুলো তথ্য।

▲ তা দেখুন আমি তো আর গোয়েন্দা বিভাগের কেউ নই। আপনারা না-ও জানতে পারেন, ইয়াহিয়া খান আমার পদাবনতি ঘটান। ঐ সময় সচিবের চাকরি যায়। আমার পদাবনতি ঘটে। আমাকে লাহোর অফিসে ফেরত পাঠানো হয়। সে অবস্থায় সরকারী পর্যায়ে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার সাথে আমার যোগাযোগ ছিল না। আমি যা জানি তা শুধুই আমার ব্যক্তি পর্যায়ে জানা তথ্য বা সে রকম কিছু।

◆ আপনি রাও ফরমান আলীর বই পড়েছেন। করাচী ও লাহোরে কিছু লোকের সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তাদের অভিমত হলো, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু শিক্ষকরা ছিলেন প্রভাবশালী। তাঁরা তরুণ বাঙালী ছেলেমেয়েদেরকে প্রভাবিত করেছেন বলেই তারা যুদ্ধে লড়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

▲ যা হোক, এ ব্যাপারে আমার নিজ অভিমত রয়েছে। শুধু রাও ফরমান আলীর নয়, এ অভিমত পশ্চিম পাকিস্তানের ডানপন্থী সংবাদপত্রের, জেড এ সুলেরী ও অন্যান্যেরও। ওটাই ছিল ধারণা। আমি এ ধারণায় অংশীদার নই যে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে হিন্দু শিক্ষকরাই প্রেরণা যুগিয়েছে। বাঙালীদের স্বকীয়, সত্যিকারের জাতীয়তাবোধ ছিল, যা, আর যাই হোক, হিন্দুদের প্রেরণা সঞ্জাত নয়। এমন ভাবনা নির্বোধসুলভ, অর্থহীন। তবে একথা ঠিক যে, সুনির্দিষ্টভাবেই তখনকার পাকিস্তানে দুই অংশের মাঝে একত্বের কোন অনুভূতি ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে কখনও আমি এ একত্বের ধারণার অনুভূতি পাইনি। আমার অনেকের সাথেই ওখানে উষ্ণ বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু আমাদের দুটি ধারা যে এক এ অনুভূতি আমার কখনও হয়নি। কাজেই যা ঘটে গেছে তা যে অনিবার্যভাবেই আসছে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

◆ তাহলে কি আপনি মনে করছেন, দুই ডানাওয়ালা পাকিস্তানের সৃষ্টিই ছিল বেখাপ্পা, অদ্ভুত?

▲ হাসি।

মি ন হা জ বা র্না

[পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ইউনিয়ন নেতা মিনহাজ বার্না ১৯৭১ সালের মার্চে বেশ কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন। তাঁর এই সাক্ষাৎকার নেয়া হয় করাচীর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের অফিসে।]

◆ জনাব বার্না, আপনি দীর্ঘদিন ঢাকায় ছিলেন, '৭১-এও ছিলেন। সেসব দিন সম্পর্কে কিছু বলবেন?

∆ আপনারা সবাই জানেন, আমার পেশা সাংবাদিকতা। তিন বা চার বছর বাদে আমার জীবনটা কেটেছে সাংবাদিকতায়। ১৯৯৪ সালে আমাকে জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রেস মিনিস্টার ও কূটনীতিক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। দু'টি বছর আমি ঐ পদের দায়িত্ব পালন করি। এর পর আমাকে স্টকহোমে বদলি করা হয়। ওখানেও আমি একটি বছর কাজ করি প্রেস মিনিস্টার হিসাবে। তারপরে বিদেশে পাকিস্তানী বিভিন্ন দূতাবাস ছোট করে আনার কার্যক্রমের আওতায় আমাকে ১৯৯৭ সালের মে মাসে দেশে ফিরতে হয়। এরপর থেকে আমি আমার নিজ পেশায় কাজ করার জন্য ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক হিসাবে লিখতে শুরু করি। আমি ১৯৬৬ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কাটিয়েছি। এটা প্রায় তিন বছরের মতো, বেশ একটা লম্বা সময়। আমার জন্য ঐ সময়টা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। সময়টি এক টানাপোড়েনের সময়ও বটে। সরকার ঐ সময় আমাকে *পাকিস্তান টাইমস* পত্রিকার করেসপন্ডেন্ট হিসাবে নিয়োগ করে। ঐ সময় *পাকিস্তান টাইমস* ছিল খুবই ভাল পত্রিকা এবং তা বের করতেন মিঞা ইফতেখারউদ্দিন। পত্রিকাটি ছিল স্বাধীন মতামতের ধারক। কিন্তু এর দায়িত্বভার আইয়ুব খানের সামরিক সরকার গ্রহণ করে ১৯৫৯ সালে। পরবর্তীকালে পত্রিকাটিকে ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের আওতায় নিয়ে আসা হয়, আর এভাবে তা কার্যত সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কিন্তু এ সবের পরেও ঐ পত্রিকায় অনেক ভাল সাংবাদিক কাজ করছিলেন। আর সেই সুবাদে আমরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনা তথা সাংবাদিকতার চেষ্টা করতাম যথাসাধ্য। আর একটি মজার বিষয়

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

এই যে, আমি ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম। ঐ সময়ে এটি ছিল অত্যন্ত সু-সংগঠিত একটি সংগঠন। এই সংগঠনে বিভিন্ন পদে আমার বাঙালী সহকর্মী বন্ধুরাও ছিলেন। পিএফইউজে'র প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলন, ভুল বলছি, প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালে ঢাকায়। তখন আমাদের একটি অলিখিত প্রথা ছিল। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ পিএফইউজে'র সভাপতি হন তাহলে সাধারণ সম্পাদক হতেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে। কিংবা এর বিপরীতক্রমে। ঐ সম্মেলনের জন্য ঠিক হলো জনাব আসরার আহমদ পিএফইউজে'র সভাপতি হবেন। আর একই সঙ্গে ঠিক হলো সাধারণ সম্পাদক পদে আসবেন আমাদের একজন বাঙালী সহকর্মী। কিন্তু আমার বাঙালী বন্ধুরা ধরলেন, আমাকেই সাধারণ সম্পাদক হতে হবে। আর তাঁদের সেই প্রস্তাবক্রমে তাঁদের পক্ষ থেকে আমি ঐ পদে নির্বাচিত হলাম। অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে আমি ঐ পদে দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হলাম। এর দু'বছর পরে ১৯৬৯ সালে আবার ফেডারেল প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইসলামাবাদে। ঐ সম্মেলনে কে. জি. মুস্তাফা সভাপতি নির্বাচিত হন। আর আমি একই পদে পুনর্নির্বাচিত হই। একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এই যে, সরকার ঐ সময় সাংবাদিক বেতন বোর্ড গঠন করেছিল। আর আমি, কে. জি. মুস্তাফা ও এ ডি চৌধুরী ঐ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম। ১৯৬৯ সালে বদলি হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এলে আমাকে লাহোরে পাঠানো হয়। তখন আগস্ট মাস। ১৯৭০ সালে সাংবাদিকদের এক লাগাতার ঘর্মঘট পালন করা হয়। সেই সময় কে. জি. মুস্তাফা করাচীতে পিএফইউজে'র সদর দফতরে আসেন। ১৯৭০ সালের পর কে. জি. মুস্তাফা ওয়েজ বোর্ডের বৈঠকগুলোতে যোগ দিতে আসতে পারেননি। এরপর এলো একাত্তরের ঘটনা। এর মধ্যে দু'টি বৈঠকে কে. জি. মুস্তাফা আসতে পারেননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক বেতন বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, যদি তৃতীয়বারও তিনি বেতন বোর্ডের বৈঠকে না আসতে পারেন তাহলে তাঁর সদস্য পদ বাতিল করা হবে। ২৫ মার্চের পর...।

◆ আপনি কি তখন পূর্ব পাকিস্তানে?

∆ না, আমি ঐ সময় করাচীতে ছিলাম। যা হোক, এর কয়েক দিন পরে লাহোরে পিএফইউজে'র নির্বাহী পরিষদের এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে কে. জি. মুস্তাফাকে ওয়েজ বোর্ডের বৈঠকে যোগ দিতে আসার জন্য অনুরোধ করার জন্য বলা হয়। তাই আমি ২০ বা খুব সম্ভব ২১ এপ্রিল ঢাকায় যাই। ঢাকা বিমানবন্দরে আমাদের বিমানটি নামতেই...।

◆ আপনি কি নিজেই ঢাকা গিয়েছিলেন?

∆ না, আমি আপনাদের আগেই বলেছি, আমাকে ঢাকায় যেতে বলা হয়েছিল পিএফইউজে'র সভাপতি কে. জি. মুস্তাফাকে সাংবাদিক বেতন বোর্ডের সভায় যোগ দিতে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে। ঐ বেতন বোর্ডের সভা '৭১-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লাহোরে অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্ধারিত ছিল। তাই আমি ঢাকায় গেলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলাম, ঢাকা বিমানবন্দর প্রায় ফাঁকা, লোকজন তেমন নেই। সেনাবাহিনী বিমানবন্দরটি নিয়ন্ত্রণ করছে। আমি যখন বিমানবন্দর এলাকা পেরিয়ে যাচ্ছি তখন নজরে এলো সৈন্যরা

বিমানবন্দরটি প্রায় ঘিরে আছে। কেউ তাদের পাশ কাটিয়ে গেলেই তাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, 'কোন্ হ্যায়, কিধার যাতা, কাঁহা যাতা।' আমাকে অবশ্য ওরা এমন কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আমার এক বন্ধু সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তখন কাজ করতেন পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনালে। তিনি আমাকে বললেন, এক ভদ্রলোক আসছেন, তাঁকে তিনি নিতে এসেছেন। আর এ কথাও বললেন, আসুন আমি আপনাকে পৌঁছে দেব ঢাকা প্রেসক্লাব অবধি। দেখলাম রাস্তার আশপাশে সর্বত্র জনশূন্য, পরিত্যক্ত অবস্থা। আমি যখন ঢাকায় পৌঁছেছি তখন পঁচিশে মার্চের পর পঁচিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ পঁচিশে মার্চের সেনাবাহিনী অপারেশনের পর পঁচিশটি দিন কেটে গেছে। আমি ঢাকা প্রেসক্লাবে পৌঁছে কে. জি. মুস্তাফার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। সেখানে ছিল এনায়েতউল্লাহ্ খান, *হলিডে*'র সম্পাদক। এরপর আমি ঢাকার আশপাশের পরিস্থিতি বেশ ভালভাবেই দেখার সুযোগ পাই। দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। জগন্নাথ হল বন্ধ। আমি কে. জি. মুস্তাফার বাসায় থাকার সময় একদিন সন্ধ্যায় কিছু লোক তাঁর সাথে দেখা করতে এলো। ওরা আসতে কে. জি. মুস্তাফা বেরিয়ে গেলেন সম্ভবত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য। এরপর তিনি ফিরে এসে আমাকে বললেন, ঘটনা কী হয়েছে, জানো? তাঁর বাড়ির কাছাকাছি তিন প্রতিবেশীর বাড়ি। ঐসব বাড়িতে তিনটি তরুণী থাকত। তাদের এক জনকে সেনাবাহিনীর লোক ধরে নিয়ে গেছে। গণহত্যা ও ধর্ষণের এসব বিভীষিকাময় অনেক কাহিনীই আমি শুনেছি। তার আগে সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের কথা আমার মনে আছে। সে লাহোরে *ডন* পত্রিকা অফিসে বসে ছিল। এই ক্যাপ্টেন ছিল আমার বন্ধু নিসার ওসমানীর আত্মীয়। নিসার ওসমানী ছিল *ডন* পত্রিকার সংবাদদাতা। বছর তিনেক আগে সে মারা যায়। এই নিসার ওসমানী এক সময় পিএফইউজে'র সেক্রেটারি জেনারেল ছিল। লাহোরের এই *ডন* অফিসে আমার কয়েক বন্ধু বসত আড্ডা দিতে। ওখানে আরেক জন ছিল ঐ সময়ে। তার নাম লতিফ। সেনাবাহিনীর লোক কর্নেল লতিফ। যখনকার কথা বলছি তখনও সে কর্নেল হয়নি, ছিল আসলে ক্যাপ্টেন। এই লতিফ ছিল জেনারেল টিক্কা খানের লিয়াজোঁ অফিসার। ২৫ মার্চে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর অপারেশনের সময় সে জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে কাজ করার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যায়। তারপর ১৩ এপ্রিল সে পূর্ব পাকিস্তানের অপারেশন থেকে ফিরে আসে। সে লাহোরের ঐ আড্ডায় বসে চা পান করছিল। সেই সময়ে ক্যাপ্টেন আকিল নামে এক লোক আসে। এই লোক পরে মেজর বা কর্নেল হিসাবে পদোন্নতি পায়। সে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেক কাহিনী বলতে থাকে। সে জানায় এসব কাহিনী সে যোগাড় করেছে বাইরের বিভিন্ন সূত্র যেমন, বিবিসি অথবা ব্রিটিশ খবরের কাগজ থেকে। তার বর্ণনায় জানা যায়, তখন কেমন করে, কীভাবে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়ে গুলি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। সে এসব ঘটনার তথ্য-প্রমাণ দিয়ে উল্লেখ করে।

◆ দেখুন, আমরা যেসব বিষয়ে অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছি এ বিষয় তার অন্যতম। তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, সেনাবাহিনীর উপরতলায় একটা সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, সেনাবাহিনী নামিয়ে দিলেই কাজ হয়। কেননা, আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় এভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়, আর তাতে ঐ সময় ১৯৬৯-এ বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার

গণআন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। ইয়াহিয়া যখন সামরিক আইন জারি করেন আর আইয়ুব পদত্যাগ করেন তখনও সেনাবাহিনী নামানো হলে সবকিছু শান্ত হয়। ফলে তাদের তখন ধারণা হয় যে, তারা কাজটি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করে। আর সে কারণেই তারা আশাবাদী হয়ে ওঠে যে, এ ক্ষেত্রেও তাদের সেই সাফল্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আপনারও কি কখনও এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে? কেননা ১৯৬৯ সালে সামরিক আইন জারির পর তো সবকিছুই ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাই নয় কি?

Δ তা নয়। আমি তো তখন ঢাকায় ছিলাম। আমার মনে পড়ে যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয় তখন আমি সে সংবাদ কভার করার জন্য ঢাকায় আসতাম।

◆ তা আপনার অভিমত কী ছিল, আমি আসলে বলতে চাই...

Δ এতে রাখঢাকের তো কিছু নেই। জবাবটা খুবই সোজা। সাংবাদিকরাও ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের, আইনজীবীরাও পশ্চিম পাকিস্তানী। আর কুল্লে দু'জন লোক ছিল বাঙালী। বুঝতেই পারেন।

◆ না, মানে তাহলে পরিকল্পনার মূল নক্সা আসছিল অন্য কোথাও থেকে? হয়ত ওরা...

Δ সে কথা আমি বলতে পারি না, আমার সেটি জানা নেই।

◆ তা আপনার নিজের ধারণা কী, কেননা আপনি তো সাংবাদিক হিসাবে ব্যাপারটা দেখছিলেন!

Δ আমার তো মনে হয়, শেখ মুজিবুর রহমান ওভাবে, ঐ পরিসরে জড়িত ছিলেন না। ভারতের একটা চক্রান্ত থাকতে পারে। তবে শেখ মুজিব... আমার মনে হয় না।

◆ শেখ মুজিব হয়ত ছিলেন না, ওরা হয়ত

Δ যে কোন কিছুই হতে পারে, সেটির সত্যিমিথ্যে তো আর আমি বলতে পারি না। তবে গোটা জিনিসটা নিয়ে যা তুলকালাম নাটক চলে... বিচারের নামে নিগ্রহের প্রদর্শনী হয়...

◆ আমার মনে হয়, ঐ মামলার বিচারক ছিলেন বিচারপতি এসএ রহমান।

Δ হ্যাঁ, সেই সময় বহু লোক, হাজার হাজার লোক কুর্মিটোলার, যেখানে আগরতলা মামলার আদালত বসেছিল, দিকে মিছিল করে যায়।

◆ আপনি কি মনে করেন, এই ঘটনাটিই শেখ মুজিবকে অনেক বেশি জনপ্রিয় করে তোলে?

Δ আমার তাই মনে হয়। আর সে কারণেই তিনি নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী হন। আপনি জানেন, ওরা যেদিন ঢাকা নগরীতে হরতাল-ধর্মঘট ডেকেছিল সেদিন কী ঘটে?

◆ আপনি আসলে কোন্ হরতালের কথা বলছেন, কখন হয় সেটা? আমরা তো তখন বলতে গেলে রোজই হরতাল ডেকেছি!

Δ বেশ কয়েকবার! আমি যখনকার কথা বলছি তখন আগরতলা মামলার বিচার চলছে। ওটা কীভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল আমার জানা ছিল না। আমি তখন শান্তিনগরে থাকতাম। আমার বাড়ির একেবারে কাছেই ছিল পুলিশের সদর দফতর। সেদিন রাতের ঘটনা। তখন রাত ১১টা। হঠাৎ অনেক মানুষের স্লোগান শোনা গেল। ওরা কারফিউ ভেঙে বাড়িঘর থেকে

বেরিয়ে এসেছে। ওরা স্লোগান দিচ্ছে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। গুলি চলল ওদের ওপর। রীতিমতো নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড! আমি লাহোরে ফোন করে খবর পাঠিয়ে দিলাম। সে খবর পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। তাতে বর্ণনা ছিল মানুষ কেমন করে রাতে কারফিউ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল বাড়িঘর থেকে! এ লোমহর্ষক ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি।

◆ আপনার দীর্ঘ এই ৩০ বছরের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় কখনও কি পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে তখনকার পাকিস্তানের শাসক মহলে যে আলোচনা হতো, যে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে তার মোকাবিলায় কী করা হবে—সে আলোচনা শোনা কিংবা এ রকম আলোচনায় থাকার সুযোগ হয়েছে? আসলেও কি এ ধরনের আলোচনা কিছু হয়েছে?

Δ সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এ রকম কোন আলোচনা আমি, বিশেষ করে, কর্তৃপক্ষীয় কিংবা আমলা মহলে লক্ষ্য করিনি। তবে একটা জিনিসের অস্তিত্ব ছিল সাধারণভাবে। সেটি ছিল সামরিক, অসামরিক আমলা—উভয় মহলেই। সাধারণ চিন্তাধারা এই ছিল যে, হিন্দুরা মাথা তোলার চেষ্টা করছে আর আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। ওরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করছে। এই ছিল প্রচলিত সাধারণ ধ্যানধারণা।

◆ কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, এ রকম চিন্তাভাবনার বুনিয়াদ কী? কোন কিছু তো আপনা থেকে উড়ে আসে না। সেটির কোন কোন কারণ তো থাকেই। এ রকম ধারণার কথা আমরাও জানি, কিন্তু তার ভিত্তি কোথায় ও কী সেটা? আর আপনি বলছেন, এ ধারণাটি গড়ে উঠেছে অনেক পরের দিকে। আপনার তেমন মনে করারই বা কারণ কী? আমার কথা হলো, আপনি খুব বেশি দিন লোকজনকে বোকা বানাতে পারেন না। আপনি কী বলেন? ধরুন, ওরা যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে প্রভাবিত করেছে, সরকার ওসব তথ্য প্রচার মাধ্যমগুলোকে দিয়েছে, তো ঠিক আছে। কিন্তু আসলে কী ঘটছে জনসাধারণই তো দেখছে। এগুলো কি সরকারীভাবে প্রচার করা হচ্ছিল?

Δ সরকারীভাবে তা করা হয়নি। আমি মনে করি, জনসাধারণ, সেনাবাহিনী মহলে এ ধরনের মতামত প্রচলিত ছিল। তারা এ রকম একটা ধারণাকে সাধারণ করে তোলে। এছাড়া *জিন্দেগী, জাসারাত* ও জামায়াতে ইসলামীর পত্রিকাগুলোর মতো ডানপন্থী কাগজগুলোর এ ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা রয়েছে।

◆ '৭১-এর মার্চে পাকিস্তানের বামপন্থীদের অবস্থানটি কী ছিল?

Δ বামপন্থীরা কখনও এসবে বিশ্বাস করেনি। সঙ্কট চলাকালে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো অন্তত প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেয়। এ ক্ষেত্রে আমি ওয়ালী খান, বেজেঞ্জো, এমনকি মুফতি মাহমুদের নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁরা ভুট্টোর প্রতি নিন্দা জানান ও শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন করেন। আমার মনে আছে... ও হ্যাঁ, আপনারা কি ভ্যানগার্ড-এর *বাংলাদেশ পেপার্স* নামের বইটি পড়েছেন?

◆ কারা প্রকাশ করেছে? ভ্যানগার্ড?

∆ জ্বি! খুব ভাল বই। ভুট্টো, মুজিব ও ইয়াহিয়া সে সময় বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব বিবৃতি দেন তার কালপঞ্জি দিয়ে সুবিন্যস্তভাবে সে সবের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিবৃতিও রয়েছে। আপনি ঐ বইটি থেকে একটা পরিপূর্ণ ধারণা পেতে পারেন। খুবই আগ্রহ উদ্দীপক বই। ভ্যানগার্ড প্রকাশ করেছে *বাংলাদেশ পেপার্স* নামের এই বইটি। আর এতে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বরাত রয়েছে হার্মিস জে মর্গেনথাও নামের এক মার্কিন অধ্যাপকের। প্রফেসর মর্গেনথাও শিকাগোর কোন এক ফরেন পলিসি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ছিলেন। তিনি সেই ১৯৫৬-তে এশীয় ও বিশেষ করে পাকিস্তান সম্পর্কে এক নিবন্ধ লিখেছিলেন। সে কথা আমার আজও মনে আছে। ঐ সময়ে তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তান ইজ নাইদার এ নেশন নর এ *স্টেট*' 'পাকিস্তান কোন জাতি নয়, কোন দেশও নয়'! 'দিস কান্ট্রি ক্যান নট গো অব ভেরি ফার'। তাঁর এ কথাগুলো খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

◆ আপনার কি ঐ কালপরিক্রমার কোন সময়ে মনে হয়েছিল যে, দেশ একাত্তরের মার্চের দিকেই কদমে কদমে এগিয়ে চলেছে? আপনি কি অনুভব করছিলেন যে, সঙ্কট এগিয়ে আসছে, অলক্ষুণের তিলকাভাসটি সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে?

∆ একটি জিনিস ছিল নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট, তা হলো, দেশের পরিস্থিতি তখন যেভাবে এগোচ্ছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল নাজুক। পাকিস্তানকে আপনি যেভাবেই বলুন, ইতিহাস ও ভূগোল—দু'দিক থেকেই এক আজব জিনিস। দেশটির দু'টি বিচ্ছিন্ন অঙ্গ রয়েছে, আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে হাজার মাইলের এক বৈরী ভূখণ্ড! বস্তুত এ কারণেই বোধ করি, লাহোর প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত সঠিক, যাতে দু'টি দেশ—দু'টি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ বা রাষ্ট্রের উল্লেখ ছিল, কোন একটিও একক রাষ্ট্র নয়। ঐ সময়ে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ খুবই শক্তিশালী ছিল, আর সেটি ছিল বাঙালী জনসাধারণের দল। কাজেই বিষয়টি আদৌ হেলাফেলার বিষয় ছিল না। লাহোর প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্রের যে ধারণা ছিল তার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে কনফেডারেশন বা এ রকম কিছু গড়তে পারত এবং তা হতো বাস্তব পরিস্থিতির জন্য সবচেয়ে অনুকূল। পরে সে প্রয়াসে তারা উদ্যোগীও হতে পারেনি...

◆ আমরা কিন্তু অল্প কিছুকাল আগেও এখানে কয়েকবার এসেছি। কিন্তু তখনও আমরা বুঝতে পারিনি যে, পাকিস্তানের অন্যতম বড় সমস্যা হচ্ছে তার সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণী। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক বজায় না রাখার ব্যাপারে তাদের একটা কায়েমী স্বার্থ ছিল। কেননা তাদের আশঙ্কা ছিল, কোন সামন্তবাদবিরোধী রাজনৈতিক দল বা একাধিক দল ক্ষমতায় এলে তারা ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারে হাত দিতে পারে। আর বলাবাহুল্য, সে কারণেও সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায়ন বা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী থাকার ও ভূমিকার ব্যাপারটায় তাদের বড় স্বার্থ ছিল। এখানকার অনেকেই এ কথা বলেছেন। এ সব মতামতের বেলায় আপনার ধারণা কী?

∆ মানে, আপনি বলছেন...

◆ আমি বলতে চাই, ২৫ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর আঘাত হানার ব্যাপারে পাকিস্তানের সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থ ছিল। তাই ক্ষমতার কোটারিকে নিজেদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে তারা সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। কেননা, উল্লিখিত রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় এলে তারা

গোটা পাকিস্তান জুড়ে ভূমি ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করতে পারে, আর তা হলে তারা নিজেরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন একটা আশঙ্কা তাদের ছিল।

∆ আমার ধারণা, পাকিস্তানের সামন্ত শ্রেণী বড়জোর দোসর হতে পারে তবে মূল পালের গোদা হলো সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র। গোলাম মোহাম্মদ থেকে এর সূচনা। গোলাম মোহাম্মদ খাজা নাজিম উদ্দিনের সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা নিজ হাতে নেন, গণপরিষদ ভেঙে দেন ও তারপর চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। আর তাতে ওয়ান ইউনিট ও প্যারিটি আসে। আমি বলতে চাই, এ সকল ব্যবস্থাই নেয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের ঠেকাতে—কার্যত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠকে ৫০ শতাংশে কমাতে। কাজেই বিষয়টি খুবই পরিষ্কার। সব ব্যবস্থাই ছিল বাঙালী স্বার্থের বিরুদ্ধে। আমার মনে হয়, এরই প্রতিফলন ঘটেছে ৬ দফায়। এই পটভূমিতে বাঙালী জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটে। ৬ দফা হয়ে ওঠে বাঙালীদের অবশ্য-আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণীয় প্রতিভূ। কিন্তু তখনও বাঙালীরা বলেনি যে, তারা পাকিস্তান ভাঙতে চায়। তাদের প্রথমত বলার ছিল পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়ে। বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়টি স্পষ্টত তাদের জন্য বিতর্কিত। কেননা, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ছিল হাজার মাইলের দুস্তর ব্যবধান। এরকম বিচ্ছিন্ন দেশ শাসন অসম্ভব। এই আলোকেই প্রফেসর মর্গেনথাও-এর উক্তির বরাত আমি ইতোমধ্যেই দিয়েছি। তিনি বলেছিলেন যে, যুদ্ধ বাধলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা সম্ভব নয়। তিনি ১৯৫৬-তে একথা লিখেছেন। তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী একাত্তরে এসে ফলেছে।

◆ আরও একটি কথা আমরা জেনারেল উমরের মতো ব্যক্তির কাছে শুনেছি। তিনি পাকিস্তানের ইসলামী বৈশিষ্ট্যের কথা বলছিলেন। আর পাকিস্তানের ইতিহাসের দিকে একবার নজর দিয়ে দেখুন। দেখবেন, পাকিস্তানকে ধর্মতান্ত্রিক দেশই বলতে হয়, যদিও বাস্তবিকপক্ষে পাকিস্তান কোন যাজক বা ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল না। পাকিস্তানের যে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ঐ সময়ে গড়ে ওঠে, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে, তাতে লক্ষ্য করা যায় ইসলাম বলতে যা বোঝানো হতো সে ব্যাপারে পাকিস্তানের নেতৃমহলে রীতিমতো সংঘাত ছিল। আর এই সংঘাত সত্যিকার অর্থে তাঁদের মধ্যেই ছিল যাঁরা পাকিস্তানে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এখন আমাদের প্রশ্ন, পাকিস্তানের যে নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে তার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

∆ দেখুন, এ নিয়ে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। বিশেষ করে, পাকিস্তানের এ ধরনের আদল সম্পর্কিত ধারণায়নের ক্ষেত্রে। কেননা, জাতির পিতা মি. জিন্নাহ এ ধরনের ধারণা সংশোধন করতে চেয়েছিলেন বলেই আমি মনে করি। তিনি যেমন কখনও কোন ধর্মরাষ্ট্রের কথা ভাবেননি, তেমনি আল্লামা ইকবালও ভাবেননি। আপনি যদি আল্লামা ইকবালের ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে দেয়া ভাষণ পড়েন তাহলে দেখবেন তাতে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় হিন্দুদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, পাকিস্তানে কোন ধর্মীয় সরকার হবে না। আরও একটি কথা, আল্লামা ইকবাল তাঁর পাকিস্তান সম্পর্কিত ধারণায় কখনও পূর্ব পাকিস্তানের কথা বা বাঙালিদের কথা ভাবেননি, কল্পনা করেননি। ইকবাল ধারণা করেছিলেন, উপমহাদেশের পশ্চিমাংশে অর্থাৎ

পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ইত্যাদি স্থান নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, পাকিস্তানে কোন ধর্মতন্ত্র থাকবে না, হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলিম আর মুসলিম থাকবে না। তারা ধর্মের ধারণায় হিন্দু বা মুসলিম ঠিকই থাকবে, রাজনৈতিক ধারণায় তারা তা থাকবে না। কাজেই তিনি সে রকমটা কখনও কল্পনা করেননি । তবে ধর্মের নামে যখন তিনি একটি রাষ্ট্র কায়েম করলেন তখন সে ব্যাপারে কতকটা বাধ্যবাধকতা এসে যায়। এমন একটা অবস্থায় আপনাকে একটা বাধ্যবাধকতায় পড়তেই হয়... আপনার মাঝে দেখা দেয় স্ববিরোধিতা, সংঘাত। ঐ অবস্থায় রাষ্ট্রকে সব সময় ধর্মকে সংশ্লিষ্ট করেই উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারটা আমার মতে দুর্ভাগ্যজনক। আমি বরং বলব, সবাই বিশ্বাস করে যে, পাকিস্তানে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলে তার প্রতিক্রিয়া ভারতেও একইভাবে দেখা দেবে। ১৯৭৭-এর আগের বিজেপিকে দেখুন। যখন জিয়াউল হক পাকিস্তানে ক্ষমতায় আসেন, তার আগে (লোকসভায়) এই বিজেপি'র দুটির বেশি আসন ছিল কি না সন্দেহ। জিয়াউল হক আফগানিস্তানে মোজাহিদদের মদদ দিতে গিয়ে পাকিস্তানে মৌলবাদী প্রভাব বাড়িয়ে দেন। আর ভারতে বিজেপিও সমান তালে প্রভাব বিস্তার করে। পাকিস্তান ধর্মরাষ্ট্র হতে পারে না, আমি মনে করি এখনও এরকম কিছু এদেশে হওয়া উচিত নয়। কারণ, আমরাই তো পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি মনে করি, পাকিস্তানে ধর্মীয় প্রভাব ও উন্মাদনা বাড়লে ভারতেও ধর্মীয় উন্মত্ততা বাড়বে। দেখুন না, এসব বাড়ছেও ভারতে। ভারতের লোকায়ত বৈশিষ্ট্যে এর একটা প্রভাব রয়েছে।

◆ গোটা এই সঙ্কটে জনাব ভুট্টোর ভূমিকা কী ছিল বলে আপনি মনে করেন? তিনি কি পাকিস্তানকে রক্ষার চেষ্টা করছিলেন, আর সেই প্রক্রিয়ায়ই কি পাকিস্তান সঙ্কটে পড়ে যায়, না তিনি এমন একটা পরিস্থিতি তৈরির ফন্দি আঁটছিলেন যে অবস্থায় তিনি কেবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রভু হতে পারবেন?

∆ শুরু থেকে একটা মানসিকতা অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। যেমন ধরুন, নির্বাচনী প্রচারণা অভিযানকালে এমনকি এ অভিযানের আগাগোড়া জনাব ভুট্টো কখনও ছয় দফার সমালোচনা করেননি। নির্বাচনী প্রচারণা অভিযান শুরু হয় ১৯৭০-এর জানুয়ারি থেকে আর শেখ মুজিবুর রহমান প্রকাশ্যেই জানিয়ে দেন, তিনি তাঁর ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচন লড়ছেন। এখন আপনি যদি তখনকার নানা অবস্থা খতিয়ে দেখেন, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার বা এলএফও থেকে শুরু করে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করেন তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আপনি যদি ১৯৭০-এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গোটা মেয়াদ লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন জনাব ভুট্টো নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর এই ছয় দফার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন এবং তিনি সেটা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি ছয় দফার পরিবর্তনেরও প্রস্তাব করেছেন। তবে সে যাই হোক ঐ সময় জনসাধারণ ও ক্ষমতার উচ্চতর মহলে এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি একটা রফায় পৌঁছতে পারবে না। আর সেই ফাঁকে গোটা বিষয়টি ম্যানেজ করে নেয়া সম্ভব হবে। আওয়ামী লীগ বা ভুট্টোর দল কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না; আর সেই সুযোগে কিছু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসে কোয়ালিশন গঠন করবে। তখন পাকিস্তানের

ক্ষমতাসীন চক্র এই দলগুলোর একটিকে আরেকটির বিরুদ্ধে খেলাতে সক্ষম হবে। কিন্তু নির্বাচনে যে ফল প্রকাশিত হলো তাতে সবাই হতবাক হলেন। কেবল নুরুল আমিনের আসনসহ সম্ভবত মাত্র দু'টি কিংবা তিনটি আসন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে সব আসনে জয়ী হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ ছিল তাঁর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরঙ্কুশ জয়।

◆ জামায়াত ও নেজামে ইসলাম-এর কী হলো?

∆ ওদের কথা ছেড়ে দিন। জনাব ভুট্টো, তাঁর দল পশ্চিম পাকিস্তানে যে এতগুলো আসন পাবে তাও তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তাঁর দল পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহত্তম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠে। এভাবে অবস্থান মজবুত করার পর সম্ভবত জনাব ভুট্টোর মনে একটি চিন্তা-ভাবনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কেমন করে এর সূচনা তা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে আমার ধারণা, তিনি যেহেতু পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ চক্রের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন সেহেতু হয়ত এরকমটা ঘটে থাকবে। তিনি আইয়ুবের শাসন আমলের দীর্ঘ আটটি বছর ঐ সরকারের অন্যতম সদস্য ছিলেন। জেনারেল আইয়ুবের সামরিক আইন প্রশাসনের আওতায় তিনি প্রথমে ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী ও পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর একটি একনায়কতন্ত্রী শাসকগোষ্ঠীর অংশীদার ছিলেন। তাই আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর খুব কাছেই ছিলেন। এই আট বছরের পরিক্রমায় তিনি সেনাবাহিনীর লোকজনের, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও আমলাদের সংস্পর্শে আসেন। স্বভাবতই তাঁর অনেক কিছুই জানা ছিল এবং ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। যেমন তিনি ওয়ান ইউনিটের গোটা ধাঁধাটি বুঝতেন, জানতেন পাকিস্তানের সামরিক-অসামরিক আমলাতন্ত্র কেমন করে বাঙালী ও তাদের স্বার্থকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। কোন কোন লোক বলে থাকে, পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবচ্ছেদ করা হলে পাকিস্তান টিকে থাকতে পারবে কি না এরকম একটা নিরীক্ষামূলক মহড়া ঐ সময়ে পাকিস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয়ে পরিচালিত হয়েছিল; আর এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জনাব এমএম আহমদ। এ বিষয়টিও জনাব ভুট্টোর অজানা ছিল না। আর তাই তিনি যখন বুঝতে পারলেন, তাঁর দল পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, ভিন্ন সুরে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি জানতেন, গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করবে; আর শেখ মুজিবুর রহমান হবেন এদেশের প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তিনি এখন থেকে ছয় দফার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, আমাদের আলাপ-আলোচনা চালাতে হবে, অবশ্যই একটা দর কষাকষির মধ্যে আসতে হবে, এরকম আরও অনেক কিছু। তাই যখন ৩ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের তারিখ নির্ধারিত হলো, তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগসাজশক্রমে একটি জনসভা করলেন। সেই জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। ঐ জনসভায় জনাব ভুট্টো বললেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পিপলস পার্টির এমএনএ-রা ঢাকায় যাবে না। যদি যায় তাহলে আমি তাদের ঠ্যাং ভেঙে দেব। আর তারপর ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেন, যার পরিণাম হিসাবে '৭১-এর ঘটনাবলী শুরু হয়ে যায়। ঐ সময় যা ঘটে জনাব

ভুট্টো অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাতে অংশীদার ছিলেন। আমি বলতে চাই, পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল। কারণ তাহলে ক্ষমতার পথের কাঁটা তাঁর দূর হয়ে যায়। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তা হলো, তিনি জনসভায় এই যে বক্তৃতা দেন, সাংবাদিক হিসাবে আমি সেটা কভার করি। আপনাদের বোধহয় জানা আছে '৭০ সালে পাকিস্তানে সাংবাদিকদের এক ধর্মঘট হয়। সেই ধর্মঘটের কারণে বহু সাংবাদিক চাকরি হারান। তার মধ্যে ছিলাম আমি নিজে, আই এ রহমান, এ টি চৌধুরী ও আব্দুল্লাহ্ মালিক প্রমুখ। এ ধরনের বেশির ভাগ সিনিয়র সাংবাদিক তখন *পাকিস্তান টাইমসে* কর্মরত ছিলেন, তাঁদের সকলের চাকরি খতম করে দেয়া হয়। সেই সময় জেনারেল শের আলী *পাকিস্তান টাইমস*-এর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। তিনি বরখাস্ত সাংবাদিকদের পরিবর্তে জামায়াত ও অন্য ডানপন্থী লোকদের নিয়োগ করেন। সকল বামপন্থী ও সক্রিয় ইউনিয়নকর্মীদের চাকরি থেকে হটিয়ে দেয়া হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ্ মালিক, আই এ রহমান, হামিদা খায়রুদ্দিন ও দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ নিজেরা একটি খবরের কাগজ বের করেন। লাহোর থেকে প্রকাশিত এই সংবাদপত্রের নাম দেয়া হয় *ডেইলি আজাদ*। আমার মনে আছে জনাব ভুট্টো ঐ জনসভায় বলেছিলেন, 'হাম ইধার, তুম ওধার'। তিনি ভেবেছিলেন ...।

◆ তাহলে দু'টি আলাদা দেশভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা তাঁর মাথায় আগে থেকেই কাজ করছিল!

Δ ঠিক তাই। ঐ কাগজটা মানে ভুট্টোর ঐ বক্তৃতার বিবরণ আপনারা পেতে পারেন ।

◆ আপনি কি আরও কিছু সুনির্দিষ্টভাবে বলবেন?

Δ আপনারা যে কোন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি জবাব দেব।

◆ আপনি ইতোমধ্যেই তো অনেক কিছুই বলেছেন, তবে আপনি যদি মনে করেন আমরা যে ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছি তাতে কিছু নতুন তথ্যযোজনা ঘটাবেন, তাহলে আমরা উপকৃত হব। আপনি সেটা বলতে পারেন।

Δ হ্যাঁ, এরকম একটা কিছু আছে, আমি একজন সাংবাদিকের সংগ্রাম নিয়ে একটি বই লিখব।

সুহাইল জহীর লারী

[সুহাইল জহীর লারী একজন গবেষক ও আলোকচিত্র শিল্পী। তিনি একাত্তরের মার্চের দিনগুলোতে ঢাকায় ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয় করাচীতে তাঁর বাসভবনে।]

◆ জনাব লারী, একাত্তরের শুরুতে তো আপনি ঢাকায় ছিলেন?

Δ জ্বি, ঘটনাক্রমে আমি ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানে যাই। আমার সঙ্গে ছিলেন প্যাট ডেমন নামে এক বন্ধু। তিনি পূর্ব পাকিস্তান বেড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাছাড়া ঘটনাক্রমে *সান* নামে একটি পত্রিকায় আমি তখন ফটোসাংবাদিক হিসাবে কাজ করতাম। ঠিক করলাম, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো পর্যটন এলাকায় বেড়াতে যাব। সেখানে রাজা ত্রিদিব রায়ের সঙ্গে দেখা করব, যাব ঢাকা হয়ে। তাই প্রথমেই ঢাকায় পৌঁছে আমি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর এ্যাডমিরাল আহসানের সঙ্গে দেখা করি। পরে সরাসরি আমার গন্তব্যে রওয়ানা হয়ে যাই। এরপর আমি ঢাকায় ফিরি।

◆ এটা কোন সময়ের কথা?

Δ ফেব্রুয়ারির কোন এক সময়ে। ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকেই হবে। সে সময় বিভিন্ন জনের কথাবার্তায় আমরা মনে করছিলাম দেশের সবকিছুই ঠিকঠাক চলবে। স্থির ছিল, পার্লামেন্টের অধিবেশন উদ্বোধনের দিনটি আমি সেখানেই কাটাব। অধিবেশনে যোগ দেব, অধিবেশন দেখব। সে কারণেই আমি পয়লা মার্চ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরি। ঢাকায় এসে গভর্নর হাউসে আমি গভর্নরের সামরিক সচিবের কাছে যাই। দেখলাম, সামরিক সচিব তখন ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুনছেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানে স্থানীয় সময় বেলা একটা বিশ মিনিট। দুপুরের বেলা একটার খবরের পরপরই ইয়াহিয়া খানের এই ভাষণটি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। যথারীতি দেখা গেল, প্রত্যেকেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সেই সম্প্রচার শুনছে। বিশেষ করে এ্যাডমিরাল একেএম আহসানও চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে ঐ সম্প্রচার শুনছেন। তিনি ও আমি দুপুরের খাবার খেলাম। তিনি কোন কথাই বলছিলেন না। কেননা এ সব ঘটনায় তিনি অত্যন্ত নাখোশ ছিলেন। তাঁকে খুবই বিষণ্ন, বিমর্ষ

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন, মহিউদ্দিন আহমেদ ও আফসান চৌধুরী

দেখাচ্ছিল। তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, ক্ষমতায় আর থাকা যায় না। আমি অনুমান করি, বেলা তিনটার দিকে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর পদে ইস্তফা দিয়েছেন। এই খবরে ঢাকার গভর্নর হাউসের সব মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আসলে তখন গোটা গভর্নর হাউসকে ঘেরাও করা হয়েছে। এর বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। কারণ গভর্নর হাউস তখন চারদিক থেকে প্রতিবাদী মানুষ ঘেরাও করে রেখেছে।

◆ কী অবস্থা বা কী ধরনের পরিস্থিতি, লোকজন কি বাইরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে?

∆ লোকজন জোরে স্লোগান দিচ্ছে এবং তারা গভর্নর হাউসের গেটে উপস্থিত হয়েছে। তারা গভর্নর হাউসের চারদিক ঘেরাও করে রেখেছে। আমাদেরকে বলা হয় যে, এ অবস্থায় গভর্নর হাউস থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, চারদিকে রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। আমার ধারণা, ৩ মার্চ অবস্থা অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে।

◆ আপনি কি জানতেন ঠিক তখন গভর্নর হাউসের খুব কাছে পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগের একটি সভা চলছিল?

∆ না, আমার তা জানা ছিল না।

◆ ওখানেই জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত করার বার্তাটি শেখ মুজিবুর রহমানকে জানানো হয়।

∆ আমার ধারণা, ঐ সভাস্থলে একমাত্র যে আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ওখানে যান তাঁর নাম হলো ডিপিএ-র কামাল হোসেন।

◆ যিনি গভর্নর হাউসেও গিয়েছিলেন?

∆ হ্যাঁ, কিন্তু ঐ সময় খোদ গভর্নর এতই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি কারও সাথে কথা বলেননি। তিনি একাকী থাকতে চাচ্ছিলেন। খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি। তিনি তাঁর পদে ইস্তফা দিতে চাচ্ছিলেন। তাই ৩ মার্চ শেখ মুজিব যখন পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন তখন অবস্থা বদলায়। আর তারপর থেকে ঢাকায় এক ধরনের শান্ত অবস্থা ফিরে আসে। আপনারা জানেন, রাস্তাঘাটের ব্যারিকেড তখন তুলে ফেলা হয়। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা বেরিয়ে এসে এ সব কাজে সাহায্য করে। কিন্তু ৩ মার্চ পর্যন্ত আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে ঢাকার আশপাশ এলাকায় ঘুরে দেখতে সক্ষম হয়েছি। গিয়েছিলাম লোকজনের সাথে কথা বলার জন্য। এর মধ্যে একজনের নাম মনে আছে; বাকি সকলের নাম আমার এখন মনে নেই। লন্ডনের এক দৈনিক পত্রিকা থেকে আগত কিছু লোক আমার চেনা ছিল। আমি তাদের সাথে ঘোরাফেরা করতাম। তবে আমি খুব একটা তথ্য আপনাদেরকে জানাতে পারব না। কারণ, ঐ সময়ে গভর্নর হাউসে এক প্রচণ্ড নীরবতা বিরাজ করছিল। শুধু গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রাতে এই গুলির শব্দ শোনা যেত বেশি করে।

◆ বাইরে ...?

∆ রাস্তায়।

◆ রাস্তায়?

▲ মানে, আমরা তো ছিলাম গভর্নর হাউসে; আর এর চারদিক থেকে গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, যেমনটা আমি আগেই আপনাকে বলেছি। পরের দিন সকালে রাও ফরমান আলীর অধীনে কর্মরত ব্রিগেডিয়ার সাহেবের সাথে আমার যখন দেখা হয় তখন আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কী করছেন আপনারা? এই যে সব গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে, এগুলি কী? বলা দরকার, এই ব্রিগেডিয়ার সাহেব গভর্নর হাউসের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জবাবে বললেন, আমরা কিছুই করছি না। কেবল ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছি। আমরা হাওয়াই গুলি ছুঁড়ছি লোকজনকে এখান থেকে দূরে সরানোর জন্য। কিন্তু হলে হবে কী! একজন বাঙালী এডিসি কার্যত কাঁদো কাঁদো অবস্থায় আমাকে জানালেন, দেশের সকল থানার সাথে আমার যোগাযোগ রয়েছে, ওরা চারদিকে শুধু মানুষ গুলি করে মারছে! তাঁর কথাবার্তায় আভাস মিলল, এভাবে মানুষ খতম করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সাহেব এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানালেন। আমারও এ সবের সত্যতা জানার কোন উপায় ছিল না।

◆ তখন ৩ মার্চ?

▲ না না এটা ছিল ২ মার্চ থেকে পরে দু'রাতের ঘটনা। প্রথম ও তার পরের রাত।

◆ কারা মানুষ হত্যা করছিল? ওরা কি সেনাবাহিনীর লোক?

▲ হ্যাঁ, বাঙালী ঐ এডিসি ভদ্রলোক বলেছিলেন, কে বা কারা হত্যা করছে। আমার ধারণা, এরা ছিল সেনাবাহিনীর লোক। বাঙালী এডিসি এ রকম আভাসই দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার গুলি চলার কথা স্বীকার করে বলেছিলেন, এ সব ফাঁকা গুলি বর্ষণের ঘটনা, লোকজনকে দূরে সরানোর জন্য। গুলির শব্দের ব্যাপারে এভাবে দু'টি ভিন্ন ভাষ্য পাওয়া যায়। তবে ৩ মার্চে শেখ মুজিবের ভাষণের পর শান্ত অবস্থা ফিরে আসে। তারপর থেকে লোকজন শ্লোগান দেয়া থামিয়ে দেয়। আমার মনে আছে, মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশে সেদিন কী বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি চাই আপনারা শান্ত হোন। আমি কোন গোলামাল শুনতে চাই না।' বাস্তবিকপক্ষে আমার যে বাঙালী বন্ধুটি আশপাশ এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন তিনি আমায় বললেন, দেখো, যে সব লোক ডাণ্ডা, লাঠি ইত্যাদি হাতে নিয়েছিল তারাও শান্ত হলো এবং সর্বত্র পূর্ণ শান্তি ও শান্ত পরিবেশ ফিরে আসে। রাতে কোন গুলির শব্দও হলো না। কোন বিক্ষোভও আর হয়নি।

◆ ঐ সময়ে গভর্নর হাউসে আর কারা কারা থাকত?

▲ গভর্নর ছাড়া ব্রিগেডিয়ার, আমি নিজে, গভর্নর সাহেবের সামরিক সচিব ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন।

◆ রাও ফরমান আলীর সঙ্গে কি আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল?

▲ ফরমান আলীর সঙ্গে আমার দেখা হতো। তবে যে কারণেই হোক, ফরমান আলী আমাকে পছন্দ করতেন না। তাই আগ বাড়িয়ে কেনই বা আমি তাঁর সাথে কথা বলতে যাব? আমি কেন বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে চাচ্ছি শুধু সেটা জানার ব্যাপারে সে উৎসুক ছিল। আর এই

কথাটাও আমি জানতে পারি দ্বিতীয় এক সূত্র থেকে। সামরিক সচিব আমাকে জানান, আপনি যেখানেই যান না কেন তা নিয়ে ফরমান আলীর বিরক্তির শেষ নেই।

◆ আপনি আর কোন সামরিক অফিসারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছিলেন?

Δ না, এই ব্রিগেডিয়ার ছাড়া। তবে এও ঠিক, ফরমান আলীর সঙ্গে কথা বলিনি কখনও। দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সঙ্গে।

◆ আপনি কি কখনও সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ও এ্যাডমিরাল আহসানকে আলাপ-আলোচনায় মিলিত হতে লক্ষ্য করেছেন?

Δ না, বাস্তবিকপক্ষে ঐ সময় যা ঘটে ইয়াকুব খান তা লুকিয়ে রাখতে চাননি। তিনি ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং দেখতে চেয়েছিলেন, ভয় দেখিয়ে বাঙালী জনসাধারণকে দমিয়ে দিতে পারেন কি না। তাঁরা অপারেশন ব্লিৎজ নামে এক অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁদের কাজ করার কথা ছিল। তবে তিনি মূল পরিকল্পনায় কিছু সংশোধন করেছিলেন। যখন তিনি দেখলেন তাতেও কাজ হচ্ছে না তখন তাঁর চৈতন্যোদয় ঘটে। তিনি সেটি মুলতবি করেন। আর তারপর তিনি তো

◆ তিনি অপারেশন ব্লিৎজ-এর যে সংশোধিত ভার্সানের কথা বলেছিলেন সেটা কী ছিল? তার মানে আমি বলতে চাই এই ভয় দেখানোর পরিকল্পনাটি কেমন ছিল?

Δ পরে তিনি যা বলেছিলেন তা হলো, অপারেশন ব্লিৎজ-এর পরিকল্পনা তিনি তৈরি করেছিলেন মাত্র। এটি ছিল মহড়ামূলক দৃশ্যপট মাত্র। তাঁর কথামতো এটি বাস্তবায়িত করার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। তা ছাড়া সবসময়ই সেনাবাহিনীর এ ধরনের একটি কার্যক্রম থেকেই থাকে। তাই বলতে হয়, যে পরিকল্পনাটি বাংলাদেশে শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হয় তা প্রকৃত অর্থে সাহেবজাদা ইয়াকুবের আমলেই প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু তিনি যা বললেন, তার সাথে আলতাফ গওহরের বিবৃতির মিল নেই। তিনি বলেন যে, সেনাবাহিনী সে পরিকল্পনা তৈরি করেছিল আর আমি সেটা বাস্তবায়িত করিনি।

◆ তাঁর নিজের মতামতের কথা কি আপনি শুনেছিলেন? তিনি কি ভাবতেন এই সব?

Δ তাঁর বিশ্বাস ছিল, এ্যাডমিরাল আহসান খুবই নরম মানুষ। এ কথা বিভিন্ন আলোচনায় তিনি প্রায়ই উল্লেখ করতেন। আর বলতেন, আরও একটু কঠোর হও। তবে সাহেবজাদা ইয়াকুব খান বাজপাখির মতো ভায়ানক রকমের উগ্র জঙ্গী ছিলেন এমনও নয়। বরং তিনি ভাবতেন, যে রকমটা দরকার এ্যাডমিরাল আহসান ঠিক সেই ভূমিকায় যেতে পারছেন না। তিনি আলাপ-আলোচনায় বড্ডো নরম প্রকৃতির লোক। তিনি সবাইকেই খুশি করতে চান।

◆ ফরমান আলী লিখেছেন যে, ইয়াহিয়া খান যখন এ্যাডমিরাল আহসানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন তখন সাহেবজাদা ইয়াকুব খুব খুশি হয়েছিলেন।

Δ জ্বি হ্যাঁ, কেননা সাহেবজাদা ইয়াকুব খান মনে করেছিলেন যে, এইবার তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারবেন, তিনি দেখিয়ে দিতে পারবেন কী করে কোন একটা বিষয়ে ছেদ টানতে হয়। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের

মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর নিয়ন্ত্রণভার হাতে তুলে নেয়ার ঘটনার পর তাঁর সত্যিকারের উপলব্ধি ঘটে। এর পরে তিনি নিজ থেকে আর কিছু করতে চাননি। এ বিষয়ে তিনি যে সব বিষয় তাঁর বিচার-বিবেচনায় রেখেছিলেন সেই সময়কার ঘটনায় তা যথার্থ ও অনতিবিলম্বে প্রমাণিত হয়। তার ধারণাটি সঠিক ছিল এই বিবেচনায় যে, মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগিয়ে গোটা জনসাধারণকে ও ট্রাফিক চলাচলকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন এবং তার বাঞ্ছিত ফলও পেয়েছিলেন তিনি। এ সবের পর সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা আর ছিল না। আসলে তিনি ব্যক্তি হিসাবে টিক্কা খানের মতো ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল যখন কেউ কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তাকে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি তখন তাঁর স্থির অবস্থান নিলেন এই বলে যে, শান্তি ফিরে আসায় ব্যবস্থা গ্রহণের আর কী দরকার!

◆ কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কী করলেন?

▲ তিনি কোন ব্যবস্থা নিতে না চাইলেও দেশের পশ্চিমাঞ্চলে লোকজন চাইল যে ব্যবস্থা নেয়া হোক। কাজেই তাঁর ওপরে চাপ রয়েই গেল সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

◆ এই চাপ আসছিল কার কাছ থেকে?

▲ ইসলামাবাদ থেকে।

◆ প্রেসিডেন্ট সাহেব?

▲ হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট সাহেবের পক্ষ থেকে।

◆ প্রেসিডেন্ট সাহেবের না সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে?

▲ জ্বি হ্যাঁ, জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে।

◆ জনাব পীরজাদা?

▲ জ্বি হ্যাঁ, এই পীরজাদাই হলো পালের গোদা। আর এ কারণে যে বিরোধ-সংঘাতের সৃষ্টি হয় তার পরিণতিতে সাহেবজাদা ইয়াকুব খান পদত্যাগ করেন। কেননা, তিনিই তখন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। ঘটনা তাঁর চোখের সামনেই ঘটছিল। তিনি দেখতে পেলেন আওয়ামী লীগ পরিস্থিতির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কাজেই এমন অবস্থায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর জানা ছিল, সেনাবাহিনীর কাজ হলো শান্তি ফিরিয়ে আনা আর সেই শান্তি ইতোমধ্যেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

◆ আচ্ছা ধরুন করাচীর বুদ্ধিজীবীদের কথা। পূর্ব পাকিস্তানে যেসব ঘটনা ঘটছিল সেই ব্যাপারে তাঁদের মাঝে সাধারণ অনুভূতি কী ছিল?

▲ আপনাদের বোধহয় জানা, এখানকার অধিকাংশ লোকই ছিল ৬ দফার বিরোধী। তাদের বিচার-বিবেচনায় ৬ দফার অর্থই হলো দেশের বিচ্ছিন্নতা। তাই তাদের আশু প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, ৬ দফা পাকিস্তানকে খতম করবে।

◆ কারা এ সব ভাবত?

▲ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব লোকেরই এ রকম ধারণা ছিল।

◆ তাহলে, পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলোও কি এভাবেই সবকিছুর বিচার-বিশ্লেষণ করেছে?

∆ জ্বি হ্যাঁ, পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্র তখন পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে সেভাবেই দেখেছে। তবে কিছু ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। আসগর খানের মতো বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আপনাদের হয়ত এ কথাও জানা, পূর্ব পাকিস্তানে তখন যা ঘটছিল তার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন এবং গোটা দেশ ঘুরে এ বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তার পরিণতি ছিল এই যে, তাঁর যে জনপ্রিয়তা ছিল তিনি তার পুরোটাই হারালেন। এখানে জানানো দরকার, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু লোক তাঁকে পাত্তাই দেননি বরং তারা তাঁকে একজন বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করতেন। তবে প্রকাশ্যে তাঁকে এই বিশ্বাসঘাতক বলতে পারেননি এই কারণে যে, তিনি ছিলেন বিমানবাহিনীর সাবেক এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তবুও তাঁর সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল এ রকমই। আমি এই সাথে একটু যোগ করেই বলতে চাই, গোটা পাকিস্তান জুড়ে তাঁকে এই জন্য একটা কাল পরিক্রমায় অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছে। তবুও তিনি দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। সাহস করে জনসাধারণের মাঝে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন, কিন্তু কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি।

◆ দেখুন, আজ সকালে জেনারেল ওমর বলছিলেন যে, যখন পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী ক্র্যাক ডাউনের খবর এখানে এসে পৌঁছায় এখানকার লোকজন তখন খুব খুশি হয়েছিল।

∆ জ্বি হ্যাঁ, তারা খুব খুশি হয়েছিল। আমি এ ব্যাপারে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলেছি। আমি যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখানে ফিরি তখন দেখি পিপলস্ পার্টির এক বৈঠক চলছে। আর ড. মুবাশ্বির হাসান আমার সাথে দেখা করার জন্য এসেছেন। তিনি আমার কাছে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা কী সে বিষয়ে জানতে চাইলেন। আমি বললাম, সেখানকার গোটা পরিস্থিতি এখন বাঙালীদের নিয়ন্ত্রণে। আর তাদের যেসব দাবি রয়েছে তার কম কিছুই তারা গ্রহণ করবে না। মুবাশ্বির এ কথায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানালেন এই বলে যে, আমরা আমাদের দেশরক্ষার জন্য কয়েক লাখ জীবন বিসর্জন দিয়েছি, প্রয়োজনে এ রকম আরও কয়েক লাখের প্রাণ যাবে সেটি কোন বিষয় নয়। অথচ এই মুবাশ্বিরই ছিলেন পিপলস্ পার্টির নেতৃত্বের অন্যতম বলিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মৃদুভাষী, বিবেচনাসম্পন্ন মানুষ।

◆ এ রকম অনুভূতি ছিল বলে আপনি বলতে চাইছেন? এই পরিস্থিতি কাটানোর জন্য মানুষের প্রাণের মূল্যেও ব্যবস্থা নিতে হবে, এই ছিল তাদের অভিমত?

∆ জ্বি হ্যাঁ, এটাকে আপনি ধরে নিতে পারেন। তারা বলতে চায়, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য তা করতেই হবে। এর জন্য মানুষের জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হবে, সেটি তাদের কাছে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়।

◆ যখন যুদ্ধ অনিশ্চিতভাবে দিনের পর দিন চলছিল, তখনকার অনুভূতি কী ছিল?

∆ আপনি জানলে আশ্চর্য হবেন, ইয়াহিয়া খান ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের আগের দিন এক বেতার ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, আমরা হারা যুদ্ধে জিতেছি! আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। এ রকম কিছু কথা। জনসাধারণ তো সে বক্তৃতা শুনে মহাখুশি। সাধারণ

মানুষের মধ্যে যারা বিবিসি'র খবর শুনত তারাই সেদিন শুধু বুঝতে পেরেছিল যে, যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয়েছে। আমার মনে আছে পরের দিন সকালে আমি আমার ব্যাংকে গিয়ে দেখি, সেখানকার সকলেই ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণে মহাখুশি। তাদের মতে ইয়াহিয়া খান এক জব্বর ভাষণ দিয়েছেন। আমরা তাহলে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। যুদ্ধে যে কলঙ্কজনক পরাজয় ঘটেছে জনসাধারণ তা আদৌ জানত না। তারা জানত যে, বিবিসি যা বলছে তা ডাহা মিথ্যা।

◆ এ রকম একটা অবস্থায় পাকিস্তানের সংবাদপত্র কেন মেনিমুখো হয়ে রইল? কারণ আমি তো নিশ্চিত করে বলতে পারি খবরের কাগজের সাংবাদিকরা ঠিকই জানত আসলে কী ঘটছে। ইয়াহিয়া খানের পাগলামি তাদের কাছে তো অজানা ছিল না।

∆ আমার তো তা মনে হয় না। যে কারণেই হোক তারা বিষয়টা জানত না, একেবারেই অজ্ঞ ছিল তারা। আমি এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিই, তাহলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। আমার এক বন্ধু বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করে ইংল্যান্ড থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এসে হাজির হলো। ঠিক সেই সময় ঢাকায় আমাদের সেনাবাহিনী ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। আমি সেই বন্ধুটিকে বললাম, কী ব্যাপার তুমি যে এখানে! দেশে! সে বলল, হ্যাঁ দেশে আমাকে আসতেই হলো। আসলে কী ঘটছে এখানে তা নিজ চোখে দেখার জন্য। কেননা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, পাকিস্তান পরাজিত হতে পারে! কী করে এটা সম্ভব? ইংল্যান্ডে আমার পরিচিত মহলে এ নিয়ে আমি বড়ই পেরেশানির মধ্যে আছি। তাই আমি নিজেই এসেছি এই এতটা পথ ঘুরে স্বদেশে। কী বলব আপনাকে, দেশের লোকজন তাদের চোখ পুরোপুরি বন্ধ করে ছিল এ ব্যাপারে। এখানকার মানুষ ছিল বাঙালীবিরোধী, তারা এ ধরনের সবকিছুই বিশ্বাস করত।

◆ কিন্তু আমি বলতে চাই, এখন তো নেপথ্যের অনেক কিছুই আপনাদের জানা। কেন আপনারা ভেবে দেখেননি যে, আপনাদের দেশের সংবাদপত্র এক অদ্ভুত রহস্যময় আচরণে লিপ্ত?

∆ শুধু সংবাদপত্রের কথাই বা কেন বলি, অনেক প্রগতিশীল চিন্তাধারার লোকজনকেও আমরা চিনি যেমন ধরুন সিবতে হাসান প্রমুখের কথা। তাঁরা অত্যন্ত চমৎকার ব্যক্তি। সব খবরই ছিল তাঁদের জানা। কিন্তু তাঁরা কখনও মুখ খোলেননি।

◆ কী কারণে ...?

∆ কী কারণে তা আমার জানা নেই। আমাদের বালুচ লোকেরাও এমনভাবে বদলে গেছে যে তারা কোন মহলে কথাবার্তা বলার সময় সকল লোকের পছন্দ এমন কথা বলে। যদিও সেসব কথাবার্তা আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়। আর এ ধরনের কথাবার্তাই এখন রীতিমতো একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন প্রত্যেকে বলে, আমেরিকা রয়েছে কোন না কোন ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে এবং এটা বলেই দায় খালাস। সে রহস্যের কোন কূল-কিনারা নেই আর তাতে সকলেই জ্বি হুজুরের মতো সায় দেবে। বলবে, ঠিক আমেরিকাই এর পিছনে রয়েছে। যদিও সাধারণ মানুষের কাছে এর গোমরটি মোটেও অজানা নয়। দৃষ্টান্ত দিয়েই আমি বলি,

আফতাব আহমদ খানের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হতো। তিনি তিন-চার বছর আগে এ ধরনের আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। তার সকল বাকোয়াজের শেষ কথা ছিল, চক্রান্ত। আমি একদিন তাঁকে বলেই ফেললাম—"দেখ আফতাব, তুমি খুবই জ্ঞানী, বুদ্ধিদীপ্ত লোক। তুমি তো সরকারের সকল সেরা পদের সরই খেয়েছ। আমেরিকানরা কি তোমার কিছু করেছে?" সে বলল, 'না'। আমি বললাম, "তাহলে তোমার এসব কথা বলার কী দরকার।" সে বলল, "আমি কী করব? সকলেই তো আমেরিকানদের কথা বলে। এখন আমি যদি তাতে বাদ পড়ি তাহলে কেউ সেটা সুনজরে দেখবে না।" এ নিয়ে আমি তাঁকে প্রায় ৬ মাস ধরে হাসি-ঠাট্টা করার পর সে ঐ বোলচাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু কথা হলো, মানুষের সাধারণ প্রবণতাই হলো এ ধরনের ফাঁদে পা দেয়া, বুদ্ধিমান লোকদের বেলায়ও দেখা যায় তারা জনপ্রিয়তা লাভের জন্যই কথা বলে। যেমন ধরুন, প্রায়ই বলা হয়ে থাকে ইসলাম বিপন্ন। অথচ সাধারণ মানুষের ইসলামকে নিয়ে তো কিছু করার নেই। তবুও তাদের এসব কথার খৈ ফুটতেই থাকবে। কেননা, এসব কথাবার্তা লোকজনের কাছে সমাদর পায়। আসলে আমাদের মূল্যবোধের গোটা ব্যবস্থাটি বিপর্যস্ত আর সে কারণেই সেই সময়ে আসগর খানের মতো ব্যক্তি এক অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে উঠেছিলেন। অবস্থাটা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, বাস্তব অবস্থা লোকের জানা থাকলেও সে কথা তারা কখনও মুখে আনত না।

◆ আপনি কি এমন অন্য কোন ব্যক্তির কথা মনে করতে পারেন যিনি ৬-দফার বিষয়টি কী তা ব্যাখ্যা করে বলার চেষ্টা করছিলেন? কিংবা এই ৬-দফার সত্যিকারের রাজনৈতিক তাৎপর্য কী তা খুলে বলার চেষ্টা করেছিলেন?

▲ আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে, ওয়ালী খানের মতো নেতা, যাঁর উচিত ছিল এই কাজটি করা, সেই তিনিও ঠোঁট সেলাই করে ছিলেন। এমনটিই প্রত্যাশা ছিল মানুষের কিন্তু কেউ তা করেনি। এমনকি কয়েকজন সিন্ধি রাজনীতিক, যাঁরা অনেকটা তৈরিও ছিলেন, তাঁরাও এগিয়ে আসেননি। অবশ্য একজন মাথা পাগলা লোক ছিলেন বটে খোদ পিপিপিতে। তাঁর নাম আহমদ রাজা মাসুদ। তিনি কিছুটা মুখ খুলেছিলেন।

◆ তিনি তাহলে কাজটি করেছিলেন ঐ সময়ে?

▲ অবশ্যই। তিনি ভুট্টোর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। ভুট্টো বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে যে-ই এখান থেকে যোগ দিতে যাক আমি তার ঠ্যাং ভেঙে দেব। অথচ মজার ব্যাপার, তিনি নিজেই ঢাকায় গিয়েছিলেন ঐ অধিবেশনে যোগ দিতে। যদিও সে অধিবেশন শেষ পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়। এই স্ববিরোধিতা ফাঁস করে দিয়েছিলেন আহমদ রাজা মাসুদ। আর সে জন্য তাঁকে বলা হয়েছিল পাগল!

◆ এই আহমদ রাজা মাসুদ কি পিপিপির টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন?

▲ জ্বি হ্যাঁ, পিপিপির টিকিটেই তিনি নির্বাচনে জয়ী হন। আসলে এক সময়ে তিনি ভুট্টোর খুব কাছের লোক ছিলেন। কিছু সিন্ধির ব্যাপারেও এই কথা বলা যায়, কিন্তু তারাও মুখ খোলেনি। এদের মধ্যে ছিলেন ওয়ালী আহমদ তালপুর, এমনকি বেনজীর ভুট্টোর শ্বশুর হাকিম আলী রাজাই। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে গৃহীত ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য। তাঁরা খাঁটি লোক ছিলেন কিন্তু তাঁরা কথা বলেননি, বলছেনও না। কেউ এ বিষয়ে কথা বলতে গেলেই দেখা যেত তার ওপর ইট-পাথর, ডিম-টমেটো ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

◆ কার চাপে তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন? পরিস্থিতি ছিল সে রকম, তাই?

▲ আসগর খান অবশ্যই সরব হতে পেরেছিলেন। কারণ তাঁকে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর জনক বলে মনে করা হয়। তিনি ছিলেন, '৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের একজন নায়ক। তাঁর উত্তরাধিকারী এয়ার মার্শাল নুর খানের চেয়েও তাঁকে অনেক বড় মনে করা হয়। শুধু এ কারণেই তাঁর পক্ষে মুখ খোলার সাহস দেখানো সম্ভব হয়েছিল। তাঁর নামে এমন কোন কলঙ্ক আরোপ করা সম্ভব ছিল না, যার অজুহাতে তাঁকে জেলে পাঠানো যায় কিংবা তাঁর বিচার করা যায়।

◆ ঢাকায় কাদের সাথে দেখা হয়েছিল আপনার? আমি বেসামরিক নাগরিকদের কথাই বলছি।

▲ অনেক লোকের সাথেই আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু কেমন করে জানি, তাদের সকলের কথা আমার মনে পড়ছে না। আমার স্মৃতিশক্তি খুবই খারাপ।

◆ মাযহারুল ইসলাম ছাড়া আর কারা হতে পারে?

▲ মাযহারুল ইসলাম আমার পরিচিত। কেননা, তাঁর সাথে আমার বহুবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

◆ বদরুদ্দীন উমরের সাথে কি আপনার দেখা হয়েছিল?

▲ নিশ্চয়ই। তাঁর সাথে আমি দেখা করেছিলাম। তিনি আমায় এ কথা বলেছিলেন বলে মনে আছে, কেন আপনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন? জানেন না আপনার গতিবিধির ওপর নজর রাখা হয়েছে? এ ছাড়া আরও একজনের কথা মনে পড়ে, যে *লন্ডন ডেইলিতে* পূর্ব পাকিস্তানের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লিখেছিল। ওটা ছিল একটা ছোট পুস্তিকার আকারে। তার নামটা কবির না কিবরিয়া ঠিক মনে করতে পারছি না। *হলিডে*'র এনায়েতউল্লাহ খানের সাথেও আমি দেখা করেছি। ভুট্টোর সাবেক সচিবের সাথেও সম্ভবত আমার দেখা হয়েছে। তিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরে কাজ করতেন। ভুট্টো '৬৫ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিল।

◆ নিয়াজীর এবং তার ৯৩ হাজার সৈন্য যখন ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তখন জনগণের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

▲ সে সময় জনগণও এটা ভুলে গিয়েছিল।

◆ তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া কী ছিল? পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার ব্যাপারে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তারা দেখিয়েছিল?

▲ না, কখনও না। কারণ পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের বিষয়টি তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। তারা মনে করতে পারেনি যে, এটা আদৌ সম্ভব বা ঘটেছে।

◆ **কেমন করে এই ৯৩ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করল? এটা কীভাবে ঘটল আর সেটা কীভাবে দেখল তারা?**

∆ তারা লোকজনকে বিভ্রান্ত করেছিল। তাদের আদৌ বুঝতে দেয়া হয়নি আসলে ঘটনাটা কী। পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন ঢাকায় আত্মসমর্পণ করছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ মনে করেছে, পাকিস্তান একটা বিপর্যয়ে পড়েছে বটে কিন্তু যুদ্ধ চলছে।

◆ এটাকে ওরা হয়ত ধরে নিয়েছে একটা সাময়িক বিপর্যয় হিসাবে?

∆ হ্যাঁ, ওরা মনে করেছে এটা একটা সাময়িক অসুবিধা মাত্র। ইয়াহিয়া খানও তা-ই তাদেরকে বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, ইয়াহিয়া খানের ওপর প্রেসার ছিল। তিনি বলেছিলেন, শান্তি আমাদের যখন দরকার নেই তখন কিছু বিশ্বাসঘাতকই বলছে, তারা নাকি শান্তিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

◆ তিনি বলেছিলেন, এটা একটা সাময়িক বিপর্যয় মাত্র?

∆ হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন, আমরা একটা লড়াইয়ে হেরেছি কিন্তু গোটা যুদ্ধ এখনও চলছে। অর্থাৎ তিনি কথাগুলো বলেছিলেন চার্চিলের মেজাজে। কিন্তু তিনি তাঁর এ ভাষণে যে ধারণাটি দেয়ার চেষ্টা করছিলেন তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তিনি একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন যে, একটা যুদ্ধে পরাজিত হলেও বিজয় আমরা আবার ছিনিয়ে নেব। অবশ্য তার পরপরই...।

◆ তাঁর এই ভাষণটি সম্প্রচারিত হয়েছিল?

∆ জ্বি হ্যাঁ, সম্প্রচারিত হয়েছিল। এরপর জনাব ভুট্টো ক্ষমতায় আসেন। তিনিও সেই একই রকমের ধারণা দেবার চেষ্টা করেন। তিনি ক্ষমতায় আসার পর সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত করেন। তবে ক্ষমতায় আসার পর তিনি সেনাবাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করেন। আর সেজন্য তিনি ঢাকায় পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য টিভির পর্দায় দেখানোর ব্যবস্থা করেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। কেননা, কর্তৃপক্ষ এটি দেখানোর পর ঘোষণা দেয়, এটি আবার আগামীকাল টিভিতে দেখানো হবে। কিন্তু প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে পরদিন আর টিভিতে সেটা দেখানো হয়নি। তবুও টিভি কর্তৃপক্ষ দুই-একদিন পর সেটি আবার টিভিতে দেখান কোন রকম ঘোষণা না দিয়ে, চুপেচাপে।

ওসমান বালুচ

[ওসমান বালুচ বর্তমানে পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টির প্রেসিডেন্ট। ১৯৭১ সালে তিনি মুত্তাহেদা মজদুর ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিতাস গ্যাস শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সে সময় তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। সে সময়ই তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।]

◆ আপনার কাছে জানতে চাই, একাত্তরে যেসব ঘটনা ঘটে সে ব্যাপারে আপনার মনোভাব বা প্রতিক্রিয়া কী?

∆ আমি যেহেতু আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক সংগঠনগুলোর সাথে সম্পর্কিত ছিলাম সেহেতু তাদের সাথে আমার ভাল সমঝোতা ছিল। সে কারণে আমি এসব ঘটনা ঘটে যাবার আগেই বলেছিলাম, 'পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হতে চলেছে।' তবে সে যাই হোক, আমি যখন তৎকালীন পাকিস্তানের এ অংশের (পশ্চিম পাকিস্তান) অন্যান্য অঞ্চলের শ্রম আন্দোলনের কর্মীদের সাথে একেকটা স্তরে কাজ করছিলাম তখন তাদের অনেকের অভিমত ছিল এই যে, বাঙালীরা ভারতের এজেন্ট। আর সে কারণেই তাদের এ আপত্তি নিয়ে তাদের সাথে আমাদের মতপার্থক্য দেখা দেয়। আমরা বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাই। আমরা তখন বলি, বাংলাদেশের মানুষ অনেক আত্মত্যাগ করেছে, এখনও করছে। কাজেই আমাদের উচিত হবে না তাদের প্রতি উপনিবেশের মতো, দাসের মতো আচরণ করা।

◆ আপনারা সেদিন এই যে অবস্থান নিয়েছিলেন, তার প্রতি কি কোন সমর্থন পেয়েছিলেন?

∆ অবশ্যই। আমরা সমর্থন পেয়েছিলাম মজদুর শ্রেণীর। রাষ্ট্র সমর্থন করে না এ রকম একটি প্রবণতার পটভূমিতেও আমরা কিন্তু বিভিন্ন কল-কারখানার শ্রমিকের সমর্থন পেয়েছিলাম। সিন্ধি ও বালুচ জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানায়।

◆ কেন তারা আপনাদেরকে সে সমর্থন জানিয়েছিল? তারা কি ছয় দফার দাবিগুলো খতিয়ে দেখেই সমর্থন প্রকাশ করেছিল?

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন, মহিউদ্দিন আহমেদ ও আফসান চৌধুরী

▲ সত্যি কথা বলতে কি, তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় স্তরে ছয় দফার একটা রাষ্ট্রবিরোধী চেহারা তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু সিন্ধি ও বালুচ জনসাধারণের বিশ্বাস, বাঙালী জনসাধারণ এই ছয় দফার মধ্য দিয়ে তাদের জাতীয়তাভিত্তিক অধিকার পেতে চেয়েছিল। তারা এ অধিকারের বাস্তবায়ন চেয়েছিল ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেছিল বাঙালীরাই। তারা তখনকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও কর্মীদের পাঠানোর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিল। তারা বলেছিল, পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প কারখানায় এসব পর্যায়ের লোকজন পাঠানো শুভ নয়। তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রদত্ত ধারণাকে সমর্থন করেনি। তাদের মাঝে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতার একটি ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে। আর এ বিষয়ে কিছু জ্ঞানও তাদের ছিল। দেশের গোটা জনসমষ্টির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এ ধরনের লোকজন স্থানান্তর তাদের গণতান্ত্রিক চেতনার বিরোধী ছিল। কেননা তৎকালে পশ্চিম পাকিস্তানে যে সব ফেডারেটিং ইউনিট বা প্রদেশ নিয়ে দেশের পশ্চিমাঞ্চল গঠিত ছিল তার গোটা জনসমষ্টি পূর্বাঞ্চলের তুলনায় ছিল কম। আর সে জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যাকে সেই স্তরে কমিয়ে আনার...।

◆ আর সে জন্যই কি সেনাবাহিনী ১৯৭১-এ বাংলাদেশে নির্বিচারে গুলি করে মানুষ মারছিল?

▲ সন্দেহ নেই, সমস্যাকে তার যথার্থ প্রেক্ষাপটে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের উন্নত, উপলব্ধিও প্রশংসার দাবিদার। তবুও আমাদের ধারণা ছিল, বাঙালীদের পাকিস্তান রাষ্ট্রবিরোধী হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের নিধনে সেনাবাহিনী নিয়োজিত করা হয়। তারা বাঙালীদেরকে তাজউদ্দিন বা বাংলার এজেন্ট বলেও আখ্যায়িত করে। এ কারণে শ্রমিকরা সেনাবাহিনীর নীতি সমর্থন করেনি। তারা সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র কিংবা শিল্পপতিদের মাধ্যমে নীতি প্রণয়নের বিষয়টিকে কখনও সুনজরে দেখেনি। ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানেও শিল্পপতিদের কয়েকটি শিল্প ইউনিট ছিল। আর সে কারণে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও শিল্পপতিরা ছিল শ্রমিকবিরোধী।

◆ এক সময় পাকিস্তানে অভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছিল। এ আন্দোলনের কোন জাতীয়তাবাদী শ্লোগান ছিল না। যেমন ধরুন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একটি আন্দোলন ছিল। এ সব আন্দোলনের অভ্যন্তরে ১৯৭০-এর নির্বাচন নিয়ে কি কোন মতপার্থক্য ছিল?

▲ ভাসানী ও অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ এ দেশের মজদুর শ্রেণীর কাছে অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন। আর '৬৯-৭০-এর আন্দোলনের দিনগুলোতে ভাসানীর অধিকতর জঙ্গী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। তিনি শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ রাখতেন। আর শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমি বলব, তিনি বেশি করে সম্পর্ক রাখতেন জাতীয়তাবাদী নেতা জি এম সৈয়দ ও ন্যাপের সাথে। দেশের দুই অংশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে একটা অভিন্নতাবোধ অবশ্যই ছিল। তাদের চিন্তাভাবনায়ও মিল ছিল। কিন্তু শিল্প শ্রমিক হিসাবে আমার যতদূর উপলব্ধি তাতে বলতে পারি, বাঙালী শ্রমিকরা পশ্চিম পাকিস্তানী শ্রমজীবী মানুষগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। তখন রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল পাকিস্তানের এই অংশে (পশ্চিম পাকিস্তান) শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ও অন্য অঞ্চল থেকে ঐ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের

জন্য শ্রমিক আমদানি করা। এর নেপথ্য উদ্দেশ্য, এ শ্রমজীবী মানুষগুলোকে তাদের মূল থেকে উৎপাটিত করা, আর সেই সুবাদে তারা যাতে পুঁজিপতিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের বাঙালী শ্রমিকরা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অদক্ষ, আধাদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিক পূর্ব পাকিস্তানে আনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আর তা থেকে আমরা বুঝেছিলাম যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমজীবীদের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ও সমঝোতা রয়েছে। তাদের আন্দোলনও একইভাবে ঐক্যবদ্ধ। উপমহাদেশের দেশবিভাগের আগের দিনগুলোতে সেখানে যে সব শ্রমিক আন্দোলন ছিল সেগুলোর মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য ছিল। আমি বলতে চাচ্ছি, পূর্ব পাকিস্তানে ছিল একটি বিরাট শ্রমজীবী শ্রেণী। ধরুন, এদের অস্তিত্ব ছিল ১৯৫২-এর দিকে ও তার পরেও। তাদেরকে আমরা দেখি ১৯৬৮-১৯৬৯-এর দিকে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের আইন-কানুন ছিল বেশ, যার অনেকটাই অস্পষ্ট, আর ছিল পূর্ব ও পশ্চিম— উভয় পাকিস্তানে নানা ধরনের ও শ্রেণীর আইন। আর এ দৃষ্টির নিরিখেই আমি বলব যে, পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিকরা ছিল অধিকতর সংগঠিত ও বিক্ষোভপ্রবণ।

◆ আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, সেই সময়ে কিছু সিভিলিয়ান আমলা, বুদ্ধিজীবী ও নানা ধরনের পেশাদার গোষ্ঠী দেশে যা ঘটে চলেছে সে ব্যাপারে কখনও প্রতিবাদ করেনি। এসব লোক কখনও সেনাবাহিনীর গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় বেরিয়ে আসেনি। কেউ আসেনি।

∆ এই জিনিসটিকে বুঝতে হলে আবারও গোটা পটভূমির মূলে ফিরে যেতে হবে। কেননা আমি মনে করি যে, এ সবের প্রধান কারণ ছিল রুশ ও চীনাপন্থী—এই দুই চিন্তাধারার লোকজনের মধ্যকার সংঘাত। তবে এ সংঘাতের বহু আগে রাষ্ট্র বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করে এবং আইয়ুব খান সে কাজটি করেছিলেন। আইয়ুব তো ছিলেনই, সেই সাথে তাঁর সঙ্গে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার আরও অনেকেই। কিন্তু ঐ সময় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দ্বিমত ছিল এ প্রশ্নে যে, জনসাধারণের জন্য নির্দেশনা কী হবে? আর বাস্তবিকপক্ষে এখনও আমাদের সামনে সে নির্দেশনাটি নেই। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই, পাকিস্তানী জাতি বলতে কাকে বোঝাবে—এটি কি পাকিস্তানী জাতিসমূহের ফেডারেশনকে বোঝাবে, না মুসলিম উম্মাকে বোঝাবে, নাকি মুসলিম জাতিকে বোঝাবে—এই বিষয়টির নিষ্পত্তির প্রশ্নে আমরা এখনও আঁধারে হাতড়াচ্ছি। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, ওটা আছে কি নেই সে বিষয়টি নিয়ে রুশ শিবিরে একটি অভিমত ছিল। কিন্তু জনসাধারণ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিল চীনপন্থী গোষ্ঠীদের দ্বারা। আমি বলি, রুশ শিবিরের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র অবস্থানে দাঁড় করায়। এই রুশপন্থী ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র অবস্থানে দাঁড় করায়। এই রুশপন্থী ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশ আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। তবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মতবিরোধ এবং রাষ্ট্রের দমন-নিপীড়নমূলক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে আসতে পারেননি। বস্তুতপক্ষে, পশ্চিম পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবীদের তাঁদের অধিকার আদায়ে রাস্তায় নেমে আসার কোন ঐতিহ্য এখনও নেই।

◆ ধন্যবাদ।

Δ কিন্তু এই সঙ্গে আমি একটি কথা যোগ করতে চাই যে, আপনারা বাঙালী ভাইয়েরা অনেক বেশি প্রভাবের অধিকারী। সে কারণেই আমি বলি ওখানকার শ্রমিক-কর্মজীবীরা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তবু ব্যবধান বা ফারাক যদি সাগরের মতোই বিস্তর হয়, সেটির সেতুবন্ধন নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। আর তাই সার্ক (SAARC) পর্যায়ে যদি এর একটা সমাধান থেকে থাকে, তবে সেই ব্যবস্থায় ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করুন, আর সেই সঙ্গে একটি মানবাধিকার কোড বা মানবাধিকার পর্যায়ে একটি যৌথ কোড রাখার ব্যবস্থা করুন। এর ফলে শ্রমজীবীরা কিংবা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যারা, বিশেষ করে মৎস্যজীবী, মজদুর শ্রেণীর লোকেরা যদি কখনও অনবধানবশত কোন দেশের সীমা অতিক্রম করে ফেলে, তবে তাদেরকে জেলে পাঠানো যাবে না। আমার ধারণা এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত সীমান্ত অতিক্রমের জন্য এখন ভারতের কারাগারে ৬৯-৭০ জন শ্রমিক বা জেলে অবস্থান করছে। পাকিস্তানেও ভারতের এ ধরনের কিছু লোক আটকে আছে। পাকিস্তানে এসব ক্ষেত্রে অনেকে সক্রিয় রয়েছে, আপনারাও যদি এ বিষয়ে কথা তোলেন আমরা কৃতজ্ঞ হব। ধন্যবাদ।

ড. তারিক রহমান

[ড. তারিক রহমান ১৯৭১ সালে ক্যাডেট হিসাবে ছিলেন কাকুল সামরিক একাডেমীতে। সেখানে তিনি খবর পান ঢাকায় গণহত্যার। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেনাবাহিনীর কমিশন ত্যাগ করেন এবং শিক্ষকতা-গবেষণায় যোগ দেন। তাঁর পিএইচডি থিসিস 'ল্যাংগুয়েজ এ্যান্ড পলিটিকস ইন পাকিস্তান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইসলামাবাদের কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশনে (১৯৯৮) প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ড. রহমান বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে চা পর্বের সময় তাঁর এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।]

◆ ড. রহমান, শুনেছি ১৯৭১ সালে আপনি ছিলেন সেনাবাহিনীতে, পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার সংবাদ শোনার পর আপনি সেনাবাহিনী ত্যাগ করেন। ঘটনাটি বলবেন?

∆ তখন আমি কাকুল সামরিক একাডেমীর ক্যাডেট। ঢাকায় সামরিক ব্যবস্থা নেবার কথা প্রথমবারের মতো আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে জানায়। আগে কখনও এসব নিয়ে ভাবিনি। একদিন ফায়ারিং রেঞ্জে টার্গেট প্র্যাকটিস করার সময় গুলি লক্ষ্যভেদ করতেই চকিতে এ প্রশ্ন আমার মাথায় বিদ্যুৎ হেনে যায়, কেন আমি এ সব করছি? আমি যাকে গুলি করতে চাই না—একদিন হয়ত আমাকে তাকেই গুলি করতে বলা হবে। আমি রাজনীতি সচেতন কেউ ছিলাম না। হিন্দু, মুসলিম, ইহুদী কোন ধর্ম, কোন জাতি, বর্ণ—কারও বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ ছিল না। রাজনীতি সম্পর্কে এর বেশি তেমন কিছু জানাও ছিল না। তবে হঠাৎ আমার কেন যেন মনে হলো, রাজনীতি কেমন যেন আমার মাথায় চেপে বসছে। আমি তো সেনাবাহিনীর সদস্য। ঠিক-বেঠিক যা-ই হোক, আমাকে আদেশ দেয়া হবে। আর আমি না চাইলেও তা পালন করতে হবে। তাই বন্ধুর কাছে ঢাকার সামরিক ব্যবস্থা নেবার কথা শুনে প্রথমে আমার মুখ থেকে যে কথাগুলো বেরিয়েছিল তা হলো, এ ব্যবস্থা

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন, মহিউদ্দিন আহমেদ ও আফসান চৌধুরী

অত্যন্ত বর্বর, অন্যায়। বন্ধুটি ঢাকায় নেয়া ব্যবস্থার পক্ষে বলতে চাইল, 'দেখ ঠিক-বেঠিক যা-ই হোক, এই তো আমার দেশ!' আমার জবাব ছিল, 'আমার কাছে মানবতা আগে বিবেচ্য, পরে দেশ। প্রয়োজনের ডাক দেশের মাটির নয়, বরং কিছু লোকের, সিদ্ধান্ত প্রণেতার। দেশের নামে ঢাকায় যা ঘটছে তাকে যৌক্তিকতার মোড়ক দিতে পারি না। যদি তা করি, আমাদের অন্যায় হবে। আসলে এটি করে আমরা 'কতিপয়তন্ত্রের' অন্যায় কাজকে যৌক্তিকতা দিচ্ছি।' এ কথাও আমি বললাম যে, দেশকে গড়ার চেয়ে ভাঙার সম্ভবত এটি একটা সেরা উপায়। বন্ধুটি একমত হতে পারল না আমার সঙ্গে।

◆ তারপর?

∆ ইতোমধ্যে অনেক পানি গড়িয়েছে। আমি সেনাবাহিনীর কমিশন পেলাম। দেরি না করে আমি সোজা চলে গেলাম আমার ওপরওয়ালা কমান্ডিং অফিসার কর্নেল শামসুর রহমান কালুর (বর্তমানে লে. জেনারেল হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত) কাছে রিপোর্ট করতে। আমি প্রথমেই তাঁকে বললাম, 'আমি সত্যিই এ যুদ্ধে জড়াতে চাই না। তবে এখন ইস্তফা দেবার মতো সাহসও আমার নেই।' তিনি বললেন, 'ও কাজটি কর না, করলে তোমাকে হয়তবা গুলি করতে হবে আমাদের।' আমি বললাম, 'করব না, না করার কারণ বলেছি। তবে আমার সহানুভূতি ওদের সঙ্গে, যাদেরকে এখন ঢাকায় গুলি করা হচ্ছে।' তিনি বললেন, 'ঢাকায় কি তোমার কোন বন্ধু আছে? ব্যক্তিগতভাবে বাঙালীদের সঙ্গে তোমার জানাশোনা আছে?' আমি বললাম, 'আছে। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমীতেও ছিল, কিন্তু তাতে কী! ঘটনা তা নয়, আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, ঢাকায় যা ঘটছে তা অন্যায়।' তিনি অবশ্য আমাকে জানালেন, 'তুমি তো আর্মড কোরের। তোমাকে আসলে ঢাকায় যেতে হবে না, অন্তত এখনই না। তা ভাল কথা, ঢাকায় সামরিক তৎপরতা শেষ হয়েছে।' আমি বলেছিলাম, 'হলো আর কোথায়! এ কেবল এখনকার সামরিক ব্যবস্থার কথা নয়, ঢাকার কথা নয়। এমনটা হতে পারে বেলুচিস্তানে, করাচীতে, এই এখানে কিংবা অন্য কোথাও, যার জন্য আমি অনুপযুক্ত। আমাকে তাই আমার কমিশন থেকে ইস্তফা দেবার অনুমতি দেয়া হোক।' আমি কী করতে চেয়েছিলাম সত্যি আমি ঠিক তা বুঝিনি। কেননা, দেখা গেল আমার সঙ্গে যাদের একত্রে কমিশন হয়েছে তারা আমাকে মোটেও ভাল চোখে দেখছে না। ওরা আমাকে বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক ভাবছে। আমি অবশ্য স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলাম, আমি পাকিস্তানের বিরোধী নই। আমার কাছে পাকিস্তানকে রক্ষার অর্থ হলো, পাকিস্তানের অধিবাসীদের সুখ-দুঃখ দেখা। দেশের শতকরা ৫৬ জন লোকের বাস পূর্বাঞ্চলে। আমরা তাদের সঙ্গে ভাল আচরণ করিনি। আর কেবল আচরণই নয়, তার চেয়েও আরও গুরুতর রকমের কিছু ছিল যা আমি আরও পরে টের পেয়েছি।

◆ পাকিস্তান ভাঙার কারণ কী ছিল বলে আপনার মনে হয়?

∆ Language and Politics in Pakistan বইটি লেখার সময় পড়াশোনা করে ও ঢাকায় গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি ঘটনার মূল কোথায়। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন ছিল শোষণ-বঞ্চনার প্রতীক। ভাষা কেড়ে নেয়া আর কারও আবেগ-অহংবোধ, এমনকি সংস্কৃতি কেড়ে নেয়া একই কথা। কাউকে তার কাজ করে খাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। যে ভাষা সে বোঝে না সে ভাষায় তাকে ফরম পূরণ করতে বলা,

ক্ষমতার আঙিনায় গরিষ্ঠের ভাষা ব্যবহারযোগ্য নয়—এ দোহাই পাড়া সমর্থন করা যায় না। এ রকম আরও নানাভাবে সৃষ্টি করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক—গরিষ্ঠের মধ্য থেকে। মানুষ তো এ অন্যায় আধিপত্যের প্রতিবাদ করবেই। এ প্রতিবাদেরই নাম একুশে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশ অমিত আবেগের মূল আধার। এ ছিল প্রথম রক্ত ঝরানো দিন। আইয়ুবী আমলে ঐ দিনটি ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, সরকারের কাজে সন্তোষ বা অসন্তোষ প্রকাশের দিন। এলিস কমিশনের রিপোর্ট, তাজউদ্দিনের ডায়রিতে রক্তাক্ত এ সব ঘটনার সুবিপুল তাৎপর্যের আভাস রয়েছে—নুরুল আমিন প্রমুখের মরমে তা প্রবেশ করেনি।

সেই একুশের পর একাত্তরের ২৫ ও ২৬ মার্চের নিকষ কালো মাঝরাতেই, আমি মনে করি, পাকিস্তান নিরুদ্দেশ হয়। আমাদের জেনারেল নিয়াজীর মতে, তাঁরা নাকি ভারতের একাংশ কব্জা করে নিতে পারতেন। আমার মতে, তিনি তা পারতেন না। আর পারলেও তাতে অবস্থার কোন বড় রকমের প্রতিকার হতো না, গৃহযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতো। আমি মনে করি, এ সব থেকে আমাদের শিক্ষা নেবার আছে। সে শিক্ষা হলো, সমস্যার সমাধান রয়েছে শোভন সৌজন্যে—মানবিকতায়।

◆ তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্কটের সমাধান হতে পারে আলোচনার মাধ্যমে, সংঘাতের মাধ্যমে নয়?

∆ কখন পতাকা নামাতে হবে তা রাষ্ট্রকে বুঝতে হবে, অন্য জনসমষ্টিকে কখন মেনে নিতে হবে তা-ও প্রতিপক্ষ জনসমষ্টিকে উপলব্ধি করতে হবে। তবে এক-আধ জনের হেন উপলব্ধিতে কাজ হবে না; ব্যাপক জনমত গড়ে উঠতে হবে। ব্রিটেনের মতো রাজনৈতিক দল থাকতে হবে, যে দল বলতে পারে—ঠিক আছে, আসুন আমরা ভারতে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ফেলি। তবে এ ধরনের ঘটনা সচরাচর ঘটে না। আমি শুধু এটুকু যোগ করতে চাই, এই যে ইতিহাস লেখা হচ্ছে তাতে সমস্যার গভীরতর উপলব্ধি আমাদের ঘটবে, আগামীতে আমরা এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে পারব। আর তা যদি পারা যায় চমৎকার। বলা যাবে আমরা কিছু শিখেছি। যদি না পারি তা হলে দক্ষিণ এশিয়ার কপালে বড় দুর্ভোগ রয়েছে। সুবিচার না থাকলেও এ অঞ্চলে গোলযোগ-সংঘাত সবসময় লেগেই থাকবে। বলবাহুল্য, দক্ষিণ এশিয়ায় এরকম নানা অন্যায়-অবিচারের অস্তিত্ব রয়েই গেছে।

আসল কথা, আমরা অভিন্ন প্রতিবেশের অধিবাসী। আমরা যদি এ প্রতিবেশ ধ্বংস করে ফেলি, তাহলে আমাদের আর কোথাও ঠাঁই থাকবে না।

আহমদ সেলিম

[পূর্ব পাঞ্জাবের একজন জনপ্রিয় কবি আহমদ সেলিম। ষাটের দশক থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন; ছোটগল্পকার হিসাবেও তিনি পরিচিত। সমাজ সচেতন এই লেখক ছিলেন ন্যাপের সক্রিয় সদস্য। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কারণে সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন। বর্তমানে একটি এনজিওতে কাজ করছেন। আহমদ সেলিমের উর্দু ও পাঞ্জাবীতে লেখা সাম্প্রতিক দু'টি কাব্যগ্রন্থের নাম 'ঘড়ি দি টিক টিক' এবং 'যব দোস্ত নাহি হোতা'। তাঁর এই সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে ইসলামাবাদে আমাদের অতিথি নিবাসে।]

◆ আপনি ১৯৭১-এ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাই আপনি কি আমাদের কাছে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের পরের পরিস্থিতির একটা বিবরণ দিতে পারেন? ১৯৭০-এ পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি কী ছিল? নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা কেমন ছিল? ন্যাপ-এর সদস্য হিসাবে নির্বাচনী ফলের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল—অনুগ্রহ করে বলবেন?

Δ আসলে সাধারণ নির্বাচনের ফল যখন প্রকাশ করা হয় তখন মনে করা হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন জনসাধারণের মাঝে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ইয়াহিয়া খান, ইয়াহিয়াপন্থী ও ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও বলাবলি করছিল যে, পার্লামেন্টে ভোট ভাগ হয়ে যাবে আর তার ফলে ইয়াহিয়া খানের খেলা সহজ হয়ে যাবে। তিনি আগামী সরকারের ঘাড়ে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু নির্বাচনের ফল আসে চমকে দেবার মতো। খবরের কাগজে ফলাও করে খবর ছাপা হয়—জনগণের জয় হয়েছে। এ ছিল পত্রপত্রিকার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। নিরপেক্ষ ও গণমুখী খবরের কাগজে বড় শিরোনামে খবর ছাপা হয়, আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি 'ময়দানে জিত লিয়া'। এ খবর ছিল শাসকগোষ্ঠী ও সমর্থকদের জন্য অত্যন্ত বিক্ষুব্ধকর। তারা তখন নানা রকমের পাঁয়তারা শুরু করে। ডানপন্থী দলগুলো বলতে শুরু করে যে, যা হলো

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ।

তা টিকবে না, তারাই আবার আসবে—এ রকম কথা। ঠিক এ সময় ভুট্টো সাহেব হঠাৎ করে এ রকম দাবি করতে থাকেন যে, তিনি ক্ষমতায় শেখ মুজিবের অংশীদার। তাঁর এ অভিলাষ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের ধারণা, ভুট্টো মেজাজ-মানসিকতার দিক থেকে ফ্যাসিস্ট প্রকৃতির লোক। তাই আমাদের ধারণা হলো, তার এই সব কথাবার্তা সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলনীতির পরিপন্থী। নির্বাচনের ফল বেরিয়েছে, এক ব্যক্তি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, ল্যাঠা চুকে গেছে, ভাবনার কিছু নেই। গণতন্ত্রের নীতির ভিত্তিতে নির্বাচনের এ ফল মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু ভুট্টো সে কথা বুঝতে চাচ্ছিলেন না। এই সময় সামরিক শাসকচক্র এমন কিছু তৎপরতা শুরু করে যাতে বোঝা যায়, তারা নির্বাচনের ফল নস্যাৎ করে দেয়ার একটা উপায় বের করতে চায়। আমার ধারণা, ভুট্টো এ ক্ষেত্রে হাতিয়ার বা সাধনীর কাজটি করেছেন। তাঁর ধারণা তিনি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছেন, আর সেনাবাহিনীর মতলব, তারা ভুট্টোকে কাজে লাগাচ্ছে। ভুট্টোর নিজস্ব মতলব ছিল সব সময়। তিনি ডানপন্থী দলগুলোকে দোষারোপ করে ইয়াহিয়ার কাছ থেকে সমর্থন নিচ্ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, যেভাবেই হোক তিনিই হবেন ক্ষমতাধর দ্বিতীয় ব্যক্তি। আওয়ামী লীগ থেকে যদি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে পিপলস পার্টি থেকে বা এর ঠিক বিপরীত। আর সে ক্ষেত্রে কিছু মন্ত্রী তাঁর দলের থাকবে। পিপলস পার্টির মন্ত্রিসভা থাকবে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে কিংবা এ রকম একটা কিছু ব্যবস্থা। ইয়াহিয়া খানের নিজের খেলাও ছিল। তাঁর ভিতরে ভিতরে পরিকল্পনা ছিল ভুট্টোকে ব্যবহার করে তিনি শেখ মুজিবকে বাগে আনবেন। সে ক্ষেত্রে তিনি এই অজুহাত তুলে ধরবেন যে, এই লোকটা ক্ষমতায় অংশীদার হতে চায় আর সে ক্ষেত্রে আমার যদি বলতে হয় তাহলে বলব, আমার হাত তো সেদিক থেকে বাঁধা। শেখ মুজিবের ভূমিকাটি ছিল একক ও অভিন্ন। তাঁর বক্তব্য, বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের। আমরা যদি প্রস্তাবে রাজি না হই ওটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না। এ দিকে ইশারা-ইঙ্গিত ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে থাকে। শেখ মুজিবের বহু বন্ধু জানিয়েছেন, তাঁরা শেখ মুজিবকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিছুটা নমনীয়তা দরকার তা না হলে নৈরাজ্য দেখা দেবে।

◆ ওরকম দুই একজনের নাম বলুন।

∆ সরদার শওকত হায়াত খান, মিয়া মমতাজ দৌওলতানা, ওয়ালী খান, মওলানা মুফতি মাহমুদ ও আরও অনেকে, যাঁরা মার্চে ঢাকায় আলোচনার সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে সে প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি। তাঁরা শেখ মুজিবকে আভাসে-ইশারায় বুঝানোর চেষ্টা করেন। শেখ মুজিব ওয়ালী খানকে বলেন, আপনি জানেন, ওরা মুসলিম লীগের আর আমিও স্বাধীনতার যোদ্ধা। আমি পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য লড়েছি। তাহলে এমন প্রশ্ন কীভাবে উঠতে পারে, আমাদের মদদ দেয়া হচ্ছে বা এই জাতীয় কিছু? যা হোক, এই হলো ব্যাপার। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে বলেন, তিনি অন্য একটা উপায় বের করতে চান। তাই কোন একটা শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সমাধান বের করুন। শেখ মুজিব তাতে সম্মত হন। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবের মধ্যে আলাচনা শুরু হয়। পরের দিনও এই আলোচনা চলতে থাকে। ভুট্টো এই আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও ১৮ মার্চ

সম্মত হন। তাই নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে একটি বা দু'টি 'খেল' নয়, একাধিক 'মাদারীর খেল' অনুষ্ঠিত হয়। আর তাতে প্রতিটি খেলোয়াড়ই নিজের চাল চেলে মনে করতে থাকেন তিনিই পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিনিধি। এ ছাড়াও আরও একটা নেপথ্য কাহিনী আছে। শেখ মুজিব মনে মনে চাচ্ছিলেন, সরকার গঠনের পরে তিনি আশু ও অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন নানাবিধ সংস্কারের লক্ষ্যে। তিনি কৃষি সংস্কারে অত্যন্ত আগ্রহী ও উৎসুক ছিলেন। তিনি সামন্ত প্রথা উচ্ছেদের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। আর তাই কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল শেখ মুজিবের সংস্পর্শে আসতে চাচ্ছিল। এমন একটা চুক্তি করার জন্য, তিনি সামন্তবাদী প্রথা উচ্ছেদ না করার শর্তে তাঁকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে। উল্লেখ্য, সামন্ত প্রভুরাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান শক্তি—ক্ষমতার উৎস।

◆ তা কী ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছিল?

∆ চক্রান্ত ছিল সামন্ত জমিদারদের। আর এ কাহিনী বলেছেন মাসুদ কাদেরহোশ। তিনি সেই সময় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দেশপ্রেমিক, পাকিস্তানীও বটে। পাঞ্জাবী ভাষা তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। অত্যন্ত আন্তরিক ও উত্তম একজন আমলা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন জনগণের সেবক। তাই তিনি বহু গোপন বিষয়ই ফাঁস করেন। শেখ মুজিবের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল তিনিই আসছেন জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে। সে ম্যান্ডেট জনগণ তাঁকে দিয়েছে। তাই এই দুই বা তিনটি বড় বিষয় ইয়াহিয়া খানের কানে যায় এবং তাঁর মনে ছিল তিনি সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেবেন...।

◆ পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

∆ গোড়ার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ খুশিই ছিল। দুই প্রদেশের দুই দল আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি আর অন্য দুই প্রদেশে ন্যাপ, পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ। এমন করে দেখা যায় ওরা জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেয়নি। একটি ভোটও পায়নি জামায়াতীরা। আর ডানপন্থী দলগুলো যেমন নেজামে ইসলাম, পিডিপি ও আরও অনেক দলের অস্তিত্ব কার্যত ধুয়ে মুছে যায়। যেহেতু এ ম্যান্ডেট ছিল জনগণের, সে জন্য তাদের নিজেদের রায়কে শনাক্ত করতে ভুল হয়নি। খুশিই ছিল তারা।

◆ ঢাকায় কী ঘটছে তারা জানত?

∆ না। তাদের বলা হয়েছিল, শেখ মুজিব গোলমাল পাকাচ্ছেন; তিনি আন্তরিক নন।

◆ তাহলে তখন রাজনৈতিক দলগুলোর কী ভূমিকা ছিল? বিশেষ করে প্রগতিবাদী ন্যাপ ও সে রকম অন্য দলগুলোর?

∆ প্রতিক্রিয়া ছিল আওয়ামী লীগেরই অনুরূপ। তবে আমি আরও কিছু যোগ করতে পারি এতে। কিছু ডানপন্থী রাজনৈতিক দল ছিল যারা ভুট্টোর জন্য সমস্যা হয়নি। বরং ভুট্টোর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এই যে, তিনি বুঝতে পারেন যে মুহূর্তে মুজিব ক্ষমতায় যাবেন সেই মুহূর্তেই এমনকি তাঁর নিজ দলেরই ৩০/৪০ জন এমএলএ আওয়ামী লীগে যোগ দেবে। এ সময় বিষয়ে তখন গোপন যোগাযোগ ও দরকষাকষি চলছিল। আর প্রায় সকল এমএলএ শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে বলছিলেন, আমি আপনার লোক, এ মুহূর্তে আমি ভুট্টোর সঙ্গে

বসছি বটে তবু আপনি আমাকে আপনার লোক বলেই মেহেরবানী করে ভাববেন। তখন পশ্চিম পাকিস্তানের দু'টি প্রদেশে আওয়ামী লীগের বড় আঁতাত গড়ে ওঠে আর তাতে ছিল ন্যাপ, মুফতি মাহমুদের জমিয়তুল মুদাসসেরিন, পিপলস পার্টির বহু এমএলএ ও স্বতন্ত্র জনপ্রতিনিধি। তখন কেউ এরকম দাবি করে যে, কেবলমাত্র একটি প্রদেশ থেকেই যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা এসেছে তখন সেটিকে মিথ্যা না বলে এ কারণে পারা যায় না যে, এ ধরনের তত্ত্ব মিথ্যার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি কথাটা হলো এই যে, কমপক্ষে ৭০-৮০ জন এমএলএ জোট বা অংশীদার হিসাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে তৈরি ছিল। এতে প্রমাণিত হয় পাঁচ প্রদেশ মানে সকল প্রদেশেই আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব ছিল।

◆ ওরা কি এই মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছিল, মানে আমি বলতে চাই...।

∆ না এ সব বিষয় খবরের কাগজে আসেনি, কারণ এগুলো ছিল গোপন বিষয়। যোগাযোগও গোপনে অনুষ্ঠিত হয়।

◆ না, আমার কথা হলো শেখ মুজিব ম্যান্ডেট পেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবি তো শুধু তাঁরই। ভুট্টোর এখানে চাইবার কিছু নেই। অর্থাৎ অন্য নেতারা যেমন ধরুন ন্যাপ বা অন্য প্রগতিবাদী দলগুলো এ ধরনের মতাদর্শ প্রচার করেছিল?

∆ ন্যাপ, জামিয়াতুল মুদাসসেরিন, এমনকি ভাসানী ন্যাপও মত বদলায়। বহু চীনাপন্থী রাজনৈতিক কর্মীও বলতে শুরু করেন যে, শেখ মুজিব সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন। তাঁরই প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত। ওয়ালী ন্যাপ ও পূর্ব পাকিস্তানের মুজাফফর ন্যাপের এ প্রশ্নে অবস্থান ছিল অনুরূপ। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর ৩ মার্চ দলটি তার অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার করেই ব্যক্ত করে। এ সময় ন্যাপের এক সভা হয়। আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা চার দফা দাবি তুলেছিলাম। এ দাবিগুলো আওয়ামী লীগের দাবিগুলোর সঙ্গে অভিন্ন ছিল। আমরা আমাদের মঞ্চ থেকে সে দাবিগুলোর পুনরাবৃত্তি করে বলি, এগুলো সরকারকে মেনে নিতে হবে। এক পর্যায়ে ন্যাপ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নেতাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

◆ আসুন এখন আমরা ২৫ মার্চের ঘটনায় আসি। ২৫ মার্চে কী সব ঘটে আপনি জানেন, কিছু বলবেন...?

∆ আমার বইয়ে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। বইটির কপি আপনাকে দিয়েছি। বইয়ের প্রথম অধ্যায় 'জেনারেলদের রজনী'। আর সেটি লেখা হয়েছে ২৫ মার্চের ঘটনাবলী নিয়ে।

◆ আচ্ছা অনুগ্রহ করে বলবেন কি, কী করে এ সব আপনি জানলেন?

∆ আসলে সব কিছুর দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। ঢাকায় ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও শেখ মুজিবের মধ্যে আলোচনা চলছিল। দেশের সব বড় নেতা যেমন ওয়ালী খান, মুফতি মাহমুদ, সর্দার শওকত ও আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করছিলেন ইয়াহিয়া খানকে এ কথা বোঝাতে যে, তাঁর উচিত কোন একটা রাজনৈতিক সমাধানের ফর্মুলা দেয়া। এ ছাড়া শেখ মুজিবের ওপরেও চাপ ছিল। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কেমন করে যেন এ রকম একটা অনড়

প্রত্যয় জন্মায় যে, এখন যা ঘটছে এগুলো পুরোপুরি সাজানো নাটক। ওয়ালী খানের কাছে শুনেছি শেখ মুজিব তাঁকে বলেছেন, ওদের (অন্য) পরিকল্পনা আছে আর এসব মতলব নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানো হচ্ছে। তারা ঠিক করেছে, আর কোন রাস্তা নেই। আমি মনে করি না এখন আর পাকিস্তানের জন্য কোন নিরাপদ রাস্তা খোলা আছে। আসলেও উপায় নেই। আমি মুসলিম লীগার ছিলাম। এখনও তারা যদি কিছু করে তাদের উচিত হবে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করা, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নেয়া। তারপর সবকিছু আবার গুছিয়ে নেয়া হবে। তিনি ওয়ালী খান ও অন্যদের এ বিষয়ে বলেছেন, তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে এ সবের বিবরণ লিখেছেন। সেসব গ্রন্থ এখন প্রকাশিতও হয়েছে। সর্দার শওকতের বই প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ে ঢাকা আলোচনার বিশদ বিবরণ রয়েছে। আরও অনেকে এ সবের বিবরণ দিয়েছেন। তাই এখন এটি কোন গোপন বিষয় নয়, বরং পরিষ্কার। সেদিন সেখান থেকে অনেকেই চোখের পানি ফেলে ফিরে এসেছিলেন।

◆ তাহলে ২৫ মার্চের পরের দিকে যাওয়া যাক।

▲ ২৫ মার্চের আগে তাঁরা সবাই ঢাকায় ছিলেন। ইয়াহিয়া খান ঐ দিন সন্ধ্যায় ঢাকা ছাড়েন, ভুট্টো থেকে যান। ভুট্টো তাঁর বইয়ে তখনকার পরিস্থিতির অত্যন্ত সংবেদনশীল বর্ণনা দিয়েছেন, করেছেন এক মহা ট্র্যাজেডির প্রস্তাবনা। বর্ণনা দিয়েছেন, কেমন করে ঢাকা জ্বলছিল আর ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে সেটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, খবরের কাগজের অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়, লিখেছেন লোকজনকে পুড়িয়ে মারার কথা, আর কিছু ভাবনাও ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, এ সবের জন্য তাঁকে দায়ী করা হবে। তিনি ফিরে আসার পর ওয়ালী খানও শওকত হায়াতকে বলেছিলেন, এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার যথাশীঘ্র সমাধান হতে হবে। এখন আমি আপনার জীবন রক্ষা করার মতো অবস্থায় নেই। আমার ধারণা, তাঁরা ২৪ মার্চ পাকিস্তানে ফেরেন। ইয়াহিয়া রওনা দেন। ২৫ মার্চের সময় ভুট্টো ছিলেন ঢাকা থেকে ফেরা শেষ ব্যক্তি।

◆ তখন পাকিস্তান তো রক্ষা পেল আর ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক ঘোষণা করলেন কিংবা এমন কিছু?

▲ ওটাই ছিল আশু প্রতিক্রিয়া। এদিন সারা দেশে ছিল পিনপতন নীরবতা। মানবিক আইনের রশি টানা হলো আরও টাইট করে। জনসাধারণকে বলা হলো রাজনৈতিক বিষয়ে কোন মন্তব্য না করার জন্য। আমার কবিতা ছাপা হয়েছিল ৩/৪ দিন আগে, সেই কবিতা সামরিক আদেশে বাজেয়াফত ও নিষিদ্ধ করা হলো। আমি গ্রেফতার হলাম, আমার অনুমান এক বা দু'মাস পর, অর্থাৎ মাসাধিককাল পর আমি কোয়েটা যাই। কোয়েটায় আমি ছদ্ম নামে লিখি। ইতোমধ্যে আমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। পুলিশ আমার জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে। আমি দ্রুত ফিরে আসতেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়। ২৪ মার্চের ঘটনার অনেকটাই সবিস্তার বিবরণ রয়েছে আমার বইতে। বোধ হয় আপনার জানা আছে, শাহ হুসেন আমাদের এক বড় কবির নাম। তিনি ১৬ শতকের মোগল আমলের কবি। তাঁর এক বন্ধুর নাম ছিল মধু। তাঁর নামের কথা মনে রেখে আমার কবিতার প্রথম চরণ লিখেছিলাম এভাবে—"শাহ হুসেন, দ্যাখো তোমার মধু খুন হয়েছে বাংলায়"। অথচ আশ্চর্যের বিষয়...।

◆ ওরা এ ধরনের আর কিছু ছাপিয়েছে কি না আপনার জানা আছে?

Δ না, আমরা ওয়ালী খান ও তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারি। ওরা আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

◆ তাঁরা তো ২৫ মার্চের আগে চলে যান।

Δ তবে ইয়াহিয়া খান ও পিপলস পার্টির অনেকের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল।

◆ তাঁরা জানতেন এ সব ঘটবে?

Δ তাঁরা জানতেন আর বস্তুত তাঁরাই এখানে এসে জানান, পাইকারী হত্যাকাণ্ড চলছে।

◆ তাহলে তারপর আপনি আপনার এ কবিতা লেখেন?

Δ ভুট্টোও এসব খবর নিয়ে এসেছিলেন। পিপলস পার্টিতে আমাদের অনেক বন্ধু ছিল। আমাকে গ্রেফতার করার পর পিপলস পার্টি জোট তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, আমার মা আমাকে বন্দী অবস্থায় দেখতে এলে সেনাবাহিনীর লোক তাঁকে ধাক্কাধাক্কি করে। এ বিষয়ে পরে পিপলস পার্টির পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়। এ সবই চলছিল তখন। এভাবে একটা পরিষ্কার ভেদরেখা গড়ে উঠেছিল। কিছু প্রগতিবাদী লোক তো ছিলই। পিপলস পার্টিতেও এসবের বিরুদ্ধে কিছু সহানুভূতিশীল লোক ছিল। এই দলের অনেকেরই ধারণা হয়, ভুট্টোর করার ছিল অনেক... করছেন না। আমরা ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় শাহ্ হুসেনের মাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। আমি আমার বন্ধুদের বলি, এবারে মাজারে (ওখানে) নাচব না, খালি পায়ে সেখানে যাব এবং বাংলাদেশে আমাদের ভাইদের নিরাপত্তার জন্য মোনাজাত করব। কিন্তু তারা বলল, ব্যাপারটা ঐ অঞ্চলের একটা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা ওভাবে মাজারে যাব না। যা হোক মাজারেই কবিতাটি লিখি। আমার মনে তখন শাহ্ হুসেনের বন্ধু মধুর কথাই ছিল। কিন্তু আমি যখন পড়লাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধু নামে এক লোক ছিল, সে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ক্যান্টিন চালাত। আর তাকে ঐ ২৫-এর রাতে মেরে ফেলা হয়। এ এক কাকতালীয় ব্যাপারই হয়তবা। কিন্তু আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম। এর এক মাস পর আমি গ্রেফতার হই। আর আমিই ঐ মামলায় ছিলাম আটক একমাত্র ব্যক্তি। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল পাঞ্জাব থেকে সেই একই অভিযোগে আটক আমিই ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি। অভিযোগের বক্তব্য ছিল, আমি ছিলাম নাকি একজন বিশ্বাসঘাতক, ভারতীয় এজেন্ট, পাকিস্তানের দুশমন... এ রকম আরও অনেক কিছু। তাই সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে আমার বিচার করা হয়। আমাকে বিচারে জেল-জরিমানা ও ৫টি বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদান করা হয়। নভেম্বরে আমি জেলে ছিলাম। শেখ মুজিবকে জেলে একা রাখা হয়েছিল। এরপর ওরা শেখ আয়াজকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। শেখ আয়াজ ছিলেন আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট। এরপর সিন্ধু থেকে মাস্টার খান গুণ ও গাজী ফয়েজকে ও আরও অনেককে, যারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, গ্রেফতার করা হয়। ন্যাপ থেকে শুধু আমিই গ্রেফতার হই। নভেম্বরের গোড়ার দিকে ন্যাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং দলের সকল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ওয়ালী খান ও আরও অনেককে গ্রেফতার করা হয়। খবরের কাগজের ওপর কড়া সেন্সরশিপ বহাল থাকে। সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে, পূর্ব

পাকিস্তানে গৃহীত সামরিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন রকম সমালোচনা পত্র-পত্রিকায় ছাপাতে অনুমতি দেয়া হতো না। কাজেই খবরের কাগজগুলোতে যদি সামরিক অভিমতের পরিবর্তে অন্য কোন মতামত খুঁজতে যান তো আপনি হতাশ হবেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আরও কবিতা তখন রচিত হয়নি। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি বলব, আপনি জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তরে বলব, এমনকি পাঞ্জাব থেকেও অচিরেই অনেকে এ ধরনের কবিতা লিখতে শুরু করে। আসিফ শাকের নামে একজন নেতা এ ধরনের এক পাঞ্জাবী কবিতা লেখে। নভেম্বরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

◆ সেটি কি প্রকাশিত হয়েছিল?

∆ প্রকাশিত হয়েছিল। অক্টোবর-নভেম্বরের শেষের দিকে মুস্তাফা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বাংলাদেশের সমর্থনে সে ইয়াহিয়ার শাসন আমলে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিল। এই মুস্তাফা রহিমকে জেলে পাঠানো হয়। হাবিব জালেব হলেন আরেকজন বিখ্যাত কবি যাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অক্টোবর-নভেম্বরের দিনগুলোতে এ রকম আরও অনেককে গ্রেফতার করা হয়। তবে একটাই আনন্দের কথা আমরা সবাই জেলে এক সঙ্গেই ছিলাম। একটা সময় দেখা গেল, পাকিস্তানের তখনকার শাসকরা বেশিদিন টিকবে না। আর সে রকম সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। ঘটনাক্রমে বলি, জেলার সাহেব সেই সময়ে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার তো বেত খাওয়ার দণ্ড পাওনা আছে। সেটার জন্য কি আপনি তৈরি? আমি জবাবে বললাম, জেল ছেড়ে যাওয়ার সময় আপনারা আমাকে সেই দণ্ড দেবেন, আমি আপত্তি করব না। তাতে ঐ বেত খাওয়ার পরও বেঁচে থাকলে আমার চিকিৎসাটা অন্তত জেলের বাইরে হতে পারবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তখনকার শাসকগোষ্ঠী ছয় মাসের বেশি টিকবে না। আর জেলখানায় আমার পাঁচ মাস পুরো হওয়ার আগেই ১৬ ডিসেম্বর এসে পড়ে। ঐ সময় বেশ কিছু কবি, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, যাঁরা বাংলাদেশের সমর্থক, তাঁরা খবরের কাগজে এক বিবৃতি দেন। এঁদের মধ্যে মাযহার আলী খান, তাহেরা মাযহার, আসগর খানের মতো শীর্ষস্থানীয় বাংলাদেশ সমর্থক ছিলেন। ঐ বিবৃতি *পাকিস্তান টাইমস* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি শেখ আয়াজ, আননাতি জাদালের মতো ব্যক্তিদের নামও উল্লেখ করতে পারি। আননাতি ছিলেন বিমানবাহিনীতে। তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁকেও সম্ভবত গ্রেফতার করা হয়। আসগর খানের ছেলে ছিল সেনাবাহিনীতে। তাঁকেও বোধ হয় গ্রেফতার করা হয়। আরও বহু প্রতিবাদী লোক ছিলেন যাঁদের ঐ সব প্রতিবাদের আজ হয়ত কোন রেকর্ড নেই। হয়ত প্রথমবারের মতো আজ আপনি এ সব জানলেন। বাংলাদেশের সমর্থনে সিন্ধি ভাষায় রচিত কমপক্ষে ২০০ কবিতা আমি সংগ্রহ করেছি। পশতু এলাকা থেকেও এরকম ৫০টিরও বেশি কবিতার সংগ্রহ রয়েছে। বেলুচিস্তান থেকে ২০টির বেশি কবিতা পাওয়া গেছে। আর পাঞ্জাবীতে লেখা এরকম চার-পাঁচটি কবিতা আমার কাছে রয়েছে। এভাবে সব মিলে ৫০০ পৃষ্ঠার একটা বড় বই হয়ে উঠেছে। আমি আমার বাংলাদেশের বন্ধুদের বহুবার অনুরোধ করেছি, আপনারা যদি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৭১-এর দিনগুলোর লেখার ওপর এ ধরনের বই প্রকাশ করতে পারেন তো একটা কাজের কাজ হবে। মানুষ জানতে পারবে, বহু বন্ধু,

রাজনৈতিক কর্মী, দলীয় নেতা, কবি, বুদ্ধজীবী, লেখক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে তখন জেলে পাঠানো হয়, অনেকের চাকরি চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন পরিস্থিতির তুলনায় এগুলো নগণ্য নয়। কেননা তখন এখানে চলছিল ইয়াহিয়া খানের শাসন। তাই প্রতিবাদ সেখানে থাকলেও তার রেকর্ড রাখা তখনকার মতো সম্ভব হয়নি। তবে কোন কোন সময় কোন কোন সংবাদপত্র বা পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলোতে আপনার বাংলাদেশের সমর্থনে অনেক উপকরণ পাবেন। তবে যুগপৎ এ-ও আমি উল্লেখ করব, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকেই বিভ্রান্ত করা হয়েছিল এই বলে যে, ওরা বিশ্বাসঘাতক। আর এতে আশ্বস্ত হয়েই তাঁরা বলতেন, ওদের উচিত শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু বাঙালীরা কি মাত্রায় নিষ্ঠুরতার শিকার, তা ওরা জানত না। আজও আমি তাই জাহানারা ইমামের বই সম্পর্কে আগ্রহী। বইটি প্রকাশিত হওয়া উচিত। এতে '৭১-এর দিনগুলোর চমৎকার রেকর্ড রয়েছে। আজও আমাদের এখানকার লোকজন জানে না বাংলাদেশে সত্যিই কী ঘটেছে।

◆ ধন্যবাদ আপনাকে। তা আপনি আপনার কবিতাগুলো সঙ্কলিত করছেন না কেন?

∆ আমি বাংলাদেশে আমার বন্ধুদের এ জন্য অনুরোধ জানিয়েছি।

◆ কিন্তু আপনাকে এগুলোর অনুবাদ তো করে দিতে হবে।

∆ বাংলা একাডেমীতে একবার আমি যাই। তখন আমি ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, প্রস্তাব ভাল কিন্তু জানেন তো দু'দেশের সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ভাল। আমরা চাই না...।

◆ আরে মোটেও না, আপনি সঙ্কলন ও অনুবাদ করে দিলে নিশ্চিত বলা যায়, বাংলাদেশের কোন কোন প্রকাশক ওটা প্রকাশে আগ্রহী হবে।

∆ ব্যাপার আসলে তো সোজা নয়। আমি সঙ্কলন করে পাঠিয়ে দিতে পারি...।

◆ কিন্তু আমরা তো সিন্ধি জানি না!

∆ না না, পাঠালে তো অবশ্যই ইংরেজী অনুবাদ পাঠাব।

◆ তাহলে তো চমৎকার, আমার মনে হয় আমরা এর প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারব।

∆ ইতোমধ্যে উর্দু ও ইংরেজীতে বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। বাংলাদেশ আন্দোলনের ওপর একটা উপন্যাসই রয়েছে সিন্ধি ভাষায়।

◆ উপন্যাসটির নাম?

∆ এ মুহূর্তে নাম মনে পড়ছে না।

◆ তাহলে লেখকের নাম?

∆ দুর্ভাগ্যের কথা তা-ও মনে নেই। তাছাড়া অনেক ছোটগল্প রয়েছে। আর এ সব লেখকের মধ্যে রয়েছেন আমর জাদিন, নাসিম খায়ের প্রমুখ। শেখ আয়াজ বহু কবিতা লিখেছেন। তাঁর জেলের ডায়েরিও রয়েছে। তিনি বলেছেন, শেখ মুজিব কোথায় থাকতে পারেন তা কল্পনা করতে চেষ্টা করছি। বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ আখ্যানও রয়েছে। এরা সবাই মানবিকতাবোধে অনুপ্রাণিত কবি, লেখক, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষক,

আইনজীবী। কাজেই বুঝতে নিশ্চয়ই পারছেন বাংলাদেশের অনুকূলে বহু লেখা, বই ইত্যাদি রয়েছে। দুই খণ্ডে উর্দুতে লেখা এক চিত্তাকর্ষক বই রয়েছে। ৭ জানুয়ারি ১৯৯৯ বইটি বেরিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের ভাষায় প্রায় ডজনখানেক লোকের নাম আমি করতে পারি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মহৎ বালুচ কবি গুর্খা নাসির। তিনি কবিতা লিখেছেন অনেক। বাংলাদেশের স্বার্থ সমর্থন করেছেন। তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। বিখ্যাত সিন্ধি কবি শেখ আয়াজের কথাও বলা যায়। তিনি গত মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের পক্ষে তিনি জেলে বসে রোজনামচা লিখেছেন। তাঁকেসহ বহু সিন্ধি কবিকে গ্রেফতার করা হয়। ন্যাপ নেতা আজমল খাটক অনেক কবিতা রচনা করেন। বাংলাদেশের পক্ষে লেখেন। তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়। ছিলেন ওয়ালী খান, ন্যাপের কর্মীবর্গ ও অন্য কিছু দল। কিছু লোকের নাম আমি বলতে পারি যাঁরা সামরিক বাহিনী থেকে নিজ পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন আনোয়ার পি. যাদাব (সিন্ধু), ড. তারেক রহমান, আসগর খান ও আরও অনেকে। কিছু মহিলা সমিতির নারী নেত্রী ও কর্মীর নামও করা যায়। তাহেরা মাযহার আলী এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্বামী মাযহার আলী খান ঐ সময় বাংলাদেশে ছিলেন। তিনি একটা নিষ্পত্তিতে আসার জন্য ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খানকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। অত্যন্ত হতাশ হয়ে ফেরেন তিনি। তাই কথা হলো, কবিতা ও লেখার একটি সঙ্কলন হবে—এ রকম প্রকল্পে দুই দেশের মধ্যে কোন এক ধরনের সহযোগিতা হতে হবে ও বাংলাদেশে সেটি প্রকাশিত হতে হবে। এ রকম যদি কিছু সম্ভব হয় তাহলে বাংলাদেশের মানুষ খুব নিশ্চিতভাবেই বলতে পারবে, বাংলাদেশের স্বার্থদরদী এমন বহু বন্ধু তাদের ছিল পাকিস্তানে।

খা লে দ মা হ মু দ

খা লে দ মা হ মু দ

[খালেদ মাহমুদ তৎকালীন ইন্টারউইং স্কলারশিপ পেয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। অধ্যয়নকালে বামপন্থী রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। বর্তমানে ইসলামাবাদের ইনস্টিটিউট অব রিজিওনাল স্টাডিজের প্রফেসর। ইসলামাবাদে তাঁর অফিস কক্ষে এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।]

◆ ১৯৭১-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে আপনার ধারণার কথা আমরা শুনতে চাই।

∆ ১৯৭০ থেকেই তাহলে শুরু করা যাক। ভাঙনের অবস্থা আসার, শেষ অঙ্কের কথাবার্তা আসার আগে মূলত আমি মনে করি, বাঙালীর উন্নতির কিছু কিছু কারণ বা কিছু মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালীরা ছিল পাকিস্তানের জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ শাসককূলের অভিজাত অবাঙালী পদের বেশির ভাগই মোহাজির, পাঞ্জাবী মোহাজির। সে কারণে লিয়াকত আলী খানের হত্যাকাণ্ডের পর নাজিমুদ্দিনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হলেও আমার মতে তিনি ছিলেন নামমাত্র সরকারপ্রধান। সত্যিকার ক্ষমতা ছিল গোলাম মোহাম্মদ, ইসকান্দার মির্জা, কিরমানির হাতে। এ কারণে পাঞ্জাবী রাজনীতিবিদরা সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার গণতান্ত্রিক নীতিভিত্তিক কোন রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন না।

◆ পাঞ্জাবী রাজনীতিকদের শ্রেণী বিভাজন আপনি কেমন করে করবেন?

∆ দেশের শাসনতান্ত্রিক গঠন কাঠামো কেমন হবে সে বিষয়ে কোন রকম মতৈক্য ছিল না। এ বাস্তবতাতেই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ অবধি যা ঘটেছে তার পূর্বাভাস থেকে যায়। কোন্ ধরনের শাসনতন্ত্র দেশ পেতে চলেছে সে বিষয়ে কোন ঐকমত্য ছিল না। তা হলে মতানৈক্য কী নিয়ে? শাসনতন্ত্র হতে এত বিলম্ব হলো কেন? তার মূল কারণ কী? আমার মতে মতানৈক্যের মৌলিক কারণটি ছিল এই যে, তারা যদি সংসদে একটি ঐতিহ্যবাহী ধারার সাধারণ সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় মত দেয়, তা হলে ক্ষমতা চলে যায় বাঙালীদের হাতে, কেননা সে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

ক্ষেত্রে পার্লামেন্টে বাঙালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। সেজন্য ওদের চেষ্টা ছিল এমন এক ধরনের ব্যবস্থা বের করা, যার বদৌলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের অধিকারকে অস্বীকার করা যাবে। এ জন্য আপনারা যদি ১৯৫৬-র আগে এ ব্যাপারে যেসব প্রস্তাব করা হয় সেগুলোতে মনোনিবেশ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, গোড়ার দিকে ওরা পার্লামেন্টে একটি উচ্চকক্ষ রাখার চেষ্টা করে। এ ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের তুলনায় উচ্চকক্ষের জন্য বেশি ক্ষমতা রাখার প্রস্তাব করা হয়, একটা প্রতিসাম্য আনার জন্য। তবে সে উদ্যোগ সফল হয়নি। এরপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানে শেষ পর্যন্ত ওরা একটা আপোস ফর্মুলা হিসাবে 'ওয়ান ইউনিট' ব্যবস্থা খাড়া করে। এই ওয়ান ইউনিট ব্যবস্থা ছিল মূলত বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ঠেকানো বা তাতে একটা ভারসাম্য আনার কৌশল। এই ওয়ান ইউনিটের আওতায় পার্লামেন্টে উভয় প্রদেশের সমপ্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হওয়ায় বাঙালীরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচনে যা পেতে পারত তা থেকে বঞ্চিত হয়। এ গেল একদিক। অন্যদিকে, এখন আপনারা জানেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র বেশ কয়েকটি কারণেই দুর্বল, এ শাসনতন্ত্র তুলনামূলকভাবে দুর্বল সেনাবাহিনীর তুলনায়। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী ও আমলাতন্ত্র অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালে দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। সেনাবাহিনী বা আমলাতন্ত্রে কোথাও বাঙালীদের তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ছিল না। সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা ও আমলারাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। তারা মূলত ক্ষমতা তাদের নিজেদের হাতে রেখে দিতে চায়। ঐ সময়কার পরিস্থিতি ছিল এ রকম—তখন পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে কিছু স্লোগান তোলা হয়। বিশেষ করে, পাকিস্তানের গোড়ার দিকে উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চলে। ঢাকায় এক সভায় এরই রেশ ধরে কায়েদে আজম ভুল করে বসেন। তিনি বলেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের আইন পরিষদীয় ভাষা। জনগণ এর প্রতিবাদ করে। এ অবস্থায় বুঝতে কারও কষ্ট হয় না, এ ছিল হাতিয়ার মাত্র। কেননা ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষাপাতী হওয়ায় উর্দু তাদের উদ্দেশ্য সাধকের কাজ করে। তারা ভাষা হিসাবে উর্দুকে খুব ভালবাসে বলেই উর্দু বেছে নেয়া হয়নি বরং তা করা হয় এ জন্য যে ওটা সুবিধাজনক। আরও নিরেট বাস্তবতা হলো এই যে, ওরা বাঙালীদের এভাবে বেকায়দায় রাখতে চেয়েছিল। এ গেল একটা দিক, এ ছিল বঞ্চিত করার রাজনৈতিক পদক্ষেপ। তবে আসল গলদ ছিল অন্যখানে... তা হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসমতা...। সে দৃশ্যপটে কোন কোন অঞ্চল আরসব অঞ্চলের চেয়ে উন্নত। আর এর ফলে তৈরি হয় বঞ্চনার অনিবার্য অনুভূতি। বিশেষ করে পাকিস্তানের মতো দেশে একটি জিনিস, একটি বাস্তবতা অবশ্যই লক্ষণীয় আর তা হলো, এ দেশ এক বহুজাতিক রাষ্ট্র যা পাকিস্তানের শাসকবর্গ স্বীকার করেনি। তারা এ বাস্তবতার উজান ঠেলে এক শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ার প্রয়াসী হয়। আর সেজন্য একদিকে কোন কোন অঞ্চলে অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। আবার অন্যদিকে এমন অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে দেখা যায়, যে অঞ্চলে ঘটনাক্রমে এক বিশেষ জাতি বা নরগোষ্ঠীর বাস—তেমন ক্ষেত্রে বিষমবোধ আরও ঘোরতর হয়ে ওঠে, আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। তাই আমি মনে করি, অসম বা বিষম অর্থনৈতিক বিকাশের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, যারা ঘটনাক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের মাঝে

বঞ্চনাবোধ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, যার নজির সত্যিই বিরল। কেননা, অধিকাংশ দেশে সাধারণত সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হতে দেখা যায়, যেখানে একই কারণে গড়ে ওঠে শক্তিশালী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এটি ঘটে যদি দেশের একটি বিশেষ অঞ্চল কিংবা বিশেষ জনসমষ্টি কোন বিশেষ এক একক জাতিসত্তার হয়ে থাকে। এ ধরনের একটি জনসম্প্রদায়ের অনুভূতি থাকে এ রকম যে, আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের যথেষ্ট অংশীদারী নেই। তাই আমি বলি, বাঙালীদের অনুভূতি ছিল এই যে, তাদের প্রাপ্য আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই।

◆ আপনি বলছেন, 'বাঙালী'দের অনুভূতির কথা। কিন্তু আসলে অবস্থা কী ছিল আপনার মতে?

▲ এটি তো বাস্তবতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। ওরা যখন উত্তম কিছু প্রাপ্য হিসাবে পাওয়ার চেষ্টা করেছে, যারা তখন ক্ষমতায় ছিল তারা তার বিরোধিতা করেছে। এ কারণে এখানে আমি ১৯৫৪-তে মুসলিম লীগের পরাজয় দিয়েই আলোচনায় যাব। এ সময় মুসলিম লীগ ৩১০টি আসনের মাত্র ১০টি ছাড়া আর সব আসনই হারায়, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। এরপর যুক্তফ্রন্টকে হেয় করার ও এ রাজনৈতিক জোটকে ভাঙার এমনকি ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চলে। ইস্কান্দার মির্জাকে গভর্নর হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়। আর এভাবে শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টকে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলে ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়। এ সবের কারণে জন-অসন্তোষের আভাসের মোকাবিলা করার জন্য প্রাসাদ ষড়যন্ত্র রাজনীতির আশ্রয় নেয়া হয়। আর এসব কারণে যুক্তফ্রন্ট শেষ পর্যন্ত ভেঙে খান খান হয়ে যায়। এ হলো প্রথম বিষয়। এরপর ১৯৭০। শেষাবধি ১৯৭০-এর নির্বাচনেও দেখা যায়, শেখ মুজিব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে মাত্র একটি ছাড়া সকল আসনে জয়ী হন। আমি তাই এক কথায় এভাবে বলতে চাই যে, বঞ্চনাবোধ কেমন করে বিচ্ছিন্নতাবাদে মোড় নিল আর কেমন করে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল চিরকালের মতো। পাকিস্তান বহুজাতিক রাষ্ট্র আর তাই দেশটির জন্য একটি ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা ছাড়া গত্যন্তর নেই—এ বাস্তবতা মেনে নিতে পাকিস্তানের শাসক অভিজাতবর্গের অস্বীকৃতির মাঝেই তার কারণ নিহিত। তাঁরা বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে এভাবে দ্রুততর হতে সাহায্য করেন। অথচ প্রথমত দরকার ছিল, সত্যিকারের ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় প্রদেশগুলোর হাতে থাকবে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন। দ্বিতীয়ত, দরকার ছিল কেন্দ্রে এমন এক সরকার ব্যবস্থা যা দেশের সব অঞ্চলের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল। আর তারপর বাঙালীদের উন্নয়নের সুফলে অংশীদার করতে হবে। আমার ধারণায় এই ছিল তখনকার মূল পরিস্থিতি। এখন অনেকে বলেন, শেখ মুজিবের ৬-দফা মাত্রা ছাড়া। তবে এ রকম পরিস্থিতি অনেকখানিই এড়ানো যেত যদি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা আর একটু বেশি সমঝোতা ও রফার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতেন। সে জন্য পরবর্তীকালে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সে পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তাঁদেরকেই দায়ী করা উচিত। কেননা, এমন এক পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পক্ষে কনফেডারেশনের ডাক দেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। দ্বিতীয়ত আমি মনে করি, এর পরেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটিকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হলে হয়তবা একটা আপোসরফা সম্ভব হতো। ইয়াহিয়া খান ও

কিছু কিছু লোক যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিল, সেসবের আশ্রয় নেয়া উচিত হয়নি। ভুট্টোও এ রকম কিছু করেছিলেন যদিও এ প্রশ্নে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবু এ কথা সত্যি, তাঁর কিছু কায়েমী স্বার্থ ছিল। তিনি জানতেন, মুজিবুর রহমান ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপলস পার্টিরও কোন পথ খোলা থাকবে না। আমি এও বলব যে, মুজিবুর রহমান গৌণ পর্যায়ে হলেও সঙ্কট কাটাতে কিছুটা সাহায্য করতে পারতেন। একটা আপোসরফায় আসতে তাতে সাহায্য হতো। সেটি হতো তিনি যদি পিপলস পার্টির সঙ্গে কোন একটা রকমে ক্ষমতায় শরিক হতে রাজি হতেন, আর সেটি সম্ভব হলে হয়তবা পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হতো। তবে দুর্ভাগ্যবশত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের নিয়ন্ত্রক হলেও দলটি ছিল কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি আর পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের। আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় অংশীদারী বাড়ানো গেলে পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হতো। তবু এত কিছুর পরও আমি বলব, এগুলোর ভূমিকা গৌণ। সবচেয়ে প্রধান ও অগ্রগণ্য বিষয় হলো ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। এ কারণেই আমি মনে করি আর সবই গৌণ, মুখ্য কারণ নয়। সেনাবাহিনীর ক্র্যাকডাউন ও আরও যেসব কাজ ওরা করেছে সেগুলো নির্বিচার, বেপরোয়া ধরনের। আর এ সবের পরিণতিতেই গোটা দেশ একের পর এক চরম অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ঘটেছে বাইরে থেকে। অবশ্য আমি মনে করি না, পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ না থাকলে ভারতের সেনাবাহিনী তেমন কিছু করতে পারত। এই মতের অনুকূল আভাস এই বাস্তবতায় রয়েছে যে, ভারতের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করার পরও দেশের মাটিতে ওরা গেড়ে বসতে কিংবা তাদেরকে হুকুমের তাঁবেদার করতে পারেনি; যে সরকার, তাদের সমালোচকদের কথায়, ভারতের সেনাবাহিনীর মদদ ও সহায়তায় গদিতে আসে। আর তাই পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাবার ব্যাপারটির জন্য যদি কাউকে দায়ী করতেই হয় তাহলে সে দায়িত্ব বর্তায় পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের ওপর, যাদের বেশিরভাগই পাঞ্জাবী। ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চায়নি। বাস্তবিক পক্ষে, বাইরের পক্ষের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে একান্তই তাই প্রান্তিক।

◆ ২৫ মার্চে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যে সামরিক ব্যবস্থা নেয় ও দীর্ঘ নয় মাস ধরে সেখানে সেনাবাহিনীর যে নিষ্ঠুরতা চলে, সে ব্যাপারে এ দেশের জনগণের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে কি কিছু বলবেন?

∆ এখানে তখন উগ্রবাদী দেশপ্রেমের মহড়ার মতো পরিবেশ বিরাজ করছিল, আমি সে কথা গোড়াতেই বলে রাখি। আর সে কারণেই আমি ঠিক বলতে পারব না, পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট প্রদেশগুলোর মানুষের এতে কী প্রতিক্রিয়া ছিল। এর একটা কারণ, ঐ সময়ে আমাদের যোগাযোগ খুব বেশি একটা ছিল না। যোগাযোগ তেমন ঘটেনি আমার এ বিষয়ে বালুচ কিংবা সিন্ধীদের সঙ্গে। হয়তবা পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনায় তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল একটু ভিন্ন রকমের। তবে পাঞ্জাবের বিশেষ করে পাঞ্জাবী বুদ্ধিজীবীরা পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নেয়া ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানায় আর সেটি এ কারণে যে, তাদেরকে জানানো হয়, ভারতীয়রা

ওখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। সে কারণেই সেনাবাহিনীর কার্যব্যবস্থায় তাদের সমর্থন দেয়াটা দেশপ্রেমসুলভ কাজ বলে ওরা মনে করতে থাকে। অবশ্য কিছু বিবেকবান মানুষ যে আপত্তি জানায়নি, পূর্ব পাকিস্তানে নিষ্ঠুরতার নিন্দা জানায়নি তাও নয়। তবে নির্দয়, নিরেট সত্যটি হলো এই যে, হয় সেখানকার বহু লোকই পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের কথা জানত না, আর তা না হলে ওরা মনে করত, সেখানে এই কার্যব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে আমার ধারণা, বেশিরভাগ লোকই সেনাবাহিনীর কাজকে সমর্থন জানায়।

◆ এখন তো ১৯৭১-এর অনেক নায়কের কাছ থেকে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে তাদের জবানীতে, যাতে রয়েছে নানা স্ববিরোধিতা। এর ফলে বাদপ্রতিবাদ ও অনেক কিছুই এখন খোলাখুলি করছেন অনেকে। অপনি এ ব্যাপারে...।

▲ আপনাকে একটি মূল জিনিস মনে রাখতে হবে। পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী তথা পাঞ্জাবী বুদ্ধিজীবী মহলকে ১৯৭১-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের ধারণা বদলাতে হলে আগে তাদেরকে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কিত ধারণা বদলাতে হবে। আগের ধারণায় মনে করা হতো সেনাবাহিনী দেশের হেফাজতকারী, ত্রাতা। তারা এক ধরনের বীরবন্দনা পেত। তবে এ ধারণা এখন বদলেছে। এতকাল সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থাকার বিষয়টিও মানুষ এখন নতুন করে ভেবে দেখছে। এর আগে সাধারণভাবে জনগণের মাঝে এ ধরনের প্রচারণা ছিল যে, রাজনীতিকরা দুর্নীতিগ্রস্ত, শুধু সেনাবাহিনীই পারে জাতীয় সংহতির নিশ্চয়তা বিধান করতে। সেনাবাহিনী দক্ষতার সাথে সরকার চালাতে পারে, জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে। কেননা সেনাবাহিনী দুর্নীতিপরায়ণ কিংবা অযোগ্য, অক্ষম নয়। সেনাবাহিনী সম্পর্কে এ রকম ভক্তি আর নেই, অন্তত তা নিয়ে এত মাতামাতি নেই। সেনাবাহিনীকে এখন আর রক্ষক বা ত্রাতা মনে করা হয় না। আমার মতে, এ বিষয়টি ১৯৭১-এ কী ঘটেছিল সে বিষয়ে জনগণের ধারণা বদলে দেবে, কেননা মাত্র কিছুদিন আগে অবধিও পাঞ্জাবের গড় বুদ্ধিজীবীদের ধারণা ছিল, ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তান জিতেছিল। সে সময় সেনাবাহিনী চমৎকার শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেছে। আসলাম বেগের মতো লোক পর্যন্ত বলেছে যে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে সত্যিকার অর্থে আমরা জয়ী হতে পারিনি। কিন্তু এরপরও উগ্র, উৎকট জাতীয়তাবাদী ধারণার আধিপত্য এখনও সেখান থেকে পুরোপুরি যায়নি। আমার বিশ্বাস, জনসাধারণ এখন আরও বাস্তববাদী দৃষ্টিতে ঘটনা দেখতে, বিচার-বিশ্লেষণ করতে চাইছে। পাঞ্জাবের বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এখন ত্রাতা হিসাবে সেনাবাহিনীকে দেখতে চায় না। আমার বিশ্বাস, সত্যিকার ঘটনা আর কী ঘটেছিল, আরও বেশিমাত্রায় ওদের জানানো দরকার ওদের ধারণা জগতটাকে বদলানোর জন্য। এখনও লোকজনের মনে এমন ধারণা গেড়ে আছে যে, চক্রান্ত ও ভারতীয় প্রভাবের কারণে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ধারণা বদলাতে হবে। বদলাবেও যদি ভারত-পাক সম্পর্কের আকাশ অনেকটা মেঘমুক্ত হয় কোনদিন।

রেজা কায়েম

[যৌবনে রেজা কায়েম কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। মতপার্থক্যের কারণে ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেন। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন দীর্ঘদিন। ১৯৭৩ সালে ছিলেন পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭০-৭১ সালে পাকিস্তান পিপলস পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পাকিস্তানে শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীদের একজন রাজা কায়েমের এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় মার্চ (১৯৯৮) মাসে লাহোরের গুলবাগে তাঁর বাসভবনে।]

◆ আপনার কথা কিছু জানতে চাই।

Δ আমার বয়স ৬৮। ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে আমার জন্ম। আমি ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানে আসি। ১৯৪৯ সালে আমি বিএ পাস করি। আর তার আগে আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই। ১৯৪৮-এর সেই সময় একটিমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিরই অস্তিত্ব ছিল। আমি ১৯৫১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিতেই ছিলাম। এ সময় পার্টির কাজকর্ম নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের সাথে আমার কিছু মতবিরোধ ঘটে। তবে তাতে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। আমাদের এই আলাদা হবার ব্যাপারটা তাই পরস্পরের বৈরী হিসাবে হয়নি। পার্টি তার সিদ্ধান্তগুলোর খসড়া তৈরি করেছে কেবলই সীমিত চৌহদ্দির কৌশল হিসাবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে রণকৌশল ও পরিকল্পনার আলোচনায়—এ নিয়েই ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক মতপার্থক্য। ১৯৭২ অবধি আমি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জড়িত থাকি। ১৯৭৩-এ আমি ছিলাম পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদক। বস্তুত এর পর থেকে আমি কোন রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত ছিলাম না। আক্ষরিক অর্থেই বলা যায়, আমাকে ১৯৭০ সালে পিপলস পার্টিতে টেনে নেয়া হয়। আর সেটি ঘটে একান্তই নামকাওয়াস্তে; কেননা এ বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। ড. মোবাশ্বির আমাকে এ ব্যাপারে নাছোড়বান্দার মতো চেপে ধরেন। এ সবের পরেও আমি কিন্তু কখনও পিপলস পার্টির রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম না। ভুট্টোকে আমি কখনও বিশ্বাস করিনি। ভুট্টো এ দেশের জন্য ভাল কিছুই করেননি—আমার এ ধারণা ছিল

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

পরিষ্কার। আমি তখন আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলাম, সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই করছিলাম না। তাই এ সময় এমন একটা কিছুতে জড়িত থাকতে চাচ্ছিলাম যাতে সমাজের সাথে, সমাজের সকলের সাথে একটা যোগাযোগ বজায় থাকে। আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। বরাবর আমার অবস্থানটি ছিল র‍্যাডিক্যাল, বিপ্লবী বামের যে কোন মতের যে কারও সাথে আমার কোন সমস্যাই ছিল না এ কারণে যে, আমি কখনও নেতা ছিলাম না, কখনও কোন পদে নির্বাচনপ্রার্থী হইনি। আমার পেশা ছিল সীমিত চৌহদ্দির। ১৯৫৩ থেকে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করছিলাম। আর তাই রাজনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন আমার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে তেমন অর্থবহ হয়ে ওঠেনি। এগুলোর কোন প্রতিফলন কখনও পড়েনি আমার পেশায়। আমার ব্যবহারজীবীর পেশাটি ছিল প্রায় পুরোটাই বাণিজ্যিক, আয়-উপার্জনের। ভুট্টো আমাকে খুব একান্তই চাচ্ছিলেন তাঁর দলে। তিনি আমাকে পিপলস পার্টির সদস্য হবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। আমি সে সময়টায় পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে, সেখানকার পরিস্থিতি কেমন—এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না। এজন্য আমি দুঃখিত। মাত্র ২/৩ দিনের এক সংক্ষিপ্ত সফর ছাড়া আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানে যাইনি। তাই ওখানকার জনগণ ও আন্দোলনগুলোর সঙ্গে আমার যোগাযোগও ছিল অতি সামান্য। শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী খবরের কাগজে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে যা কিছু ছাপা হতো সে সবের মাধ্যমেই যা কিছু জেনেছি দেশের পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে আমার মতামত *পাকিস্তান টাইমস* পত্রিকায় আমার এক নিবন্ধে প্রকাশ করেছি। নিবন্ধটি '৭০-এর মার্চে ছাপা হয়। আমার ধারণা, এ সময়টিতেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিখ্যাত জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

◆ আপনি কি নিশ্চিত যে দিনটি ছিল ৭ মার্চ?

▲ জ্বি হ্যাঁ, দিনটি ৭ মার্চ বটে। আমার নিবন্ধটি এর সপ্তাহখানেক আগে প্রকাশিত হয়। আমি যদ্দূর জানি, শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি লিখেছিলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান আর তাতে অধ্যাপক আমার উল্লেখিত তিনটি অনুচ্ছেদের বরাত দিয়ে তাঁর টীকাভাষ্য করেছিলেন পাঞ্জাবী শৌভিনিজম বলে। উল্লেখ করার বিষয় এই যে, অধ্যাপক রেহমান জানতেন না যে, আমি ঠিক পাঞ্জাবী নই। বরং ভারত থেকে আগত একজন মোহাজির। কাজেই রেহমান সোবহানের উল্লিখিত উক্তির নেপথ্য কারণ বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়। এর আগে শাসনতন্ত্র কমিটির এক বৈঠকে তাঁর সাথে আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়। সময়টা সম্ভবত ১৯৭০-এর ফেব্রুয়ারি। ভুট্টো তখন সদ্য ঢাকা থেকে ফিরেছেন। এ বৈঠক শাসনতন্ত্র কমিশনের বৈঠক হলেও ১৩/১৪ পৃষ্ঠার কলেবরে আমি আমার অমতের উল্লেখ করেছিলাম। আর সেটিই ছিল একমাত্র দ্বিমত। আমি ভুট্টোর ঘোষণার আগেই দ্বিমত প্রকাশ করেছিলাম। ভুট্টোও এ রকম ঘোষণা দিয়েছিলেন পাকিস্তানের ইয়াদগারের এক বৈঠকে। ঐ বৈঠক সম্ভবত হয়েছিল ১ মার্চের পরে। এ বৈঠকে মাহমুদ আলী কাসুরী, রফি রাজ্জাক, শেখ রফিক, নাসিম আকবর ও শাসনতন্ত্র কমিশনের অন্যান্য সদস্য মিলে ডজনখানেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। সভায় আমিই প্রশ্নটি উত্থাপন করি।

আমার আলোচনার বিষয় ছিল দেশের জন্য সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন। আওয়ামী লীগের ৬ দফাও ছিল। তবে তা ছিল পার্শ্ব ইস্যু। আমি ভুট্টোর উদ্দেশে বলেছিলাম, "দেখুন, পূর্ব

পাকিস্তানের ব্যাপারে আপনার ভূমিকায় আমি খুশি নই।" এ নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে। আর শুধু আমরা দু'জনই ছিলাম এ আলোচনায় অংশীদার। আমার মৌলিক অবস্থানটি ছিল এ রকম ৬ দফার কার্যত অর্থ হচ্ছে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে নিরন্তর সংঘাত। আমি মনে করি না, সম্প্রীতির প্রয়োজনীয় মাত্রার চৌহদ্দিতেও ফেডারেশনের দুই অংশের মধ্যে এটি কার্যক্ষম হবে। আমি বলেছিলাম, "আমি মনে করি, আমাদের ওটা মেনে নেয়াই উচিত হবে '৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসের আলোকে। পরিস্থিতি আজ এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে, যে পরিস্থিতিতে কেবল বিচ্ছেদই আসতে পারে। আমরা ৬ দফা মেনে নেব না, কিন্তু আলাদা হয়ে যাবার ব্যাপারে আমাদের একমত হওয়াই উচিত হবে। কেননা, সেটিই হবে শোভন কাজ।" পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। তবে আগরতলা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি ভাল রকমে অবহিত।

◆ আপনি আলাদা হয়ে যাবার কথা বলছেন। আসলে কি আপনি দু'টি ভিন্ন স্বাধীন জাতির কথাই বলছেন?

∆ আমি ঠিক সে কথাই বলছি। পুরোপুরি দু'টি স্বাধীন দেশ। কেননা, আমরা এমন একটা অবস্থানে পৌছেছি যখন ৬ দফা থেকে পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণকে বঞ্চিত করতে আমরা আর পারি না। আবার আমরা আমাদের দেশের কাঠামোর মধ্যে ৬ দফার সাথে সহাবস্থান করতেও পারি না। আর সে জন্য বন্ধুপ্রতিম দেশের ক্ষতি ন্যূনতম রেখে আমাদের আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবু ভুট্টো বারংবার বলতে থাকেন, না, এটি আমরা করতে পারি না। তিনি বললেন, "রাজা, আমি তো এ নিয়ে দর কষাকষি, আলোচনা করছিই।" আমি বললাম, "আলোচনা খুব ভাল কথা। এই হলো রাজনীতি। গোটা জনগণ এর সাথে সম্পর্কিত। ইস্যু চরম পর্যায়ে পৌছলে তার সমাধান হওয়া উচিত খোলাখুলি। কেননা, এ রকম একটা সমাধান নিয়ে সবাইকেই বসবাস করতে হবে।" তিনি বললেন, "না, আমাকে এ জন্য সময় দিতেই হবে। আমাকে দর কষাকষির কাজটি করতে হবে গোপনে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি, মুজিবুর রহমান আমাকে এক ইঞ্চি ছাড়তে চাইলে আমি তাঁকে এক মাইল দিতে তৈরি।" আমি বললাম, "আমি তা জানি না। আমি শুধু বলতে পারি, ভবিষ্যতের বেলাভূমিতে আপনার এ সবের আঁচড় কাটার কোন সম্ভাবনা নেই। এত মুনির সমাবেশে কোন ঐকমত্যে পৌছানোর আশাও নিরাশা।" দেখা গেল, সবাই নীরবে ভুট্টোর পক্ষেই সায় দিয়েছে। ঠিক এ সব আনুপূর্বিক ঘটনার আলোকেই *পাকিস্তান টাইমস*-এ আমার নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আর বলাবাহুল্য, এটি মুজিবুর রহমানের চোখ এড়ায়নি, যা তাঁর কাছে পাঞ্জাবী উগ্রবাদ বলেই প্রতিভাত হয়েছে। আমি অবশ্য জানি না, পরের মাত্র পক্ষকালের মধ্যেই এমন এক পরিস্থিতিতে তাঁকে নিজেকেই পড়তে হবে—সে উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল কি না। পরবর্তীকালে আমার অজ্ঞতার কারণেই আমার মনে হতো, মুক্তিবাহিনীর ব্যাপার-স্যাপার ঠিক নয়। আসলে ওরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাঝে এক ধরনের উত্থানেরই প্রতিনিধি। এ উত্থান পাতি বুর্জোয়া অভিলাষের উত্থান। এ রকমই ছিল আমার ধারণা। যা হোক, পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশের সুদৃষ্টি আমার ওপর ছিল না, ওদেরকে কিছু দেবারও আমার ছিল না,

সরকারের সাথেও কখনও আমি জড়িত হইনি। তবু আমাকে চার বার জেলে যেতে হয়। আমার প্রথম কারাবাস ঘটে ১৯৫০-এ। পাঞ্জাবের লাহোরকে আমার নিবাস হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম। এখানে আমাকে ভারতীয় এজেন্ট, নাস্তিক, রুশ, সোভিয়েত চর ইত্যাদি নানারকম অভিযোগে দোষারোপ করা হয়েছে। আমি শেষবার জেলে যাই '৮৪ বা '৮৫তে। ঐ সময় আমাকে 'আটক' দুর্গে বন্দী রাখা হয়। এ মেয়াদের ৯টি মাস আমাকে কাটাতে হয় নির্জন কারাকক্ষে। বিবেকের কাছে আমার জবাবদিহি করার কিছুই নেই, সেদিক থেকে আমার সব কিছু খুবই পরিষ্কার। একমাত্র অভিজ্ঞতাই কিছু সমস্যা হতে পারে। জীবনের শিক্ষা থেকে আমি এ অভিজ্ঞতাই লাভ করেছি যে, দুষ্ট বিবেক আর অজ্ঞতাই নিয়ে যায় দোযখের ঠিকানায়। আমি তখনও নিজের বিরুদ্ধে লড়ছি পাকিস্তানের আদর্শিক মহিমায়, তখনও আমি মোহাচ্ছন্ন, তবে 'সব পেয়েছি' পাকিস্তানে পৌছানোর ৩ মাসের মধ্যেই আমার মোহভঙ্গ ঘটে। এ সময় এদেশের রাজনীতি, রাষ্ট্রযন্ত্র পথভ্রষ্ট হয়। আর তাই আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই। অথচ এই আমিই '৪৬-এর শেষ অবধি মুসলিম লীগে ছিলাম। এর আগে আমি বিশ্বাসী ছিলাম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। ১৯৪২-এ স্কুলের প্রথম ধর্মঘটে আমিই নেতৃত্ব দিই। আমাদের সমসাময়িককালে বস্তুত আমরা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত আগেভাগেই বড় হয়ে উঠেছিলাম বলেই আজ মনে হয়।

◆ ভারতের কোথায় ছিল আপনার আদি নিবাস?

∆ লক্ষ্ণৌ-এর আনুমানিক ৫০ মাইল পশ্চিমে কোন এক গাঁয়ে। আমার বাবা লক্ষ্ণৌতে প্র্যাকটিস করতেন। আমার মা ছিলেন প্রত্যন্ত উত্তরের মাঘরা নদী বরাবর পূর্বাঞ্চলের মেয়ে।

আমার এমন এক উপলব্ধি ঘটে যে, আমাকে ক্ষমতাসীন কায়েমী স্বার্থ বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এ ধারণা আমার মনে দৃঢ়মূল হয় '৪৮ থেকে। আমার আরও মনে হতে থাকে, এ লড়াই আমাকে আমৃত্যু লড়ে যেতে হবে। এ সংগ্রামের বাজি ধরে তাই আমাকে '৭১ সাল থেকে ভুট্টোর শাসনামলে তিন বার ও জেনারেল জিয়াউল হকের আমলে দু' দু'বার জেলে যেতে হয়েছে। পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমর্থনে কাজ করার কোন কারণ আছে বলে আমার মনে হয়নি। তবে আমার এ ধরনের মনোভাব ও কমিউনিস্ট পার্টি লাইন এক ছিল না। আমার ধারণা ছিল আমার একান্ত নিজস্ব। আমি পূর্ব পাকিস্তানে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটের কথা শুনে মর্মাহত হয়েছি। আমি অবশ্য এ সব ঘটনার ঐ ভাষ্যই শুনেছি যা কিনা আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে, আর সেগুলোকেই বাছাই করে নিয়েছি। আমি এ অবস্থায় একান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে প্রথমবারের মতো এ প্রশ্নে পার্টির অবস্থান জানতে চেয়েছি। দেখা গেল, পার্টি এ প্রশ্নে ইতিবাচক অর্থে নীরব আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একটি ভাল কথা বলতেও প্রস্তুত নয়। স্বভাবতই আমি এতে হতাশ হই।

◆ এ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীন পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কট সম্পর্কে যে অবস্থান নেয় তার সাথে এর কি কোন যোগসূত্র থাকতে পারে?

∆ হতেও পারে। আমার অবশ্য সব ঘটনা এখন ভাল করে মনে নেই। আমার কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকাকালে এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। ঐ ঘটনার পর আমার মনে পড়ে, পাশ্চাত্য

বার্তা সংস্থাগুলো বর্বর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে সব খবর পরিবেশন করে তার একটি বর্ণও আমি বিশ্বাস করিনি। আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রকাশিত খবরগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করি। এসব দেশের ইতিহাসের মোহাফেজখানা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেয়ার আগে পর্যন্ত আমি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সত্যিকার খবর জানতে পারিনি। এখন আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে আমার বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনায় সমস্যাগুলো কী ছিল আসলে তা বুঝতে পারি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র আমার চোখে ছিল যথাক্রমে ফেরেশতা ও শয়তান। তাই এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটি ভাষ্য যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া, অন্যটি সে রকম না হওয়া। '৭১-এ আমার বেলায় এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে কিছুটা নিম্নতর মাত্রায়। আমি নিশ্চিতভাবেই দেশের পূর্বাঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর কার্যকলাপ সমর্থন করিনি। আমার লেখা নিবন্ধে এ বিষয়টি পরিষ্কার বলেই আমার বিশ্বাস। আমি রক্তপাতের পক্ষপাতী নই, এমনি ধরনের ঘটনায় আমার সমর্থনও নেই। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানী সেনা ও কর্মকর্তারা এবং লোকজন ফিরে আসার আগে অবধি আমি ঘটনার কিছুই জানতাম না। সবাই ফেরার পর ওদের কাছ থেকে কী সব ঘটেছে জানতে পারি। জানতে পারি, ঘটনা সম্পর্কে এ সব লোকের কাছ থেকে যাদের সবকিছু লুটপাট করে নেয়া হয়েছে, যারা সেখানে হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে। এ সবের পর মতামতের কোন অবকাশ থাকে না, ছিল না। আমি কখনও বিশ্বাস করিনি, মুজিবুর রহমান সত্যিকার অর্থেই রাজনৈতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট, কিংবা সেই সুবাদে তিনি যে আন্দোলন করছেন, তা সত্যিকার অর্থেই একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যে আন্দোলন মুসলিম লীগ বা পিপলস পার্টির আন্দোলনের চেয়ে উন্নততর। পিপলস পার্টির আন্দোলনে আমি কোন কালে বিশ্বাসী ছিলাম না। আমি মনে করেছিলাম বাংলাদেশ কায়েম হবার পর সেখানকার লোকজন আমরা এখানে যা করছি তাই করবে, দুর্নীতিতে লিপ্ত হবে। ভারতীয় কংগ্রেসের নজির রয়েছে চোখের সামনে। সে কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। ক্ষমতায় একবার আসার পর কংগ্রেস কীভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, নেহরুর মতো মানুষকে কেমন করে দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের নৈরাজ্যে সভাপতিত্ব করতে হয় তা মোটেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। আজকে কংগ্রেসের অবক্ষয়ের জন্য ইন্দিরাকে দোষারোপ করা রীতিমতো ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। আমার মতে, ইন্দিরার প্রতি এ এক অবিচার। এই প্রবণতা আসলে উপমহাদেশীয় চরিত্র অর্জন করেছে। খুঁটিনাটি অল্প-বিস্তর তফাৎ কিছুটা হয়ত থাকতেও পারে, তবুও এ অভিমতের সর্বজনীন সারবত্তা আমাদের সমসাময়িক জীবনে অনস্বীকার্য। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ না করার কার্যত বিপক্ষে আমি। এই রিপোর্ট গোপন রাখা হলে আমার মতে তা হবে খুবই খারাপ ও অশুভ কাজ। কেননা, এদেশের মানুষের অন্তর খুলে দেখানোর একমাত্র পথ হতে পারে বিবেকের অনুশাসনে আত্মস্বীকৃতি। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হতে পারে সেই দিকনির্দেশনায় এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অথচ ভুট্টো এ কাজটি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এতে আমার এ বিশ্বাসই পুনঃপ্রত্যায়িত হয়েছে যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আজও ধরে রেখেছে পাকিস্তানী সমাজ।

◆ আমরা ভুস্বামী, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাচক্রের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে আপনি কি আশা করেন, জনগণের সরকার আসার মতো একটা বড় ঘটনা ঘটে যাবার কোন সুযোগ-সম্ভাবনা কোন পর্যায়ে হতেও পারে?

∆ কখনও নয়। তাহলে সে কথায়ই আসি। মুবাশ্বির হাসান অর্থমন্ত্রী হবার পর তিন বার আমার সাথে দেখা করতে আসে। উদ্দেশ্য, পিপলস পার্টি সরকারে আমাকে সংশ্লিষ্ট করা। আমি তাকে বললাম, তোমার সাথে কাজ করব? কেন? আমি তো এর কোনই যুক্তি দেখি না। কারণ, তোমার-আমার পথ তো আলাদা। তৃতীয়বারের মতো মুবাশ্বির আমার বাসায় এলে আমি কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ি। মুবাশ্বির বয়সে আমার চেয়ে বেশ জ্যেষ্ঠ। আমার মতে, রাজনীতিতে সে ভুল পথে রয়েছে। আমি সে কথাই তুলে ধরি, বলি, 'দ্যাখো, আমার ভাবমূর্তিগত কোন সমস্যা নেই। কারণ, আমি কোন নেতাই নই। নিজেকে সামলাতে আমি নিজেই যথেষ্ট।' আর সে যদি নিশ্চিতই হয়ে থাকে যে, তাদের সরকার চরিত্রের দিক থেকে বিপ্লবী—এটা প্রমাণ করে দেখাবে, আমি কি সে ক্ষেত্রে এ প্রভাবের বাইরে, ধরাছোঁয়ার উর্ধে থেকে যাব? আমি আসলে যেমনটি ছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে সে রকমটা থেকেও গেছি। আমি পিপলস পার্টিতে গিয়েছি তার সাথে কিন্তু তাকে এ কথাও বলেছি, আমি কখনও কোন কিছু স্পর্শ করব না।

◆ মুবাশ্বির পিপলস পার্টিকে র‍্যাডিক্যাল লাইনে নিয়ে যাবেন—এমন ভাবনা কি আন্তরিক অর্থে কখনও তাঁর আশা ছিল বলে কি আপনি মনে করেন?

∆ তার এ রকম একটা আশা ছিল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তার একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, এই রাজনৈতিক দলটিকে সে র‍্যাডিক্যাল লাইনে নিয়ে যেতে পারবে, সেভাবে গড়ে নিতে পারবে। আমি এর সাথে কয়েক মাস জড়িত ছিলাম। কিন্তু তারপর ঘটনা ঘটে গেল। ভুট্টো নিজে জেলে গেলেন। সব জ্বালা মিটে গেল আপনা আপনি।

◆ আপনি নিজেও তো ভুট্টোর শাসনামলে জেলে ছিলেন?

∆ সে কথা তো বলেইছি।

◆ কেন?

∆ পিণ্ডি ষড়যন্ত্রের পর আমি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলাম, এ কারণে।

◆ ভুট্টোই কি প্রধানত পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী?

∆ না, সে কৃতিত্ব আমি তাকে দিতে পারি না।

◆ মনে হয় এরও অনেক আগে থেকেই পাকিস্তানের শাসকচক্র হয়ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

∆ সেটি আমারও নজর এড়ায়নি। আমি বরাবরই এখানে রয়েছি। আমার মনে হয়, এ ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি, পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ এ সম্পর্কে বলার যোগ্যতা রাখেন না। এ জন্য আরও বছর বিশেক লাগবে বলেই মনে করি। এ মুহূর্তে আমাদের আলোচনার

বিষয় নিয়ে আংশিক কিছু ভাষ্য ও বহু মতামত রয়েছে, যেগুলো বিশ্বাসের শ্রেণীভুক্ত। এগুলো আমার মতে যথার্থ নয়।

◆ আমরা মনে করি, পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের কাজকর্ম যেভাবে চলা উচিত ছিল কমিশন তার কাজকর্ম সেভাবে চালাতে পারেনি।

▲ বিলকুল ফাঁকি। কিন্তু আমি বলব আপনি যা বলছেন তার কোন প্রমাণ নেই। আসলে পাকিস্তানে পরিকল্পনা কমিশন ক্ষমতার অনেক অনুশীলনই করেছে। ক্ষমতার স্থাপনা তথা ক্ষমতাচক্রের হাতে পরিকল্পনা কমিশন ছিল এক হাতিয়ার বা ক্ষমতার উপায়, খোদ স্থাপনা নয়। কমিশন একটা নির্ধারিত পরিমাণে ও মাত্রায় স্বায়ত্তশাসিতও ছিল। এই পরিকল্পনা কমিশনে ছিল সবরকম ব্যক্তিত্বের সমাবেশ। এক সময় চৌধুরী মোহাম্মদ আলী লিখেছিলেন, যমুনার ওপারের (দিল্লি তথা অবিভক্ত বৃহত্তর পাঞ্জাব প্রদেশের যমুনা নদী) কোন ব্যক্তিকে কোন গুরুত্বপূর্ণ নথির নাগাল পেতে দেয়া যাবে না এ জন্য যে, তার (পাকিস্তানের প্রতি) আনুগত্যকে আস্থায় নেয়া যায় না। এ বিষয়ে আমি অবশ্য কোন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে যাব না, এ কথাও বলব না যে, এ বিষয়ে পাকিস্তানে কায়েমী ক্ষমতাবান চক্রটির মোহাজিরদের সম্পর্কে একটি নির্ধারিত নীতি ছিল। আইয়ুব এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন তবে তিনি এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ এড়িয়ে যান। আমি আমার ধারণায় মনে করি, ন্যায়সঙ্গতভাবেই এ কথা বলা যায় যে, '৪৭-এর পরে দেশে যে ক্ষমতার স্থাপনাটির আবির্ভাব ঘটে তার ঘটন-উপাদানসমূহ, চরিত্র ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সব মিলে যে আদল গড়ে ওঠে অনিবার্যভাবেই তার একটি পাঞ্জাবী আধিপত্যময় স্থাপনা বলয়ের মাধ্যাকর্ষণে তার চারদিকেই আবর্তিত হওয়া কক্ষপথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, যে পাঞ্জাবী আধিপত্যাধীন ক্ষমতার স্থাপনা বেলুচিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান শাসন করবে। তবে পাকিস্তানের সরকার কেবল পাঞ্জাবীদের নিয়ে গঠিত নয়। পাকিস্তানের তৎকালীন ক্ষমতার স্থাপনাকে অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলা যায়, পাঞ্জাবের জনসমষ্টির অর্ধাংশ, যারা ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। আমি এমন একজনও পাঞ্জাবীকে চিনি না, যে ইংরেজীতে কথা বলতে সক্ষম নয়, যে তখনও ক্ষমতার স্থাপনার একজন শরিক নয়। এরা সকলেই উপনিবেশ আমলের ঐতিহ্য থেকে আগত, যারা তাদের নিজ জনগণের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্ন। এই শ্রেণীর পাঞ্জাবীরা পরের দিকের এক পর্যায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বস্তুত এই পাঞ্জাবী ক্ষমতার স্থাপনাটিই পরবর্তীকালে পাকিস্তানে সাবেকী উপনিবেশ ঐতিহ্যে লালিত কুলীন শাসকবর্গ হিসাবে অবস্থান নেয়। এই শাসকচক্রটি সবার ওপর, সবকিছুতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় এগুতে থাকে, সর্বত্র তাদের দোসরও যোগাড় হয়ে যায়। এরা এভাবে শক্তির একটি একক দুর্ভেদ্য কাঠামো হয়ে ওঠে। তাই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই ২৫ বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আরেকটি বলয়ে চলে যাবার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আজকে সীমান্ত প্রদেশ বা বেলুচিস্তানের পাকিস্তান বলয় ভেঙে অন্য বলয়ে যাবার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। আমি নিজে এ সব জিনিসে আদৌ তেমন আগ্রহ বোধ করি না। এর যৌক্তিকতায়ও আমি তেমন আস্থাবান হতে পারি না। কেননা, আমি এ উপমহাদেশের লোক। আমি মনে করি, আমার মূল পরিচয় আমি এ উপমহাদেশেরই একজন নাগরিক। আমি একজন

পাকিস্তানী, পাকিস্তানের সাথে আমার বন্ধন বা একাত্মবোধ সম্পর্কে আমার আদৌ কোন বিভ্রান্তি নেই। পাকিস্তানের কথা বলতে আমি এর জনগণকে বুঝিয়ে থাকি, এর ক্ষমতার স্থাপনাকে নয়। আর এ কারণেই ওরা আমাকে ভারতীয় কিংবা সোভিয়েত চর বলে। একজন নাগরিক, ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসাবে আমি যখন এ উপমহাদেশের মানচিত্রের দিকে তাকাই তখন এমন খুব কম কালপরিক্রমাই আমার চোখে পড়ে যখন ভারত একক ও সম্মিলিত দেশ বা রাষ্ট্র ছিল। বরং এ উপমহাদেশ ছিল বহুধা, বহু দেশ তথা রাজ্যে বিভক্ত। এই উপমহাদেশের জনসমষ্টিগুলোকে রাজনৈতিক বিবেচনার মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যায়, উপমহাদেশের একক রাষ্ট্র কাঠামোর বিষয়টি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক ঘটনা। এর উন্মেষ ঘটেছে রানী প্রথম এলিজাবেথের আমল থেকে। একে আমরা রাজনৈতিক দেশপ্রেমও বলতে পারি। ভারতে এই চেতনাটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলীয় সংবেদনশীলতায় সুস্পষ্ট। পূর্ব পাকিস্তানের কথাই ধরুন, সেখানে গেলে সে দেশে নিজেকে কোন অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুক মনে হবার কোন কারণ আমি দেখি না। অথচ আরও আগ বাড়িয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বর্মায় পা দিলেই আমার সে অনুভূতি আসে। পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের কারণে আজ কেন নিজেকে পীড়িত, অবদমিত মনে হবে তার কোন যৌক্তিকতা আমি দেখি না। আমার সহযোগী ওয়ালী খান সীমান্ত প্রদেশকে পাখতুনিস্তান নামে অভিহিত করা উচিত বলে যে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। আমি বলি, তা ডাকুন যে নামেই চান। তবে এ উপমহাদেশটির জন্য তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কথা হলো, দয়া করে আরও দেশ বানাবেন না। সব মিলে একটাই রাখুন। অবশ্য, এও আমি খুব ভাল করেই জানি, একটি দেশ গড়ার জন্য ঢের পরিণত বিচারবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দরকার। সংস্কৃতিগতভাবে অনেকে যা কিছু হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তেমনটি হওয়া খুব বিরল ক্ষেত্রেই সম্ভব।

◆ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কিছু কি আপনার চোখে পড়ে?

Δ আমার ধারণা, আমরা এগুচ্ছি এক কঠিন পথে। মানুষকে শেখানোর স্বকীয় উপায় আছে ইতিহাসে, এ কথা আপনারা জানেন। কিন্তু মানুষ ইতিহাসের সেই শেখানোর প্রক্রিয়ার সাথে ক্বচিৎ সহযোগিতা করে থাকে। বন্যা এলে আমি বন্যার পানির ওপরে আমার মাথা যতটা সম্ভব জাগিয়ে রাখার চেষ্টাই করি এই আশায় যে, বন্যার পানি সরতে শুরু করলেই বীজ বোনার কাজের আয়োজনে লেগে যাব। আর এর ফাঁকের সময়টুকু আমি আমার নিজ পরিমণ্ডলের কাজ করব। চিন্তানুশীলন চলবে, এখানকার এই ইনস্টিটিউট থেকে শিখবও। দেখুন, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা গত ৩/৪ বছর ধরে আর এখানে থাকে না। ইনস্টিটিউটের গোটা তহবিলের যোগান দিই আমি। আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। ওদেরকে আমি কোন টাকা-পয়সা দিই না। অপ্রয়োজনে এ রকম টাকা-পয়সা নেয়া ভাল নয়। তাই এখন আমি যা কিছু উপার্জন করি, সে অর্থে এই ইনস্টিটিউটে কাজে লাগাই। আমি এ ইনস্টিটিউটের নাম দিয়েছি 'সওগমনগর ইনস্টিটিউট অব ফিলসফি এ্যান্ড আর্টস'। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের ভাবধারায় আমি এ প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলছি। রবীন্দ্রনাথ শান্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কর্মকীর্তি আমি যেটিকে উপনিবেশ যুগের এক উপমহাদেশীয় ছদ্ম-রোমান্টিকতাবাদ বলি।

◆ এ জায়গাটির নাম তাহলে সওগমনগর? এ নাম এলো কীভাবে, কোথা থেকে—একটু বিস্তারিত বলবেন?

Δ 'সওগম'-এর অর্থ চেতনা, মেধা, জ্ঞান, সত্যচেতনা। 'নগর'-এর অর্থ স্থান, নিবাস। আমি মনে করি সত্য ও চেতনার অনুসন্ধান হলে ভবিষ্যৎকে পাওয়া যাবে। আমার মতে, আমরা এখন যুক্তিবিহীনতার যুগে বাস করছি। আমার বিশ্বাস, আমরা নিজেরা যদি এটি উপলব্ধি করি, অযৌক্তিকতা যুক্তিবিহীনতা খুব বেশি দিন টিকতে পারবে না, তবে আমরা যতদিন আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও এমনিতর সবকিছুতে আত্মকেন্দ্রিকভাবে ডুবে থাকব ততদিন যুক্তিবিবর্জিত অবস্থাও বহাল তবিয়তে থাকবে। আপনি স্ববিরোধী দুটো কাজ যুগপৎ করতে পারেন না। বিবেক ও চেতনার কাজে থাকলে পাশাপাশি আপনার ব্যক্তিস্বার্থের কাজও চলতে পারে না। এদের একটি মুখ্য হলে অন্যটিকে অবশ্যই গৌণ হতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থের কাজের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই তবে সে ক্ষেত্রে শর্ত হবে, এই ব্যক্তিস্বার্থের কর্মসূচীকে হতে হবে গৌণ। সমাজ কর্মসূচীর যৌক্তিকতার মুখ্যতার উপলব্ধি থাকলেই কেবল ব্যক্তিগত কর্মসূচীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। আমার বিশ্বাস, সমাজ কর্মসূচীর প্রেরণাদায়ক উৎস হলো যৌক্তিকতা। আমাদের পরস্পরের সহযোগিতার এই যৌক্তিকতার উপাদান প্রতিষ্ঠা করা দরকার এ রকম সহযোগিতার জন্যই। এ সহযোগিতা বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা। এ সহযোগিতার জন্যই এই স্থানটিকে আমি গড়ে তুলেছি।

খা লে দ আ হ ম দ

[খালেদ আহমদ বর্তমানে লাহোর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ফ্রাইডে টাইম'-এর সম্পাদক। যৌবনে তিনি ছিলেন সৈনিক। '৭০ দশকে যোগ দেন পাকিস্তানের কূটনৈতিক সার্ভিসে। তারপর কাজ শুরু করেন সাংবাদিক ও মানবাধিকার রক্ষার কর্মী হিসাবে। তাঁর এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় লাহোরে 'ফ্রাইডে টাইম'-এর কার্যালয়ে।]

◆ ১৯৭১ সালের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?

Δ বাংলাদেশের সঙ্কট যখন ঘটে তখন আমি মস্কোয়। যা ঘটছিল তার পাকিস্তানী ভাষ্যই আমরা পাচ্ছিলাম। আমি মনে করি, গোলযোগ ও পূর্ব পাকিস্তানের দুষ্কৃতিকারীদের সম্পর্কে পাকিস্তান যা বলছে তা ঠিক নয়—সেটি খুবই পরিষ্কার। পরবর্তীকালের সত্যতার আলোকে চক্রান্ত আসলেই কী ঘটেছে তা বেরিয়ে আসে। ইয়াহিয়া খান পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্যতা হারান। জেনারেলরাও একইভাবে ধিকৃত হন। তবে আমার মনে হয়েছে, যে ট্রাজেডি ঘটে গেছে তা থেকে পাকিস্তানের নিজের মুক্তি ঘটেনি। আমার ধারণা, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো, পাকিস্তানে বাকস্বাধীনতার, বিশেষ করে ঐ সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অভাব। আমার বিশ্বাস, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একটা স্বকীয় মনস্তত্ত্বই বাংলাদেশে সে সময় কাজ করেছিল। পরিস্থিতি ভাল-মন্দ যাই হোক, নির্বিশেষে সেনাবাহিনী এ রকম মনে করতে থাকে যে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। তাদের এ ধরনের পরাজিতের মানসিকতা আফগান যুদ্ধের আগে পর্যন্ত দেখা যায়নি। তাদের মাঝে যে মনস্তাত্ত্বিক গোলকধাঁধা গড়ে উঠেছিল তা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি। কোন কোন সময় আমি এ রকম ব্যাখ্যার প্রয়াস পাই যে, আফগানিস্তানের যুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যে প্রয়াস নিয়েছে তা ছিল একটি পরাজিত সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ধুয়েমুছে সাফ করারই প্রয়াস। যে প্রয়াস চলে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে। এ কাজটি করা হয় অত্যন্ত চমৎকার সামরিক ফ্যাশনের দৃশ্যপটে এ দৃশ্যপটে কেউ যুদ্ধের তহবিলের যোগান দিয়েছে, কেউ সে যুদ্ধে লড়েছে আর সেই প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানী জেনারেল যেভাবে হোক

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে এই ভেবে যে, এতদিনে তারা পরাজিত জেনারেলের ভাবমূর্তির ঘেরাটোপ ছেড়ে বিজয়ীর বেশে বেরিয়ে এসেছে। এ রকম উভয়বিধ প্রতারণায় যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানী মানসের। পাকিস্তানের ডানপন্থী মানসিকতা বাংলাদেশের বাস্তবতা ও কীভাবে সেটি ঘটেছে তা মেনে নিতে তৈরি নয়। এ মানসিকতা ১৯৪৭-এর পরের ইতিহাস গ্রহণ করে না। এ ব্যাপারে নিজেদের বাগাড়ম্বর রয়েছে। পাকিস্তানের এই অংশের মানসিকতার অবস্থানস্থল প্রধানত পাঞ্জাব। আর সে কারণে বাঙালীরা যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয় তখন তাদের লক্ষ্য পাকিস্তানীরা কখনও ছিল না। সব সময়ই তাদের অভিযোগ ছিল পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে। পাঞ্জাবীরা পাকিস্তানী আদর্শের আধার হয়ে উঠেছে—এ কথা অত্যন্ত সত্যি বলেই আমার মনে হয়। পাকিস্তানের একাধিক প্রদেশ কেন্দ্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখে চলতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর সাথে সত্যিকার অর্থে পাকিস্তানের মানিয়ে না নিতে পারার অন্যতম কারণ, পাঞ্জাবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পূর্ব পাকিস্তানের বিষয় শুনতে রাজি নয়। আর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সিংহভাগই পাঞ্জাবীদের নিয়ে গঠিত। অবশ্য, সামরিক বাহিনীতে এক ধরনের বিশেষ মতবাদ কাজ করে, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের একটা বাঁধাধরা, অনমনীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হয়। এ হলো উর্দির দীক্ষা। আর তাই সামরিক বাহিনীর যেসব সদস্য ও অফিসার পদমর্যাদার উচ্চতর মর্যাদায় উঠে আসে তাদের সকলেই এক বিশেষ ধরনের চিন্তাধারার অধিকারী হয়ে ওঠে। পাকিস্তান রাজনীতিক ও বাংলাদেশ নিয়ে যে বিষম আচরণ করছে তার ইঙ্গিত অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। কতকগুলো রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের ক্ষমতাচক্রের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো গ্রহণযোগ্য। লোকায়ত (ধর্মনিরপেক্ষ) দলগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ এখনও সেই ১৯৪৭-এর কাঠামো মাথায় রেখে ভাবে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বড় রকমের বিদ্রোহ করেছিল আওয়ামী লীগ। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের কাছে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়েছিল। ঐতিহাসিকরাও ঘটনাকে এভাবেই লিখলেন। পাকিস্তান আপাতত এই ধারণার বিধিনিষেধের বেড়াজালমুক্ত হয়েছে যে, অন্তত আপনি আপনার মতামত প্রকাশ করতে পারেন। আপনি এখন বই লিখতে পারেন।

◆ পাকিস্তানী শাসকদের অতীত কার্যকলাপ নিয়ে বই লিখতে এখন আর আপনাদের বিধিনিষেধের বাধায় পড়তে হয় না?

∆ বিধিনিষেধ আর নেই। হতে পারে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হয়ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান হয়ে পড়েছে এক নৈরাজ্যময় দেশ। এ দেশে নানা ধরনের মিলিশিয়া বাহিনী রয়েছে সক্রিয়। ওরা এখন দু'টি জিহাদে লড়ছে আর তাতে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছে। আগের মতো রাষ্ট্র আর মানুষকে ব্যক্তি পর্যায়ে সেভাবে কব্জায় নিতে পারছে না। তাই মানুষ এখন কথা বলতে চায়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কারণে ক্রমেই বহু অভিমত প্রকাশিত ও সোচ্চার হতে পারছে। তবে এ সব কণ্ঠস্বর তথা অভিমতের নিন্দা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, নিন্দা করার স্বাধীনতাও এখন রয়েছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের উর্দু সংবাদপত্রগুলো রাষ্ট্রীয় আদর্শিক ধ্যানধারণার খুবই কাছাকাছি তবে ইংরেজী সংবাদপত্রে অনেক সময়ই পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটেছিল তার অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আপনার চোখে পড়বে। পাকিস্তানে

ইংরেজী পত্রপত্রিকা চাপের মুখে রয়েছে। ১৯৭০-এ আমি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম। বাংলাদেশের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন দেখার জন্য ১৯৯৬-তেও আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে ওখানকার পরিবর্তনগুলো আমার চোখে পড়েছে। চোখে পড়েছে জন্মের সময় এ নতুন দেশটি ছিল লোকায়ত, ধর্মনিরপেক্ষ। তবে সেখানে দীর্ঘকালের সামরিক শাসনে বাঙালীরা বদলে গেছে। ওদেশের মানুষ তেমন ধর্মনিরপেক্ষ আর থাকেনি যেমনটি তারা হবে বলে আমি ভেবেছিলাম। আমি এর আলামত দেখেছি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর লোকজনের প্রতি আচরণে। একটি গ্রামে গিয়ে দেখতে পাই হিন্দু ভোটারদের মারধর করা হয়েছে। আমাকে এক সংবাদ সম্মেলনে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি কী দেখেছি তা খুবই সতর্কতা সহকারে ব্যাখ্যা করে বলি। নিজ অভিমত আমি দেবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম যেসব তরুণ রিপোর্টার আমার কথা শুনছে তার শতকরা ৭০ জনের কাছে আমার কথাবার্তা পছন্দসই হচ্ছে না। আরও একটি জিনিস আমার চোখে ধরা পড়ে। ওদেশে ভারতবৈরিতার মাত্রা তীব্র হয়ে উঠেছে। আমার মতে এ জন্য ভারতীয়রাও দায়ী। নতুন রাষ্ট্রটি কায়েম হবার পর আমার ধারণা, ভারতীয়রা বাংলাদেশের সঙ্গে সঠিক আচরণ করেনি। আমি ভারত ও পাকিস্তান—উভয় দেশকেই দোষ দিই। দেশ দু'টি বাংলাদেশের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক তৈরি করেনি। আর সে কারণেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশে এর একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তবে এই ভারতবৈরিতা আত্মঘাতী। আমি দেখেছি, বাংলাদেশের বাজারঘাট ভারতীয় পণ্যে আগাগোড়া সয়লাব। ওখানকার লোকজন জানিয়েছে, এ সব পণ্যের সবই চোরাচালানে এসেছে। বাংলাদেশের বাজার পুরোপুরি এখন ভারতীয় পণ্যে ভরা। ভারতবিরোধী মানসিকতা বেশ জোরদার এমন কিছু মহলের সংস্পর্শে আমি এসেছি। আমি এও লক্ষ্য করেছি যে, ধর্মীয় সংগঠনগুলো বাংলাদেশে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সেখানে তাবলীগ-ই-জামাত আমার চোখে এসেছে। তাদের অত্যন্ত বড় বড় জমায়েত হচ্ছে। আমার সিলেটে থাকার সময় আমি সেখানে জমিয়তুল উলেমা-ই-ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর লোকজনকে প্রত্যক্ষ করেছি। ওরা প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। এক ভদ্রমহিলা এক হিন্দুকে বিয়ে করেছিলেন সেজন্য ওরা তার বাড়িতে বোমা ছুড়েছিল। এভাবে দেখা যাবে, ওদেশে অনেক কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হয়, বাংলাদেশ পাকিস্তানের নকল করার চেষ্টা করছে যা খুবই ভয়াবহ। মরার সাধ যদি জেগে থাকে আপনি পাকিস্তানের নাগাল পেতে চেষ্টা করেন। পায়ে পায়ে মৃত্যু এগিয়ে আসবে। তবে আমার ধারণা, আওয়ামী লীগের নির্বাচন জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্য নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তবে একথাও ঠিক, আওয়ামী লীগ স্পষ্টতই তাদের ধর্মনিরপেক্ষ মেনিফেস্টোতে ফেরত যেতে পারছে না। বরং আমার নজরে পড়েছে, আওয়ামী লীগ ইসলামের রক্ষাবরদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তবে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সক্রিয়তাবাদীদের অস্তিত্ব রয়েছে। যারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াবে। ওদের সাথে মিলিত হতে পেরে আমি খুবই সন্তুষ্ট। অথচ পাকিস্তানে এ ধরনের সক্রিয়তাবাদীদের দেখা মেলা ভার। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। ওরা পাকিস্তানে কতখানি চাপে আছে তা আমি বিশদ খুলে বলতে পারব না। তবে তাদের প্রতি এক ধরনের অন্যায়

আচরণ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক আইন রয়েছে দেশে। যে কেউ ইচ্ছে করলে এসব আইনে ওদেরকে হয়রানি করতে পারে। আমি ধরে নিয়েছি বাংলাদেশে এখনও এ ধরনের কোন আইন নেই। তবে অর্পিত সম্পত্তি আইনের মতো অন্যকিছু আইন আছে এদেশে। বাস্তবিক পক্ষেও এদেশে একজন হিন্দুকে তার সম্পত্তি থেকে বেদখল ও তাকে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা সম্ভব। এ রকম একজন হিন্দু পালিয়ে গেলে তার সম্পত্তি গ্রাসও করা যায়। তবু বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিবেশ এখন সহনশীল বলতে হবে। আমি দেখতে পাই, বাংলাদেশের একটা ভবিষ্যৎ আছে কেননা, বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে বহুত্ববাদের এক ধরনের একটা বুনিয়াদ আছে। এ দেশের মানুষ দেশের সকল বৈচিত্র্যের মানুষের ব্যাপারে একটি সুষম দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে আসবে। তবু দুর্ভাগ্যই বলতে হয়, বহু ভ্রান্ত, বেপথু জিনিসও ঘটে গেছে এ দেশেই।

◆ কবে ফিরেছিলেন পাকিস্তানে মস্কো থেকে?

∆ ১৯৭৪-এ। প্রথমে আমি মস্কোয় ছিলাম। পরে কিছুদিনের জন্য চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে পররাষ্ট্র দফতরে একজন কর্মকর্তার চাকরি করি। ওখানে আমি একজন রাষ্ট্রদূতের অধীনে কাজ করি। ঘটনাক্রমে তিনি ছিলেন বাঙালী, বিয়ে করেছিলেন একজন পাঞ্জাবী মহিলাকে। ঐ রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খুব একটা সুআচরণ পাননি। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি এ ধরনের কর্তৃপক্ষীয় দুর্ব্যবহারের শিকার হন তাঁর নাম কর্নেল কাইয়ুম। তাঁরও কাহিনী রয়েছে। এ কাহিনীর শুরু ১৯৪৭ থেকে।

ধরুন বলা হলো, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সবকিছু ইসলামী আদর্শমাফিক হবে। কিন্তু তখনই দেখা গেল অন্য পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে। আমি বাঙালী রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে খুব একটা ভাল ধারণা পোষণ করি না। বাঙালীদের নেতৃত্বের হিন্দু অংশটিই আমার মনে হয় ধর্মনিরপেক্ষতার আওয়াজ তোলে। ওরা বলেন, প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত আকারে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা তোলা যাবে না। কারণ, এটি একান্ত সুনির্দিষ্টভাবে অ-মুসলিমবিরোধী। গণপরিষদের সমসাময়িক কার্যবিবরণী পড়লে যে কেউ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন যে, যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে সেগুলো অতীব চমৎকার। তবে ও পথটি অত্যন্ত পিচ্ছিল, বিপজ্জনক। এ রকম কিছু করা হলে একটার পর একটা তা চলতেই থাকবে যার লক্ষ্য বা শিকার হব আমরা। এ সময়কার অনেক বাঙালী রাজনীতিক সম্পর্কে আমার তেমন কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। তবে আমার ধারণা, আমরা এখন সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে একটা মূল্যায়নে উপনীত হয়েছি। আমি নিজে অন্তত পৌছেছি। অতীতে আমরা তাঁকে যেমন মনে করেছি তাঁর মর্যাদা আসলে অনেক উঁচুতে বলেই আমার বিশ্বাস। অতীতে পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও রাজনীতিকরা এই নেতার নেতৃত্বের মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্নতরভাবে। আজকে তাঁর কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পর্যালোচনা করলে আমার মনে হয়, তিনি ছিলেন বাস্তবতাভিত্তিক আশাবাদী। তাঁর পথই ছিল সঠিক। আজকে আমরা যে ডানপন্থী বিপর্যয়ে পড়েছি তিনি পাকিস্তানকে তা থেকে সরিয়ে উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

◆ ১৯৭০-এর রায় বাস্তবায়িত হলে সবকিছুই ভিন্ন হতো—এ ব্যাপারে আপনার কিছু কি বলার আছে?

∆ তবে আমি মনে করি না পাকিস্তানের কেউ এ জন্য প্রস্তুত ছিল।

◆ এমনকি ১৯৭০-এর আগেও দেশের পরিকল্পনা কমিশন কিছু চেষ্টা চরিত্র, মহড়া চালিয়ে যাচ্ছিল, কেননা ঐ সময় নাগাদ বিদেশী মুদ্রা ও উন্নয়নের জন্য বিদেশী তহবিলে পূর্ব পাকিস্তান তার প্রাপ্য অংশের জন্য দাবি তোলে। পরিকল্পনা কমিশন এতে সাড়া দেয়। তবে ঠিক এ সময়টাতেই পাকিস্তানের মূল ক্ষমতাচক্রের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে হলেও দেশের পূর্বাঞ্চল দায়বোঝা হিসাবে গণ্য হয়। এ সম্পর্কে কিছু কাগজপত্রও প্রকাশিত হয়। এ সবের বাস্তবতা সম্পর্কে কোন উপলব্ধি বোধ কোন সময়ে আপনার ঘটেছিল, কাগজপত্র পড়েছিলেন কিংবা এ ব্যাপারে জানতেন? এ ধরনের কোন কাগজপত্র আপনার হাতে এসেছিল?

∆ না, সম্ভবত নয়। তবে আমার কাছে ধরা পড়েছিল যে, ঐ সময়কার খবরের কাগজগুলো বরাবর জরুরী আইন বা পরিস্থিতির ভিতরে কাজ করেছে। পাকিস্তানের সংবাদপত্র বস্তুত অবাধ ও মুক্ত প্রকাশনার পরিবেশ পেয়েছে মাত্র ১৯৮৫-র পর।

◆ এখন তাহলে তার বিধিনিষেধমূলক আইনগুলি নেই?

∆ জ্বি, ওগুলো নেই। ১৯৮৫-৮৬তে এসব গেছে। সেদিক থেকে পাকিস্তান এখন ভিন্ন দেশ। কেননা, এখন আপনি আপনার কথা বলতে পারেন। তবে একটা আশঙ্কার কথা এই যে, একটা আদর্শিক মতবাদ আরোপের মতো বাস্তবতা এ দেশে রয়ে গেছে। বস্তুত আপনি এখানে একজনকেও পাবেন না যে কী ঘটেছিল, কেন আমাদের দেশ ভেঙে গেল সে সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রেখে কথা বলতে পারে। আমাদের কেবলই বলার ছিল, কেন আবার, হিন্দুস্তান! হিন্দুস্তানই তো এ কাজ করেছে! অন্য বাস্তবতা হলো : সংবাদপত্র, সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য সংগঠনে পাঞ্জাবী আধিপত্য। আপনি পাঞ্জাব ছাড়া অন্য প্রদেশগুলোতে যান, ভিন্ন ভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আপনার পরিচয় ঘটবে। এ বিষয়টি সত্যিকার অর্থেই যথেষ্ট তাৎপর্যবহ। আমার জন্য এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি হলো আমি একান্তভাবেই কিছু জানতাম না। মস্কো দূতাবাসে কাজ করার সময় আমি ছিলাম তৃতীয় সচিব পদে। ঐ সময় আমি বুঝতে পারি ইয়াহিয়া খান মিথ্যে কথা বলছেন। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি ঘোর সন্দিহান ছিলাম। তবে আমার জানা ছিল নেহাতই কম। বিষয়টা অবাক হবার মতোই। ১৯৭০-এ আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে যাই। আমি কুমিল্লায় ছিলাম। সেখানে আমাকে স্থানীয় জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে হয়েছে। বাঙালী লোকজন কী বলাবলি করে তা আমি বুঝতাম না। আমার কোন ধারণাই ছিল না, তবু আমি বুঝতে পারতাম, বাঙালীরা পাঞ্জাবীদের ঘৃণা করে। এ সংস্কার তাদের ভেতর কাজ করে। পাঞ্জাবীরা লম্বা-চওড়া—এ ধারণায় দশজনের ভিড়ে তারা আগে চোখে পড়ে। পাঞ্জাবীরা রগচটা ধরনের, মেজাজী? আমি বুঝতে পারতাম, সন্তর্পণে, অতি সন্তর্পণে এখানে ওখানে পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে বাঙালী প্রতিরোধের অস্তিত্ব রয়েছে। আর এরই অবাধ বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০-এ। পরিষ্কার হয়ে যায়, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এ ধরনের আধিপত্যে থাকতে চায় না। আজকে আমরা বলতে পারি, ওদেরকে ৬ দফা দিয়েই দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেসব দিনগুলোতে পাকিস্তানের কেউ তাতে সায় দিচ্ছিল না বলেই আমি মনে করি। যদি কেউ বলত, আসুন ওদের দাবি মেনে নিই, আসুন দেশটাকে পুরোপুরি ভেঙে

যাওয়া থেকে রক্ষা করি, তাহলে সে তার নিজের সর্বনাশও ডেকে আনতে পারত। তাই এখানে ধরে নিতেই হবে যে, ঐ সময় পাকিস্তানীদের সামগ্রিক মগজ ধোলাই ঘটেছিল। বাস্তবিকপক্ষেও আমি মনে করি, গোটা জনসমাজই যখন এক ও অভিন্ন ধারণায় চিন্তা-ভাবনা শুরু করে তখন সব রকমের ট্রাজেডিই ঘটে। আমি মনে করি, ঠিক এ মুহূর্তে সার্বিয়াতেও এই ট্রাজেডিই ঘটছে। সার্বিয়ার ট্রাজেডি হলো, গোটা জাতি সার্বীয় জাতীয়তাবাদের মদে ডুবে আছে। মানে আমি বলতে চাই, ওরা সবাই একযোগে বলছে, মুসলমানদের খুন করতে হবে। যে জিনিসটা দেশের জন্য মারাত্মক সেটি করার ব্যাপারেই সেখানে রয়েছে সর্বাত্মক সর্বনাশা একাত্মতা। অথচ কারও না কারও উচিত এ বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করে বলা, দেখিয়ে দেয়া যে, "দ্যাখো এটি ঠিক নয়"। তাকে এ কথা বলার সুযোগ দিতে হবে।

◆ **১৯৬৮-৬৯-এ শেখ মুজিবুরের বিরুদ্ধে যখন আগরতলা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় তখন তাঁকে ভারতীয় চর বলে অভিহিত করা হয়। বলা হয়, তিনি অমুক ও অমুকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন। তাঁকে কাঠগড়ায় তোলা হয়। এতে শেখ মুজিব 'নায়ক' হয়ে ওঠেন পূর্ব পাকিস্তানে আর পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পরিচিতি জোটে ভারতীয় এজেন্ট হিসাবে। পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের সাধ্যমতো সমর্থন পেতে এটি শেখ মুজিবুর রহমানকে সাহায্য করে। আমি বলতে চাই, তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নেতা। আপনি কি মনে করেন, পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁকে ফাঁসি ও পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় করায় এ যুগপৎ প্রভাব ছিল?**

▲ অবশ্যই, ব্যাপারটি খুবই সহজ। পাকিস্তানের যদি অন্তঃকরণ বলে কিছু থেকে থাকে তাহলে তাতে একটা বড় গর্ত ছিল যা ভরাট করা হয়নি। আসলে সেটি করতে অনীহা ছিল। তাই ভুট্টো যখন জেল থেকে মুজিবকে মুক্তি দেন পাকিস্তানীরা মনে করে তিনি একজন বিশ্বাসঘাতককে ছেড়ে দিলেন, যার শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। পরের পর্যায়ে ভুট্টো বললেন, "বাংলাদেশকে আমার স্বীকৃতি দিতে হবে।" তিনি এরপর জনগণকে মানসিকভাবে তৈরি করার জন্য ঘুরলেন। জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠলেন। সকল আসন জয় করলেন। কিন্তু যখন তিনি বললেন, "আমি কি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব?" জনতার কাছ থেকে আওয়াজ এলো "না।" জনগণ এতই ক্রুদ্ধ ছিল যে তারা না করে দিল কেননা সে একজন বিশ্বাসঘাতক। অবাক কাণ্ড এই যে, কেউ একবার ভেবেও দেখল না যে, এই ব্যক্তিই বাংলাদেশে সব ভোট পেয়েছে। হতে পারে, বাংলাদেশকে তারা সুনজরে দেখেনি। এখন সেই দেশের বড় নেতা হয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। কাজেই...। কিন্তু এদেশের মানুষ এ বাস্তবতা মোটেই স্বীকার করেনি যে, দেশ বা জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে তারা যে অবস্থান নেয় তা বৈধতা পায়। আমরা এ সব জিনিস নিয়ে কখনও ভাবিনি। আমরা মনে করেছি, ভুট্টো আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর বরং উচিত ছিল তাঁকে হত্যা করা। এসব বাস্তবতা কোন না কোনভাবে পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিতে হবে আর যা ঘটেছে সে বিষয়ে একটা উপলব্ধিতে আসতে হবে। আমি তো মনে করি ক্ষমা প্রার্থনার মহতী দিক আছে। আর এ ক্ষমাপ্রার্থনা ভাসা ভাসাভাবে নয়; বাস্তবিকই এ কথা পরিষ্কার বলা: দেখুন যা হবার হয়েছে, আমরা এ জন্য দুঃখিত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে নানা বিরোধের ব্যাপারে দু'দেশ কেন সফল হতে পারেনি তার একটি কারণ হলো

পাকিস্তানে যা হয়ে গেছে সেগুলোর ব্যাপারে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এমন এক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা দরকার যে ব্যক্তিত্ব অনুতপ্ত হতে পারে, অতীতে যা ঘটেছে তাতে দুঃখবোধে সক্ষম। এটি বিশেষ করে জরুরী যখন কোন দেশ বা জাতি কোন নৈতিকতাবর্জিত ধারণার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। আমি মনে করি, ঠিক এ রকম অবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করতেই হবে। সেখানে যদি অনৈক্যের অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে এ ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক হয়ে ওঠে না। যদি কোন অন্যায়, ভুল সরকার করে থাকে আর সে বিষয়ে দেশের জনমত বিভক্ত থাকে তাহলে সে দেশের ক্ষমা প্রার্থনার দরকার হয় না।

◆ আজকে যে বিতর্ক চলেছে আপনি কি সেই পরিপ্রেক্ষিতেই একথা বলছেন? আমরা *দ্য ডন, দ্য নেশন* ইত্যাদি ইংরেজী খবরের কাগজ দেখেছি। তবে পাকিস্তানের উর্দু সংবাদপত্র এ বিষয়ে কী বলে তা আমি জানি না।

∆ পাকিস্তানের ইংরেজী সংবাদপত্রগুলো একান্তই ভিন্ন। পাকিস্তানে ইংরেজী সংবাদপত্রের ব্যাপ্তি কম এ ধারণায় যে, এ দেশে খুব কম লোক ইংরেজী পড়তে পারে। উর্দু সংবাদপত্রে আমার আশঙ্কা, এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতা রয়েছে। তাহেরা মাযহার আলী ক্ষমা চাওয়ার কথা যখন তোলেন তখন বাস্তবিকপক্ষে তা করতেও যান—কোথাও হয়ত তা করেও থাকবেন। সেই তাঁকেই এ দেশের সংবাদপত্র ধিক্কৃত করেছে। উর্দু সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় অসুবিধে এই যে, সংবাদপত্রের খবরাখবরের উপাত্ত খুবই কম বা তথ্যভিত্তিক। বেশিরভাগ তথ্য ছাপা হয়ে থাকে ইংরেজী সংবাদপত্রে। বলেছি, এ দেশের খুব কম মানুষই ইংরেজী পড়তে পারে। কাজেই তাদের মনের পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব! বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে পাকিস্তানের এই শ্রেণীর পাঠককুলের ধারণা একান্তই বিকারগ্রস্ত। তারা যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সমালোচনা করে সেগুলো সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা। তাদের ধারণা, গোটা দুনিয়াই ইসলামবিরোধী। অথচ বাইরের জনগণ সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা। আপনি যদি ইংরেজী সংবাদপত্রগুলো পড়েন তাতে পরিণত চিন্তার পরিচয় পাবেন, বাস্তবতা সম্পর্কে ওদের দখল কতখানি তাও জানা যাবে। বাংলাদেশ সম্পর্কিত বাস্তবতা বা সত্যিকার ঘটনাগুলোর ছিটেফোঁটা কখনও উর্দু পত্র-পত্রিকায় আসে না। আপনি যদি আমাদের পাঠ্যপুস্তক পর্যায়ে বইগুলো পড়েন তাহলে লক্ষ্য করবেন, বাংলাদেশের পুরো ঘটনাই ভারতের চক্রান্ত হিসাবে নাকচ করে দেয়া হয়েছে আর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কেমন করে যেন কোন গণনা বিবেচনার মধ্যেই পড়ে না। তাদের উল্লেখ কোথাও নেই। বিস্ময়ের ব্যাপার, ১৯৪৭-এর পর আমাদের মাথাব্যথা ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত গণপরিষদের শতকরা ২৫ জন সদস্য। শতকরা ৭৫ জন নয়। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের নিয়ে বিকারগ্রস্ত ছিলাম। পাকিস্তানের ইতিহাস পড়ুন। সবকিছুই দেখবেন ঐ ২৫ শতাংশের সাথে সম্পর্কিত। হিন্দুরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আধিপত্যশীল, তারাই শিক্ষিত দার্শনিক। আর কোন না কোনভাবে পূর্ব পাকিস্তানীরা? ওরা কেউ নয়। পূর্ব পাকিস্তানী যেন এক পশু যাকে হিন্দুরা গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ এমন আদিম চিন্তাধারা যা রীতিমতো অচিন্তনীয়। আর এ রকমই অদ্ভুত ধ্যানধারণা গেড়ে বসে আছে পাকিস্তানী মানসে। তাই পূর্ব পাকিস্তান যেভাবেই হোক, তাতে আবেগ কিংবা যুক্তি থাকুক, বা না থাকুক পাকিস্তান থেকে সরে যাবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাতে আমি অবাক হইনি। কেন জানি না এখন আমি ভাবি, হতে পারে

পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক থেকে পেছনে পড়ে যাচ্ছিল—এ হয়ত বা কারণ। তখন আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ, ভারতের বরাবরের ৩ শতাংশ, আর বাংলাদেশ তো 'বাস্কেট কেস'। আজকে অবস্থা পাল্টে গেছে। আমাদের প্রবৃদ্ধি নেমেছে ৩ শতাংশে, ভারত উঠে গেছে ৬-৭ শতাংশে আর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমেছে। পাকিস্তানে বাড়ছে ৪ শতাংশেরও বেশি ভয়ানক হারে। আমার আশঙ্কা সাম্প্রতিক আদমশুমারিতে আরও সব ভয়ানক তথ্য বেরিয়ে আসবে। আমরা এক অসম্ভব অবস্থায় আছি। যুদ্ধ লড়ছি দু'টি। এ অসম্ভব অবস্থায় নবজাতক বেশি করে আসছে। আমার আশঙ্কা, পাকিস্তান একটা ভয়ঙ্কর সঙ্কটে রয়েছে। এ অবস্থা উপলব্ধির জন্য শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এ কামনাই করা যায় বড়জোর।

আরেকটি বিষয় বলার। বাংলাদেশ পায়ের নিচের মাটি থেকে অর্থনৈতিকভাবে মাথা উঁচু করে তুলছে। আমি ওখানে যখন ছিলাম তখন ওদেশের মানুষের তাদের নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে প্রকাশ করার সামর্থ্য ছিল অতি সামান্য। দুর্নীতিও দেশটায় ব্যাপক। খালেদা জিয়ার আমল দুর্নীতিতে ভরা। দুর্নীতির অঙ্ক রীতিমতো চমকে দেবার মতো। যারা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছিল তাদের সকলেই প্রায় ব্যবসায়ী। প্রত্যেকেই বলেছে, আমি একজন ব্যবসায়ী। তবে একজন অর্থনীতিবিদ জানান, এরা সকলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়েছে, কেউ ফেরত দেয়নি। কাজেই বাংলাদেশ নিজেকে উপযুক্তভাবে তুলে ধরতে পারেনি। পাকিস্তান ভারত পেরিয়ে নজর ফেলতে পারেনি। পাকিস্তানের দৃষ্টি পশ্চিমে ইরান ও উপসাগর অঞ্চলে, অবশ্যই পাশ্চাত্যে। তবে ভারতের ব্যাপারে পাকিস্তান অন্ধ। সরাসরি সে ভারতকে দুশমন মনে করে, তাকে ঘিরে যত মাথাব্যথা, যদিও সে মাথাব্যথা সত্যিকারের নয়—যা হওয়া উচিত ছিল এবং ভারত সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান রেখেই। বলাবাহুল্য, ভারত সম্পর্কে পাকিস্তানের যথাঅবগতি অতি সামান্য।

◆ আপনি কি মনে করেন পাকিস্তানের জন্মই স্বাভাবিক ছিল না?

∆ আমি তা মনে করি না, যেমন মনে করি না, বাংলাদেশের জন্ম অস্বাভাবিক। আমি মনে করি বীজ ঠিকই ছিল। একইভাবে আমি মনে করি, কংগ্রেসেই বিচ্ছিন্নতার বীজ ছিল। এ অবশ্য আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত। ভারত ভাগ ঘটেছে কংগ্রেস নেতাদের কারণে, তাদের মানসিকতার জন্য। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে যে আচরণ করেছে, বিশেষ করে ১৯৩৬-এ সকল মুসলিম আসনে জয়ী হবার পরে, সে কারণেও। এখানে আমরা একটা লোকায়ত দল দেখছি। চমৎকার ব্যাপার। মুসলিম আসনের দাবিদার হবার পরেও মুসলিম লীগ একটি আসনও পেল না। তখন থেকে কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে মুসলিম লীগের ধারণা খারাপ হয়ে যায়। কংগ্রেস নেতৃত্বের জন্য এ ছিল কিছু করার চ্যালেঞ্জ। আমার বিশ্বাস, জিন্নাহ তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। আমরা সকলেই ওখানকার কথা জানি। তিনি বলেছিলেন, ঠিক আছে, আসুন, আমরা একটা রফা করি। অথচ, তারা সকলে তাঁর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য ঘৃণা করেছিল। তাই বলছিলাম, সব উপাদানের সমাবেশই রয়েছে সেখানে। উপমহাদেশের সকল দুর্ভাগ্যই সেখানে। এ যেন কৃত্রিমভাবে প্রোগ্রাম করে দেয়া 'জিন'-এর বংশগতির, তথা প্রজন্মের ভবিষ্যতের মতো কিছু।

রাও ফরমান আলী

[১৯৭১ সালে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্থান ছিল জেনারেল নিয়াজীর পরেই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ছিলেন তিনি ঘনিষ্ঠ। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী নীতিনির্ধারণে তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন। বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য তাঁকে দায়ী করা হয়। ২৮ বছর পর এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা বললেন জেনারেল রাও কোন বাঙালীর সঙ্গে। তাঁরা এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন রাওয়ালপিন্ডির সেনানিবাসে খুরশিদ আলম রোডে তাঁর বাসভবনে।]

◆ জেনারেল রাও ফরমান আলী, আপনার কাছে আমরা জানতে চাই ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) সেনা অভিযানে আপনি কেমন করে জড়িয়ে পড়েন?

Δ ১৯৬৭ সালে আমাকে ১৪শ ব্যাটালিয়ানের কমান্ডার হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করা হয়। ৬৮-৬৯ মেয়াদে আমি সেনাবাহিনীতে এ পদেই বহাল ছিলাম। এ সময় দেশে সামরিক আইন জারি হয়। এরপর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এর আগে আমার এ পদে ঠিক দু'বছর পূর্ণ হলে আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। এ বদলি ছিল সেনাবাহিনীর রুটিন কার্যক্রমেরই অংশ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে দুই বছরের মেয়াদে স্বীয় পদের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে যেহেতু এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেহেতু সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানে ১০ দিন না কাটাতেই আবার পূর্ব পাকিস্তানে আমাকে নিয়োগ দিয়ে পাঠায়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি (জেনারেল অফিসার কমান্ডিং) ছিলেন জেনারেল মুজাফফারউদ্দিন। তিনি গভর্নরের দায়িত্বপ্রাপ্তও ছিলেন। এখানে আমি বিশেষ করে আবারও বলতে চাই, তিনি ভারপ্রাপ্ত গভর্নর ছিলেন, পূর্ণ গভর্নর নন। আমি পূর্ব পাকিস্তানে কয়েক বছর যাবত উপ-সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে কাজ করি। তখনকার এই সর্বশেষ সামরিক আইনের শাসনের সাথে আমার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। যারা সামরিক বাহিনীর বাইরের লোক তাদের পক্ষে বুঝে ওঠা খুব কঠিন যে, এই সামরিক আইনের প্রশাসনের আওতায় কতকগুলো শাখা

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

ছিল, যেগুলোর কাজের নির্বাহ হতো একান্ত স্বাধীনভাবে। এ শাখাগুলো একজন সামরিক প্রশাসকের আওতায় কাজ করত। এভাবেই তখন কাজ চলত।

◆ তখন সামরিক আইনের প্রশাসন চলছিল, আর আপনি ছিলেন বেসামরিক বিষয়ের দায়িত্বে?

▲ বেসামরিক বিষয় অবশ্যই। সচিবালয় থেকে গভর্নর হাউসে আসত এমন সকল নথিই আমার কাছেই প্রথমে আসত। গভর্নর হাউসে দায়িত্ব পালন করতাম আমি। আমার হাতঘুরে নথি যেত গভর্নরের কাছে। এ নথি বা ফাইলগুলো সাধারণত পূর্ণাঙ্গ নথি। তাতে আমার করার কিছু থাকত না। মাঝে মাঝে আমি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতাম। আমার পর্যায়ে একজন সাধারণ অফিসার হিসাবে যে জেনারেল ভারপ্রাপ্ত গভর্নর হিসাবে কাজ করছেন তাঁর কাছে এ রকম কিছু প্রশ্ন তোলার এখতিয়ার আমার ছিল। জিওসি তথা জেনারেলের কাজ ছিল কম্যান্ড দেয়া, কাজেই বেশ অনেক কিছুর দায়িত্বই আমার ওপর ছিল।

◆ আপনার জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজটি কি আসলে জনগণের নিরাপত্তা ছিল?

▲ ক্ষমতার লীলাখেলার ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজ-কর্ম আমি করতাম না। আমি এই অর্থে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ করতাম যে, দেশকে এক থাকতে হবে, এর সংহতি রক্ষা করতে হবে। এটিই জাতীয় নিরাপত্তা। এর অর্থ আমি পূর্ব পাকিস্তানে নেয়া প্রতিটি পদক্ষেপ বা ব্যবস্থার রাজনৈতিক দিকগুলো দেখাশোনা করতাম। কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি। সে সময়ে সামরিক আইন জারির আগে প্রকৃতপক্ষেই ছাত্ররা রাজনীতি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খানের আমলে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। তাই তখন রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ ছিল না। এ পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতে হয়। ছাত্রদের রাজনীতি অব্যাহত থাকে। আর আমি ছাত্রদের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

◆ ছাত্রদের বিষয়গুলো দেখতে গিয়ে মূলত আপনার কর্মসূচী কী ছিল?

▲ কাজটি ছিল ছাত্রদেরকে সপক্ষে নিয়ে এসে তাদের মন জয় করার। এ কাজটি ছিল ছাত্র সম্প্রদায়ের যত বেশি সংখ্যক সম্ভব সদস্যকে সপক্ষে নিয়ে আসার, শ্রমিকদের বেলায়ও সেই একই কথা প্রযোজ্য। প্রশাসনকে সঠিক অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য আমি প্রচুর সময় ব্যয় করেছি। আমার মতে, এ অধিকার রয়েছে প্রতিটি প্রশাসনের। অনেক সমস্যাই আপনাআপনি ঠিক করে আনা যায়। প্রশাসনের দিক থেকে অনেক কিছু ঠিকঠাক চলে না বলেই হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, আর সে জন্য মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একই পটভূমিতে দেখা দেয় শ্রম সমস্যা। এ সব সমস্যা দেখা দেয় সামরিক আইন জারি হবার আগে। এ সমস্যাগুলোর সমাধানের দরকার ছিল। সে জন্য আমি ছাত্র ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় বসে সব কিছু সমাধানের চেষ্টা করি।

◆ এ সব সমস্যার জন্য ঐ সময় কে দায়ী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

▲ দেখুন, সেগুলো ছিল খুবই জটিল সমস্যা। আপনি যদি শ্রম সমস্যার কথাই তোলেন, তার সাথে জড়িয়ে আছে জনসংখ্যা সমস্যা। আপনি তো আর সবাইকে কাজ বা চাকরি দিতে

পারেন না। কিন্তু যারা চাকরিতে ইতোমধ্যে ছিল, তাদের স্বার্থই তারা দেখছিল। কাজেই একে বলা যায় একটা দুষ্টচক্র। এটি ভাঙা সম্ভব তখনই যখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমবিক্ষোভ দেখা দেয়, ছাত্ররাও এতে শামিল হয়। আর যেমনটি আমি বলেছি, ছাত্ররা এ সবের পথ ধরে একসময় রাজনীতিতে এসে পড়ে। এভাবেই ছাত্ররা কার্যত গোটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে নিয়েছিল। তারা যাচ্ছেতাই করছিল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল বা হলে পুলিশকে যেতে দেয়া হয়নি। ছাত্রাবাস তো দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়েই ঢুকতে দেয়া হয়নি। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটা উঁচু গাছ ছিল। আমরা ওটায় দিনে ৫ বার উঠে পর্যবেক্ষণ করতাম। আর দেখতাম তাদের কর্মকাণ্ড।

◆ তাহলে আপনার এই নিয়োগটা বেশ গুরুত্বপূর্ণই ছিল, মানে আমি এটা বলতে চাইছি, কেননা, আপনি তো ইয়াহিয়া খানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাই না?

∆ সত্যিকার অর্থে ঠিক তা নয়... তিনি আমার সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন না। কেননা, কখনও আমি মদ্যপান করিনি, মাতাল হইনি। সুরা স্পর্শও করিনি কখনও। না, কখনও আমি ঐ দলভুক্ত ছিলাম না। দ্বিতীয়ত, আমি ছিলাম জুনিয়র পদমর্যাদার লোক। আমার পদোন্নতি ঘটে অত্যন্ত দ্রুত। আমি অন্য ছয়জনের আগে জেনারেল হিসাবে পদোন্নতি লাভ করি।

◆ কত দিনে?

∆ ২/৩ বছরের মেয়াদে। আমি ওখানে যাই কর্নেল হিসাবে। পরে ব্রিগেডিয়ার ও তারপর জেনারেল হিসাবে পদোন্নতি পাই।

◆ একে কি আমরা দক্ষতার পরিমাপ হিসাবে ধরব?

∆ এ আমার কঠোর কাজের পরিমাপ। এমনও হতে পারে, আমি নিজের আয়েশ ভুলে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে শুরু করে রাত ১১টা অবধি অক্লান্ত ও কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমি গভর্নর হাউসে থাকতাম। সেখানে হাজারো মানুষের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে। আমি এমন কাউকে ব্যক্তিগতভাবে জানি না, যিনি সেদিনের কথা মনে করতে পারবেন। ওখানে বহু লোক আসত আমার সাথে দেখা করতে। তাই আমি বেসামরিক বিষয়ই দেখতাম। রাজনীতি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এ কাজ করতে গিয়ে প্রায় সকল রাজনীতিককেই চিনতাম। তবে পরের দিকে পরিস্থিতি বদলে যায়...

◆ আপনার বইয়ে সে কথা বলেছেন?

∆ আমি?

◆ জ্বি হ্যাঁ।

∆ না, এ রকম কিছু কখনও আমার জানা ছিল না। এ ধরনের কোন সংস্কার তো ছিল না। তবে আমার এ রকম একটি অনুভূতি ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা তারা যা পেতে পারে তার চেয়ে বেশি দাবি করছে।

◆ প্রশ্নটি অর্থনীতির... আপনি কি অর্থনীতির কথা বলছেন?

▲ না, বরং বলছি রাজনীতির কথা। সত্যিকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কী, তা আমার জানা ছিল না। দেখুন তখন আমি ছিলাম ব্রিগেডিয়ায় পদে। তখনকার দিনে একজন ব্রিগেডিয়ারের যেমন এসব চোখে পড়ার কথা নয়, তেমনি এ সব বিষয় নিয়ে তার চর্চা করারও কথা নয়। আমি জানতাম, কলেজ রয়েছে, অর্থনীতি কলেজ, কৃষি কলেজ। আমাদের কালে আমরা এ সব নিয়ে পড়াশোনা করিনি।

◆ তার অর্থ মূলত আপনি মার্শাল ল' কালচারেরই লোক! মানে আমি বলতে চাইছি, আপনি যদি গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের কথা বলেন, বলেন সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের কথা—তাহলে সেক্ষেত্রে যে জনসমষ্টিকে চিরকালই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে জানেন, তারাই তো পাবে আইন পরিষদের সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন... আর তাই...

▲ জ্বি হ্যাঁ, এ কথাটিই আমি শেষ পর্যন্ত বলতে চেয়েছি, অন্তত উপলব্ধি করেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি মনে করি, আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম, গোড়ার দিকে এগুলো আদৌ আমার চিন্তায়ই আসেনি। কিন্তু যখন ওখানকার পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজ করতে শুরু করলাম তখন আমার গোটা ধারণাই বদলে গেল। এর আগে আমি একজন প্রশাসক ছিলাম মাত্র। নানা বিষয় আসত। আমি সিদ্ধান্ত দিতাম। এরপর যখন পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করল, প্রশাসক হিসাবে তা প্রত্যক্ষ করলাম, যা ঘটে যাচ্ছে, যা গোড়াতে আমি বুঝিনি। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে বলি, আমার ওখানকার দায়িত্বের গোড়ার দিকে ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের একটি শাখা খোলা হয়েছিল। আমি তার উদ্বোধন করেছিলাম। আর সে অনুষ্ঠানে আমি বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। ঐ ভাষণে আমার মনে হয় আমি বলেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানীরা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তবে তখন আমার জানা ছিল না, এক হিন্দু নেতা সেখানে বসে আছেন।

◆ আপনার বইতে আপনি...

▲ এমনকি আমি এও পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারিনি যে গোটা সমাজেই তারা মিশে আছে।

◆ এটাই বাস্তব সত্যি। বাঙালী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কিত যে কোন বই আপনি পড়ে দেখতে পারেন।

▲ আমি পড়েছি। বিষয়টি ছিল কিনা তাতে তা আমি মনে করতে পারছি না। তবে মুসলমান রায়ত, প্রজাদের সংগ্রামের কথা আমি পড়েছি। এদের মধ্যে কৃষক শ্রেণীর লোকেরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়েছে, লড়েছে জমিদারদের বিরুদ্ধে। বাস্তবিকপক্ষে আমার এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ঘটে রংপুর জেলায়। আমি রংপুর, সৈয়দপুর ইত্যাদি শহর পরিদর্শনে গিয়েছিলাম, আরও একটা শহরে গিয়েছি, নামটা কী যেন মনে নেই। ওখানে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে আমার কথা হয়। তাঁকে বেশ সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলেই মনে হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছিলাম কাহিনী। জেনারেল মুজাফফরও ছিলেন সঙ্গে। ঘটনা যে সব জানা গেল তা রীতিমতো জ্ঞানচোখ খুলে দেবার মতো।

◆ ঐ জেলা প্রশাসক কোন পশ্চিম পাকিস্তানী নয় তো?

Δ না, তিনি ছিলেন একজন বাঙালী। সে সময়কার ঘটনাবলীর পটভূমি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান ছিল তাঁর। ঐ সময় স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার ক্রমেই দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি বলতে পারি, যেদিন প্রথমে আমি সেখানে পৌঁছাই সেদিন আমি দেখলাম, লোকটি সঙ্গে পিস্তল রাখে। কখনও বাইরে গেলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না নিয়ে যায় না। অথচ আমি কখনও এ ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নিইনি, এমনকি শেষ দিনটি পর্যন্ত তেমন কিছু আমার সঙ্গে ছিল না। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, ঢাকায় আমিই ছিলাম একমাত্র জেনারেল অফিসার যে কিনা একটি লাল গাড়িতে ঘুরে বেড়াত। গাড়িটি আমি নিজে চালাতাম। শেষ দিন পর্যন্ত আমার কোন এসকর্ট ছিল না, সঙ্গে কেউ ছিল না। কোন অঘটনও ঘটেনি।

◆ অথচ আপনি আপনার বইয়ে লিখেছেন যে, ইতিহাস এক পূর্বনির্ধারিত ও সংজ্ঞায়িত বিষয়। দ্বিতীয়ত যদ্দূর আমার মনে পড়ে আপনি লিখেছেন, ৬৮-৬৯-এ আপনি এক পোস্টারে এক ধুতিপরা লোককে দেখেছেন যার হাতে ছুরি, কিন্তু এখন আপনি যা বলছেন।...

Δ না, আমি তো সে পর্যন্ত এখনও আসিইনি। সে কথায় পরে আসছি। পূর্ব পাকিস্তানে তখন যে ধরনের প্রচারণা চলছিল সেটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি। এ কথাও বাস্তবিকই সত্যিই যে...।

◆ না, এর মর্ম কিছু তো নয়। আমি বলতে চাই, একটা ধুতিপরা লোকের হাতে ছুরি দেখেছিলেন আপনি। কিন্তু কথা হলো এই যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই ধুতি পরে না, লোকটি হয়ত লুঙ্গি পরেছিল। আর এই ধুতি আর লুঙ্গি পরার মধ্যে রয়েছে আসল ব্যাপার। আপনি যদি বলেন, লোকটি ধুতি পরেছিল তার অর্থ দাঁড়ায়, সে ছিল হিন্দু! আমি এখানে যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো, সচেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক একটা সংস্কার আপনার মাঝে রয়েছে যার জন্য আপনি মনে করেন, হিন্দুরা মুসলিম বাঙালীদের প্রভাবিত করছে, হিন্দুরা আসলে ভারতীয় আর এসব কর্মকাণ্ড তাদেরই প্রচার-প্রচারণা এবং প্রভাবের ফল?

Δ ঠিক বলেছেন আপনি।

◆ না, এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, সেনাবাহিনী পূর্ব ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

Δ ঠিক নয়, বরং আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝি ও বিশ্বাস করি যে, হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানের মন-মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে।

◆ আপনার বইয়ে আপনি এও উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তাজউদ্দিন আহমদ হিন্দু চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। আমার মনে হয় এই বিষয় ঐ ধারণারই অংশবিশেষ। আর তাই আপনি ধরে নিয়েছেন জনাব তাজউদ্দিনের পরিবার ছিল...

Δ না, ঠিক তা নয়। তবে তাজউদ্দিন পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন। মুজিব তা ছিলেন না। খোন্দকার মোশতাক পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন না?

◆ তার মানে আপনি বলতে চান, তাজউদ্দিন ছিলেন বাংলাদেশবাদী, বাঙালীর পক্ষ সমর্থক?

∆ না, এ ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু আলাদা। আপনি বাঙালীপন্থী হতে পারেন। প্রত্যেকেরই তাই হওয়া উচিত। যা আলাদা, আমি বলেছি তা হলো তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিলেন। আর সকলে তা চায়নি।

◆ তাই! এ জন্যই কি আপনি তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন আপনার বইয়ে?

∆ অন্যদের তুলনায় তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে সে রকমই আমার প্রবল মনোভাব ছিল; অন্যরা সঠিক পথেই ছিল।

◆ অথচ '৪৭-এর এই সেই বাঙালী জনগোষ্ঠী যারা তখনকার পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিল যাদের মধ্যে আপনি হিন্দুর আধিক্য দেখেছেন, দেখেছেন আমাদের দেশে হিন্দু বেশি, আর এরা যদি হিন্দু প্রভাবিতই হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব তারা পাকিস্তানের প্রস্তাব করত না।

∆ আসলে এ নিয়েই আমি শুরু করতে চেয়েছিলাম। আমার বইতেও আমি কিন্তু বলেছি যে, কী ঘটেছিল যার জন্য পূর্ববাংলার শতকরা ৯৫ জন মুসলমান পাকিস্তানের জন্য ভোট দিয়েছিল। যদি তারা এভাবে কাজ না করত, তাহলে কী হতো? এই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে। তাই পাকিস্তানের এই সৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের চাপিয়ে দেয়া কিছু নয়। বরং পাকিস্তানের হেফাজত করার স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের।

◆ ঠিক তাই।

∆ নয় কি?

◆ কেবল যখন তারা...

∆ কেবল যখন তারা ভাবল যে, সম্ভবত পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাদের সাথে ন্যায্য আচরণ করছে না, ওরা তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলো দিচ্ছে না। এ সব বিষয়ে আমি বাঙালীদের পক্ষে। প্রাপ্য অধিকারগুলোর জন্য তাদের প্রশ্ন তোলার এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান ভাঙার প্রয়াসে আমি তাদের সাথে নেই। আমার ধারণা ও চিন্তায় আমি মনে করি তাদের কাজটা ঠিক হয়নি। এর কারণ, আপনারা বোধকরি জানেন যে, উপমহাদেশে পাকিস্তান আন্দোলনের পুরো সময়েই পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তাটুকু পূর্ব পাকিস্তানীরাই পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় বেশি উপলব্ধি করেছিল; পাকিস্তান যারা সৃষ্টি করেনি—সেই পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তানীরা তা করেনি... ভারতের মুসলমানরাও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বোঝেনি।

◆ আপনি কি মনে করেন না যে, পাকিস্তানের জন্য সকলের যে অনুভূতি, সেক্ষেত্রে বাঙালীদের ন্যায্য অনুভূতিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে? এর কারণ দেশের বনেদী শাসকগোষ্ঠীও ছিল সেনাবাহিনীর ভিতরেই যারা পাকিস্তানের ঠিকাদারী নিয়েছিল। তারাই ঠিক করেছিল, পাকিস্তানকে কেমন করে চালাতে হবে। আর সে কারণে ক্ষমতার সেই কাঠামোর মধ্যে বাঙালীদের জন্য কোন জায়গা ছিল না। আমি এ কথাই বলতে চাচ্ছি, বাঙালীদের মাঝে শোষবঞ্চনের ধারণা ও জ্ঞানের বিষয়টির কি কোন যৌক্তিকতাই ছিল না?

∆ ঠিক, তাদের ঐ ধরনের চিন্তাভাবনা একান্তই সঠিক ছিল। আমি এর পরও বলি, তাদের সে অধিকার ছিল, তাদের শাসনের অধিকার থাকা উচিত ছিল কিংবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে ক্ষমতা তাদেরকেই দিতে হবে। আমি তখনও এটি মনে করতাম, এখনও করি। এ দু'টি জিনিসের মধ্যেকার পার্থক্য হলো, আমার মতে এই যে, যে কোন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর তাদের নিজ অধিকার চাইবার বৈধতা আছে। তা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তারা যে কাঠামো (রাষ্ট্র কাঠামো) নিজেরা তৈরি করেছে তা ভাঙা অর্থাৎ পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলা সঠিক নয়; যদিও ধারণার অমিল হতেই পারে।

◆ ঠিক!

∆ আমি বলি, পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তান ভাঙেনি, ভেঙেছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। তবে আমি মনে করি এর মধ্যেও বাস্তবতা আছে যে, উভয় তরফের ভুলের কারণে পাকিস্তান ভেঙেছে। পূর্ব পাকিস্তান কিছু ভুল করেছে, পশ্চিম পাকিস্তানীরাও ভুল করেছে। আর দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু অন্যায় বা ভুল করেছে যা পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ঠিক ছিল না। আমি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে বিষয়টি খোলাসা করে বোঝাতে পেরেছি। আমি যে লক্ষ্যের কথা বলেছি, আশা করি তা আপনাদের কাছে এখন পরিষ্কার।

◆ বুঝতে পেরেছি। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। আপনার কথামতো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অনুভূতি যদি অন্যায় না হয়ে থাকে, তাহলে তার পিঠে তাজউদ্দিনের কথাও এসে যায়। তিনি একই অনুভূতির কথা বলেছিলেন, একই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ছিলেন। তাই ছিলেন না-কি তিনি? তাহলে আপনি কেমন করে...।

∆ আপনারা তো জানেন, আমিও জানি—আমি একান্ত সুনিশ্চিতভাবেই জানি, মুসলিম লীগই হোক আর আওয়ামী লীগই হোক—এ সব দলে তিন শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব ছিল। আওয়ামী লীগে শেখ মুজিব ছিলেন নেতা, খোন্দকার মোশতাক ডানপন্থী ছিলেন বলা যায়। আবদুস সামাদ আজাদ ছিলেন সমাজবাদী গ্রুপের নেতা। তিনিও ছিলেন আওয়ামী লীগে। তাজউদ্দিনও ছিলেন। এঁরা সকলেই পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার চেয়েছিলেন। কিন্তু যে পার্থক্যের কথা আমি উল্লেখ করেছি তা হলো—উল্লিখিত দুই গ্রুপ খোন্দকার মোশতাক ও শেখ মুজিব ঐ সব অধিকার চাইতেন এক পাকিস্তানের আওতায়। আর তাজউদ্দিন সেগুলো চাইতেন পাকিস্তানের আওতার বাইরে। অধিকারগুলো একই কিন্তু তিনি সেগুলো চাইতেন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ হিসাবে। এখন পাকিস্তান ভেঙে সেই বাংলাদেশ হয়েছে। এ স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছেন তাঁরা। তাই আমার মতে, বাংলাদেশে কেউ কেউ বলছেন, আমরা এ রকমটি হতে চাইনি। বাংলাদেশে আমরা যা পাচ্ছি না, বাংলাদেশ না হলে বরং কিছুটা হলেও পেতাম। ওদের অভিযোগ এখন ঢাকার বিরুদ্ধে। কিন্তু এ নিয়ে ওরা ইতস্তত মনোভাব নিয়ে এগিয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যা ঘটছে তা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

◆ আপনার কল্পনা ও অনুমান আমরা বুঝতে পারি। এও অনুমান করতে পারি, আপনি আমাদেরকে ২৫ মার্চ সম্পর্কে বলতে পারেন। আপনি আপনার বইতে লিখেছেন, ১৯৭০-এর জুনে—আমি রীতিমতো কালপঞ্জিও মনে রেখেছি—লিখেছেন, জামায়াতে ইসলামীর মতো

ডানপন্থী দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে টাকা-পয়সা ও অন্যান্য মদদ দিয়েছেন আপনারা। ওদেরকে সাহায্য করেছেন।

∆ না, আমি কোন টাকা-পয়সা বিলিবণ্টন করিনি।

◆ তাহলে ওদের মদদ দিয়েছেন?

∆ ওদেরকে আসন পেতে সাহায্য করেছি, এক সাথে কাজ করেছি।

◆ ঐ নির্বাচন তো ছিল সাধারণ নির্বাচন। আমি বলতে চাই, ওরা নির্বাচন করছিল যাতে করে...

∆ আমি শেখ মুজিবকে ব্যাখ্যা করে বলেছি, এটি কোন রাখঢাকের ব্যাপার নয় যে, আমি ডানপন্থী দলগুলোকে সাহায্য করেছি। এর উদ্দেশ্য ছিল একটা যুক্তিসম্মত মনোভাব দেখানোর অবকাশ করে দেয়া মোশতাক ও মুজিবের জন্য। এখন মনে হয় মুজিব যদি ২০ বা ৩০টি আসন কম পেতেন ও তিনি আমাদের কাছে আন্তরিকভাবে সৎ থাকতেন, তাহলে তিনি হয়ত বলতেন আমি পাকিস্তান ভাঙব না, আমি সহযোগিতা করব। কেন্দ্রে সরকার গঠন করব যা হবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

◆ তাহলে ওটাকে টেক্সাস সমঝোতার মতো কিছু একটা বলতে হয়?

∆ ঠিক ধরেছেন আপনি। কথা ছিল সেটি তিনি করবেন ও ছয় দফার সংশোধন করে তা নমনীয় করে তুলবেন। কেননা, ওটা কোন কোরানী কানুন তো ছিল না। ৬ দফা আর যাই হোক বেহেস্ত থেকে আসেনি। আর এও আমাদের জানা ছিল, আওয়ামী লীগের ভিতরেই কিছু লোক ছিল যাদের মধ্যে ছয় দফার বিষয়গুলোর ধারণা নিয়ে মতাপার্থক্য ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মুজিব যদি কম ভোট পেতেন তাহলে তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবেই সব কিছু করার অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত সুযোগ পেতেন। কিন্তু কল্পনাতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেলেন তিনি। মাত্র দু'টি আসন হারাতে হয় তাঁকে। আর এর পরিণতিতে তিনি ৬ দফার দাবিদারের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন। কাজেই ছয় দফার প্রশ্নে সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর রইল না। ৬ দফা চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠল। এটি হয়ে গেল মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন—এ জাতীয় অনিবার্য কিছু। অথচ রাজনীতিতে লেনদেনমূলক আলাপ-আলোচনা চলছিল; সুতরাং এমন সময়ে এটি হওয়া উচিত ছিল না। আর যুগপৎ আমি ভুট্টোর বিরুদ্ধে কী বলেছিলাম তাও আপনাদেরকে জেনে রাখার অনুরোধ জানাব। কাজেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমাকে অনেকটা নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হয়েছিল। আমি তাদের সমালোচনাও যেমন করিনি, তাদের প্রতি সমর্থনও জানাইনি। আমি বৈঠক-আয়োজনের চেষ্টা করেছি ও সব পক্ষকে বলেছি, আপনারা একত্রে আলোচনায় বসুন। তারা আসলে কারা? তারা পূর্ব পাকিস্তানী তো বটেই; ওরা পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ ছিল না।

◆ আপনি ডানপন্থীদের কথা, নূরুল আমীনের কথা বলছেন? গোলাম আযম?

∆ ওরা সকলেই ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। তাই এ ধরনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটের একটা সমাধান আমরা খুঁজে পেতাম। শেখ মুজিবের দল যদি সকল আসন না পেত তাহলে আমরা তাঁকে চাপ দিতে সক্ষম হতাম।

◆ তাহলে আপনারা দেখলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন না, সরকারের কর্তব্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া? তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না?

Δ আপনার বক্তব্য যথার্থ নিঃসন্দেহে।

◆ তাহলে তারপর কী ঘটে গেল?

Δ অন্তত আমার তরফ থেকে আমি বলতে পারি, আমি তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখতে চেয়েছিলাম, এমনকি শেখ মুজিব জেলে থাকার পরে ঐ সময় অন্য কেউ একজন প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। সে কথা আমি জেনারেল ইয়াহিয়াকে বলেছিলাম...

আমার ধারণা ছিল নির্বাচনের পর বিভিন্ন দফা নিয়ে কিছু সমঝোতার পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে, কিন্তু বাস্তবে তার বদলে দেখা গেল সমঝোতা নয় সংঘাত শুরু হয়েছে। ঐ সময় থেকে উভয় তরফের মনে সুগভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে। শেখ মুজিব ভুট্টোকে বিশ্বাস করেননি। ভুট্টো বিশ্বাস করেননি শেখ মুজিবকে। আমার তো মনে পড়ে শেখ মুজিব নিজে আমাকে বলেছিলেন—সে কথা আমি আমার বইয়েও লিখেছি—সেই রাতে ভুট্টো শেখ মুজিবের দাবি প্রত্যাখ্যানের পর আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনাদের দু'জনের আলোচনা কী হলো?

◆ এ সাক্ষাৎ প্রথম কোথায় ঘটে?

Δ আমাদের সাক্ষাত ঘটেছে।

◆ প্রথম সাক্ষাতে ওরা কি মিলিত হয়েছিল?

Δ তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন ১২ জানুয়ারি।

◆ জনাব ভুট্টো ও জেনারেল ইয়াহিয়ার মধ্যে কী ঘটেছে বা কী সমঝোতা হয়েছে সে ব্যাপারে কি আপনি জানতেন?

Δ না।

◆ আপনি তথাকথিত লারকানা পরিকল্পনার কথা জানতেন? আপনার মতে, কখন এসব ঘটছিল?

Δ আমি এর কিছু জানতাম না। জেনারেল ওমর আমাকে এ সম্পর্কে সামান্য ছিটেফোঁটা জানিয়েছিলেন। তাই আমি সরাসরি যা জানতাম শুধু সে সব কথাই আমার বইয়ে লিখেছি।

◆ ঠিক আছে, পরে জেনারেল ওমর আপনাকে কী বলেছিলেন?

Δ তিনি আমাকে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ঢাকা থেকে ফেরার পর তাঁরা লারকানায় যান। এর আগে ঢাকায় জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিব হবেন পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। তবে লারকানায় ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেন, আপনি তো মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, আমি নই, জনসাধারণই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করেছে। পরে কিছু কথাবার্তার পর তিনি তাঁকে বলেন যে, মুজিবের স্বদেশপ্রেম যাচাই করতে হবে আর সে যাচাই পরীক্ষাটি হবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। এতে যদি তিনি প্রতিক্রিয়া

দেখান তাহলে তিনি দেশপ্রেমিক নন, যদি না দেখান, তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি। আমার লেখা বইতে আমি সম্ভবত উল্লেখ করেছি যে, যদি বিপরীত পরিস্থিতি যাচাই হিসাবে আসত তাহলে কী ঘটত সে সম্পর্কে আমি ঐ সময় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বলেছি...।

◆ তাঁর প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

∆ দেখুন, আপনি যখন মানে কাজ করেন...

◆ গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে...?

∆ কিংবা বলুন রাজনীতি। তখন নানা দিক থেকে চাপ ছিল। তাঁর ওপর জেনারেলদের চাপ এত প্রবল ছিল যে, তিনি কার্যত আমাকে বলেই ফেলেন যে, দ্যাখো, আমি আমি পশ্চিম পাকিস্তান চললাম। তবে আমার ধারণা, আমি বোধহয় একটা চরম অবস্থায় পৌঁছেছি। এ কথা বলছি কেননা, ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হবার খায়েশ প্রকাশ করেছিলেন অথচ দেশ একটা। দু' জনে প্রধানমন্ত্রী হতে হলে দুটো দেশ দরকার। তিনি নিজে এক মার্কিন সাংবাদিকের কাছে দুই প্রধানমন্ত্রীর কথা বলেছিলেন। আর পরে সে কথা অস্বীকার করেছিলেন।

◆ কে? জনাব ভুট্টো?

∆ জনাব ভুট্টোই বলেছিলেন এবং পরে তিনি সেটি অস্বীকার করেছিলেন। এ ঘটনা বেশ অনেকটা গোড়ার দিকে ঘটে। কিন্তু এটিই তখনকার চিন্তা-ভাবনায় দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ শান্তি সমঝোতার বদলে মোকাবিলা, সংঘাত শুরু হয়ে যায়। আমি আমার স্মৃতিচারণে আরও কিছুটা পিছনে চলে যাচ্ছি—যখন মুজিব বিবৃতি দিয়েছিলেন, ভুট্টোও একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন আর এভাবে বিবৃতির পিঠে বিবৃতি দেয়া চলতে থাকে। মুজিবের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তাঁর তেমন বাধ্যবাধকতা বা দায় ছিল না। তিনি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভুট্টো যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন সেটি বোধহয় তাঁকেই সাজে। দেখুন, একজন রাজনীতিক স্বাভাবিকভাবে যা করেন তিনি তাই করেছিলেন। তাঁর জায়গায় আপনি... কিংবা পুরনো আমলের মুসলিম নেতাদের কথাই ভাবুন। তাঁদের পক্ষেই এ রকম মনোভাব সম্ভব। তাঁরা মুজিবকে স্বীকার করে নিতে পারলে ল্যাঠাই চুকে যেত। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নিজ দলকে বাঁচিয়ে রাখতে। একটা কিছুর জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জিইয়ে রাখতে না পারলে এ দল ভেঙে যাবার ঝুঁকি থাকে; তাই নেতাকে আক্রমণাত্মক হতে হয়। ভুট্টো এ কাজটি করতে গিয়েই বাড়াবাড়ি করে সীমা অতিক্রম করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হাম ইধার, তুম উধার। না হলে আমি যাকে পাব, যা কিছু পাব টুকরো করে ফেলব।' আমার ধারণা... যা বলতে চাচ্ছি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। যদি না করে থাকেন, আমাকে আরও বলতে হবে।

◆ না। বলতে হবে না।

∆ তাহলে দেখুন, আপনারা বিষয়টি ধরতে পেরেছেন। ভুট্টো ও মুজিব উভয়েই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের ওপর একটি চাপ ছিল, তা হলো তিনি তাঁর ৬ দফার

সপক্ষে বিপুল ভোট পেয়েছিলেন আর সেই পটভূমিতে তিনি যা অঙ্গীকার করেছিলেন তাতে তাঁকে আঠার মতো লেগে থাকতে হয়েছিল। নির্বাচনের পরপরই আমি তাঁর সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলাম। এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান টোব্যাকো কোম্পানির এক কর্মকর্তার বাসায়। ঐ বৈঠকে আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। এ রকম কঠিন কাজে আসার আগে আভাস তেমন পাওয়া যায় না। তাই যতটুকু জানার, পাওয়ার... আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, তাহলে তখন আপনি কী করবেন? তিনি জবাব দিলেন, একটি মুদ্রা বা কারেন্সিই রাখব। আমি বিষয়টাকে খোলাসা করার চেষ্টা করি। আমাদের আলোচনা খুবই চমৎকার হয়। বাস্তবিকপক্ষে আমরা দু'জন পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠি। এরপর আমি তাঁকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যাই। তখনকার দিনগুলোতে, আপনারা জানেন, লোকজন সর্বদাই আতঙ্কিত। কেউ যখন এসকর্ট বা প্রহরা ছাড়া তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে রাজি ছিল না। তাই আমি নিজে একটা ছোট কারে করে তাঁকে তাঁর বাড়িতে ছেড়ে আসি। তাঁর বাড়িতে সময় কাটাইও কিছুক্ষণ। সে কারণে এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ তাঁর মনে আমার সম্পর্কে তৈরি হয়েছিল। আমি এখনও মনে করি, তিনি ভুল করেননি। তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চাচ্ছিলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন এ নিয়ে আমার সাথে তর্কবিতর্ক করেছে।

◆ কাজেই যেভাবে হোক আলোচনা ব্যর্থ হোক সেটিই ছিল ইচ্ছা। আর এভাবেই কি আপনি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চান?

Δ আলোচনার ব্যাপারে ইয়াহিয়া যদ্দূর জড়িত, সে সম্পর্কে এ কথা বলা যায়, তিনি প্রথমে আলোচনা বৈঠকের জন্য ১৬ মার্চ ঠিক করেন বলেই আমার মনে পড়ে। আমার সঙ্গে আলোচনায় দুই ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এক, আমি নিজে আর দুই, বিমানবাহিনীর অফিসার মাসুদ, '৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের বীরনায়ক। আমরা ঐ আলোচনা বৈঠকে কোন কথা বলিনি। জেনারেল শাহ্ আলী কিছু বলছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে বলেছিলাম, স্যার, এমন এক নীতি অনুসরণ করা ঠিক নয় যাতে পূর্ব পাকিস্তান আমাদের ছেড়ে যায়। আমরা তখন "ভেঙে যাওয়া" শব্দগুলো ব্যবহার করিনি।

◆ আপনি কুসংস্কারের ইঙ্গিত দিচ্ছেন?

Δ আর তিনি বললেন, জাতির জনক (মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ) জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি ছিলেন। আমি তখন সেটি মেনে নিইনি। এখন এসব থেকে একান্তই পরিষ্কার যে, জেনারেল একটি রফা মেনে নেবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে... আমার ধারণা কোন রকমে একটা সমাধানে উপনীত হয়েছিলেন। আমি ১৯ মার্চের সন্ধ্যায় মুজিবকে টেলিফোন করে জানতে চাইলাম, ভাই কুছ হুয়া? আপনারা জানেন, মুজিবের সাথে আমার বন্ধুসুলভ সম্পর্ক ছিল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী হব, পাঞ্জাব থেকে কয়েকজন মন্ত্রী হবে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে হবে পাঁচজন। আমি বললাম, খুবই খুশি হলাম শুনে। কিন্তু পরের দিন সকালে সেখানে ভুট্টোর উদয় হলো, তিনি সব কিছু ভেঙেচুরে মিসমার করে দিলেন।

◆ এ ঘটনা ২০ মার্চের।

Δ ঠিকই ধরেছেন। তিনি বললেন, আপনারা সামরিক আইন তুলে দিতে পারেন না। তাহলে পাকিস্তান ফেডারেশনকে আর একত্রে রাখা যাবে না। তখন দেশে কোন শাসনতন্ত্রও ছিল না। সামরিক আইন তুলে দেয়ার ব্যাপারে এ ছিল ভুট্টোর আপত্তি। একই বছরের নভেম্বরে, ভারতীয় আক্রমণ শুরুর ঠিক আগে লাহোরে ইয়াহিয়ার সাথে দেখা হয়। ওখানে পিপলস পার্টি তাঁকে এক সামরিক আইন আদেশের আওতায় এ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানায়। আমি বললাম, দেখুন, ওরা কীভাবে বদলে গেছে? এ কাজটিই কি এক বছর আগে করা যেত না? এ অবস্থায়, আমি যদ্দূর মনে করতে পারি, পূর্ব পাকিস্তানের বহু লোকের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। তাতে দেখতে পাই এমন একটা ধারণাই শেকড় গাড়ছে যে, সিঙ্গাপুর স্বাধীন থাকতে পারলে বাংলাদেশ কেন স্বাধীন দেশ হিসাবে টিকে থাকতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানেও তখন একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত তখন এ রকম একমত প্রকাশ করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেললে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর বাস্তবসম্মত ও টেকসই হয়ে উঠবে। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা কমিশনের মাথাতেও ছিল। কাজেই এ রকম বহু ধরনের বিষয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে ঢুকে পড়ে। আর তার পরিণতিতে জনসাধারণ যৌক্তিক বিচার-বিবেচনার বিষয়টি বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় আবেগানুভূতি অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠে। আমি আমার বইয়ে এ অবস্থার উল্লেখে বলেছি, এমনও একটা সময় আসে, কেউ কেউ বলতে থাকে ঐ হারামজাদাকে আমরা আমাদের ওপর শাসন চালাতে দেব না। এ কথার জবাবে আমি বলেছিলাম, ওরা যদি হারামজাদা হয় তাহলে ওদের কাছে আমরাও হারামজাদা। আমি আরও বলেছিলাম, আমাদের সামনে একটা আশার সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে। অনেকে সে ধরনের আশাবাদীও ছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে পশ্চিম পাকিস্তানে এমন লোক ছিল যারা পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ ভাবত।

◆ হ্যাঁ, পূর্ব পাকিস্তান একটা দায় বোঝা!

Δ হ্যাঁ, সেটি এখনও ভাবা হয়। তবে প্রশ্ন, তাহলে কেন আমরা এখনও বলি আমরা পূর্ব পাকিস্তান হারিয়েছি? বরং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে হারিয়েছে। কেননা ওরাই তো আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

◆ জেনারেল আমরা আপনাকে ২৪, ২৫ ও ২৬ মার্চের কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। কখন 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কেন করা হয়েছিল?

Δ প্রকৃতপক্ষে ওটা ছিল ১৯ মার্চে, আলোচনা বৈঠকের পরে। আমি সব কিছুতে তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু ২০ তারিখে এসে আমাদের এ রকম একটা উপলব্ধি জন্মায় যে, কোন কোন জায়গায় ভুল হয়েছে। ২৫ মার্চেই আমার ধারণা অপারেশনের শুরু। এটাকে বাংলাদেশ দিবস বা অন্য যা কিছুই হোক ধরা যেতে পারে।

◆ ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস।

Δ ২৩ মার্চের পাকিস্তান দিবসে আমার মনে হয় মুজিব এসেছিলেন একটা বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে। ঐ দিন তাঁর বাড়ির সামনে এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব ঐ কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন এবং বলা যায়, বাংলাদেশ

ঘোষণা করেন। কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের হাতে এমনকি আমাদের সদর দফতরে তেমন কোন তথ্য ছিল না।

প্রেসিডেন্ট হাউসে আলোচনা চলছিল নিজস্ব কায়দায়। ওখানে ছিলেন, আমার যদ্দূর মনে পড়ে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, জনাব পীরজাদা, কর্নেল ইলিয়াস, জনাব আহসান, জনাব হামিদ এবং আরও ২/১ জন। কিন্তু তাঁরা সকলে সব কিছু গোপন রেখেছিলেন। আমি ও জিওসি এ সবের বাইরে ছিলাম। আমাদের হাতে কোন কাজ ছিল না। আমরা গভর্নর হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। জেনারেল খাদেম হোসেন রাজাকে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। আমরা প্রেসিডেন্ট হাউসে কী হচ্ছে তা জানার জন্য জেনারেল টিক্কাকে বলি। কেননা ওখানে কী হচ্ছে তার বিন্দুবিসর্গ আমাদের জানা ছিল না। শুধু আমরা এ টুকুই জানতাম, একটা কিছু গোলমাল কোথাও হয়েছে। সে কথা আমি আমার কতাবার্তায়ও বলেছি। অন্তত আবছা হলেও গোলমালের আভাস পেয়েছিলাম, তাই টিক্কা সেখানে গেলেন। ফিরে এসে তিনি জানালেন, একটা কিছু গোলমাল হয়ে গেছে, দরকষাকষির আলোচনা ভাল চলছে না। সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা কিছু করতেই হবে। ঐ দিন কী ঘটছিল... আমাদের ফিরে যেতে হবে—তারিখ বদলানো হলো, ঘোষণাও দেয়া হলো, ঢাকায় একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গেল। আমরা পুরনো ঢাকার নওয়াবগঞ্জে লোকজনকে হত্যার খবর পেলাম। সেখানে সেনাবাহিনী পৌঁছে গেছে। ওখানে একটি বড় আকারের সমাবেশ হয়। আর ঐ সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ সরকার চালাবে। তাজউদ্দিন কার্যত সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। তিনি ব্যাংক ও কার্যত সকলের প্রতি নির্দেশ জারি করলেন। সেনাবাহিনী তখন ব্যারাকের মধ্যেই ছিল। এমনকি তারা সেনানিবাসগুলোর বাইরে যেতে পারছিল না, হাটবাজার থেকে কিছু কিনতেও পারত না। কোন ঠিকাদারও সেনাবাহিনীকে এমনকি সবজি পর্যন্ত সরবরাহ করত না, সরবরাহ আনতে হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। আর পূর্ব পাকিস্তানের সকলের ধারণা ছিল যত জাহাজ আসছিল, প্রত্যেকটি ভরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনা হচ্ছিল; অথচ বাস্তবিকপক্ষে এগুলোতে আলু-পিঁয়াজের মতো রেশনসামগ্রী আনা হচ্ছিল। এ জাহাজে বলতে গেলে...।

◆ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানে সৈন্য আনা হয়নি?

▲ ২৬ মার্চ...

◆ ২৬ মার্চের আগে পূর্ব পাকিস্তানে ৯০ হাজার সৈন্য ছিল... ক্রমে ক্রমে কি সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল?

▲ না, এটি একেবারেই এক আলাদা প্রশ্ন। ২৬ মার্চে প্রথম ব্যাটালিয়ন সৈন্য পৌঁছায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। ২৫ মার্চের পর।

◆ তাহলে এখন আপনি আমাদেরকে "অপারেশন সার্চলাইট"-এর বিস্তারিত পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ বলতে পারেন। এর যে টার্গেট বা লক্ষ্য ছিল তার উদ্দেশ্য হলো...

▲ উদ্দেশ্যের কথাই বলি। পরিকল্পনাটি প্রণীত হয় বেশ কিছু সময় ধরে। এতে নিরূপণ করা হয় কী ধরনের অভিযান সফল হবে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, অমৃতসরে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ চালায়। ঐ আক্রমণে তারা ট্যাঙ্ক, মর্টার, কিংবা যা পারে তাই

ব্যবহার করে। শুধু তারা ঐ অভিযানে বিমান ব্যবহার করেনি। তারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ভাঙতেও সক্ষম হয়—এ জন্য যে সেখানে একটা প্রতিরোধ ছিল। যখন সেনাবাহিনীকে নামানো হয় সেনাবাহিনীর কাজ আর বেসামরিক ব্যাপার থাকে না। ঐ অবস্থায় সেনাবাহিনী সফল হয় বা হবার চেষ্টা করে। আর সেটি সাধারণত পা টেনে টেনে ধীরগতিতে একটা সময় নিয়ে চলে না। পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সময় সান্ধ্য আইন, সামরিক আইন সব কিছুই তাদের কার্যকারিতা হারিয়েছিল। কেউ সামরিক আইন মানছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে সরকার নামক ব্যবস্থা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

তা আমরা ৭ মার্চের কথায় চলে এসেছি। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়। আর পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর জন্য একেবারেই ভিন্ন ছিল। সেনাবাহিনীকে আরেক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। আমরা আবেগানুভূতির বিষয়টি বিবেচনায় না এনে, আমার মতে, ভুল করেছি। আমরা সেনাবাহিনীর অনুভূতি বুঝে উঠতে পারিনি। ফলে যা ঘটছিল তা হলো, বহু জায়গায় তাদের মারধর করা হচ্ছিল, সেনা অফিসারদের লাঞ্ছিত করা হচ্ছিল। ওরা বাইরে বেরুতে পারছিল না। ফলে ক্ষোভ-ক্রোধ মিশ্রিত আবেগ-উত্তেজনা পুঞ্জীভূত, ধূমায়িত হয়ে উঠছিল—আমরা এমন এক সরকারের সেনাবাহিনী, আমরা এমনকি বাজার থেকে মাংসও কিনতে পারব না! এ অবস্থায় পরিকল্পনা ছিল একেবারে সোজা। আমরা কারফিউ বসাব, আর আমরা গিয়ে নেতাদের গ্রেপ্তার করব।

◆ এর আগে আপনি বলেছেন, ১৯ মার্চ ভুট্টো আপনাদের বলেছিলেন, সব সমস্যার মিটমাট হয়ে গেছে...।

∆ ভুট্টো বলেননি, বলেছিলেন মুজিব।

◆ ভুট্টো নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছিলেন।

∆ কিন্তু তিনি তা করেননি। ইয়াহিয়া খান সম্মত হলেও ভুট্টো সম্মত হননি, ভুট্টো এসেই তো...।

◆ ইঙ্গিত দিলেন, আর তাতেই ...।

∆ বেশ, সেটিই ধরুন না, কেননা, পাকিস্তানে ফিরে আসার পর ভুট্টোর সাথে আমার দেখা হয়। এর আগে আর কখনও তাঁর সাথে আমার দেখা হয়নি। আমি পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে ভুট্টোর সাথে দেখা করার জন্য এক ব্রিগেডিয়ার ছিল অতি নগণ্য। তাঁর সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। তাই যা বলছিলাম, সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। দ্বিতীয় দিন আমি বলব, ঢাকার অধিবাসীরা পরিস্থিতির জন্য ভাল রকমে তৈরি ছিল। এই তৈরির ভাব ছিল ৭ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত। অসামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার সব কিছুই ছিল। এরা সকলেই ঐ সময় সরকারের কমান্ডে ছিল। এই সরকার কোন ঘোষিত সরকার না হলেও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। রেডিও স্টেশন দখল করে নিতে যাচ্ছিল এ সরকার। রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িঘরগুলো চিহ্নিত করা হয়েছিল। অন্যান্য কাজও সারা হয়েছিল। সৈন্যদের তল্লাশি পরিকল্পনাও দেখানো হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতাদেরকেই কেবল গ্রেফতার করার বিষয় স্থির হয়েছিল, যাতে কোন জনগোলযোগ হাঙ্গামা বেধে না

যায়। কিছুই না ঘটে। তবে সন্ধ্যার পর রাত ১১টার দিকে ইয়াহিয়া চলে যান। সূর্যাস্তের পর তখনও ভাল করে আঁধার ঘনায়নি, তখন ইয়াহিয়া একটি ছোট্ট কারে বিমানবন্দরে পৌছান ও ২৫ মার্চের সে রাতে ঢাকা ছেড়ে যান। তবে তিনি জানতেন না যে, এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার ঐ সময় বিমানবন্দরে ছিলেন। আমার ধারণা, তিনি পরের দিকে এসেছিলেন, তিনি ঐ সময়ে শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কথা জানান। ঐ সময় শেখ মুজিবের বাড়িতে আওয়ামী লীগের বৈঠক চলছিল। আমাদের ধারণা ছিল, আমরা গিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করব। কাজটা সোজা আর সহজ দুই-ই হবে। তবে এর আগে আমি কিছু কথা বলে নিতে চাই। এসব আলোচনা যখন চলছিল তখন সেনাবাহিনীর জনসংযোগ অফিসার সিদ্দিক সালিককে আমি একটা কাগজ দিই। সিদ্দিক সালিক ছিলেন লিয়াজোঁ অফিসারও। তিনি গভর্নর হাউসে যাচ্ছিলেন। ঐ কাগজে আমি দুটো ত্বরিত কার্যকৌশল বা কার্যব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলাম। বলেছিলাম, ক্ষমতা বা শক্তি থাকতে হবে তবে একটা রাজনৈতিক সমাধানও দিতে হবে। এগুলো করুন, রাজনৈতিক সমাধান দিন। এগুলো করতে হবে অনতিবিলম্বে আমাদের তালিকার লোকগুলোকে গ্রেফতারের পরপরই। প্রেসিডেন্টকে সেখানে গিয়ে ঘোষণা করতে হবে যে, ছয় দফার বদলে পাকিস্তান পিপলস পার্টির আট দফা মেনে নেয়া হবে। আপনারা হয়ত জানেন, এ ছয় দফা-আট দফা—এগুলো কার্যত একই—শুধু পার্থক্য এই যে, একটি খুবই চরম ও অন্যটি বেশ মৃদু। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একই রকমের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যসাধক। তাই যখন সামরিক আইন সদর দফতরে শেখ মুজিবকে নিয়ে কী করা যাবে—এ আলোচনা চলছিল তখন আমি প্রস্তাব দিই যে, তাঁকে হত্যা করা উচিত হবে না, কেননা, এসএসি তাঁর বাড়িতে হানা দিতে যাচ্ছে। এতে ওরা খুশিই বোধ হলো। আমি বললাম, শেখ মুজিবকে হেফাজতে নিতে হবে, তারপরে এ কথা বললাম, ঘোষণা করতে হবে, আমরা তাঁকে হেফাজতে নিয়ে চরমপন্থীদের থেকে আলাদা করেছি। তবে তাঁকে জনসাধারণ থেকে আমরা আলাদা করিনি। আলাদা করেছি সেই সব লোকের কাছ থেকে যারা স্বাধীনতা চায়। প্রস্তাবের প্রথমাংশে শেখ মুজিবকে হত্যা করা যাবে না—এটি গৃহীত হয় কিন্তু একই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে—যুগপৎ একটি রাজনৈতিক সমাধানের কথা ঘোষণা করতে হবে—এটি গৃহীত হয়নি, বাস্তবায়িতও হয়নি। আমার মনে হয় না যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আদৌ এ প্রস্তাব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন বা সেজন্য সময় দিয়েছিলেন। কেননা তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। এখন এরপর আমি ও জিওসি দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আর সকলে অন্য পক্ষে অবস্থান নেয়। আমাদেরকে হয়রানিতে পড়তে হয় এ কারণে। এরপর আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে চাই। জেনারেল হামিদ ও জেনারেল খাদেমের ওখানেও যাই। আমরা দু'জন একত্রে ছিলাম, এ কারণে যে, আমি গভর্নর হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। ওরা আমাদের জানাল, আমরা সামরিক ব্যবস্থা নিতে ভয় পাচ্ছি। আমরা দু'জন—আমি ও খাদেম এই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধী ছিলাম। আমাদের স্ত্রীদেরও এ সব কথা ওরা জানাল যে, আমরা সামরিক ব্যবস্থা নিতে চাই না। আমি বললাম, স্যার, আমি আমার জীবনের জন্য ভীত নই, আমি পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রশ্নে উদ্বিগ্ন। কেননা এসবের পর আর পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকবে না। এ সব কাজ করলে একদিন একই সত্তার পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন তুমি এ সবে ছিলে? এখন

আমরা সামরিক অফিসার হিসাবে পদত্যাগ করতে পারি না। সাহেবজাদা ইয়াকুব এ কাজটিই করে 'বদনাম' কুড়িয়েছেন আর বহু দিন তাঁর সবকিছু কুয়াশাবৃত অস্পষ্ট ছিল। এমনকি এখনও এমন লোক আছে যে, তাকে 'কাপুরুষ' মনে করে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি তা ছিলেন না, তাঁর একটা দৃঢ়, স্বকীয় বিশ্বাস ছিল, থাকতেও পারে। কিন্তু আমরা যা বিবেচনায় রেখেছিলাম তা হলো—ধরুন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রকৃত যুদ্ধে এমন এক অবস্থানে আক্রমণ চালানোর জন্য আদেশ দিচ্ছি যে আক্রমণ বা যুদ্ধে আমি জানি প্রাণ হারাব, সৈনিকদের প্রাণহানি ঘটবে। কিন্তু তার পরও আমি আক্রমণ চালাব, কেননা ওপরের নির্দেশ রয়েছে আমার ওপরে।

◆ সেনাবাহিনীতে কি এমন বিধি নেই যার আওতায় কোন নির্দেশ নির্বোধ বা পাগলামিসুলভ হলে তা অগ্রাহ্য করা যাবে?

∆ নেই, অন্তত এ ধারণা নেই।

◆ বলতে চাই, আমি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছি। সেখানে তাকে বলছে, পাগলামিসুলভ আদেশের ক্ষেত্রে আপনি এ আদেশ বাস্তবায়িত না করার অধিকার বেছে নিতে পারেন।

∆ এ হলো যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপার—এ হলো বিজ্ঞ বিচারক মহোদয়ের অভিমত মাত্র... জার্মান সেনাবাহিনীর কোন জেনারেল কি...

◆ জার্মান সেনাবাহিনী নয়। এ ধরনের একটি বক্তব্য কোন এক ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করেছিল।

∆ হতে পারে। তবে এটি স্বাভাবিক নয় যে, কোন কিছু করতে বলা হলে ও তা পালিত না হলে ঐ জেনারেল পদে ইস্তফা দেবেন। আর ঘটনাক্রমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আমি জিওসি ছিলাম না।

◆ আমার মনে পড়ে, জেনারেল নিয়াজী লিখেছেনও—টিক্কা খান আদেশ দিয়েছিলেন যে, চেঙ্গিস খান বুখারা ও হালাকু খান বাগদাদে যে বর্বরতা চালিয়েছিল, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে তার চেয়ে নির্মম হতে হবে। আমি এদেশের মানুষ চাই না, শুধু মাটি চাই। তিনি নিজে এও বলেন যে, জেনারেল রাও ফরমান আলী ও ব্রিগেডিয়ার অনুকরণীয়ভাবে সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন আর আপনি তো আপনার ডায়রিতে লিখেইছিলেন যে, সবুজ দেশ পূর্ব পাকিস্তানকে লাল রঙে রাঙাতে হবে।

∆ দুটো ভিন্ন জিনিস। আমি দুঃখিত এ কথা বলার জন্য যে, জেনারেল নিয়াজী একজন মিথ্যাবাদী। তবে আসুন সবুজ পূর্ব পাকিস্তানকে লাল রঙে রঙিন করার কথায় আসি।

◆ আমার মনে হয়, আপনি আপনার বইতে এ ব্যাখ্যা দিয়েছেনও।

∆ আপনি কাজী জাফরকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন যে, তিনি টঙ্গীতে এ বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন কি না। আরও ছিলেন দু'জন। একজন জামায়াতে ইসলামীর, অন্যজন মার্কসবাদী তোয়াহা। তিনি এই মর্মে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যার নির্গলিতার্থ হতে পারে, 'আমরা পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে কমিউনিস্ট ধারণায় রূপান্তরিত করব। জেনারেল ইয়াকুব আমাকে টেলিফোনে এ কথা জানান, আমি সেটা লিখে রাখি। আমি তাঁকে

বলেছিলাম, তিনি যা বলেছেন সেটি আসলে এমন নয়... তখন আপনি যে ডায়রি দেখতে পান, সেটি আমার টেবিলে ছিল না। সেটি আমি ছেড়ে এসেছিলাম আর তাতে মাত্র একটি বাক্য ছিল। আপনি কি একবাক্যে গোটা এক পরিকল্পনাই ফেঁদে ফেলতে পারেন? কাজেই বিষয়টি স্পষ্ট।

◆ জেনারেল নিয়াজীর বইটি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

▲ তিনি অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। এর বেশি দেখার আমার কিছুই নেই। কেননা, এটি সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ মিথ্যা। তিনি নিজে বইটি লেখেননি। আপনি তাঁকে ঐ বইটির একটি মাত্র পৃষ্ঠা লিখতে বলুন আবার, আমি মেনে নেব বইটি তাঁর লেখা। জনসাধারণ তো আর খোঁজ রাখে না, রাখবেও না, আর তাই তাঁরা এই বই লিখেছেন তাঁদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী। জেনারেল টিক্কা কখনও এ কথা বলেননি। আমার বিশ্বাসও তিনি একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন গভর্নর হিসাবে। দুর্ভাগ্য তাঁর, সে জন্য তাঁর বেলুচিস্তানের ও পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর দুর্নাম জুটেছে। তাঁর সাথে দেখা হলে, দেখবেন, তিনি একজন চমৎকার মানুষ।

◆ আপনি কি নিয়াজীর সাথে দেখা করতে বলেন?

▲ তাঁর অবস্থা ভাল নয়। ভয়ানক অসুস্থ তিনি।

◆ তা নিয়াজী কী বলেছিলেন?

▲ নিয়াজী যেদিন দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেদিন পরিষ্কার বলেছিলেন তাঁর কথা। চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে তাতে বসে তিনি বলেছিলেন, মনে হচ্ছে দুশমনের দেশে রয়েছি। বর্মায় আমরা রেশন যোগাড় করতাম জমি থেকে। গবাদিপশু পাওয়া যেত কিন্তু তা ছিল সীমিত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তিনি এমনই ব্যক্তিদের একজন যিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বলছেন দুশমনের দেশ। আমরা কখনও একে দুশমনের দেশ ভাবিনি। আমাদের কাছে ওটা ছিল পাকিস্তান। তিনি আরও সব ভয়ঙ্কর কথাবার্তা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জাতিগত পরিচয় বদলে দেব। অর্থাৎ নিয়াজী ছিলেন কিছুটা চতুর ব্যক্তি। যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন, খুবই চমৎকার, যেমনটি তাঁর সাথে আপনাদের বৈঠকে মনে হয়ে থাকবে। এ সব আদেশ আপনাদেরকে তিনি দেখিয়ে থাকতে পারেন। তবে যে ব্যক্তি এ সব আদেশ তাদের জন্য লিখে দিয়েছেন আর তিনি তাতে সই করেছেন, সেই ব্যক্তিই লিখেছেন তাঁর বই। কিন্তু তাঁর আদেশের সেই বাস্তবায়ন ছিল ভয়ঙ্কর।

◆ বলা হয়ে থাকে, আপনি রাজাকার বাহিনী গড়েছিলেন। কাজেই ইপিসিএএফ বা সিভিল আর্মড ফোর্সেস গঠন সম্পর্কে কি কিছু বলতে পারেন?

▲ আমার ধারণা এ বাহিনী গঠন করেছিল মার্শাল ল সদর দফতর।

◆ এটি কার মস্তিষ্কজাত?

▲ ফোর্স কমান্ড্যান্টরা অবশ্যই...।

◆ এ সময়ে ফোর্স কমান্ড্যান্ট কে ছিলেন?

▲ নিয়াজী। তিনি দাবি করেন শামস ও বদররা হাতিয়ার।

◆ তাঁর বইও তাদের উদ্দেশে নিবেদিত...

∆ তিনি তাদের স্রষ্টা, ব্যবহারকারী, আর আমি মনে করি, অন্য যে কেউ এটি করত।

◆ পরিস্থিতি ছিল যুদ্ধাবস্থা। নিয়াজী তাঁর বইতে বলেছেন যে, আল বদর ও আল শামসের নেতাদেরকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে ফিরিয়ে আনা হয়!

∆ আমি জানি না।

◆ কিছুই জানেন না আপনি?

∆ দেখুন, ঘটনা হলো এই যে, আমার কর্তৃত্বই ভেঙে পড়েছিল, আমি বস্তুত আর কেউ-ই ছিলাম না। যদ্দূর মনে পড়ে ১৩ তারিখে গভর্নর মালিক পদত্যাগ করেন। আমি গভর্নর হাউসে ছিলাম। ভারতীয় আক্রমণের মুখে তিনি ইস্তফা দেন। এরপর আমার কোন কাজ ছিল না, কেউ আর ছিলাম না আমি।

◆ এ ঘটনা '৭১-এর ১৩ ডিসেম্বরের। তাই ১৩/১৪ ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদেরকে...

∆ হ্যাঁ, হতে পারে। ঠিক ধরেছেন আপনি। নিয়াজী ওদের হত্যার জন্য দোষ দেয়... বস্তুত ওরা সকলেই এ জন্য আমাকেই দোষারোপ করে।

◆ আন্তর্জাতিক তথ্য মাধ্যমগুলো এবং পাশ্চাত্যের ও নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তথ্য মাধ্যমও তো আপনাকেই দায়ী করেছে, কেন?

∆ ব্যক্তি হিসাবে আমি জানি না, একাই ছিলাম তখন আমি... কাজেই।

◆ তারা প্রমাণ দিয়েছে, আর কেউই সেগুলো এ পর্যন্ত অস্বীকার করেনি।

∆ আমি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় এ সব দেখিনি।

◆ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে অক্টোবরে শুরু হয়। কেননা ঢাকার নটর ডেমের কাছে এক ডাক্তারকে হত্যা করা হয়। আমি বলি, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড আগেই শুরু হয়, ১৪ ডিসেম্বর সে সব হত্যালীলার চূড়ান্ত পরিণতি। এ গেল একদিক। আরেকটি কথা হলো এই যে, আপনি বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। নিয়াজী নিয়োজিত ছিলেন রণাঙ্গনের দেখাশোনায়।

∆ না, তিনি ছিলেন সামরিক আইন প্রশাসক।

◆ আপনি ছিলেন বেসামরিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্বে। যেমন—গোলাম আযম ও মাওলানা মান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আপনার। তারা আপনার সাথে বৈঠকে মিলিত হতো, আপনার পরামর্শ নিত আর এমন হতে পারে যা হয়ত জানি না। পরামর্শ অনুযায়ী কাজও করত। কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নেয়া যায়, কোন কিছুই আপনার অবগতির বাইরে হতে পারত না। আপনি কি এ সবের সাথে একমত?

∆ কেন?

◆ কেননা আপনি তো ...

∆ কিছুই না বলতে কি হত্যাকে বোঝায়?

◆ **এ তো সবকিছুরই অন্তর্ভুক্ত, প্রশাসনও?**

Δ না, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর অবস্থা বদলে যায়। সামরিক আইন শেষ শক্তি হিসাবে কাজ করতে থাকে। গভর্নর হাউসের কোন নিজস্ব অবস্থান আর ছিল না। কেননা, গভর্নর হাউসের নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র সচিবালয়, পুলিশ ও রাজাকারের ওপর বজায় ছিল। সেনাবাহিনী, ইপিসিএএফ ছিল সামরিক আইন প্রশাসক ও কোর কমান্ডারের নিয়ন্ত্রণে, এমনকি আমার অধীনে নয়।

◆ তাহলে ওসবের জন্য দায়ী জেনারেল নিয়াজী?

Δ জেনারেল নিয়াজী আইন-শৃঙ্খলার জন্য দায়ী ছিলেন।

◆ রেখে আসা ঐতিহ্য বলে...

Δ সত্যি। আমি আপনাকে বলেছি, জেনারেল শামসের—যিনি পিলখানায় সিএএফওর দায়িত্বে ছিলেন—তিনি আমাকে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেন। তিনি জানান, আমাদেরকে জেনারেল নিয়াজীর সাথে দেখা করতে যেতে হবে। জেনারেল নিয়াজীর সাথে সাধারণত আমার কখনও কোন বৈঠক হয়নি। আমি বললাম, ঠিক আছে, আজই আমরা যাব, পরিস্থিতি তো ভাল নয়। পিলখানায় পৌঁছতে দেখলাম কিছুটা আঁধার নেমেছে। ওখানে কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ্য করলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমি কেন তোমার গাড়িতে যাচ্ছি, আর এ গাড়িগুলো ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? তিনি বললেন, বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা জেনারেল নিয়াজীর কাছে যাচ্ছি আর সেজন্যই গাড়িগুলো এখানে। যাবার পথে তিনি আমাকে বললেন, কয়েক লোককে গ্রেফতার করতে হবে। আমি জানতে চাইলাম কেন? তিনি বললেন, কথাটা নিয়াজীকেই তুমি জিজ্ঞাসা করো। আমরা নিয়াজীর দফতরে যেতে তিনি বললেন, তোমার মত কী? আমি বললাম, স্যার কাউকে গ্রেফতারের সময় এটা নয়। আপনাদেরকে বরং দেখতে হবে কত বেশি লোক আপনার সাথে আছে।

◆ এ কত তারিখের কথা?

Δ ৯ ডিসেম্বরের। আত্মসমর্পণের ঠিক আগে ৯ কিংবা ১০ ডিসেম্বরের। আমি বললাম, তাদেরকে গ্রেফতার করা ঠিক হবে না। সে প্রশ্নই ওঠে না। আমি নিয়াজীর ওখান থেকে ফিরে এলাম। ১৬ বা ১৭ ডিসেম্বর সকালে ভারতীয় জেনারেল ও আর ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি আমায় বললেন, আপনার আদেশে এই লোকগুলো প্রাণ হারিয়েছে। আমি জবাবে বললাম, কিন্তু আমার আদেশ কার্যকর করতে হলে তো পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাকেই সেটি করতে হয়, সেটি কী করে সম্ভব? কাকে আমি সে আদেশ দিয়েছি? আমি একা গিয়ে লোকগুলোকে হত্যা করতে পারি? আমার তো কোন সৈন্য ছিল না।

◆ ঐ লোকগুলো কারা ছিল?

Δ ওরা সবাই ছিল বুদ্ধিজীবী...

◆ **বাংলাদেশ দখলমুক্ত হওয়ার পর বঙ্গভবন মানে গভর্নর হাউসে কিছু লিখিত দলিল পাওয়া যায়। তাতে যেসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের নামের একটা তালিকা পাওয়া যায়, যা আপনার হাতের লেখা।**

▲ আমার লেখা নয়। গভর্নর হাউসে তখন অনেক লোক আমার কাছে আসত দেখা করার জন্য। ওরা আমাকে এ ধরনের তালিকা দিত। আমি কখনও...

◆ কিন্তু তা দিত কেন? কী কারণে?

▲ ওরা ছিল পাকিস্তানবিরোধী। তাই ওদের ওসব আমি রেখে দিতাম বটে তবে সেগুলোর ওপর কোন এ্যাকশন নিতাম না। আর এই একই সব তালিকা কোর কমান্ডারকেও দেয়া হতো। এই লোকগুলো এখানে-সেখানে নানান জায়গায় যাতায়াত করত। তাদের দেয়া এসব কোন গোয়েন্দা তথ্য ছিল না, কিন্তু ওদের কাজ ছিল সুযোগ সুবিধা বাগিয়ে নেয়া।

◆ কিন্তু রাও সাব, আপনি তো নিরপেক্ষ তথ্য মাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে ছিলেন, তাই নয় কি?

▲ কিন্তু... আপনিই বলুন, কোন ব্যক্তির একার পক্ষে ১৬ ডিসেম্বরের রাতে যাওয়া ও...

◆ না, না, ঘটনা তো ঘটে ১২, ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর রাতে।

▲ না, আমার কোন ধারণা নেই। তবে আমি আপনাদেরকে একজন সম্পর্কে বলব যাঁর কথা জেনারেল নিয়াজীও বলেছেন। আমার মনে পড়ে তিনি হয়ত ছিলেন বিবিসি প্রতিনিধি। ঘটনা এই যে, ৭ ডিসেম্বর বিবিসি এই বলে খবর প্রচার করে যে, জেনারেল নিয়াজী পালিয়ে গেছেন আর রাও ফরমান তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছেন। আসলে এটি সম্ভব ছিল না, কেননা আমি ছিলাম জুনিয়র পদে। কোর হেডকোয়ার্টার থেকে আমার কাছে টেলিফোন আসে। তাতে বলা হয়, কে এই লোকটা দেখ, তাকে বল এ রকম খবর তার দেয়া উচিত হয়নি বা প্রকাশ করবে না। সে অনুযায়ী আমি বিবিসি সংবাদদাতাকে টেলিফোন করি। সম্ভবত ঐ সংবাদদাতার টেলিফোনের সাথে সিস্টেম রেকর্ডার ছিল। তবে সে যাই হোক, লোকে জানত না যে, আমি সেনাবাহিনীর লোক হলেও সেখানে দু'টি আলাদা সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। সেনাবাহিনীর আদেশ কার্যকর করার ব্যাপারে আমার আদৌ কোন গরজ ছিল না। কেননা আমি সেনাবাহিনীর অধীনে ছিলাম না। আমি সেই সংবাদদাতাকে তাই বললাম যে, সেনাবাহিনী হয়ত আপনার বিরুদ্ধে খুব কড়া এ্যাকশন নিতে পারে, আমি আপনাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যেই বলছি, আপনি এ ধরনের খবর আর বাইরে পাঠাবেন না। আর এটাই আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহার করেছে সেটা আন্তর্জাতিক তথ্য মাধ্যমগুলো। এসব মাধ্যমে আরও বলা হয়, রাও ফরমান আলী শুধু কাজটাই করেননি, তাঁকে শাসিয়েছেনও। আমি তাঁকে এ বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, না, আসলে যা ঘটেছিল তা হলো সরকারের এক সাবেক সচিব। তিনি ছিলেন গভর্নরের সচিব, হুসেন বা এ নামের কেউ। তিনি আমার সাথে দেখা করে জানান, অনেক লোককে গ্রেফতার করা হচ্ছে। আপনি, আমাকে আপনি বাঁচাতে পারেন। আমি বললাম, কে গ্রেফতার হয়েছে বলুন? তিনি জানালেন, লোকজনকে গ্রেফতার করা হচ্ছে অথচ আমি সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। এখন আপনাদেরকে আমি জানাই যে, তখন সেনাবাহিনীর নিজস্ব একটা জেল ছিল, যা আমাদের কারও জানা ছিল না। তারা লোকজনকে ধরে সেই জেলে ভরে রাখছিল। আমরা গভর্নর হাউসের কেউ এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। আমরা জানতাম যে তাদের একটা জেল আছে বটে, কিন্তু সে জেল সেনাবাহিনীর লোকেরা যেসব অপরাধ করে সেসবের জন্য। ওটা ছিল তাদের কথামতো

তাদের জেলখানা। অন্যথায় ব্যাপার যদি বুদ্ধিজীবীদেরই হয়, তাহলে তাদের খোঁজখবর নেয়া ও তাদের সাথে দেখা করতে যাওয়া আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব?

◆ জেনারেল নিয়াজী এ দাবিও করেছেন যে... আর আপনি তো জানেনই যে, আপনার বই আগে, আর পরে বই বেরিয়েছে নিয়াজীর। এখন তিনি তো পুরোপুরি দোষ আপনার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছেন। কাজেই উপায় বলতে তো হাতে থাকে আপনার আরেকটা বই লেখা, লিখে ব্যাখ্যা করা...

∆ না, তবে আমার মনে হয় আমি যখন ভারতে ছিলাম ঘটনা তখন যা ঘটে তা হলো— ভারতীয় সেনাবাহিনী আমার বিরুদ্ধে কোন একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে আমার বিচার করার ব্যাপারে বেশ এক পায়ে খাড়াই ছিল। তারা ইপিআর থেকে ৫০ জনকে গ্রেফতার করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার বশির। তাঁদের সবাইকে এ বলে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, যাঁরা জেনারেল ফরমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাঁদেরকে সবার আগে পশ্চিম পাকিস্তানে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে দেয়া হবে। তাঁদেরকে কৃতিত্ব দিতেই হয় এ জন্য যে, তাঁদের একজন এতে সাড়া দিয়ে জানান যে, ফরমান খারাপ কিছুই করেননি। আমিও এ মুহূর্তে দাবি করে বলছি আমি কোন খারাপ কাজ করিনি। আমি সবার আগে পাকিস্তানকে হেফাজত করার চেষ্টা করেছি, আর সেটা করেছি কাউকে হত্যা না করে। কেউ যদি দাবি করতে পারে আমি একজনকেও হত্যা করেছি আপনারা আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকে দিতে পারেন। আমি এ প্রস্তাব দিয়েছিলাম জব্বলপুরে এমআইআরসিপির কাছে। বলেছিলাম, আমাকে একবার মেহেরবানি করে ঢাকায় নিয়ে চলুন ও ৫ মিনিটের জন্য হলেও মুজিবের সাথে দেখা করতে দিন। তারপর যদি তিনি আমাকে আলিঙ্গন না করেন তাহলে আপনারা আমাকে নিয়ে যাচ্ছেতাই করতে পারেন।

◆ এই এমআইআরসিপি কী?

∆ উও হোতে হ্যাঁয়... আসলে ওটা বলতে আন্তর্জাতিক রেডক্রস বোঝায়।

◆ তাই নাকি? বেশ।

∆ জব্বলপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডেপুটি ডিডিএমআই লেসলি আমার সাক্ষাৎকার নেন, আর সেই সময় আমাকে বলেন, জেনারেল আপনার বিরুদ্ধে ২০০ লোক হত্যার অভিযোগ রয়েছে...।

◆ আপনি এসব জিজ্ঞাসাবাদের কথা আপনার বইতেই বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আমার তো মনে হয় ঐখানেই যেন এখন জেনারেল নিয়াজী বসে রয়েছেন। নিয়াজীকেও কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?

∆ বেশ তো তাহলে ওখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন আমি কি ঐসব লোকের গ্রেফতারের বিরোধিতা করিনি? আর তা যদি আমি করে থাকি আমার তাদের হত্যা করার কথা নয়। তবে সে যা-ই হোক, কী আমার ছিল? শুধু ছিল পুলিশ!

◆ আপনি তো জেনারেল হিসাবে আদেশ দিতেই পারেন?

∆ কিন্তু কাকে?

◆ না, অভিযোগ আছে এ কাজ করেছে আলবদর ও আলশামস!

∆ না, ওদের ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

◆ রাজাকারদের ওপর আপনার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না?

∆ এ নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হতো সামরিক আইন সদর দফতর থেকে।

◆ সামরিক আইন সদর দফতর ওদের কাজে লাগাত?

∆ আর ওদের কাজে লাগাতে হলে সেটা করতেন জেনারেল নিয়াজী। আওয়ামী লীগের লোকজনের সাথেই আমার সুসম্পর্ক ছিল। তবে ওরা তখন কলকাতায় চলে যায়। আমার বেশিরভাগ সময় কাটে যারা তখনও পূর্ব পাকিস্তানে ছিল এমন এক বিপুল সংখ্যক লোকের সাথে সম্পর্ক রক্ষায়। আমার অনুমান ওদের সংখ্যা ছিল ৪২/৪৩ জনের মতো। ওরা ছিল এমএনএ। আমি চেষ্টা করছিলাম যোগাযোগ করতে...।

◆ ওখানে তো তখন নতুন একদল এমএনএ নির্বাচিত হয়েছে। কেননা, আপনারা নির্বাচন তো করেছিলেন।

∆ সেটা অনেক পরের কথা। অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। আমার তো মনে হয় আমরা এ কথায় পরে আসতে পারি, তার আগে নিশ্চয়ই বিষয়টা পরিষ্কার করে নেয়া যায়। অবশ্য আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে। আপনারা আমার কথায় নির্ভর করতে পারেন।

◆ না, না ঠিক আছে। দেখুন এ রকম কথা তো উঠতেই পারে, উঠেছেও। কিন্তু আমি তো আর সেখানে সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে বসিনি। আমি আবারও বলি, ঐ নয় মাস... আপনি কি জানতেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন বহু লোককে হত্যা করছে, বহু নারী তাদের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে, ওরা শিশু হত্যা করছে? এটা করা হচ্ছিল পাকিস্তানী বাহিনীর জ্ঞাতসারে, পরিকল্পিতভাবে?

∆ জ্বি হ্যাঁ। ঐ সময় আমি চেষ্টা করেছিলাম ব্যবস্থা নিতে। আমি সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধান জেনারেল আবদুল হামিদকে এ কথা বলেছিলাম এবং কিছু কিছু লোকের নামও তাঁকে বলেছিলাম যাদেরকে সেনাবাহিনী হত্যা করে তাদেরকে বন্দী করার পর। এসব নামের মধ্যে সাইদুজ্জামান...।

◆ সেনাবাহিনীর লোকেরা দু'একজনকে ধরেনি বা হত্যা করেনি, সে কথা আমি বলছি না। আমি বলতে চাই এভাবে বহু লোক বন্দী হয়েছে, বহু লোককে হত্যা করা হয়েছে... এদের সংখ্যা অনেক বেশি... গণহত্যা।

∆ ঠিক নয়। গণহত্যা হয়েছে আমি সে কথা মেনে নিচ্ছি না। সামরিক পরিভাষায় গণহত্যার ব্যাখ্যা রয়েছে। গণহত্যা হয় তখনই যখন আপনি কোন রকম কারণ ছাড়াই মানুষ মারতে শুরু করেন।

◆ তার মানে তাহলে কোন যুদ্ধই হচ্ছিল না বসনিয়া কিংবা হারজেগোভিনায়?

∆ ওটা অবশ্য গণহত্যা।

◆ জাতিগোষ্ঠীগত মানুষকে এভাবে মেরে সাফ করা 'নাসল বদলা দেনা'র মতোই খারাপ কাজ।

∆ উওতো খায়র হোগা। আমি মনে করি না তিনি সেটি করেছিলেন। আমার অন্তত জানা নেই। আমার ধারণা তিনি তা করেননি। তিনি শুধুই হয়ত আলগা জবানে কথা বলছিলেন। তবে আমি মনে করি না ওটা ঘটেছিল, যেখানে সম্ভব...। সামরিক আইন হলো বেসামরিক আইন ভেঙে পড়ার চূড়ান্ত পরিণতি। আর সে রকম অবস্থাতেই সামরিক আইন আসে। আর সামরিক আইন ব্যর্থ হলে সামরিক কার্যব্যবস্থা তার জায়গা নেয়। সামরিক আইন ব্যর্থ হবার পর অর্থাৎ আমি বলতে চাই, আমরা—আমি ও গভর্নর ব্যর্থ হবার পর সেনাবাহিনী আমাদের জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে, কিন্তু এ সেনা শাসনই পূর্ব পাকিস্তানে নয় মাস অস্তিত্বশীল ছিল, গভর্নরের শাসন নয়।

◆ তার মানে বলতে চান বসনিয়া-হারজেগোভিনায় যা ঘটছে তা গণহত্যা, তাহলে আপনাদের সামরিক ব্যবস্থা কেন গণহত্যা হবে না?

∆ আমি দাবি করি ওটা গণহত্যা ছিল না। অত বেশি প্রাণহানি ঘটেনি।

◆ তাহলে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার তামাম তথ্য মাধ্যম যা বলছে তা ভুল?

∆ আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম বলতে যদি...

◆ তাহলে সব খবরের কাগজ ভুল তথ্য দিয়েছে? আর আপনারাই যাঁরা ঢাকায় ছিলেন তাঁরাই কেবল...?

∆ না, না, সে কথা সত্যি নয় যে, আমরা যারা ঢাকায় ছিলাম... বলেছি ঘটনা গণহত্যা ছিল না। গণহত্যা চালানো হয় একটা মতলব নিয়ে, মতলব নিয়ে মানুষ মারা হয়। আর আমাদের কথা যদি বলেন তাহলে আমি বলব, আমরা সেনাবাহিনী থেকে আলাদা ছিলাম।

◆ আপনারা উভয়েই ছিলেন জেনারেল, তাহলে কেন...?

∆ না, না, অনেক জেনারেলই তো ছিল।

◆ না, আপনারা সেনাবাহিনী থেকে আলাদা কেউ ছিলেন না। তবে আমি জানতে চাই, আপনার কি জানা ছিল না যে, পূর্ব পাকিস্তানে তখন ঐসব ঘটনা ঘটে চলেছে?

∆ আপনারা যে মাত্রায় বলছেন সেই মাত্রায় নয়।

◆ আচ্ছা, সে কথা যাক।

∆ ওটা হলো আমার অভিমত।

◆ আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র এসব ঘটনার খবর প্রচার করেছিল?

∆ জ্বি! ইয়াহিয়া ওদের বের করে দেন বলেই আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা, বেতার-টিভি চটে যায়। ইয়াহিয়ার কাজটি ঠিক হয়নি। ওরা ওদের মতো ছিল।

◆ আসলে ওদেরকে বের করে দেয়া তো আর ঠিক হয়নি। ওরা কার্যত ফিরে আসে ও বিস্তারিত আলোকচিত্র সহকারে তখনকার অবস্থার খবর পরিবেশনও করে। ফটোগ্রাফ ও আরও সবকিছু উপকরণ সহকারেই ওরা ঐসব খবর দেয়। আমি বলতে চাই, এখন তো আপনার কাছে তখনকার নেপথ্যে থাকা ব্যাপারগুলো পরিষ্কার। এখন যদি অনেকে আপনার এ দাবি মেনে নিতে তৈরিও থাকে যে, এমনকি হত্যাকাণ্ডের শতকরা এক শতাংশের জন্যও

আপনি বা আপনারা দায়ী নন... এ দাবি আপনি করেছেন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে, তবু কেউ না কেউ তো এটা করেছে, সে বিষয়ে তো আপনার এখন সংশয়ের কোন অবকাশ নেই?

Δ তবে কোন পরিস্থিতিতে যে-ই সেনাবাহিনী আইনের সীমা অতিক্রম করে থাকুক সে জন্য তারা দায়ী, তবে গোটা অবস্থাটাও বিবেচনায় নেয়া দরকার... এ যুক্তি মেনে নিতে হবে।

◆ জেনারেল নিয়াজী যদি তখন যুদ্ধ লড়েই থাকেন আর সেটি যদি যুদ্ধাবস্থা হয়ে থাকে তাহলে যুদ্ধে যে এসব ঘটনা ঘটে সেটা কারও বোধগম্য হবে না তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে কথা হলো এই যে, আপনি পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন নিয়াজীর কথায় তিনি তখন অবস্থান করছিলেন দুশমনের দেশে। স্পষ্টতই তিনি যুদ্ধ লড়ছিলেন। আমি বলতে চাই যে, যদি তর্কের খাতিরে হলেও ওটা মেনে নেয়া হয়, আমি আর যাই হোক বিশ্বাস করতে পারছি না যে, ঐ সময়কার একজন সক্রিয় জেনারেল হিসাবে আপনি এত ব্যাপক আকারের হত্যাকাণ্ডের কথা জানতেন না।

Δ আমি ২০ লাখ লোক নিহত হওয়ার হিসাব মেনে নিতে পারি না।

◆ না, আমরা তো ওটা নিয়ে তর্কে যেতে চাচ্ছি না।

Δ সংখ্যা ৪০/৫০ হাজারের মতো হবে।

◆ তাহলে আপনার বিবেচনায় এ ৪০/৫০ হাজার বিরাট সংখ্যা নয়?

Δ না, এটা...।

◆ সেনাবাহিনী নিরীহ, নির্দোষ লোকদের হত্যা করেছে।

Δ জ্বি হ্যাঁ, সংখ্যাটি বিরাট। আমি স্বীকার করছি সংখ্যাটি সত্যিই বিরাট। তবে একই সাথে বলব ৭ থেকে ২৮ তারিখের ভিতরে কী সব ঘটেছে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে। এক বিপুলসংখ্যক লোক তখন প্রাণ হারায়। ওদের শনাক্ত করা যায়। আমাদের ইপিআর-এর সব পশ্চিম পাকিস্তানী এনসিওকে হত্যা করা হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল জেসিওকে হত্যা করা হয়। পাবনায় ঘেরাও করে রাখা সকল সৈন্যকে জবাই করা হয়।

◆ নিয়াজীও বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি ২০০০ অফিসার হত্যার কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী, বলবেন?

Δ সেনাবাহিনীর অফিসার নয়।

◆ সেনাবাহিনীর অফিসার ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন—এ সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় কোন খবর প্রকাশিত হলো না কেন? অন্তত পাকিস্তানী ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় সে খবর তো ছাপা হওয়া উচিত ছিল?

Δ ২০০০!

◆ জ্বি, দু'-তিন হাজার বা এ রকম। এটা ঘটে ৭ থেকে ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থানকারী সকল সেনাবাহিনী অফিসারকে হত্যা করা হয়, তাঁদের স্ত্রীদের ধর্ষণ ও হত্যা করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

▲ যে সেনা অফিসারদের হত্যা করা হয় তাদের খবর আমি জানি। সেটাই আমি আপনাদেরকে বলছি। ঢাকা অঞ্চলে সেনাবাহিনীর দু'জন অফিসারকে হত্যা করা হয়। এঁদের একজন হলেন ক্যাডেট কলেজের কমান্ড্যান্ট ও সেন্টার কমান্ড্যান্ট জানাজুয়া। জানাজুয়াকে হত্যা করে তাঁর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ দুই অফিসারের একজনের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁর গর্ভস্থ সন্তান বের করে ফেলা হয়। এ রকম কিছু ঘটনা আছে। বগুড়ায় একটা ছোট সামরিক অস্ত্র গুদাম ছিল। সেটির দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন একজন মেজর। তাঁকে হত্যা করা হয়। হত্যা করার পর তাঁর মাথা নিয়ে ওরা ফুটবল খেলে আর তাঁর স্ত্রীকে সে দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

◆ কখন?

▲ এই সময়। ৭ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে। এক বিরাট সংখ্যক বিহারীকে হত্যা করা হয়।

◆ সৈয়দপুরে?

▲ আমি বলছি, কেয়া নাম হ্যায়... কী জায়গাটার নাম, মনে আসছে না। তবে এক বিপুল সংখ্যক বিহারীকে হত্যা করা হয়। শহরের একটি এলাকায় ৫০০ নারী ও শিশুর লাশ পাওয়া যায়। তাদের পরিবারের পুরুষ লোকদের হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। একজন পশ্চিম পাকিস্তানী এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও আইবি প্রধানের জামাতাকে টাঙ্গাইলে টানাহেঁচড়া করে মারা হয় ও যশোর এলাকায় দু'জন অফিসারকে হত্যা করা হয়।

◆ তাহলে কি একে বলা যাবে... এ ছিল একধরনের প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড?

▲ না, তা নয়। এ ঘটনা ঘটে ৭ ও ২৩ মার্চের মধ্যে যখন ওরা দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তার আগে কিছুই ঘটেনি।

◆ তাহলে ঐ ঘটনা কেন পাকিস্তানী সংবাদপত্রে ছাপা হলো না? পূর্ব পাকিস্তানী সংবাদপত্রেও কেন ছাপা হলো না? তখন আমরা তো ঢাকাতেই ছিলাম। আমরা একাগ্র মনোযোগ দিয়ে তখন পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান সব জায়গার খবরের কাগজই পড়তাম।

▲ কিন্তু ভাসানী তো চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামে রেলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছিল... এ কথা কি সত্যি নয়?

◆ ২৫ মার্চের পরে?

▲ না, ২৫ মার্চের আগে।

◆ না, তারা বেশ আগে নিহত হয়েছিল। তা সে যা-ই হোক, এ সব পরিস্থিতির জন্য আপনার কি কোন অনুশোচনা জাগে?

▲ জাগে সেটা, এমনকি এখনও! একটি মাত্র দিনের ভিতর আমার সাথে তিন ব্যক্তি বা দলের সাথে ঐ সময় দেখা হয়। একজন হলেন কুমিল্লায় তখনকার ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী, বিহারী মহিলাদের এক প্রতিনিধি দল ও পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের একটি প্রতিনিধি দল। আমি তখন অবস্থা দেখে কাঁদছিলাম, কেননা আমি তো মনেপ্রাণে একজন পাকিস্তানী। পশ্চিম পাকিস্তানী বা পূর্ব পাকিস্তানী আমার কাছে তো সবাই সমান!

◆ গোটা ঐ সময়টায়, মানে আপনার নিজের কার্যকলাপ, সেনাবাহিনীর নেয়া ব্যবস্থা... এগুলোর জন্য কোন অনুভূতি...?

∆ অত্যন্ত বেদনাদায়ক! এ রকমটা ঘটা উচিত ছিল না।

◆ আপনি কি এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুশোচনা বোধ করেন?

∆ আমি যা করতে পারতাম তা করতে পারিনি বলে...

◆ শুধু সেসব কাজই করেছেন যা আপনার করা উচিত ছিল না, তাই নয় কি?

∆ না, আমি যা-ই করেছি সেটা করেছি আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্যে ও বিবেকের তাড়নায়। আমার ধারণা, আমার তখনকার কাজ নিয়ে আমার কোন অনুশোচনা নেই। তবে আমার এমন একটা অনুভূতি আছে যে, তখন ইস্তফা দিতে পারলেই বোধ হয় ভাল ছিল। আপনারা জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে, আমি সেটা চাইলেও তিনি আমাকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন, তোমার এ জন্য কোর্ট মার্শাল হতে পারে।

◆ তা বাংলাদেশের মানুষের জন্য আপনার কোন বার্তা আছে কি?

∆ দেখুন, আমি পাকিস্তানী। আমি এখনও মনে করি, পাকিস্তানের সৃষ্টি যদি ঠিক হয়ে থাকে, পাকিস্তানকে হেফাজত করতে চাওয়াও বেঠিক হতে পারে না। যদি পাকিস্তানের সৃষ্টি না হতো, কখনও বাংলাদেশের অভ্যুদয় হতো না।

◆ জেনারেল নিয়াজীর বইতে তিনি যা লিখেছেন তার বক্তব্য হলো—আপনিই নিয়াজীর পতনের জন্য দায়ী। মানে আমি বলতে চাই, তিনি আত্মসমর্পণ করতে চাননি। কিন্তু আপনি সকল কলকাঠি ঘুরিয়েছেন।

∆ আচ্ছা! তাহলে রুশদের নিয়ে বকওয়াজ! কিন্তু তা কি সম্ভব? তাহলে সেটা হবে ইতিহাসের প্রথম ঘটনা যার আওতায় একজন বেসামরিক লোক একজন জেনারেলকে সারেন্ডার করিয়েছে।

◆ তাহলে আত্মসমর্পণের দলিলটির খসড়া আপনি লিখলেন কেন?

∆ আমি লিখিনি।

◆ আপনি তো বার্তা পাঠিয়েছিলেন জাতিসংঘে, তাই না!

∆ ওটার খসড়া তৈরি করেছিলেন ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান সচিব সৈয়দ মুজাফফর হুসেন ও গভর্নর। মুজাফফর হুসেন ও আমি দু'জন একত্রে সেটি নিয়ে যাই জেনারেল নিয়াজীর কাছে। তাঁকে আমরা বলি যে, কেন্দ্রীয় সরকার এ মর্মে বার্তা পাঠিয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে আপনারা আপনাদের বিবেচনামতো ব্যবস্থা নিতে পারেন। এর আগে জেনারেল নিয়াজী পশ্চিম পাকিস্তানে দু'দুটি সঙ্কেত বা বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তিনি কি তার বরাত দিয়েছেন? সে বার্তায় তিনি বলেছিলেন, আমি লড়াই চালিয়ে যেতে পারি এখনও।

◆ আমার ধারণা এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে জেনারেল গুল হাসানের বইতে।

∆ নিয়াজী বলতেই পারেন যে, তিনি আরও দু'দিন বা আরও কয়েকটা দিনের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন। এখন যদি প্রমাণিত হয় যে, আপনি মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যই

লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন তাহলে আমাকে আর নন্দঘোষ বানানো কেন? আমি বরং চেষ্টা করছিলাম যাতে অস্ত্রবিরতি হয়, আত্মসমর্পণ নয়। অস্ত্রবিরতি আত্মসমর্পণের চেয়ে ঢের ভাল। কাশ্মীরে ভারতীয়রা অস্ত্রবিরতি করেছে আর ওরা আজও সেখানে আছে। আমরা তো একটা অস্ত্রবিরতি করতে পারতাম।

◆ ব্যাপারটা ঠিক ও রকম নয়, কারণ ভুট্টো জাতিসংঘে ঐ সময় যখন যান তখন অস্ত্রবিরতির চেষ্টা করেছিলেন।

∆ না, তিনি তা করেননি। বরং তিনি সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেছিলেন। অন্যথায় একটা অস্ত্রবিরতি সম্ভব ছিল, আমরা সবাই এক সাথে বসে আলোচনা করে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা সরকার গঠনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতাম। তাই আমার মতে অস্ত্রবিরতি সম্ভব হলে আর আত্মসমর্পণের প্রশ্নই উঠত না। অবমাননাকর অবস্থা হতো না, যা কিছু ঘটেছে তা ঘটত না। পূর্ব ও পশ্চিম এক সাথে বসতে পারত আর তারপর একটা সমাধানও হয়ত পাওয়া যেত। তবে ভারতীয় বাহিনী ঢাকায়, পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের মেজাজ-মর্জি পাল্টে যায়, অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। যদিও ঠিক জানি না তা কেন। আপনাদের মনে থাকতেও পারে, কেননা বিষয়টির চর্চা করছেন এখন আপনারা, আবার না-ও পারে যে, এ রকম একটা অনুভূতি প্রভাব ফেলে যে, হয়ত পাকিস্তানী বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে ভারতীয় বাহিনী।

◆ না, না, তা নয়! বরং আমরা খুশি ছিলাম এ কারণে যে, ওরা আমাদেরকে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে লড়তে সাহায্য করেছে। কেননা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে চলেছিল তখন। আমরা ঐ সময় ঢাকায় ছিলাম। ঐ সময় ঐসব ঘটনা ঘটছিল আর সে কারণেই অনুভূতি ছিল ভিন্ন ধরনের। আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন। ছিলেন ক্ষমতার আসনে। আপনাদের অনুভূতি আমাদের সাথে এক হবার কথা নয়। আমরা তা বুঝি। তবে কথা হলো, ইদানীং পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় একটা বিতর্ক চলেছে। কেউ একজন লিখেছেন যে, বাংলাদেশে যা ঘটানো হয়েছে সেসবের জন্য পাকিস্তান সরকারের উচিত ক্ষমা চাওয়া। এতে আপনার প্রতিক্রিয়ায় কী বলবেন?

∆ আমার মতে ব্যাপারটা পারস্পরিক হওয়া উচিত।

◆ কেন তা হওয়া উচিত? আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

∆ আমার ধারণা, উভয় তরফই ভুল করেছে।

◆ তার মানে আপনার কথার ব্যাখ্যা হলো—উভয় তরফই ভুল করেছে?

∆ উভয় পক্ষই। পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তার তিনটি পর্যায় রয়েছে—এক. পূর্ব পাকিস্তানকে নিজের কলোনি মনে করা পশ্চিম পাকিস্তানের একেবারেই ঠিক হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানীদের ক্ষমতা না দেয়া বা ক্ষমতায় অংশীদার না করা ভুল হয়েছে; দুই. পূর্ব পাকিস্তানে যেভাবে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয় তা ছিল মাত্রাছাড়া; আর তিন. পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে ভুল করেছে।

◆ তাহলে কী করতে হবে আর কে করবে প্রথমে সেটা?

∆ প্রথমে স্থির করতে হবে, আমাদের পাকিস্তানের মাঝে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কে আমাদের ধারণা পুরনো দিনগুলোতে কী ছিল।

◆ এটা হবার নয়। আমার মনে হয় না যে সেটা এখন আর সম্ভব। সে যুগ বাসি হয়েছে। এখন আপনি আর সেই পুরনো ধারণা নিয়ে বসে থাকতে পারেন না।

∆ আমি আসলে বলতে চাই, আমরা এখনও অভিন্ন বিপদেই আছি, যে বিপদ, যে আশঙ্কা পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ছিল। যদি আমাদের সে উপলব্ধি থাকে তাহলে এক না হতে পারলেও আমাদের একে অন্যের আরও কাছাকাছি আসা উচিত। এক রাষ্ট্র আমরা হয়ত হতে পারব না। আমার মতে জনাব সোহরাওয়ার্দী হয়তবা এ ব্যাপারে সঠিক চিন্তাভাবনার অধিকারী ছিলেন। তবে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোটি নেই। যদি আপনাদের এমন কোন উপলব্ধি থেকে থাকে যে, হিন্দুরা ভারতে আধিপত্যশীল, আমাদেরকে ভারতীয় নয়, বরং হিন্দু মানসিকতার আধিপত্যে পড়তে হবে, ওরা আমাদেরকে দেখবে অচ্ছুত ম্লেচ্ছ হিসাবে যেমনটি তারা আমাদের দেখে এসেছে অতীতেও, তাহলে তেমন এক প্রেক্ষাপটে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার—এমন একটি মনোভাব বা অনুভূতি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। আর সেটা যদি আমাদের পারস্পরিক স্বার্থের অনুকূল হয় তাহলে আমাদের উভয় তরফের উচিত হবে এ বিষয়ে একমত হওয়া যে, আমরা নিভৃতে একপক্ষ বলব আমাদের মাফ করে দিন, অন্যপক্ষ বলবে আমরাও দুঃখিত। কেননা আমরা যা করেছি তার জন্য কোন পক্ষকে একতরফাভাবে অপরাধের জন্য সাফ কবুল যেতে বলা। বরং এটাকে রাজনৈতিক ভাষা দেয়ার একটা দরকার রয়ে গেছে। তবে পষ্টাপষ্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমা প্রার্থনার আনুষ্ঠানিকতা বা এ ধরনের কিছু বলা পশ্চিম পাকিস্তানের সামর্থ্যে নাও কুলাতে পারে, যেমন আমি বলতে পারি, আমি দুঃখিত, মেহেরবানি করে আমাকে মাফ করো ভাই!

আমি আপনাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি লোকে যা-ই বলে থাকুক, আমি মানুষকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য করেছি। জহুরুল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করুন, জিজ্ঞাসা করুন যাদু মিয়াকে—অবশ্য তিনি আর বেঁচে নেই, আতাউর রহমানের কন্যাকে প্রশ্ন করুন। বেগম আতাউর রহমান এসেছিলেন আমার কাছে। তিনি আতাউর রহমান গ্রেফতার হয়েছেন বলতে আমি ঢাকা থেকে বিমানে পাকিস্তানে গিয়ে জেনারেল জিয়াকে বলি—স্যার, আমরা কি পাইকারি সবাইকেই গ্রেফতার করব? তিনি বললেন ব্যাপার কী খুলে বলো। আমি বললাম, আতাউর রহমানকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। কাজেই দেখুন আমরাও ছিলাম অসহায়। গভর্নর হাউসে জেনারেল টিক্কার অবস্থাও ছিল তাই। আমার পরামর্শে জেনারেল টিক্কা ফরিদপুর ও পটুয়াখালী এ দু'জেলার ডেপুটি কমিশনারকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু জেনারেল নিয়াজী তাঁকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান। তখন ক্ষমতা ছিল তাঁর হাতে। তিনি যা খুশি তাই বলতে পারেন। আমরা গভর্নর হাউস থেকে দু'দুবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার চেষ্টা করেছি। গভর্নরও এ ব্যাপারে একান্তভাবেই ঐকান্তিক ছিলেন। হাজার হোক, তিনি বাঙালী তো বটেন! তিনি বড় দরের শ্রমিক নেতাও ছিলেন। কিন্তু আমাদের সেই প্রস্তাবে সেদিন কেউ কান দেয়নি।

জে না রে ল নি য়া জী

[১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি ছিলেন জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ্ খান নিয়াজী। তাঁরই অধিনায়কত্বে পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরাজিত এই জেনারেলের দৃষ্টিতে ১৯৭১-এর ঘটনাবলীর বিশ্লেষণমূলক এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় ১৯৯৮-এর ১৯ মার্চ।]

◆ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে আপনার সাধারণ ধারণার কথা বলবেন কি?

Δ আসলে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে কখনও প্রকৃত সত্য বা বাস্তবতা কী তা জানানো হয়নি। এর কারণ যখন জেনারেল টিক্কা পূর্ব পাকিস্তানে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তিনি বিদেশী সাংবাদিক, রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যানদের হুঁশিয়ার করে দেন ও সেখান থেকে তাঁদেরকে অবমাননাকরভাবে বের করে দেন। এর পরিণতি হিসাবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। আর সব বানোয়াট খবর প্রচার করতে ও ছাপাতে থাকে। তারা ঐ সব কাহিনীর উপাদান যোগাড় করত ঐ সময় যেসব লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে শরণার্থী হিসাবে ভারতে যাচ্ছিল তাদের কাছ থেকে। কেবল তাদের কথার ওপরই নির্ভর করছিল বিদেশী তথ্য মাধ্যমগুলো। ভারতীয়রা বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনের মাথা ধোলাই করছিল আর ভারতীয়রা যাই বলুক বিদেশীরা তা লুফে নিচ্ছিল। ফলে যা হবার তাই হয়, প্রকৃত সত্য কখনও বেরিয়ে আসেনি। যা হোক, তখন পশ্চিম পাকিস্তানেও সামরিক আইন বলবৎ ছিল। তাই জনসাধারণও পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে তা জানার জন্য তেমন আগ্রহ বোধ করেনি। আমি যখন দায়িত্বভার নিই তখন সরকার পরিস্থিতি বদলাবার চেষ্টা করে। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো চেষ্টা করেন বাংলাদেশে তাঁদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদেরকে আরও বলিষ্ঠ-শক্তিশালী করে তুলতে ও পশ্চিম পাকিস্তানকে শাসন করতে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে না ঘটছে তা তাঁরা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষ পাশ্চাত্যের পত্রপত্রিকায় যা ছাপা হচ্ছিল তাতে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ

বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। এর আরও একটা কারণ হলো, দেশের কাগজপত্রেও তখন ঘটনা সম্পর্কে কিছুই প্রকাশ করা হচ্ছিল না।

◆ জেনারেল, আপনি এসব কথা বলছেন কারণ এখন আপনার এসব জানার সুযোগ হয়েছে। আপনি পরবর্তীকালের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন। ভাল কথা। কিন্তু আমরা জানতে চাই, তখন আপনাদের চিন্তা-ভাবনা কী ছিল? তখন কি আপনি এসব কথা জানতেন?

Δ না, জানতাম না, কারণ আমি তখন আমার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে লক্ষ্য করি, এখানকার জনসাধারণ আসল ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানে না, এরা সব আমার কাছে নির্বোধসুলভ প্রশ্ন করছে। এর ফল হিসাবে সত্য মিথ্যার আঁস্তাকুড়ে চাপা পড়ে থাকে, প্রহসন হয়ে ওঠে সবকিছু। কেউ কেউ আসল ঘটনা কী তা লেখেও—কেননা কারা পাকিস্তান ভেঙেছে তা জানতে অনেকেই আগ্রহী ছিলেন। এ ভাঙনের নায়ক মুজিব। তাই এই নির্মম, নিষ্ঠুর যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হলে বাইরের জগতের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তখন উপায় ছিল না।

◆ এই বাইরের বিদেশীরা কারা?

Δ তারা হলো যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, আফগানিস্তান ও ইসরাইল। এ কারণেই তারা পাকিস্তানের অন্য প্রদেশগুলোর নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

◆ না, কথাটা ঠিক নয়। কেননা আওয়ামী লীগ তো পশ্চিম পাকিস্তানেও নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে, লড়েছে।

Δ কিন্তু ওরা নির্বাচনে জেতেনি। ওরা তা চায়নি।

◆ আওয়ামী লীগের তো নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক দলীয় সংগঠন ছিল?

Δ ওরা ভোটের জন্য লোক খুঁজত বটে। তবে ভুট্টোর পার্টিই ছিল আধিপত্যশীল। আমি পাকিস্তানে ফেরার পর একটা দল গঠন করেছিলাম।

◆ তা ঐ দলটির নাম কী ছিল?

Δ দলটির নাম... ম, মুজাহিদ... না ফেদাইন পার্টি। তবে সরকার এ দল গঠনের অনুমতি দেয়নি।

◆ কেন? কেন এই অনুমোদন দেয়া হলো না?

Δ কেননা ওটা আমার দল, তাই! আর জানেনই তো ভুট্টোর সরকার আমার বিরুদ্ধে ছিল। আমাকে এ ব্যাপারে অনেক আশ্বাস, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এই বলে যে, দলীয় একটা টিকিট আমাকে দেয়া হবে। অবশ্য নানান মহলে যে কথা প্রচলিত তা হলো, টিকিট পাওয়ার জন্য কিছু লোকই থাকে; যেখানেই যেতে চায় সেখানে যাবার টিকিট পেয়েও যায় তারা, পেয়ে যায় তা আকস্মিকভাবেই। কাজেই কিছু জিনিস আছে যার প্রতিবন্ধকতা কখনও সরে না। তারপর আমি এই বইটি লিখি। আমার প্রায় নিশ্চিত আশঙ্কা ছিল যে, বহু লোক আমার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেবে। কেননা আমার যা কিছু চোখে পড়েছে আমি তার সবকিছুই ফাঁস করে দিয়েছি, কোন রাখঢাক করিনি। প্রকৃত সত্য কী তা ছেঁকে তুলতে আমার

৫ থেকে ৬ বছর সময় লেগেছে গবেষণা সমীক্ষায়, আর তারপর যদি আমি বাস্তব প্রমাণ সহকারে না বলি তাহলে আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না; কারণ আমি তো ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ। আপনারা যা জানতে চাচ্ছেন তার সব বিষয়ই আমি আমার এই বইয়ে সন্নিবেশিত করেছি। আর আপনারা যদি বইখানি পড়ে থাকেন ভাল। আপনারা যা জানতে চাইবেন আমি তার জবাব দেব। সরকার নির্বাচন দিল। ভোটাররা বিভক্ত ছিল—একাংশ মুজিব সমর্থক, অন্য অংশ ভুট্টো সমর্থক।

তারই পথ ধরে পরবর্তীকালে এক এক করে ক্ষমতার গদিতে আসেন ইয়াহিয়া; ইয়াহিয়া ছিলেন ভুট্টোরই লোক। এরা সব তাঁর শ্রেণীরই লোক আর দৃশ্যপট এভাবেই এগুতে থাকে। আবার আমি গোড়ায় ফিরে যাই, মুজিব সমর্থকও ছিল, মুজিববিরোধীও ছিল। কাজেই সত্যিকার অর্থে তখন ভুট্টোই তার সঙ্গী সরকার হিসাবে কাজ করছিলেন। তাঁর সমর্থকদের সেটিই ছিল কাম্য। কিন্তু নেপথ্যের আসল ঘটনা তারা কখনও জানতে পারেনি। তবে আমি আপনাদের কাছে একটা বড় জিনিসের উল্লেখ করতে চাই সেটি হলো আমাদের তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক দল-উপদল ছিল, মতভেদের অন্ত ছিল না পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে। সেদিন আমরা আত্মসমর্পণ করেছিলাম। যেসব অফিসার আমার সাথে যুদ্ধ করেছিল তারা ছিল আমার ছাত্র। তারা আমাকে ভাল করে চিনত। আমিও তাদের চিনতাম। এদের তিন অফিসার মেসে থাকত আর আমি তাদের খরচ যোগাতাম। একদিন চোর হানা দেয় তাদের সেই মেসে; তাদের সবকিছু লাপাত্তা হয়ে যায়। এরপর সংশ্লিষ্ট ঐ অফিসারটি যখন এখানে ছিল তখন তার স্ত্রী আমাদেরকে ঠাট্টা করে বলত, আরে এখানে তো কোন রুশী নেই! আসলেও ঐ সময়টায় কত রকমের প্রচারণা-রটনা যে চলছিল তার কোন শেষ ছিল না। তা সে যাই হোক আমি এখনও '৭১-এর নিষ্ঠুরতার পক্ষপাতী নই। আমি এখানে তো ফিরে এলাম। আমি এখানে আপনাদেরকে এ বিষয়ে কিছু উপকরণ দেব যা একজন ব্রিটিশ নাগরিকের প্রকাশনা; যাতে পূর্ব পাকিস্তানীরা কী নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে। ধরুন আমি এখানে ছিলাম, আপনারা ওখানে ছিলেন। এখন আসা যাক, কীভাবে ঘটনা গড়িয়েছে আপনাদের ওখানে। '৭০-এর মহাঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের দুর্যোগ ছিল দারুণ গুরুতর রকমের ঘটনা। এ সময় রিয়ার এ্যাডমিরাল এ কে এম আহসান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাধিনায়ক। আহসান ঐ সময় প্রথম দিকে ঘূর্ণিদুর্গতদের কাজে হেলিকপ্টার চেয়েছিলেন। সামরিক তরফে ক্ষমতাবান সাহেবজাদা ইয়াকুব সে অনুরোধ রাখেননি। অথচ সে সহযোগিতা করা তাঁর জন্য ছিল নৈতিক কর্তব্য। এতে যা হলো তাতে দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বিপদের দিনে তাদের সেই দুঃখ-কষ্টের অংশীদার তিনি হলেন না। এর পর আরেক দল যারা এলো, তাতেও অবস্থার তেমন রকমফের হলো না।

আর এর ফলে ওখানকার মানুষের মনে এক ধরনের সংশয়-সন্দেহ জন্ম নিল। ওরা ভাবল, 'আমাদের সঙ্কটের সময় ওরা আমাদের সাহায্যে এলো না!' তবে তারা যেসব মানুষকে দোষারোপ করতে চেয়েছে তারা কোন সমষ্টি নয়, আসলে একজন ব্যক্তিবিশেষ। কিন্তু এ কথাও সত্যি, তিনি তো আসলে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, কোন এক জনসমষ্টির। আর

তাই ব্যাপারটা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তবে সে সময় সেনাবাহিনীতে দেশের দু'অংশের সমতা ছিল। ১২ ব্যাটালিয়ন সৈন্য ছিল পশ্চিম ও পূর্ব উভয় তরফে। আর উভয় দিকেই ছিল ১৩ জন করে ইউনিট অফিসার। তাই বিভেদের রেখাটি ঠিক এখানে তৈরি হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অঞ্চলেই এসব ইউনিট অফিসার ছিল। আর সে কারণে একটা বৃহত্তর ধারণায় তখন সেনাবাহিনীতে একটা শৃঙ্খলা ছিল। তবে আনুষ্ঠানিকতা সংক্রান্ত নানান বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কিছুটা হতাশা ছিল।

এরপর আসে নির্বাচন। সেই সময় ইয়াহিয়া ছিলেন প্রধান সেনাপতি। আমরা তাঁকে প্রধান সেনাপতি হিসাবে যেভাবেই জানি না কেন, তিনি নিঃসন্দেহে স্বার্থপর ও লোভী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন না কোনভাবে আইয়ুবকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন ও মুজিবকে এমন সব কাজে উৎসাহিত করেন যাতে সামরিক আইন জারি করার অবকাশ ঘটবে না, ওটা করা হবে না যদি তাঁকে (ইয়াহিয়াকে) ক্ষমতা থেকে সরাবার ব্যবস্থা না করা হয়। আর তাঁদের মধ্যে এ মর্মে একটা সমঝোতা ছিল যে, যদি মুজিব কথা দেন যে, তিনি নির্বাচনে জয়ী হলে তার পরও ইয়াহিয়া ক্ষমতায় থেকে যাবেন, তাহলে ইয়াহিয়া, আপনারা যাকে বলেন প্যারিটি ও এক ইউনিট, ভাঙবেন। সেই প্যারিটি ও এক ইউনিট ভাঙার পর পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে ওঠে ৩৫%, পূর্ব পাকিস্তানও ৩৫%, তারপর আমরা আবার এক ইউনিটের সুবাদে...

◆ আমি তো মনে করি, ভোটের বণ্টনের ব্যাপারটি সব সময় ঘটে থাকে জনসংখ্যা অনুপাতে...

∆ না, তবে প্যারিটির আওতায় ঠিক হয় সব হবে সমান সমান অনুপাতে; ৫০ আসন এখানে ৫০ আসন ওখানে... এভাবে। অন্যথায় যে অঞ্চলে জনসংখ্যা বেশি সেখানে ভোটও বেশি হওয়াই উচিত ছিল। তবে এ ব্যবস্থার আগে এ রকম একটা আশঙ্কা ছিলও। তার কারণও এ রকম ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে একটি শিক্ষিত হিন্দু জনসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। যদি তারা সরকার গঠনে একটা বড় রকমের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় তাহলে ঐ হিন্দু সম্প্রদায় সেখানে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারবে।

◆ তা পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কত ছিল?

∆ ঐ সময় প্রায় এক কোটি। তারা ছিল সবাই শিক্ষিত। তারা সবাই ভাল ভাল সরকারী পদে কায়েম ছিল। ওদের মধ্যে অনেকে ছিল অধ্যাপক, শিক্ষক। ওদের প্রায় সকলেই ছিল শিক্ষক। এ রকম অবস্থায় দেশের জন্য কোন শাসনতন্ত্র রচনা ও সেটি অনুমোদন করতে হলে সে ক্ষেত্রে হিন্দুরা তাদের জোর প্রভাব ফেলবে। অন্তত এখানে তখন সে ধারণাই কাজ করে।

◆ কোথায় এ ধারণা দেয়া হয়, পশ্চিম পাকিস্তানে?

∆ ঠিক তাই।

◆ সে হোক, তবে আপনি নিজেও কি সেই একই ধারণা পোষণ করেন?

∆ আরে না, না, আমি তো একজন সৈনিক বৈ আর নই! আমার এসব নিয়ে কিছুই করার ছিল না। আমি সেভাবে বিষয়টি ভেবেও দেখিনি। আমাদের কালে আমরা যে প্রশিক্ষণ পেয়েছি তা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির সেই প্রশিক্ষণের আওতায় আমাদের বলা হতো কী ঘটে না

ঘটে তাতে তোমাদের মাথা ঘামাবার কিছুই নেই, তোমরা তোমাদের দেশ ও শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। আমরা তাই প্রতিষ্ঠান ও শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত, ঘটনা যা-ই ঘটুক তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না।

◆ কোন্ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনারা অনুগত?

▲ আমার ইউনিট, সেনাবাহিনী ও শাসনতন্ত্রের প্রতি—যার আওতায় আমি এ মর্মে শপথ নিয়েছি যে, আমি দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, সেই সময় আমরা অসামরিক লোকজন সম্পর্কে একটা শৃঙ্খলা মেনে চলতাম। কেউ বাইরে থেকে এলে ও সে ব্যক্তি কোন রাজনীতিক হলে আমি তাকে সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দিতাম না। এমনকি আগন্তুক আমার বন্ধু হলেও তিনি যদি রাজনীতিতে লিপ্ত থাকতেন তাদেরকেও আমি ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশের অনুমতি দিইনি। যা হোক, ওখানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কারচুপি হয়। এ বিষয়ে আমাকে জানান মৌলভী...।

◆ কোন্ নির্বাচনের কথা বলছেন আপনি? ১৯৭০-এর...।

▲ ১৯৭০-এর। একথা আমাকে বলেছেন ফজলুল কাদের চৌধুরী, মোনায়েম খান, মৌলভী ফরিদ আহমদ ও আরও বেশ কিছু লোক যাঁরা ছিলেন পাকিস্তানপন্থী। একটিমাত্র লোক এখানে সবকিছু ঘটানোর পরিকল্পনা করছে, সবকিছু করছে, তাকে থামানো দরকার। এ অবস্থায় সামরিক আইন প্রশাসন যদি বাংলাদেশে ঐ সব লোককে নির্বাচনে আসতে না দেয়, আমরা নির্বাচনে বিভিন্ন নগর-জনপদে ৫০ কি ৬০টি আসনে জয়ী হতে পারি। ঐ সময় আমাদের হাতে ৫০/৬০টি আসন থাকলে মুজিবুর রহমান এ রকম বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেন না। আর সকল বিষয়ে তিনি এতখানি প্রভাব খাটাতেও পারতেন না। তবে এ ক্ষেত্রেও সামরিক আইন কর্তৃপক্ষকে নন্দঘোষ করা হয়। বলা হয়, এ কর্তৃপক্ষই তাঁকে নির্বাচনে আসতে দিয়েছে। এসবের আলোকে, পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হলেও পূর্ব পাকিস্তানে তা হয়নি। আমি মনে করি, আপনাদের হয়ত মনে আছে যে, ফজলুল কাদের চৌধুরী একজন মাননীয় ব্যক্তি, সবুর খান, মোনায়েম খান, টেকনাফের মৌলভী ফরিদ আহমদ—এঁদের সবাই ছিলেন পাকিস্তানপন্থী, তারা আমার কাছে আসতেন। সকলেই আসতেন। আপনারা হয়ত জানেন না যে, ময়মনসিংহে গিয়ে আমি বলতে গেলে জনতার মাঝে মিশে যাই। তাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, আমি তাদের কোন ক্ষতি করছি না।

আমি এভাবেই জনতার ভিড়ে মিশে যেতাম, তাতে আমার কোন বিপদ ঘটেনি। মুজিব নির্বাচনে জয়ী হবার পর ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। তিনি তখন বলতে থাকেন, শেখ মুজিবুর রহমান আমার ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। তবে মুজিব জবাবে জানান, কিন্তু আপনি আমার প্রেসিডেন্ট নন। কেন? আপনি তো অঙ্গীকার করেছিলেন। মুজিব তাঁকে সাফ জানিয়ে দেন, দেখুন, আমি একজন রাজনীতিবিদ। এর ফলে ইয়াহিয়ার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়, তাঁর চৈতন্যোদয় ঘটে। তাঁর ভাবখানা ছিল এ যে, আমি তাঁর জন্য এক ইউনিট ভেঙেছি, প্যারিটি ভেঙেছি তাঁরই কারণে, নির্বাচনে তিনি কি করছেন না করছেন, তাতে ভ্রূক্ষেপও করিনি আর সেই তিনি কিনা এখন...! ইতোমধ্যে ভুট্টো যিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ৮২টি আসন পেয়েছিলেন

তিনিও মুজিবের কাছে ছোটেন। তাঁর কাছে সরকারে নিজ দলের ভাগ চান তিনি। তিনি বললেন, আমাকে আপনার দু'নম্বর ব্যক্তি করুন। মুজিব তাতে বললেন, না। ভুট্টো বললেন, ঠিক আছে মন্ত্রিসভাতেই না হয় কিছু প্রান্তিক দফতর দিন? 'না, তাও নয়।' 'ঠিক আছে স্পীকারের পদটি তো দেবেন?' 'না।' ভুট্টো এর পর অন্য ধরনের পাঁয়তারা শুরু করেন। ইয়াহিয়া তাঁকে জানান, লোকটা আমাকে কথা দিয়েছে যে, সে আমাকে প্রেসিডেন্ট করবে। 'তো বেশ তো, আমিও আপনাকে প্রেসিডেন্ট বানাব।' 'কী করে আপনি আমাকে প্রেসিডেন্ট করবেন?' 'ও সেই কথা, ভাববেন না, পশ্চিম পাকিস্তান তো আমাদের থাকবে। আপনি হবেন প্রেসিডেন্ট আর আমি হব প্রধানমন্ত্রী। এসব কথাবার্তার আলোকে ভুট্টো তাঁকে শিকারের দাওয়াত দিয়ে লারকানায় নিয়ে যান। সেখানে তাঁরা এক মতলব আঁটেন। এটিকেই বলা হয় 'লারকানা পরিকল্পনা'। পরিকল্পনাটি ছিল এ রকম—"শূন্যস্থান পূরণ করার মতো সরকার না রেখেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমরা সরে পড়ব, ব্যস।" আমি এ রকম দাবি আবারও করছি।

◆ জ্বি হ্যাঁ। আপনি সে কথা আপনার বইয়ে বলেছেনও। পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতায় কোন উত্তরাধিকারী না রেখেই আপনারা সেখান থেকে সরে আসবেন। কিন্তু আপনারা লারকানা পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারলেন কী করে?

Δ বিষয়টি গোপনীয়। কাজী আজম নামে একজন ডিএসপি ছিল। সিকিউরিটির লোকেরা তাকে লারকানায় পাঠায়। কাজী আজম লারকানায় গিয়ে এক লোকের সাথে দেখা করে। ঐ সময় ভুট্টো ও ইয়াহিয়া শিকার ভ্রমণের নৌকায় বসে পরিকল্পনাটি করেন। ঐ আলোচনাকালে সেখানে এক লোক ছিল। আমি কাজী আজমের কাছে থেকেই বিষয়টি জানতে পারি। কাজী আজম জানতে পারে সেই লোকটির কাছ থেকে। তবে ঐ লোক তথ্য ফাঁস করার পর সেটি ভুট্টোর কানেও যায়। তিনি এটিকে চেপে যেতে চেয়েছিলেন। আর সে কারণেই ওটা জানাজানি হয়ে যায়। তা না হলে ঘটনাটি গোপনই থেকে যেত। কিন্তু কেউ একজন বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেয়। পত্রপত্রিকাতেও তখন এ খবর ছাপা হয়।

◆ পূর্ব পাকিস্তান সংক্রান্ত খবর কবে সংবাদপত্রে ছাপা হয়?

Δ ঐ সময়ই। আমার ধারণা, তখন ফেব্রুয়ারি মাস চলছে। এরপর পরিকল্পনার হোতারা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। একটি পরিকল্পনামাফিক কাজে সর্বোত্তম ফল লাভের উপায় ছিল, দেশের পশ্চিমাঞ্চলে জোরেশোরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া—যার অর্থ আমাদের এখানে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে লড়াই চালানোর জন্য সেনা সরবরাহ পাওয়া যাবে কম, বিপুল সেনা মোতায়েন থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানে। এভাবে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতকে পরাজিত করব আর পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী বাহিনী ভারতের কাছে পরাজয় বরণ করবে। লারকানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলেও ওরা এ কথাটি ভুলে যায় যে, তাদের বরাতজোর সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত করতে হলে পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে লড়েই সেটি জয় করে নিতে হবে। আর সে পরিকল্পনা শুধু ফলপ্রসূ হতে পারে যদি আমরা এখানে পরাজিত হই। যদি আমি ঘটনাক্রমে এখানে জয়ী হই বা কোন নাজুক জটিল প্রকৃতির একটা নিষ্পত্তি এখানে সম্ভব হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে লারকানা পরিকল্পনা সফল হবে না। এ ধরনের নিষ্পত্তির আওতায় রাজনীতিবিদরা যদি সরকার করায়ত্ত করতে পারে তাহলে ইয়াহিয়া খানকে এ জন্য

দায়ী করে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে। আর তেমন পরিস্থিতিতে ভুট্টোও কোথাও পাত্তা পাবেন না, কেননা পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাতে বাদ সাধবে। কাজেই এ খেলায় যে বাদ পড়বে তাকে চলে যেতে হবে বিস্মৃতির নিভৃত নেপথ্যে।

◆ এ কারণেই সঙ্কটের রাজনৈতিক মীমাংসার সকল সম্ভাবনাই পুরোপুরি নাকচ হয়ে যায়?

Δ সেটিই কারণ। ওটা হলে তো ঐ দু'টি লোকের কারও আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

◆ কখন আপনি বুঝতে পারলেন যে সঙ্কটের কোন রাজনৈতিক সমাধান হতে যাচ্ছে না?

Δ পরিকল্পনাটি নিয়ে যখন তাঁরা উদ্যোগী হন। পরিকল্পনাটি ছিল এই যে...

◆ আপনি ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক। আপনি জানতেন যে, লারকানা পরিকল্পনা বা চক্রান্ত একটা রয়েছে?

Δ না, জানা ছিল না। আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আমার বই লেখার সময় সেটি জানতে পারি।

◆ ঐ সময়ই পত্রপত্রিকায় সে খবর ছাপা হলো, আর আপনি তা আদৌ জানলেন না—এ কেমন কথা?

Δ তখন ইয়াহিয়া মারা গেছেন। ভুট্টোও ক্ষমতা হারিয়েছেন। আর সে সময়টায় বহু লোকের কাছে থেকে বহু তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকে।... সে যাই হোক তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকেন। তাঁদের ধারণা ছিল আমার পরাজয়ে তাঁদের ফায়দা হবে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, গেরিলা যুদ্ধ যারা করে তারা কখনও পরাজিত হয় না। অথচ আমি মাত্র ২ মাসে গেরিলাদের পরাজিত করেছিলাম। আমি নিজে ইন্দোনেশীয় গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়েছি, লড়েছি মালয়ে চীনা গেরিলাদের বিরুদ্ধে।

◆ আপনি সেসব আপনার বইতে উল্লেখ করেছেন।

Δ সে সামর্থ্য আমার ছিল। আমার চোর ধরার ক্ষমতা যেমন ছিল, তেমনি চোর আমি নতুন কোন বাড়িতে সেঁধিয়ে দিতেও পারতাম। দু'মাসের মধ্যে আমি এমন এক অবস্থান নিয়েছিলাম ও অবস্থা যা দাঁড়ায় তা গেরিলা যুদ্ধে রীতিমতো বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন অভিযান বলেই বিবেচিত হয়। এসবের বিবরণ আমার বইয়ে রয়েছে।

◆ কখন এ গেরিলা যুদ্ধের শুরু?

Δ যেদিন আমি দায়িত্ব নিই সেই দিন থেকেই।

◆ অর্থাৎ দিনটি?

Δ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১। ঐ সময় আমি দারুণ খোশমেজাজে ছিলাম। ওরা এতদিন ছিল কাদামাখা, উর্দিহীন কিন্তু ঐ দিন থেকে ওদের গায়ে উর্দি চড়ে। কর্নেল ওসমানী হলেন ঐ গেরিলাবাহিনীর প্রধান; ঘটনাক্রমে তিনি ছিলেন আমার বন্ধু মানুষ। এক সময় ওসমানী ছিলেন পাকিস্তানের সেনা সদর দফতরে আর আমি তখন ছিলাম এখানে। আমার অন্যতম খেতাব ছিল 'শের' (বাঘ)। তাই ওসমানী যখনই আমাকে টেলিফোন করতেন তখনই বলতেন, 'টাইগার! হ্যালো আমি টাইগার বলছি।'

◆ সেটার অভিজ্ঞতাও আপনার হয়েছে নিশ্চয়ই?

∆ আমি জবাবে বলতাম, আরে আপনি তো সিনিয়র টাইগার। আপনি তো ইস্ট পাকিস্তান (বেঙ্গল) রেজিমেন্টের লোক যাদের প্রতীক 'বাঘ'! এ জন্য তাঁকে টাইগার হিসাবে ভালই দেখাত। এভাবে ওসমানী হলেন প্রধান সেনাপতি। আমি এ ভেবে খুশি হলাম যে, আমি এখন উর্দিপরা সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ব, কিছু অসামরিক লোকের বিরুদ্ধে নয়।

◆ এ 'শের' ছাড়া আপনার আর কী কী খেতাব আছে?

∆ তারিক বিন যিয়াদ, একজন পশ্চিম পাকিস্তানী আমাকে এ নামটা দেয়... আমার আরেক খেতাব মেরিডোন...। আমি এক সময় রাজপুত রেজিমেন্টে (ব্রিটিশ ভারতে) ছিলাম। আপনারা জানেন, রাজপুতরা রাজপুতানার লোক, রাজপুতরা সাহসী লোক। রাজপুতদের এক বীরনায়কের নাম অমর সিং রাঠোর। সেনাবাহিনীতে আমার মুসলিম সহকর্মীরা আমাকে ডাকত অমর সিং বাহাদুর বলে। এসব হলো গিয়ে... মানে এই তিনটি খেতাব ছিল আমার পাকাপোক্ত। তাই আমি যখন গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযানে সীমান্ত অবধি পৌঁছে গেলাম—সে এক লম্বা কাহিনী গুছিয়ে বলতে গেলে...।

◆ আপনি এসব বিষয় বিস্তারিত আপনার বইতেই লিখেছেন, লিখেছেন আপনার রণবিন্যাস সম্পর্কেও। আমরা বরং কিছুটা অন্য ধরনের প্রশ্নের জবাব জানতে চাইব আপনার কাছে। জেনারেল টিক্কা খানের যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল বিদ্যুৎগতিতে এক অভিযান পরিচালনার। কথা ছিল সে অভিযান শুরু হবে ২৫ মার্চ। অভিযানের নাম ছিল অপারেশন সার্চলাইট। এ অভিযানের পরপরই চলবে চিরুনি অভিযান (কম্বিং অপারেশন) ও অন্য আর সবকিছু। মনে করা হয়েছিল, এ অভিযানে বিক্ষোভ দমন হবে ও তাঁরা একটা রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে উপনীত হবেন—এ ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু আপনারা যদি আপনাদের কথামতো দু'মাসের মধ্যে বিদ্রোহী বা মুক্তিবাহিনীকে কব্জা করে ফেলেই থাকেন তাহলে তখন কেন আপনারা একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছতে পারলেন না? কেন আপনারা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মতো বিকল্প বেছে নিলেন? শ্রীলঙ্কা হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আপনাকে পূর্ব পাকিস্তানে রসদ, অস্ত্র, সেনা সাহায্য পাঠানোর কাজটি সে ক্ষেত্রে খুবই কঠিন ছিল না?

∆ সে কথা আমি আপনাকে বলছি। ইয়াহিয়া ও সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ছিলেন। তাঁদের একটা পরিকল্পনা ছিল যার নাম ছিল 'অপারেশন ব্লিৎজ'।

◆ এ পরিকল্পনা কখন করা হয়?

∆ '৭০-এর গোড়ার দিকে।

◆ '৭০-এর গোড়ার দিকে? নির্বাচনের আগে না পরে?

∆ না, না। নির্বাচনেরও অনেক আগে, এমনকি ১৯৬৯-এ তিনি এ পরিকল্পনা করেন।

◆ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, এ হলো সেই পরিকল্পনা যা তিনি তৈরি করেছিলেন...

∆ নির্বাচনের আগেই ইয়াহিয়া ও সাহেবজাদা ইয়াকুব এ পরিকল্পনা করেন। ঠিক করা হয়, নির্বাচন হোক বা না হোক যদি কোন রকম গোলযোগ দেখা দেয় তাহলে সে ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাঁরা এ পরিকল্পনা তৈরি করেন।

◆ না, আমি বলতে চাই, আপনি আপনার বইয়ে অপারেশন ব্লিৎজ সম্পর্কে যা দাবি করেছেন তার কিছু কিছু জবাব জেনারেল ইয়াকুব পত্রিকায় দিয়েছেন। আপনি কি তা দেখেছেন?

∆ দেখেছি। সেটি অন্য প্রশ্ন। ফিল্ড মার্শাল রোমেল বলেছেন, কোন পরিকল্পনা শেষাবধি তার প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে না। হুবহু এক রকম থাকে না। যদি সেনাপতি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী লড়াই করেন তাহলে ভাল। কিন্তু তিনি কেমন করে সে লড়াই লড়বেন। সেটি একান্তই ট্যাকটিক্যাল বা কৌশলের ব্যাপার। তাই রণপরিকল্পনা একটা রূপরেখামাত্র। যদি কোন রণপরিকল্পনা করা হয় সে পরিকল্পনা যা-ই হোক না কেন তাতে শক্তি প্রয়োগের ব্যাপার থাকবেই। বল প্রয়োগ না করলে তেমন কোনই সাফল্য আসবে না তা থেকে। তবে তিনি সময়ের বিষয় খেয়ালে রাখেননি। আর তাই মুজিব ও তাঁর সহযোগীরা ধ্বংসাত্মক ও নিষ্ঠুরতামূলক কার্যকলাপ নির্বিচারে শুরু করে দেন। এসবের উল্লেখ যা করা হয়নি আমি আমার বইয়ে সেসবের বিবরণ দিয়েছি। আর তিনি যখন এসব কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা নীরব ছিলেন। তিনি সে অবস্থায় সবকিছু অঙ্কুরেই খতম করে দিতে পারতেন। ঐ সময় তাঁর সে ক্ষমতাও ছিল। তখনও পূর্ব পাকিস্তানী সেনারা বিদ্রোহ করেনি। ওরা আমাদের সাথেই ছিল। যারা গোলযোগ করছিল তারা অত্যন্ত অসংগঠিত কিছু জনতামাত্র।

◆ কখন তাঁর অপারেশনে যাওয়া উচিত ছিল বলে আপনি মনে করেন?

∆ সাথে সাথে, তক্ষুণি।

◆ সেটা ঠিক কখন?

∆ নির্বাচনের পরের দিনগুলোতে যখন ওরা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য হৈ চৈ করছিল।

◆ তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন ২৫ মার্চের আগেই?

∆ মার্চেই তাঁর এ্যাকশনে যাওয়া উচিত ছিল যদিও তিনি তা করেননি। তিনি এতে বিলম্ব করেন ও পদত্যাগ করেন। আর এভাবে পাখি উড়ে যেতে দেন। এরপর টিক্কা পূর্ব পাকিস্তানে যান। তখন বাঙালীরা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে তুলেছে। তারও আগে থেকে ওখানকার উর্দুভাষী লোকজনের বিরুদ্ধে হামলা চলছিল। ইয়াকুবের কারণে এগুলো ঘটে। তিনি অন্তত সেগুলো থামাতে পারতেন। তারপর সেখানে যান টিক্কা। তিনি ২৫ মার্চ রাতে বাঙালীদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেন। গোয়েন্দা বিভাগের খবর অনুযায়ী ঐ একই রাতে (২৫ মার্চ) মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন বলে খবর পাওয়া যায়। জানা যায় তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন, ব্যবস্থাও নেবেন। এ্যাকশন নেন। সেই এ্যাকশনে শক্তি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তা ছিল খুবই কঠোর।

◆ ২৫ মার্চের রাতের এ্যাকশনের কথা বলছেন?

∆ আমি সে কথাই বলেছি।

◆ ব্যবস্থাটি খুবই কঠোর বলছেন?

∆ খুব বেশি রকমে কঠোর।

◆ **আমিও বলি খুবই নির্মম ধরনের কঠোর।**

Δ কোন্ লোকের অধীনে এ এ্যাকশন চলছে তার ওপরই নির্ভর করে এর প্রকৃতি কী হবে। কেননা আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি যখন ছোড়া শুরু হয়ে যায় তখন এসবে জড়িত লোকের আচরণ অত্যন্ত অদ্ভুত হয়ে ওঠে। দেখা গেল তখন কর্তাব্যক্তি হাল্কা মেজাজে বসে শিকার ধরার সংলাপে ব্যস্ত, সেই জোশে মত্ত। এর পরিণতি হিসাবে আমরা দেখি, তিনি বলছেন, আমি মানুষ নয়, মাটি চাই।

◆ **টিক্কা খান? পোড়ামাটি নীতির কথা বলেছিলেন?**

Δ হ্যাঁ, তিনিই। তিনিই বলেন, আমি মানুষ নয়, আমি মাটি চাই। ইয়াহিয়া এসব দেখেশুনে ভড়কে গিয়ে টিক্কা খানকে ১০ দিনের মধ্যে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে বলা দরকার যে, যদি কোন জেনারেল অপারেশনে থাকেন তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া এক ভয়ানক ব্যাপার। এটি ঐ জেনারেলের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানার শামিল। যা হোক, ঐ সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টি আগাগোড়া বিবেচনার পর কিছু লোককে দায়িত্ব নেবার জন্য বলেন। আর তারপর তাঁরা চূড়ান্ত পর্যায়ে ঠিক করেন, সিনিয়রিটি নিয়ে ভাবার এখানে অবকাশ নেই, ওটা ভুলতে হবে। এখন যে কাজটা পারবে তাকেই সেখানে পাঠাও। শেষ পর্যন্ত আমাকেই এজন্য বাছাই করা হয়। যদিও আমি বেশ কয়েকজনের পিছনের অবস্থানে ছিলাম। তখন এক ডজন জেনারেল ছিলেন আমার চেয়ে সিনিয়র। আমাকে পাঠানো হলো। সেখানে আমার আগে আমার চেয়ে সিনিয়র দুই জেনারেল ব্যর্থ হয়েছেন। যাহোক আমাকে বাছাই করার পর আমি পূর্ব পাকিস্তানে আসি। এখানে এসে দেখি সবকিছু ওলট পালট হয়ে আছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্টগুলোর চারপাশে লড়ে চলেছে। আর যে যে শহর নগর তাদের কব্জায় রয়েছে সেখানেও চলেছে তেমনি লড়াই। প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ দখলে রয়েছে মুক্তিবাহিনীর। প্রাদেশিক সরকার অচল হয়ে গেছে। দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত গায়েব হয়ে গেছে। হিন্দুরা সীমান্ত পারাপার করছে অবাধে। আমাদের তথ্যসূত্র অনুযায়ী আমি যখন দায়িত্বভার নিই তখন অন্যান্য যে স্থানে আমাদের সৈন্যরা চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত, রুদ্ধ অবস্থায় ছিল তাদের সাথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল হেলিকপ্টার। ঢাকা ও প্রদেশের বাকি অংশের সড়ক ও নৌযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। এখন হলো কী, স্থানীয় লোকজনের মাঝে এক লোক ছিলেন (মুক্তিযোদ্ধা?)। তাঁকে সবাই ফিল্ড মার্শাল বলে ডাকত। কেউ একজন আমাদের এই অবস্থার খবর দেয় তাঁকে। সেই ফিল্ড মার্শাল আমাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন এই বলে যে, তোমাদের অবস্থা তো কাহিল। আমাদের জন্য চমৎকার। তোমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। আমরা এখন তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাব। আমিও পাল্টা তাঁকে ঠিক একই কথা বললাম, তোমাদেরকে আমরা ঘিরে ফেলেছি। তোমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। তোমাদের রসদ নেই। অবস্থা চমৎকার। আমি এখন আক্রমণ চালাব তোমাদের ওপর। আমি আক্রমণও চালাই। এ আক্রমণটা ছিল সুনিশ্চিতভাবেই ভড়কে দেয়ার মতো, এটা ওদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। তারা এরকমটাই ভেবেছিল যে, তাদের প্রত্যেক গেরিলা যদি একজন করেও পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা করে তাহলে ওরা দুই মাসে খতম হয়ে যাবে। তাই তারা আশা করতে পারেনি যে আমি এ ধরনের

আক্রমণ পরিচালনার সাহস করব। আমি এ ধরনের চকিত অভিযান শুরু করেই সৈন্যদের নির্দেশ দিলাম দ্রুততম গতিতে তোমরা সীমান্তের সম্ভব সকল জায়গায় পৌঁছে যাও—এটাই আমার নির্দেশ। আমি সরাসরি এরিয়া কমান্ডারদের কাছে গেলাম। তারবার্তায় কোন কিছুই পাঠানো গেল না, কেননা কিছুই তাতে গোপন রাখা সম্ভব হতো না। টেলিফোন স্থাপনাগুলো বাঙালীদের দখলে ছিল। তাই আমাকে ওভাবেই যেতে ও খবর দিতে হয়ে। আমি তাদেরকে বললাম, সোজা সীমান্তে যাও, সেখানকার সব জায়গায় গিয়ে অবস্থান নাও। তারা সেই আদেশ মোতাবেক সোজা সীমান্তে গিয়ে হাজির হয় সব জায়গায় সবকিছু নিয়েই। আর তারপর আমরা সেখানে গিয়ে কাজ শুরু করে দিই। এটা গোপন রাখা হয়। একটা পরিকল্পনা ছিল এরকমের যে, যে সংখ্যক গেরিলা বাঙালীদের রয়েছে তা দিয়ে তারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আর ওদের ঠেকাতে হলে আমার দরকার হবে তিন লাখ সৈন্যের। কিন্তু আমার মোট সেনাশক্তি ছিল মাত্র ৪৫ হাজার। এই ৪৫ হাজারের মধ্যে আবার ৩৪ হাজার ছিল নিয়মিত সৈনিক আর ১১ হাজার ছিল পুলিশ বা এ ধরনের আরও কিছু বাহিনীর। রেকর্ডে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে তার নিজ সৈন্য মোতায়েন করেছিল ৭ লাখ আর ঐ দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের মোট সরকারী সৈন্য ছিল ১০ লাখ। একুনে ভিয়েতনামে ৫০ হাজারের মতো গেরিলার বিরুদ্ধে নিয়োজিত ছিল ১৭ লাখ সেনার এক বিশাল বাহিনী। আলজিরিয়াতে ফ্রান্স ১০ লাখ সৈন্য মোতায়েন করেছিল। আমার ৪৫ হাজার সেনা লড়েছে ৪ লাখ গেরিলার বিরুদ্ধে আর সেটি ছিল বাঙালী, রুশ ও ভারতীয়দের গালে চড়ের শামিল। তখন ভারতীয়রা... মানে রুশরা বলছিল যে, গেরিলাদের সঙ্গে রয়েছে ৫০ হাজার ভারতীয় সৈন্য। আমি যখন দায়িত্ব নিই তখনকার অবস্থা ছিল এরকম। আমাদের একটা জাহাজ ছিল কিন্তু তার কোন রাডার ছিল না, রাতে দূরের কিছু দেখার যন্ত্রপাতি ছিল না, কিন্তু আমরা সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি প্রধান সেনাপতি জেনারেল হামিদকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আমি এখন ভারত সীমান্তে রয়েছি, আমাকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দিন। কিন্তু ওরা তো আসলে আমার পরাজয় দেখতে চাচ্ছিল। কাজেই আমার সাফল্যের খবরে ওরা আঁতকে ওঠে। আমি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম ওরা হয়ত আমাদের থামিয়ে দিতে পারে। আর সেজন্যই আমি কী করছি তা আমি ওদের জানাইনি। তারা প্রত্যাশিতভাবেই আমাকে অগ্রাভিযান স্থগিত করতে বলে। বলে, ভারত ভূখণ্ডের ভিতরে যাওয়া চলবে না। এর দু'দিন পর জেনারেল হামিদ পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। তাঁকে আমি বলি, আমি এখন ওদের ঠিক কলিজার কাছেই রয়েছি। ওরা পালাচ্ছে। আমরা ওদের সাফ করছি। তাদের দিকে গুলি চালাচ্ছি। আপনি যদি এখন ভারতের দিকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দেন আমি বঙ্গের (পশ্চিমবঙ্গের) একটা বিশাল অঞ্চল কব্জা করতে পারব। আমি রয়েছি ব্রহ্মপুত্র ও নাগাল্যান্ডের এদিকে। সবকিছু আমাদের ঠিকঠাক রয়েছে। আপনি যদি একবার অনুমতি দেন, দুই ডিভিশন সৈন্য দেন—কলকাতাও দখল করে নেব।

আমি ভারতীয় বাহিনীকে চুরমার করে দিয়ে আসাম, বঙ্গ ও বিহারের গোটা অঞ্চলটিই পদানত করব। ভারত পরাজিত হবে। তিনি বললেন, বিলকুল ঠিক, আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু জেনারেল এসেছিলেন পরিস্থিতি দেখতে, ভারতের সাথে খোলাখুলি যুদ্ধ করার

জন্য নয়। ভারতীয়রা তাদের লেখায় স্বীকার করেছে যে, ইয়াহিয়া যদি ঠিক ঐ সময়টায় আঘাত হানতেন তাঁর পক্ষে দেশের উভয় অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য জয় করা সম্ভব হতো। আমি বললাম, আমি কাশ্মীরেও ঢুকে পড়তে পারতাম... শিলিগুড়ির দিকে এগুতে পারতাম। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। তখনও ভারতীয়রা সবরকম অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হতে পারেনি। তাই সুযোগ ছিল অক্টোবর পর্যন্ত। অক্টোবরের পর আমার পক্ষে আর উল্লিখিত সাফল্য অর্জন সম্ভব ছিল না। আমার বাহিনীতে ১৮টি ভারি কামান, ৭৪টি মাঝারিপাল্লার কামান, সমসংখ্যক ফিল্ড গান, এক শ'টির মতো এ্যাটাক গান ও ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান ঘাটতি ছিল। গোটা পদাতিক বাহিনীতে ছিল এই অবস্থা। তবে আমার যা ছিল তা হলো সেনাবাহিনীকে প্লাটুন থেকে নির্দেশ দেয়া। এসব প্লাটুন আবার ১৮টি রণক্ষেত্রে লড়ছিল। ওরা ঐসব রণক্ষেত্রে অনড় অবস্থান নিয়ে বসেছিল। তাই কেমন করে যুদ্ধ চালাতে হবে সেটি আমিই জানতাম। যেসব লোক আমার সম্মুখে ছিল তারা তখনকার চ্যালেঞ্জ নেবার লোক ছিল না।

◆ বিমানবাহিনীর অবস্থা কেমন ছিল?

∆ বিমানবাহিনীর মাত্র একটি স্কোয়াস এয়ারক্র্যাফট ছিল। বিমানগুলি কার্যকর অবস্থায় ছিল না। তাই বিমানবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেবার মতো সামর্থ্য ছিল না। এর আগে ছয়টি যুদ্ধবিমান ছিল। ছয়টিই খোয়া যায়। আমার হাতে কেবল স্থলবাহিনী তথা পদাতিক বাহিনীর শক্তিই অবশিষ্ট ছিল।

◆ আমার মনে হয় আপনি যে অবস্থার কথা বলছেন তা বেশ চমৎকারই বলতে হয়। কিন্তু তখন বাংলাদেশের ভিতরের অবস্থা কী? আপনারা কি দরকারমতো সৈন্য-রসদ আনতে পারছিলেন? না, সিভিল আর্মড ফোর্সের লোকদের বেশি করে ব্যবহার করেছেন?

∆ যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমরা তাদের কিছু লোককে কাজে লাগিয়েছি।

◆ আপনারা কখন এই অসামরিক সশস্ত্র বাহিনী তথা আল-বদর, আল-শামস বাহিনীতে লোক ভর্তির সিদ্ধান্ত নেন? এজন্য তো একটা লম্বা প্রক্রিয়ার দরকার?

∆ আমার যদ্দূর মনে পড়ে সেটা মে মাসের দিকে। মে মাসের দিকেই আমি ওদেরে রিক্রুট করতে শুরু করি।

◆ ওরা কি সরাসরি আপনার কমান্ডে ছিল?

∆ তাই। কেউ কেউ বলে, ওরা জামায়াতে ইসলামীর অধীনে ছিল। কিন্তু আমি তা স্বীকার করি না। আল-বদর ও আল-শামস নাম হওয়ার নেপথ্যে জার্মানির এক শাসকের ধারণা রয়েছে। তিনি অনুরূপ ধরনের ধারণার উদ্গাতা। সেখান থেকে আমি ধারণাটি নিই।

◆ আপনি আপনার বইয়ে বলেছেন, আপনি ওদের নেতাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন যারা...।

∆ হ্যাঁ, ওদের কিছু লোককে পাকড়াও করার জন্য লোকজন খোঁজাখুঁজি করছিল। ওরা ছিল অত্যন্ত পরিচিত। যেহেতু ওরা সকলের চেনা ওদের খতম করে দেয়া হতো।

◆ কেন?

∆ কারণ, তাঁরা বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

◆ ওদের পরিচয় কী?

∆ ওরা বাঙালী।

◆ আপনি কি ওদের সম্পর্কে...?

∆ আমি জানতাম না, আমার স্টাফের লোকেরা তাদের চিনত, তাদের সাহায্য সমর্থন করত।

◆ সেটা কি জামায়াতে ইসলামী রাজাকার তৈরিতে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে বলে?

∆ এমনকি, বাঙালীরাও আমাকে সমর্থন জানিয়েছে।

◆ সেতো বটেই। কেননা, জামায়াতে ইসলামীর লোকেরাও তো বাঙালী বটে।

∆ তারা জামায়াতে ইসলামীর কেউ নয়। আমি রাজনীতিকদের ঘৃণা করি। যারা রাজনীতি করে আমি তেমন কাউকেই ক্যান্টনমেন্টে ঢুকতে দিই না। কাজেই আমি কেমন করে একাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতে কোন রাজনৈতিক দলকে বলতে পারি?

◆ রাও ফরমান আলীর ভূমিকা কী ছিল? তিনি কী ছিলেন?

∆ তিনি ছিলেন গভর্নরের পরামর্শদাতা।

◆ তাহলে তাঁর কি কিছু করার ছিল না?

∆ যুদ্ধ কিংবা এসবে তাঁর কিছুই করার ছিল না। তিনি কেবল গভর্নরের পরামর্শদাতা ছিলেন। আমি আর গভর্নরের মাঝে ছিল সেনাবাহিনী।

◆ আপনি জানেন, আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা ও নিরপেক্ষ তথ্য মাধ্যমগুলো পর্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও অন্যসব ঘটনার ওপর রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তবে এজন্য দায়ী হবে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ—গভর্নরের পরামর্শদাতা নয়। এই কি?

∆ পরামর্শদাতা...আব্দুল মোতালিব মালিক যখন গভর্নর হন ইয়াহিয়া খান তখন আমাকে বলেছিলেন, দ্যাখো, মালিক কোন আদেশ দিলে মনে করবে সে আদেশ আমার আদেশ। তাই তিনি আদেশ জারি করতেন।

◆ আপনার বইতে তা বলেছেন।

∆ বলেছি যে, আমাদের আওতায় দেয়া হয় সিভিল আর্মড ফোর্সকে আর গভর্নরের আওতায় থাকে পুলিশ...। আমরা পরিস্থিতির চাপজনিত কারণে ওদেরকে কোন কোন কাজে ব্যবহার করেছিলাম।

◆ কার্যত ওরা ছিল আপনার কমান্ডে।

∆ কিন্তু ওদের বেতন দেয়া হচ্ছিল সিভিল...। আমি তো...।

◆ ওরা ছিল আপনার কমান্ডে। দরকারমতো আপনি তাদের কাজে লাগাতেন।

∆ কিন্তু ওদের বেতন দিত অসামরিক কর্তৃপক্ষ।

◆ কিন্তু কাজ তো করাতে চাইত সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ। এমন হতে পারে তারা হয়ত এমন সব কাজ ওদের দিয়ে করাচ্ছিল যা বস্তুত অসামরিক কর্তৃপক্ষ নাও চাইতে পারে। পুলিশ এমন কাজ করছিল যা সরকার চায়নি তারা তা করুক।

∆ না, আমি যখন দায়িত্ব নিই তখন টিক্কা খান ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এতে কিছুই করার ছিল না। সামরিক আইন ছিল টিক্কা খানের এখতিয়ার। ফরমান আলি ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা।

◆ না, তিনি ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।

∆ আমি টিক্কা খানের অধীনে কাজ শুরু করি। তিনি ছিলেন সিএমএলএ। আমি সেপ্টেম্বরে আমার দায়িত্বপালন শুরু করি। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যা কিছু হয়ে থাক তা করেছেন টিক্কা খান।

◆ কিন্তু আপনি আপনার বইয়ে লিখেছেন যে, রাও ফরমান আলি অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে, নিখুঁতভাবে ২৫ মার্চে টিক্কা খানের আদেশ পালন করেন ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না!

∆ ওরা তা বলছে ঠিকই, কিন্তু ওদের একটা পরিকল্পনা ছিল। জেনারেল টিক্কা যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তাঁর দায়িত্ব ছিল তিনটি এক, তিনি ছিলেন সামরিক আইন প্রশাসক; দুই, তিনি ছিলেন গভর্নর; তিন, তিনি ছিলেন সেনাধিনায়কও। তাই সে রাতে তিনি ও রাজা খাদেম ঐসব আদেশ জারি করেন। টিক্কা ছিলেন সুপ্রিম কমান্ডার। ঢাকায়...

◆ টিক্কা খান বলেছিলেন যে...

∆ জ্বি হ্যাঁ টিক্কা বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ, শ্যামল প্রান্তর লাল রঙে রাঙিয়ে দিতে হবে। আমার ধারণা, কাজী জাফর তাঁর এক রাজনৈতিক বক্তৃতায় এ কথার উল্লেখ করেছিলেন। তবে সে যাই হোক, একটি ডায়েরিতে লেখা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ মাঠ লাল হয়ে যাওয়া উচিত। ওটা যারই লেখা হোক, লেখাটা দেখানো হয়েছিল, ভুট্টো বা শেখ মুজিবকে দেখানো হয়েছিল, ঢাকায় দেখানো হয়েছিল। এখন ভুট্টো বা মুজিব কেমন লোক তা তো তাঁরা জানেন। মুজিব এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি কিন্তু ভুট্টো তা ফাঁস করে দেন। তাঁদেরকে ঐ ডায়েরিটা তারিখসহ দেওয়া হয়।

◆ আমরা এখন সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইছি আপনার কাছে পূর্ব পাকিস্তান ট্রাজেডির শেষের দিকটায় যে বুদ্ধিজীবী নিধন ঘটে তার জন্য দায়ী কারা। রাও ফরমান দাবি করেছেন, তিনি এ সবের কোন কিছুতে জড়িত নন।

∆ বুদ্ধিজীবীরা আমার কাছে কোন তাৎপর্যের অধিকারী ছিলেন না। আমার ছিল অস্ত্রধারী দুশমনদের নিয়েই মাথাব্যথা। তাই বুদ্ধিজীবীরা আমার কোন বিষয় নয়। তবে আলতাফ গওহর একথা উল্লেখ করেছেন যে, কেউ একজন আমাকে জানায় যে, ফরমানের কাছে বুদ্ধিজীবীদের একটা তালিকা রয়েছে। আমি সেটার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য কেউ একজনকে পাঠাই আর তার অনুরোধে রাও ফরমান ঐ তালিকা থেকে দু'টি নাম কেটে বাদ দেন। আমি বিষয়টা জানতাম না। আমি এটি আলতাফ গওহরের কাছ থেকেই জেনেছি।

◆ তাহলে, ফরমান ছিলেন এর নেপথ্যে?

Δ সেটা হয়ে থাকতে পারে।

◆ হয়েছিল কি না?

Δ আলতাফ এ বিষয়ে কিছু লিখেছে, আপনারা সেটা জানেন। আমি কেন এসব করতে যাব? কেন এমন তালিকা রাখার দরকার আমার হবে। আমি তো যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলাম।

◆ আমি আসলে সে কথাই বলতে চাচ্ছিলাম। তবে আমি বলতে চাই এ কথাই যে, আপনার ও বিষয়ে জানা থাকারই কথা, কেননা...।

Δ আমি আপনাকে বলি, আমি বাঙালীদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এ জন্য যে, তাদের প্রায় সকলেই ভারতের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে খুশি হতে পারেনি। তারা এ জন্য এটাকে দোষারোপ করছিল। আমি তাদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া এতোগুলো লোকের (?) বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারতাম না। আমি তো আর ফেরেশতা নই।

◆ আপনি এখানে ফিরে আসার পর আপনাকে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় কাটাতে হয়েছে—সেটা আপনিই এখন বুঝছেন, সে অবস্থায় আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি কী ছিল সেটা জানতে পারি, জেনারেল নিয়াজী? আমার একথা বলার কারণ, এখানকার মানুষ তো পাকিস্তানীই ছিল, তারাই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছে—তারাই পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রণেতা?

Δ আমি আপনাকে একটা কথা বলি...।

◆ আপনার কি মনে এমন সন্দেহ ছিল যে, ওরা ঠিক যথার্থ পাকিস্তানী নয়?

Δ আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, তাঁরা মুসলমান।

◆ তাহলে সেটাই আপনার ধারণা?

Δ আমি ওটাই লক্ষ্য করেছি। আমি ওটা আগে থেকেই জানতাম। কেননা, ওরা এখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৬৫-র যুদ্ধে লড়েছে।

◆ কিন্তু ঐ সেনাদের মস্তিষ্ক ধোলাই হয়েছিল যাদের দিয়ে তাদের তো সবাই প্রায় ছিল হিন্দু। আপনিই...।

Δ না, না, তা নয়। ওরা সবাই দেশপ্রেমিক। একটা কাহিনী বলি, শুনুন। একটা প্রাণবন্ত হিন্দু তরুণ ছিল। তার বাড়ি দেশের একেবারে ভিতরের দিকে কোথাও। একদিন হলো কী, আমার রক্ষী তাকে কী কারণে যেন এই বলে হুমকি দেয় যে, আমি তোমাকে খুন করব। সে ছেলেটি রক্ষা পেতে আমার শরণাপন্ন হলো। মায় নে কাহা, কিউ, ইসকো তুম মারতে? তুম শায়েদ উনকো মারদে, তো মায় ভি তো হোক সাকতা, তুম মুঝে মারদে? ইন লোককো তুম মারতা একেলে, তো মারো, মায় একেলে, মারো। আমি আমার চায়নিজ রাইফেল তার হাতে তুলে দিয়েই কথাগুলি বললাম। বললাম যে, করছটা কী, নিজের কাজ করো, যাও, ভাগো! আমি আপনাকে বলেছি, আমার এ ধরনের ভাবনার কোন অবকাশই ছিল না। আমি ছিলাম এসব থেকে অনেক দূরের লোক। আমি আপনাদেরকে বলেছি, জেনারেল হামিদ কিছু পরিকল্পনার

কথা বলছিলেন, আমি বলেছিলাম, বাঙালীরা সঙ্কটের একটা জটিল, নাজুক প্রকৃতির রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে রাজি। কেননা, ঐ সময় ফজলুল কাদের চৌধুরী আমার কাছে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করছিলেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন, আমি ঐসব লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে চাই কি না। তারা এখন আমাদের কথা শুনতে তৈরি। তিনি আমাকে একথাও বলেছেন, নিয়াজী, এ নিয়ে খুব তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই যদিও এটা তোমার জন্য খুব শক্ত ব্যাপারই বটে, বিশেষ করে, ব্যাপারটা যদি নাজুক ও জটিল প্রকৃতির হয়। শুধু দ্যাখো একটা রফার প্রস্তাব তোমাকে দেয়া হয় কি না। কেননা ওরা তো আর রাজনৈতিক সমাধান চায় না। এই রাজনৈতিক সমাধান ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর স্বার্থের পরিপন্থী। তারা এটা চায় না। নভেম্বর অবধি রাজনৈতিক সমাধানের একটা সম্ভাবনা ছিল। হতেও পারত। ভুট্টো যখন জাতিসংঘে যান তখনও রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল। এটা সম্ভব হতে পারত শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। পরে বাঙালীদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করলেই চলত। সেটিই হতো রাজনৈতিক নিষ্পত্তি। তাতে কোন আত্মসমর্পণের প্রয়োজন হতো না। কিছুই দরকার হতো না। কিন্তু সেটা যে হবার নয়। আত্মসমর্পণের বিষয়ে একটি বিষয় বলার আছে। আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। আমি পরাজিত হইনি। আমাকে পরাজিত করা যেত না। সেটা যদি করতেও হতো আমি আমার অবস্থা বুঝে সেটা তো করতে পারতাম। ওরা তো ওখানে বসে সময় কাটাচ্ছিল আর তাদের সিনিয়র ভূমিকা জায়েজ করছিল। ফলে তারা এখানেও হারে, পশ্চিম পাকিস্তানেও পরাজিত হয়। মালিক তাঁর সম্পর্কে লেখেন ইয়াহিয়াকে এই মর্মে সতর্ক করে যে, জেনারেল নিয়াজী যদি এখানে আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানও হারাতে হবে। এই মালিক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, সামরিক আইন প্রশাসক সবকিছু। সেই তিনিই একথা বলেন। এখন সেনাবাহিনী একই কথা বলে যে, এক আদেশে জানানো হয় যে, আমাকে... সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

◆ আমার জিজ্ঞাসা হলো আপনি বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অনেক ভাল মুসলমান। তাহলে আপনি 'বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান' বা পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকতা (?) বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন? এই বিশ্বাসঘাতকতার অর্থ কী? পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম যদি অনেক ভাল মুসলমানই হয়ে থাকে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকতা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন? এর পুরোটাই তো ছিল...।

∆ পশ্চিম পাকিস্তানের কথা বলছেন? ঠিক তা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিশ্বাসঘাতক ছিল না। ছিল না পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণও। এ জন্য দায়ী যারা পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতায় ছিল, তারা ছিল সবকিছুর কর্ণধার... ইয়াহিয়া ও ভুট্টো... পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ এখনও পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের লোকজনকে পছন্দ করে, ভালবাসে। বরং নাটের গুরু হলো ঐ সব লোভী লোক যারা তাদের ওপর শাসন চালাতে চেয়েছিল। আমি পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে দোষ দেব না।

◆ আপনি বলেছেন যে তিন হাজার অফিসারকে হত্যা করা হয়। তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের ধর্ষণ করা হয়। আপনার এ খবরের সূত্র কী?

∆ এ ঘটনা ঘটেছিল।

◆ কিন্তু এ খবর তো খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। আমরাও এ রকম কোন খবর পাইনি। আপনার সূত্র কী?

∆ সূত্র হলো সংশ্লিষ্ট অফিসার ও ধর্ষিত মহিলারা। তারাই বলেছে।

◆ কিন্তু এ সংখ্যা আপনারা স্থির করলেন কী করে?

∆ কারণ, আমরা তো ওখানে ছিলাম।

◆ কিন্তু আমি যদি বলি যে, ঘটনা আদৌ ঘটেনি, সে ক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন? ওটা কি কোন রিপোর্ট ছিল?

∆ ওটা একটা রিপোর্ট।

◆ ওটা একটা অনুমান কেননা এমনকি রাও ফরমান আলী ও আরও অনেকে বলেছেন যে, এটা হওয়া সম্ভব নয়।

∆ আমার সূত্র জানিয়েছে, ওরা আর ফিরে আসেনি।

◆ কিন্তু আপনি তো বললেন, অফিসারদের স্ত্রী ও কন্যারা ধর্ষিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। তাই আমি জানতে চাই, আপনি কোন্ সূত্রে এ খবর পেয়েছেন?

∆ সূত্র...। সূত্র আমি দিইনি। কেননা, ঐ সব ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যারা পালিয়েছিল ও ফিরে এসেছিল তারা আমাকে বলেছে। সে সব বিবরণই আমি বইতে দিয়েছি। ওদের বর্ণনা খুবই মর্মান্তিক।

◆ তাহলে এসব আপনার বইয়ের কথা। ওটা থেকেই তথ্যগুলো আসছে?

∆ না, আমি অবশ্য বলতে চাচ্ছি না যে আমি ভুল করতে পারি না, ভুল হতেই পারে।

◆ তাহলে কখনও-সখনও আপনার এমনও মনে হয় যে, কিছু কিছু ভুল আপনি করেছেন?

∆ আমি? হ্যাঁ, আমি তো করেছি। এখন আপনাদের মতো ব্যক্তিদের হাতে তো অনেক রকম উপকরণ, সরঞ্জাম ইত্যাদি রয়েছে যার সুবাদে ঘটনার উৎসে গিয়ে পৌঁছতে পারেন আমাদের কেউ না কেউ, কোন না কোনভাবে। কেননা, আপনারা তো জানেন, প্রতিটি হিন্দুই একজন শিবাজি; তারা যা-ই করুক না কেন তা অহিংস হতে পারে না। ওরা আমাদেরকে নির্মূল, উৎখাত করতে চায়। আপনাদেরকে ধ্বংস করা ওদের পক্ষে কঠিন কাজ নয়। ওদের কারণেই আমরা বিচ্ছিন্ন, একাকী। আমাদের এক হতে হবে।

◆ কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান মানে আমি বলতে চাই বর্তমান পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তাদের তো ভাল সম্পর্কই রয়েছে। যদি তাই না হবে, আমি তো করাচী, লাহোর, ইসলামাবাদের সকল দোকানপাটে ভারতীয় সঙ্গীতের টেপ রেকর্ডিং, সিডি দেদার বিক্রি হতে দেখলাম। এসবের প্রভাব তো খুবই বেশি রকমে ভারতীয়! তাহলে এটা কেন?

∆ করাচীতে আমি ও আপনি...

◆ **এমনকি, আপনার এই লাহোরেও তাই। আপনার এই নগরীতে অমিতাভ বচ্চনের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করেছি!**

▲ তাহলে আমাকে বলতে দিন। শিখরা এখন সঠিক পথে আসতে শুরু করেছে।

◆ শিখরা হিন্দু নয়!

▲ না। কিন্তু ওরা আমাদের সীমান্তের ওধারেই তো রয়েছে।

◆ কিন্তু ওরা তো হিন্দু নয়। আমি বলতে চাই পাকিস্তানীরা খুব বেশি রকমে ভারতীয়দের প্রভাবে প্রভাবিত। অন্তত দেখেশুনে তো তাই মনে হয়। যদি তাই না হবে তাহলে আপনাদের এত হিন্দুস্থানী মিউজিক প্রীতি কেন? আপনারা এসব এত দেখেন-শোনেন কেন?

▲ আরে গানবাজনার ব্যাপার তো আলাদা!

◆ আমরা তো যুক্তিতর্কের কথাই বলছিলাম, তাই না? প্রয়োজনের কথা বলছেন? সে কথা তো আলাদা।

▲ বিষয়টি তো আলোচনা হচ্ছিল ধর্মীয় আলোকে, তা নইলে...। অন্যথায় আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীরা অনেকের তুলনায় ভাল মুসলিম।

◆ বলতে চাচ্ছেন ব্যবহারিক আচার-আচরণেও মুসলিম?

▲ ইসলামের প্রশ্ন যদি আসে, আমরা সেটিকেই সবার আগে স্থান দেব...।

◆ সত্যি বলছেন?

▲ ধর্মের দিক থেকে আমি অনেক ভাল মুসলমান। নামাজ, রোজা...।

◆ নামাজ, রোজা...।

▲ আমাদের সবাই করে।

◆ আপনি তাহলে ব্যবহারিক আচার-আচরণেও উন্নত মুসলমান?

▲ ভাল, হ্যাঁ, ভাল মুসলমান, ইসলামের প্রশ্নে সহানুভূতিশীল... ইসলামের মহান কারণে নিবেদিতপ্রাণ।

◆ তার মানে, আপনি ধর্মাচরণ করেন ধর্মে বিশ্বাস না করেই...।

▲ না, না, তা নয়। যদি কখনও ইসলামের জন্য কোরবানির প্রশ্ন আসে, আমরা এগিয়ে যাব।

◆ বাঙালীর মেজাজে?

▲ না। আসুন, তিনটি মেয়াদের বা আমলের কথাই ধরা যাক। এক. ইয়াকুবের আমল, দুই. টিক্কার আমল আর তিন. আমার সময়। আমার আমলে আমি সবকিছু (অনৈসলামিক?) বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যদি কারও মধ্যে এ রকম কোন কিছু ধরা পড়ত তাকে জেলে যেতে হতো। তার কোর্ট মার্শাল করা হতো। আমি এ রকম কেসে ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে ফেরত পাঠিয়েছিলাম। একই ব্যবস্থা জুটেছিল ব্রিগেডিয়ার রেজা আরিফের কপালেও। আমি কেবল তাদের ফেরতই পাঠাইনি, তাদের শাস্তিবিধানও করেছিলাম।

◆ কিন্তু আপনার বৈরীরা তো বলে অন্য কথা। আপনি ওদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন আপনার হুকুম ওরা তামিল করেনি বলে।

▲ কেউ নিয়াজীর কথার অবাধ্য হয়নি। '৬৫-র যুদ্ধের সময় কেউ একজন এ রকম অবাধ্য হয়েছিল আর আমি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। আপনি সেনাবাহিনীর যে কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, কেউ নিয়াজীর কথা অমান্য করার সাহস করেনি।

◆ সেনাবাহিনীতে আদেশ পালনে অস্বীকৃতি বলে কোন কথা নেই?

▲ আমি এখানে আপনাদের একটা কথা বলে রাখি। সে সময়ে কোন হিন্দু ইতিহাস লেখেনি।

◆ এটা তো এখন স্বাধীন দেশ। এখানে এসব ঘটছে।

▲ আমি আজকের কাগজে দেখলাম, এসব এখন হিন্দু পণ্ডিতেরা লিখছেন।

◆ হিন্দু পণ্ডিত?

▲ হ্যাঁ, এই তো আজকের *জং*-এ ছাপা হয়েছে। ওতে দেখলাম, ইতিহাস লিখছেন এক হিন্দু পণ্ডিত। আমি বিশ্বাস করি...।

◆ জগজিৎ সিং অরোরার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

▲ জগজিৎ সিং অরোরার ব্যাপারে আমার কথা হলো, তাঁরা আমাদের ওপর আঘাত হেনেছিলেন অনেক উন্নত ও শক্তিশালী অস্ত্র ও শক্তি দিয়ে। আমাদের মধ্যে সেনাশক্তির অনুপাত ছিল ২০:১। ওরা ঢাকার কাছে পৌঁছতে পেরেছিল ১২ দিনে। ইন্দিরা গান্ধীকে হায়দ্রাবাদে আসতে হয়। আমি তাঁদের ২১ দিন ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। আর তারা আমাদের পিছন থেকে আকাশপথে বিমান থেকে আক্রমণ করেছিল। আমার বাহিনী ফিরে আসে। ওরা যখন দেখল ওরা আমাকে পরাজিত করতে পারবে না, তখন তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আমাকে আত্মসমর্পণ করায়। আর এর ফলে অরোরা যদি বিজয়ীই হলো আর এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে গাজীর পর্যায়ে উঠিয়ে দেওয়া হলো, তাকে তো তাহলে একটা কোন সম্মানে ভূষিত করা উচিত ছিল!

◆ জেনারেল জ্যাকব সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? মানে জ্যাক জ্যাকবের কথাই বলছি।

▲ তিনি কিছুই ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাবু প্রকৃতির লোক যেমন ছিলেন আমাদের ফরমান।

◆ তাঁর লেখা বই আপনি পড়েছেন?

▲ না, পড়িনি। বইতে তাঁদের কোন বক্তব্য নেই। তাঁরা কখনও কোন কিছুই রেকর্ড করেননি। যা হোক, জ্যাকব কোন জেনারেল ছিলেন না। তিনি ঠিক আমাদের ফরমান আলীর মতো কেউ ছিলেন। হয়ত পরামর্শদাতা—এ রকম কিছু। সামনে আমি এগিয়ে না যাওয়ায় আমাকে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে পাকড়াও করা হয়।... চোরাগোপ্তা আক্রমণে আটক করা হয়। একইভাবে আটক করা হয় এনকে লারীকে।

◆ ঠিক। আপনি সে কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু দেখুন, আপনার সম্পর্কে জ্যাক জ্যাকব কিছু মন্তব্য করেছেন তাঁর বইতে। আপনি যদি তাঁর বইটি পড়তেন বেশ চমৎকার হতো।

কিন্তু আমার যদ্দূর মনে পড়ে, আপনার আত্মসমর্পণের আগে থেকে জ্যাকব ও অন্যান্য ভারতীয় জেনারেল আপনার সাথে যোগাযোগ রেখেছিল। আমি বলতে চাই ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কদের সাথে আপনার যোগাযোগ ছিল।

∆ আমি বলেছি ওরা ফরমান ও গভর্নর মালিকের সাথে যোগাযোগ রেখেছিল।

◆ কিন্তু ওরা তো ওদের বইতে উল্লেখ করেছে যে, ওরা ফরমান নয় আপনার সাথেই যোগাযোগ রেখেছিল।

∆ আমার কাছে ওদের সাথে যোগাযোগ করার আদেশ আসার পরেই আমি ওদের সাথে যোগাযোগ করি। ঐ আদেশ আসে ১৩ ডিসেম্বর।

◆ কবে আপনি ভারতীয়দের সাথে প্রথম যোগাযোগ করেন?

∆ ১৪ই ...।

◆ ১৪ ডিসেম্বর, ১৪-র আগে নয়?

∆ আর সেটা করা হয়েছিল আমেরিকানদের মাধ্যমে। সরাসরি নয়। যখন অরোরা আমাকে সতর্ক করে দেন তখনও আমার হাতে তিন থেকে চার ডিভিশন সৈন্য ছিল। আর ওরা যখন এলো তাদের মধ্যে ছিল জ্যাকব, আর খারা নামের এক কর্নেল। এই খারারা হলো শিয়ালকোর্টের শিখ বংশোদ্ভূত লোক। মোগল সম্রাটদের আমলে তার পূর্বপুরুষ সরনাম সিং সাঙ্গা ইসলাম গ্রহণ করে হন গোলাম মোস্তফা খারা। এই খারা আমার সাথে দেখা করে একথা-সেকথা আলোচনা করে। সে আমার কাছে জানতে চায় আমাদের কতো... আছে। তার কথার ইশারা আমি ধরতে পারলাম। আমি বললাম, তুমি তো একজন শিখ। তোমার তো শিখের মতোই হওয়া উচিত, তাই নয়? আমার ৯ ব্যাটালিয়ন সেনা রয়েছে। তোমাদের সেনার সাথে আমরা কী আর লড়ব। একগুণ, দ্বিগুণ হয় তাহলে না হয় লড়ার প্রশ্ন উঠতেও পারে। সে আমাকে জেনারেল অরোরার নির্দেশ পড়ে জানিয়ে দিল, আমাদেরকে ফোর্ট উইলিয়মে যেতে হবে।

◆ এটা কোন্ সময়ের কথা?

∆ সে আসার পর, আর তখনই আমরা কোলকাতায় যাই। তখন ২০ ডিসেম্বর কিংবা ২১ ডিসেম্বর।

◆ আপনাকে কি যুদ্ধবন্দী হিসাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?

∆ না।

◆ কিন্তু রাও ফরমান আলী তাঁর বইয়ে...।

∆ তিনি তা লিখে থাকতে পারেন। না, আমাকে নয়।

◆ কিন্তু আপনার এ বিষয়ে কিছু জানা নেই?

∆ ওরা তো আমাকে নিয়ে গেল। আমি ভারতীয় অফিসারদের সংস্পর্শে গেলাম। আমাকে সেখান থেকে ভারতের আরও ভিতরে যেতে হয়। এখন আপনি ধরুন দূরে রয়েছেন সেই সুযোগে আমি যা কিছু বলিনি সে রকম কিছু ফাঁস করে দিতেও পারি!

◆ **এখন একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরে আপনার অনুভূতি কী, কেমন ছিল বলবেন? আপনি তো বলেন, দিনটি ছিল হিন্দুদের কাছে আত্মসমর্পণের দিন...।**

▲ ওহ্! সেদিনই তো আমার আত্মসমর্পণের দিন। আমি সেদিন চুপচাপ কাটিয়েছি। ম্যায় খামুশ থা। কিয়া কারু। দেখুন, সেনাবাহিনী কার্যত একটা ঘোড়ার মতো। ইয়াকুবের অধীনে আমাদের সেনাবাহিনীর কোন কিছু করার ছিল না। সেই একই সেনাবাহিনী টিক্কার অধীনে মানুষ মারতে শুরু করে দেয়। সেই একই সেনাবাহিনী পরে লড়েছে... লড়েছে কার্যত ক্লান্ত, শ্রান্ত ঘোড়ার মতো। এর আচরণ ছিল তারই সওয়ারের মতো। সওয়ার যদি দক্ষ না হয় তাহলে ঘোড়া লাথি মারে। যদি সওয়ার সুদক্ষ অশ্বারোহী হয় তাহলে সে ঘোড়া ছোটে তীর বেগে। শিকারী কুকুর আপনার শিকারকে আমন্ত্রণ করে, পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে যায় খাঁচায় ঢোকাতে, ওতে এক রকমের অদ্ভুত মজা আছে। একই কথা বলা যায়, শাহীন বা শিকারী বাজপাখির বেলায়। একই কথা সেনাবাহিনীর বেলাতেও। শিকারীর জানা উচিত কখন সে বাজকে তার মুঠো থেকে মুক্ত করে দেবে। কখন সে শিকারী কুকুরকে ছেড়ে দেবে শিকারের পিছনে...।

◆ **আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, অর্থাৎ আমি বলতে চাই এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কত লোক প্রাণ হারিয়েছে বলে আপনি মনে করেন?**

▲ আমাদের পক্ষে আনুমানিক ৩০ হাজার, হিন্দুরা আরও বেশি মারা গেছে, আর মুক্তিবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা তার চেয়েও বেশি।

◆ **আর অসামরিক লোকজনের ব্যাপারে কী বলবেন আপনি?**

▲ টিক্কা খান যে এ্যাকশনের আদেশ দেন তাতে ৫০ হাজার লোক নিহত হয়।

◆ **আর পরের বাকি সময়ে?**

▲ তেমন বেশি নয়।

◆ **আমি জানতে চাই আপনাদের এ জন্য একটা অফিসিয়াল হিসাব তো থাকতে পারে! রেকর্ড নিশ্চয়ই আপনাদের আছে। এ ধরনের কি কোন সরকারী রেকর্ড ছিল না?**

▲ আমরা সে কথার উল্লেখ করেছি। আমরা ওটা সংগ্রহ করেছিলাম। আমরা একটা সিচুয়েশন রিপোর্ট তৈরি করতাম। তাতে হতাহতের সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য থাকত।

◆ **ওটা তো আপনারা করতেন যুদ্ধ চলাকালে। যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় ৩ ডিসেম্বর রাতে।**

▲ ২১ নভেম্বর। ভারত এই দিন আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে।

◆ **তারা তো পুরোপুরি আধিপত্যমূলক অবস্থাতেই ছিল। ওদের সাথে কোন সামনাসামনি লড়াইয়ের প্রশ্নই তো ছিল না।**

▲ এখানে মুক্তিবাহিনীর লোকজনের হতাহতের সংখ্যা দেয়া হয়েছে ৩০ হাজার।

◆ **কিন্তু আমি তো অসামরিক লোকজনের কথা বলছি।**

▲ আমাদের কাছে সে হিসাব নেই। আমরা তো সিভিলিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করিনি।

◆ **আপনি কি জানেন, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে জড়িয়েছিল?**

∆ না, আমার ৩৮ হাজারের মতো সৈন্য ছিল। ওরা অকাতরে মারা পড়ছিল। তাই আমাকে মৃত সৈনিকের স্থান পূরণ করতে হতো। আমি এসব আল-বদর ও আল-শামসদের বিভিন্ন সেনা ডিভিশনে নিয়োগ করতাম। সেনা ডিভিশনগুলো তাদের কাজে লাগাত—সেটি অন্য কথা। এই সব আল-বদর ও আল-শামস অনেকে দলছুট হয়ে পালিয়ে গিয়ে এটা-সেটা তখন করেছে। তাদেরকে একটা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়োগ করা হয়। তাদেরকে ব্যবহারও করা হয় সেভাবেই। এখন যদি ওরা বাড়াবাড়ি কিছু করে থাকে সেটা নিশ্চয় করে বলার জন্য সময় লাগবে। তাছাড়া ওদের হাতে অস্ত্রও তো দেয়া হয়েছিল।

◆ **বাংলাদেশে কী ধরনের এ্যাকশন নেয়া হয়?**

∆ এটা তো জানা। ২৫/২৬ মার্চ এ্যাকশন শুরু হয়। খবর ছিল, মুজিব ঐ রাতে এ্যাকশন নিতে যাচ্ছেন। আমরা তার মোকাবিলামূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়েছিলাম।

◆ **আপনি কি বিশ্বাস করেন মুজিব সেটা করতে যাচ্ছেন?**

∆ হ্যাঁ। তিনি তখন অনেক ওপর দিয়ে উড়ছেন। তিনি অত্যন্ত অনমনীয়। আর আমি বলি ইয়াকুব যদি তাঁকে সময়মতো নিয়ন্ত্রণে আনতেন কোন কিছুই ঘটত না। আমি আগে যে রকমটা বলেছি, ইয়াকুব যদি কাজটা ঠিকঠাক করতেন, টিক্কা আসতেন না। নিয়ন্ত্রণ করতেন, কিছুই ঘটত না। সামরিক এ্যাকশনের দরকার হতো না। আমি সেখানে যেতাম না। যা কিছু করা হয়েছে ওখানে কোন কিছুই করার দরকার হতো না। মুজিবকে যদি ক্ষমতা দেয়া হতো, যে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছিল—সে ক্ষেত্রে এতসব ঘটনা ঘটত না। তিনি নির্বাচনে জিতেছিলেন, তাঁকে ক্ষমতা না দেয়াটা অন্যায় হয়েছে। ভুট্টো সে ক্ষমতা দিতে দেননি যা তাঁর প্রাপ্য ছিল।

◆ **আপনি আপনার বই উৎসর্গ করেছেন রাজাকারদের উদ্দেশে, আপনার সৈনিকদেরকে নয়, কেন?**

∆ আমাদের একটা কর্তব্য ছিল আর তা পূরণ হয়েছে। ওরা এসেছিল স্বেচ্ছায়।